হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
রানি শেবার আংটি
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

অনুবাদ

রানি শেবার আংটি

মূলঃ হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান

কথা ছিল, চিরশত্রু ফাংদের কবল থেকে আমার অপহৃত ছেলেকে উদ্ধার করবেন আবাটিদের রানি, তবে তার আগে ফাংদের সিংহ-মাথার দেবতার বিশাল মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ফিরে এলাম লণ্ডনে। খুঁজে বের করলাম পুরনো এক বন্ধুকে, সঙ্গে জুটে গেল আরও দু'জন। রাইফেল আর ডিনামাইটের বহর নিয়ে আমরা চার জন রওয়ানা হয়ে গেলাম মিশরের উদ্দেশে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল পথপ্রদর্শক শ্যাডর‍্যাক, ধরা পড়ল আমার বন্ধু, সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেয়া হলো ওকে। ওদিকে রানির প্রেমে বুঁদ হয়ে গেল আমাদের দলনেতা অলিভার, শোধ নিতে প্রস্তুত হলো রানির হবু স্বামী সেনাপতি যশুয়া, গভীর রাতে অলিভারের ঘরে ছুরি নিয়ে ঢুকল আততায়ী। মাহেন্দ্রক্ষণে ফাঁস হলো ষড়যন্ত্রঃ সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রহরীদের, এবার অপহৃত হয়ে যেতে পারেন রানি নিজেই। শুরু হয়ে গেল আবাটিদের গৃহযুদ্ধ, রানির প্রাসাদে লাগল আগুন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হলাম আমরা, যার রায় হতে পারে একটাই—মৃত্যুদণ্ড! বজ্রাহতের মতো প্রত্যক্ষ করলাম আমরা রানির ছলনাময়ী রূপ।

তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.boiRboi.net

এক

আমার এক বন্ধু আছে, নাম টলেমি হিগস। প্রফেসর হিগস বললে ওকে আরও ভালো করে চেনে লোকে। উত্তর-মধ্য আফ্রিকার "মুর" নামের প্রাচীন এক দেশ নিয়ে লেখা ওর সেই বিখ্যাত বইটার কথাও জানে অনেকে। ওই বই-এ পর্বতঘেরা ছোট্ট ওই দেশটার বর্ণনা দিয়েছে সে, বলেছে ওই দেশের অধিবাসী ইথিয়োপিয়ান ইহুদী উপজাতিদের কথা। যা-হোক, শত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা নেহাত কম নয় হিগসের, সুতরাং বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর ওকে একহাত দেখে নেয়ার সুযোগ ছাড়তে চাইল না অনেকেই। একটা উদাহরণ দিই। আজ থেকে কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে লেকচার দিত এমন এক লোক পত্রিকায় চিঠি লিখে জানাল, হিগস নাকি উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মুর-এ যায়নি, বিশাল এক কচ্ছপের উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল সেখানে।

এসব বিদ্রূপাত্মক চিঠি পড়ে স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল হিগসের। অপমান হজম করার লোক নয় সে, সুতরাং গণ্ডারের চামড়া দিয়ে বানানো একটা চাবুক, মিশরীয়রা যাকে বলে "কুরবাশ", নিয়ে বের হলো বাসা থেকে। উদ্দেশ্য—চামড়া তুলে ফেলবে ওই লেকচারারের। লোকটাকে চিনি আমি—ছোটখাটো একজন মানুষ, কলম হাতে যেমন সাহসী তেমনই বিদ্বেষী কিন্তু এমনিতে লাজুক; কাজেই দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাসায় ফোন করলাম, বললাম যত জলদি সম্ভব পালিয়ে

যেতে। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাড়াহুড়ো করে ফোন নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক। পরে শুনেছিলাম বাড়ি ছেড়ে শুধু পালিয়েই যাননি তিনি, বাঘা বাঘা উকিলদের সঙ্গেও নাকি যোগাযোগ করেছিলেন।

পাঠকরা হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, নাম বা টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে নয়, আসল ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্যই কলম ধরতে হয়েছে আমাকে। আমরা কোথায় ছিলাম না-ছিলাম, আমাদের কী হয়েছিল আর কী হয়নি সেসব নিয়ে এত বেশি গুজব চালু হয়ে গেছে যে, আমাদের পক্ষ থেকেও কিছু বলাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিগসকে ব্যঙ্গ করে লেখা পত্রিকার চিঠিগুলো পড়ছিলাম আজ সকালে নাস্তার আগে। লোকের উপহাস একটু একটু করে চেপে বসল মনের উপর, একসময় আর সহ্য করতে না-পেরে সব খুলে বলার অনুমতি চেয়ে ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্মকে টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হলাম। এই অলিভারই আমাদের গল্পের নায়ক–অবশ্য সত্যিই যদি এ-কাহিনির কোনো নায়ক থেকে থাকে। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে সে, ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ এখানে তো কাল ওখানে। এই মিনিট দশেক হলো টোকিয়ো থেকে ওর উত্তর এসে পৌঁছেছে আমার কাছে:

"ভালো লাগলে, দরকার মনে করলে, যা খুশি করুন। আমেরিকা হয়ে ফিরবো। জাপান দেশটা সুন্দর।"

এরপর ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার নিয়ে অযথাই বকবক করেছে সে—টেলিগ্রাম করার সুযোগ পেলে কথা বেশি বলে ফেলাটা ওর স্বভাব।

মূল কাহিনিতে যাওয়ার আগে পাঠকদের সুবিধার্থে নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলি।

আমার নাম রিচার্ড অ্যাডামস। বাবা ছিলেন কাম্বারল্যাণ্ডের এক কৃষক আর মা ওয়েলশের সাধারণ এক মহিলা। সে-হিসেবে

boiRboi.net

সেল্টিক রক্ত বইছে আমার দেহে। আর এ-কারণেই হয়তো ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছোটবেলা থেকেই। গত জন্মদিনে বয়স পঁয়ষট্টি বছর হলো আমার। বলতে ভালো লাগে না, তারপরও বলতে হয়—বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল প্রায়ই টের পাই আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আয়নার সামনে যখন দাঁড়াই, নিজের লম্বা, একশ' চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের রোগাটে শরীরটা দেখে মায়াই হয়। আমার চোখের মণি বাদামি, মুখ লম্বাটে, গালে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, মাথায় সাদা চুল। যতবার নিজেকে দেখি বুড়ো ছাগল বলে মনে হয়; মনে পড়ে যায় একসময় যখন বন্দী ছিলাম আফ্রিকার মরুভূমির এক উপজাতীয় লোকদের হাতে, ওরা আমাকে "সাদা ছাগল" বলে ডাকত।

পেশায় ছিলাম ডাক্তার। "বার্টস"-এ যখন পড়তাম, ছাত্র হিসেবে ছিলাম মাঝারি মানের। ডাক্তার হিসেবেও নামকরা কেউ না। ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল বলে বাড়ির প্রতি তেমন টান ছিল না আমার। বরং ঘুরে ঘুরে দুনিয়া দেখার অদম্য ইচ্ছা ছিল মনে। আর ঘুরেছিও প্রচুর—আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল এমন কোনো জায়গাই বাদ রাখিনি বলতে গেলে। ডাক্তার বলে পেট চালাতে অসুবিধা হয়নি কখনও, নাম করতে না-পারলেও বিদ্যাটা খারাপ জানি না।

আমার বয়স যখন চল্লিশ তখন ছিলাম কায়রোয়। কথাটা বলছি কারণ ওখানেই হিগসের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। ওর বয়স তখন কম, কিন্তু তারপরও প্রাচীন নিদর্শন আর ভাষাতত্ত্বের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে অনেকের কাছেই একনামে পরিচিত সে। লোকে বলত, হিগস নাকি কম করে হলেও পনেরোটা উপজাতীয় ভাষা জানে এবং ওর জন্য হায়ারোগ্লিফিক্স পড়াটা নাকি গির্জার বিশপের "টাইমস" পড়ার মতোই সহজ একটা কাজ।

যা-হোক, একবার বাড়াবাড়ি রকমের টাইফয়েড হলো

boiRboi.net

হিগসের। প্রাচীন জিনিসপত্র যোগাড় করতে করতে টাকা-পয়সা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল বেচারার, তাই নিখরচায় ওর চিকিৎসা করলাম। ছোট্ট ওই উপকারের কারণেই আমার ভালো আর বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হলো সে।

কায়রোয় থাকাকালীন সম্ভ্রান্ত বংশের এক উচ্চশিক্ষিত মিশরীয় খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করি আমি। আমার মতো একজন লোকের পক্ষে, যার কি না নিজের দেশ আর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বছরের পর বছর ধরে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর নেশা, ওই মেয়েকে নিয়ে সংসার করা ছিল বিপজ্জনক একটা কাজ। বিপজ্জনক বলছি কারণ আমার স্ত্রীর আত্মীয়রা ভালো চোখে দেখত না আমাদেরকে। সুতরাং কিছুদিন কায়রোয় থাকার পর আসোইউয়ান নামের একটা শহরে চলে যেতে বাধ্য হই আমরা। কিন্তু সেখানেও টিকতে পারলাম না বেশিদিন, চলে গেলাম বলতে গেলে এক অজপাড়াগাঁ-এ, নাম বললে কেউ চিনবে কি না সন্দেহ। হয়ে গেলাম উপজাতীয়দের ডাক্তার। হাতুড়ে ডাক্তারের বদলে আধুনিক ডাক্তার পেয়ে অনেক উপকার হলো ওদের, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত উপজাতীয়দের কাছে পরিচিতি পেলাম ঠিকই কিন্তু অস্বচ্ছল হয়ে গড়লাম। তারপরও ছোট্ট একটা সুখের সংসার ছিল আমাদের, প্রেম-ভালোবাসার অভাব হয়নি কোনোদিন। কিন্তু সুখ সইল না কপালে—সব ডাক্তারের বড় ডাক্তার, জীবন-মৃত্যু যাঁর হাতে তাঁর ইচ্ছায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল আমার স্ত্রী। আমার জীবনেও হাসি-আনন্দ বলে আর কিছু বাকি থাকল না। তারপর একদিন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ল—রডরিক নামের বারো বছর বয়সী একটা ছেলে ছিল আমাদের, একমাত্র সন্তান, মিশরীয় এক উপজাতীয় গোত্রের লোকরা অপহরণ করল ওকে।

আসলে ওই ঘটনার পরই শুরু হলো আমার এই গল্প। আমি ছাড়া এ-কাহিনি লেখার কেউ নেই। কারণ অলিভার লিখবে না,

হিগসেরও কোনো আগ্রহ নেই। সুতরাং আমাকেই লিখতে হবে। পড়ে যদি কারও কাছে ভালো না-লাগে, ইন্টারেস্টিং মনে না-হয়, তা হলে দোষ কাহিনির নয়, আমারই, অথবা বলা ভালো আমার লেখনী ক্ষমতার। কারণ আমরা যারাই জড়িত ছিলাম এ-ঘটনার সঙ্গে তাদের সবার কাছেই ব্যাপারটা জীবনের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয়ে রয়েছে।

আর ভূমিকা না-করে মূল কাহিনিতে যাই এবার।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায়, জীবনের অর্ধেকটা লণ্ডনের বাইরে থাকার পর ফিরে এলাম নিজের জন্মশহরে, সোজা গিয়ে হাজির হলাম হিগসের বাসায়। গিল্ডফোর্ড স্ট্রিটে থাকে সে। আমার টোকার আওয়াজ শুনে সদর দরজা খুললেন হিগসের হাউসকিপার—বুড়ি আর গোমড়ামুখী মিসেস রিড। এখনও যতবার ওই মহিলাকে দেখি, জ্যান্ত একটা মমি বলে মনে হয় আমার। যা-হোক, আমার উদ্দেশ্য শুনে তেতো কণ্ঠে বললেন তিনি, 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনার করছেন মিস্টার হিগস। সুতরাং কষ্ট করে আগামীকাল আসতে হবে আপনাকে।'

'কষ্ট করে আগামীকাল কেন, প্রতিদিন আসতেও অসুবিধা নেই আমার,' হাসার চেষ্টা করলাম। 'আপনি শুধু দয়া করে মিস্টার হিগসের কাছে গিয়ে বলুন তাঁর একজন পুরনো মিশরীয় বন্ধু একটা জিনিস নিয়ে এসেছেন, দেখাতে চান তাঁকে।'

প্রথমে রাজি হলেন না মিসেস রিড। চাপাচাপি করতে হলো ভদ্রতার ধার না-ধেরে। শেষপর্যন্ত আমাকে পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি, অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'সিটিংরুমে আছেন মিস্টার হিগস।' অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে উপরে উঠলাম, থামলাম কিছুক্ষণের জন্য।

ঘরটা বেশ বড় বলা যায়, কারণ উপরতলায় এটা ছাড়া আর কোনো ঘর নেই। ধনুকাকৃতির খিলান দিয়ে ঘরটা দু'ভাগে বিভক্ত। অনেক আগে, রাজা জর্জের আমলে এ-ঘরে ফোল্ডিং

দরজা ছিল। ফায়ারপ্লেসের আগুনের কারণে আমার চারপাশে ছায়া ছায়া অন্ধকার। সামনে একটা টেবিলে ডিনার সাজানো আছে। ঘরের একপাশে প্রাচীন জিনিসপত্রের অসাধারণ সব সংগ্রহ। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস-দিয়ে-রাখা কফিনের ভিতরে খোদাই-করা সোনার মুখওয়ালা দুটো মমি বিশেষভাবে নজর কাড়ল আমার। দূরে, ঘর থেকে বাইরের দিকে বাঁকানো একটা জানালায় ঝুলছে জ্বলন্ত একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প, ওটার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে বই-ভর্তি আরেকটা টেবিল। পাশেই বসে আছে দু'জন লোক—একজন আমার "মেজবান", যার সঙ্গে গত বিশটা বছর দেখাও হয়নি, আরেকজন ডিনার করতে আসা অচেনা সেই ভদ্রলোক।

প্রথমে হিগসের বর্ণনা দিই। ওর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তো বটেই, এমনকী ওর শত্রুরাও স্বীকার করে, প্রাচীন নিদর্শন বা প্রাচীন জিনিসপত্র এবং ইউরোপের মৃত ভাষাগুলোর ব্যাপারে ওস্তাদ সে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের বেঁটে আর মোটাসোটা মানুষটাকে দেখে কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হয় না। গোলগাল, আরক্তিম মুখ ওর। চুল আর দাড়ি আগুনের মতো লাল। বেশিরভাগ সময় বড় একটা নীল চশমা পরে থাকে সে, ওটা সরালে দেখা যায় ছোট ছোট কিন্তু সুই-এর মতো তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ। পোশাকে সে বরাবরই অপরিপাটি; এমন ঢং-এ কাপড় পরে যে, অনেকে বলে ওকে যদি রাতে রাস্তায় দেখে পুলিশ তা হলে নাকি "যা ভাগ্" বলে তাড়াবে।

ওর পাশের লোকটার দিকে তাকালাম। টেবিলের উপর হাত, তার উপর থুতনি রেখে বসে আছে সে; মনোযোগ দিয়ে শুনছে হিগসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ। একনজরেই বোঝা যায় লম্বা আর বলিষ্ঠ যুবক সে। দেহ মেদহীন, কাঁধ চওড়া, বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। মুখ এত বেশি মসৃণ করে কামানো যে, চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখায়, মনে হয় সন্দেহের তীব্র একটা দৃষ্টি

যেন ফুটে বের হচ্ছে। চুল ছোট আর খাড়া খাড়া, চোখের মতোই বাদামি। বিচার-বিবেচনা আর আত্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি চেহারায়। এত কিছুর পরও হাসলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। এই লোকই ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম–ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক একদল প্রকৌশলীর ক্যাপ্টেন। কিছুদিন আগে যুদ্ধেও গিয়েছিল, সৈনিক হিসেবে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণও দিয়েছে সেখানে। তারপরও বলতে হয় বেচারা ভাগ্যবঞ্চিত, যোগ্যতা থাকার পরও উপরে উঠতে পারেনি, সেই বঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশও যেন দেখতে পাচ্ছি ওর ভাবভঙ্গিতে।

টেবিলের উপর রাখা প্যাপিরাস বা ওই জাতীয় কিছু একটা পড়ার ফাঁকে অলিভারের সঙ্গে কথা বলছিল হিগস, আমাকে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কটমট করে তাকাল আমার দিকে। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কে? এই অসময়ে কী চাই?'

'মাথা গরম করবেন না,' পরামর্শ দিল অলিভার অলিভার। 'মিসেস রিড না এইমাত্র বলে গেলেন আপনার একজন বন্ধু এসেছেন?'

'ও, হ্যাঁ, খেয়াল ছিল না। কিন্তু ওর মতো ছাগলা দাড়িওয়ালা কোনো বন্ধু আমার ছিল বলে তো মনে হয় না! ...অন্ধকারে দাঁড়িয়ে না-থেকে সামনে এসো, তোমার চেহারাটা ভালোমতো দেখি।' শেষের বাক্যটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল হিগস।

আগে বাড়লাম। এক-পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে হাজির হলাম ইলেকট্রিক ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে।

'কে? কে?' বিড়বিড় করতে লাগল হিগস। 'তুমি...আপনি কে? এই চেহারা আগে কোথায় দেখেছি? কোথায়? মনে পড়েছে...' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে গেল সে। 'অ্যাডামস, বুড়ো অ্যাডামস। কিন্তু...আমি তো শুনেছি দশ বছর আগেই মারা গেছেন বেচারা। মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, একদল

বেদুইন নাকি ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। ...দয়া করে চুপ করে থাকবেন না, আপনার নামটা বলুন।'

'নামটা ইতোমধ্যেই উচ্চারণ করে ফেলেছ, হিগস,' মুখ খুললাম এতক্ষণে। 'তোমাকে কিন্তু দেখামাত্র চিনতে পেরেছি আমি। আগের মতোই আছে তোমার চুল, পাক ধরেনি এই বয়সেও।'

'আপনাকে দেখে খুব খুশি লাগছে,' চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম আসলেই খুশি হয়েছে হিগস। 'কিন্তু হয়েছিল কী আপনার? আচ্ছা যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, বেঁচে আছেন এ-জন্য ঈশ্বরকে হাজারবার ধন্যবাদ।' দু'হাত বাড়িয়ে আমার দু'হাত ধরল সে, আত্মহারা হয়ে ঝাঁকাতে লাগল জোরে জোরে। একটা আংটি পরে ছিলাম আমি, স্পর্শ পেয়ে তাকাল সে ওটার দিকে। 'কী এটা? এ-রকম আংটি তো দেখিনি আগে কখনও! এটা পেলেন কোত্থেকে? আচ্ছা বাদ দিন, এখন বলতে হবে না। আগে ডিনারটা সেরে নিই চলুন। তারপর দরকার হলে সারারাত কথা বলবো।' ঘুরে তাকাতে গিয়ে অলিভারের উপর চোখ পড়ল ওর। 'পরিচয় করিয়ে দিই। যদিও বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তারপরও আমার বন্ধুই বলতে পারেন একে—ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম। আরবী ভাষার পণ্ডিত বলা যায়। ইজিপ্টোলজি সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানে।'

আমাকে উদ্দেশ্য করে বাউ করল অলিভার।

'সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্য নয় সে,' বলে চলল হিগস। 'যদিও বোয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তিনবার আহত হয়েছে, সবচে' বড় আঘাতটা পেয়েছে ফুসফুসে। ...মিসেস রিড,' গলা চড়িয়ে হাউসকিপারকে ডাকল সে। 'আরেকটা প্লেট দিয়ে যান।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আবার যেদিন মমি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি সেদিন খিদেটা একটু বেশিই লাগে।' আমার জন্য আরেকটা প্লেট আসামাত্র খেতে শুরু করে দিল সে। 'বসে আছেন

কেন আপনারা? তাড়াতাড়ি করুন। আমাকে আবার খাওয়ার পর দশ বছরের কথা একরাতে শুনে শেষ করতে হবে না?'

খেতে শুরু করলাম আমরা। মদ খায় না বলে মদের চাহিদাটা খাবার দিয়ে পূরণ করে নিল হিগস, সবসময় বোধহয় এ-কাজই করে সে। পেট ভরে খেল, খেয়ে শান্তিও পেল, কারণ খাওয়ার পর দেখলাম ওর চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। অলিভার খেল যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই। আর খাওয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই আমার, জীবনের বেশিরভাগ সময় ফলমূল আর শাকসব্জি খেয়েই কাটিয়েছি, তাই কিছুটা খেয়েই খিদা মিটে গেল আমার।

খাওয়ার পর যার যার গ্লাসে মদ নিয়ে বসলাম আমি আর অলিভার। হিগস নিল পানি। সাদামাটির বিশাল এক পাইপ ধরিয়ে কাছে টেনে নিল ওর তামাকের মটকা, যেটা আমি জানি অনেক আগে ব্যবহৃত হতো এক মৃত মিশরীয় বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড রাখার আধার হিসেবে।

'এবার অ্যাডামস,' আমরাও পাইপ ধরাচ্ছি, এই ফাঁকে বলে উঠল সে, 'প্রেতলোক থেকে ফিরে এলেন কী করে সে-কাহিনি বলুন তাড়াতাড়ি। আমার আর তর সইছে না।'

আঙুল থেকে আংটিটা খুললাম আমি। জিনিসটা দেখলে মনে হয় সোনার। বহুল ব্যবহারে রঙ হালকা হয়ে গেছে। তর্জনী বা মধ্যমায় যে-রকম আংটি পরে মহিলারা, ওটা দেখতে অনেকটা সে-রকম। দুর্বোধ্য আর প্রাচীন কিছু অক্ষর খোদাইকৃত একটা নীলকান্তমণি বসানো আছে আংটিটার মাঝখানে। অক্ষরগুলো দেখিয়ে হিগসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়তে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি,' একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে এসে বলল, 'আপনি পারেন না? ও, মনে পড়েছে, আপনি তো আবার পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো ভাষাই পড়তে পারেন না।' বলতে বলতে অক্ষরগুলোর দিকে তাকাল সে এবং একনজর দেখেই বলে উঠল, 'অনেক আগের হিব্রু। কী লেখা আছে শুনবেন? "ঈশ্বরের

প্রিয়, মহান রাজা সলোমনের পক্ষ থেকে, শেবার জ্ঞানী রানি ও সুন্দরী রাজকন্যার প্রতি।" রাজকন্যার হিব্রু প্রতিশব্দ কী লিখেছে দেখেছেন? বাথ-মেলাচিম। আবার রাজা সলোমনকেও হাজির করেছে! যা-ই হোক, জিনিসটা সুন্দর।' আংটিটা চাটল সে একবার, তারপর কামড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'হুঁ, এটা যে বানিয়েছে তার হাত আছে স্বীকার করতে হবে। নীলকান্তমণির মতো দেখতে ওই জিনিসটার দাম অনেক। খোদাই-এর কাজটাও নিখুঁত।' চোখ তুলে তাকাল সে আমার দিকে, 'কোত্থেকে পেলেন এটা?'

'ওয়ালদা নাগাসটা নামের এক মেয়ে দিয়েছে আমাকে। মেয়েটা বোধহয় রাজা সলোমন আর শেবার রানির বংশধর।' আরও কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু অস্বস্তি জাগল মনে। হিগস নিঃসন্দেহে ঠোঁটকাটা, আবার বিশ্বস্তও। কিন্তু ক্যাপ্টেন অলিভারের সঙ্গে আজই পরিচয় হলো আমার। যা বলবো তা গোপন রাখবে কি না সে সেটা নিয়েই আমার ভয়। আরেকবার তাকালাম লোকটার দিকে। বাদামি চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভরসা পেলাম, তারপরও কেমন কেমন যেন করতে লাগল বুকের ভিতরে। ব্যাপারটা টের পেয়ে অলিভার বলল, 'আমার সামনে সব কথা বলতে বোধহয় ভয় হচ্ছে আপনার। ভাবছেন ফাঁস করে দেবো? প্রফেসর হিগসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের খাতিরেও কি আমাকে আপনার গোপন কথাগুলো বলা যায় না?'

'যায়,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে আমাকে জিজ্ঞেস না-করে, আমার অনুমতি না-নিয়ে কাউকে কিচ্ছু বলতে পারবেন না।'

'কথা দিলাম। তবে আমারও একটা কথা আছে। আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। কাজেই আপনি-টাপনি বাদ দিয়ে আমাকে তুমি করে বলতে পারেন অনায়াসে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে শুরু করলাম আমার গল্প,

'মরুভূমিতে বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়েছে আমাকে অনেকদিন। যারা বন্দী করে রেখেছিল তাদের কাছ থেকে কীরকম খাতির-যত্ন পেয়েছি আমার শার্ট খুললেই দেখতে পাবে। চাবুকের দাগ মিলিয়ে যায়নি এখনও। আমি ডাক্তার, তাই আমাকে মেরে ফেলেনি ওরা, নইলে আজ আর এই কাহিনি বলার সৌভাগ্য হতো না আমার। যা-হোক, দিন সবার সমান যায় না—বছর পাঁচেক বন্দী থাকার পর মুক্তি পেলাম। তারপর থেকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিগুলোতে, আমার ছেলে রডরিকের খোঁজে। ...ওর কথা তোমার মনে আছে, হিগস? ও যখন ছোট ছিল তখন ওর কিছু ছবি পাঠিয়েছিলাম তোমাকে, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে বেশি মনে আছে কোন্‌টা জানেন? একবার ক্রিস্টমাসে আমাকে সুন্দর একটা চিঠি পাঠিয়েছিল সে। কিন্তু...ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কেন? কী হয়েছিল ওর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু আমার মানা শোনেনি চঞ্চল ছেলেটা। গুলি করে কুমির মারার জন্য সোজা চলে যায় নদীতে। উপজাতীয় কিছু লোকের হাতে পড়ে বেচারা। ওকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ওরা। তারপর বিক্রি করে দেয় দাস হিসেবে। সেই থেকে শুধু হাতবদল হচ্ছে আমার ছেলেটা, আজ এই গোত্রের কাছে তো কাল ওই গোত্রের কাছে। কতবার যে ওকে হারিয়ে ফেলেছি নিজেও জানি না। কিন্তু আবার ঠিকই খুঁজে পেয়েছি শুধু একটা কারণে—গানের গলা খুবই সুন্দর ওর। উপজাতীয়রা ওকে কী নামে ডাকে জানো? "মিশরের গায়ক"। আর শুধু গানই গাইতে পারে না ছেলেটা, আমার মনে হয় স্থানীয় কিছু বাদ্যযন্ত্রেও হাত এসে গেছে ওর।'

'এখন কোথায় সে?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হিগস, শুনে মনে হলো রডরিকের জন্য আশঙ্কা হচ্ছে ওর।

'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ফাং নামের একদল অসভ্য, অর্ধেক

নিগ্রো উপজাতির হাতে দাস হিসেবে বন্দী ছিল সে। উত্তর মধ্য আফ্রিকার অনেক ভিতরে বাস করে এই ফাংরা। বছরের পর বছর ধরে খুঁজতে খুঁজতে এদের সন্ধান পাই আমি। একদল বেদুইনের সঙ্গে আবার কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন আছে ওদের, কৌশলে ওই বেদুইনদের একজন সেজে হাজির হই ওদের গ্রামের কাছাকাছি। এক রাতে ঘাঁটি গাড়ি এক উপত্যকার পাদদেশে, বিশাল যে-দেয়ালটা ফাংদের গ্রাম ঘিরে আছে সে-দেয়ালের ঠিক বাইরে। দেয়াল বেয়ে উঠে শুনি গ্রামের খোলা সদর-দরজা দিয়ে ভেসে আসছে রডরিকের উঁচু-গলার ইংরেজি গান:

"সঙ্গে থাকো বন্ধু আমার
চলে যেয়ো না রেখে একেলা,
কিছু সময় পর নামবে রাত
নেবে বিদায় সাঁঝের বেলা।"

'মনে পড়ে গেল গানটা আমিই শিখিয়েছিলাম ওকে। কী যে হলো আমার তখন বলতে পারবো না। গিয়ে হাজির হলাম দরজাটার বাইরে, চুপিসারে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, সামনে খোলা একটা জায়গা। বেঞ্চের মতো একটা আসন পাতা, তার উপর বসে আছে একটা ছেলে। ওর দু'পাশে দুটো লণ্ঠন জ্বলছে। ছেলেটার মুখোমুখি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে কিছু লোক। ভালো করে তাকালাম ওর চেহারার দিকে। আলখাল্লা জাতীয় একটা কাপড় পরে আছে সে, মাথায় অদ্ভুত একজাতের পাগড়ি। কতগুলো বছর দেখিনি, ক-ত-গু-লো বছর, তারপরও সে-রাতে দেখামাত্র চিনতে পারলাম, এ আমার ছেলে! স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, "রডরিক! রডরিক!" চমকে উঠল ও, পাগলের মতো তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। ওর সামনে বসা লোকগুলোও চমকে উঠল, একজন দেখে ফেলল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে এল সে আমার দিকে, দেখাদেখি বাকিরাও। কাপুরুষের মতো ছেলের কথা ভুলে

প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটে পালালাম। এক দৌড়ে পার হলাম দরজাটা। দেয়াল বেয়ে যখন নামছি তখন বল্লম আর পাথর ছুঁড়ে মারল ওরা আমার দিকে, আহত হলাম। তারপরও হাজির হতে পারলাম আমার ঘোড়ার কাছে, দেরি না-করে ছুটলাম আমাদের ক্যাম্পের উদ্দেশে। কিন্তু অন্ধকারে পথ ভুল করে চলে গেলাম অন্য কোনোদিকে। এতে অবশ্য উপকারই হলো আমার, কারণ ক্রুদ্ধ ফাংরা গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বেদুইনদের তাঁবুতে। পালানোর সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে আগুনের আলোয় দেখি, কচুকাটা করছে ওরা হতভাগা লোকগুলোকে।

'খাড়া একটা রাস্তা ধরে ছুটে চললাম। আমার চারপাশে তখন শুধু সিংহের ডাক। মনে হচ্ছিল সিংহের কোনো পালের মধ্যে এসে পড়েছি বুঝি। একটা সিংহ তো ধাওয়া করতে শুরু করল আমাকে। ছুটতে ছুটতেই আর্তচিৎকার করতে লাগল আমার ঘোড়াটা। তারপর আর কিছু মনে নেই। কীভাবে পালালাম, কোথায় হাজির হলাম কিচ্ছু জানি না। সপ্তাহখানেক পর হবে হয়তো, জ্ঞান ফিরলে দেখি চমৎকার একটা বাড়ির বারান্দায় শুয়ে আছি আর সুন্দরী এক ইথিয়োপিয়ান মহিলা সেবা করছে আমার।'

'শুনে মনে হচ্ছে ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কোনো উপজাতি হবে আপনার এই ফাংরা,' নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল হিগস।

'হুঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। ওদের ব্যাপারে আরও কিছু বলার আছে আমার, তবে এখন না, পরে বলবো। আসল কথায় ফিরে যাই। আমাকে যারা উদ্ধার করেছিল, তারা আবাটি গোত্রের লোক, থাকে মুর নামের ছোট্ট একটা দেশে। নিজেদেরকে ইথিয়োপিয়ান ইহুদিদের বংশধর বলে দাবি করে। দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল এই ইহুদিরা চার-পাঁচশ' বছর আগে, তারপর

বোধহয় আশ্রয় নিয়েছিল ওখানেই। যা-হোক, আবাটিরা চালচলনে কথাবার্তায় ইহুদিদের মতো, বিকৃত ইহুদি ধর্ম পালন করে, সভ্য আর বুদ্ধিমান। কিন্তু ওদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দিন দিন জনসংখ্যা কমছে ওদের। তিন-চার পুরুষ আগেও যেখানে ওদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য ছিল বিশ হাজার, এখন সেখানে নয় হাজারের মতো। ফাংরা বলতে গেলে চারদিক থেকে ঘিরে আছে ওদেরকে, তাই যখনই লড়াই বাধে, একতরফাভাবে মার খায় আবাটিরা। এ-কারণে ওদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে।'

'দুই উপজাতির মধ্যে লড়াই-এর কারণটা কী? রাজত্ব দখল?'

'অনেকটা সেরকমই। মুর দেশটাকে আসলে খুব সুন্দর একটা পার্বত্য নগরদুর্গ বলা যায়। একসময় ফাংদের পূর্বপুরুষদের দখলে ছিল ওটা। কিন্তু আবাটিরা কৌশলে দখল করে নেয়। সেই থেকে আবাটিদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না ওরা। এই ঘৃণার ব্যাপারটা চলে আসছে বংশ-পরম্পরায়।'

'এ তো দেখছি জিব্রাল্টার আর স্পেনের আফ্রিকান রূপ!' মন্তব্য করল অলিভার।

'হুঁ। পার্থক্য শুধু একটাই—দিন দিন সংখ্যায় কমছে আবাটিরা, আর ফাংরা বাড়ছে।'

'তারপর?' প্রশ্ন করার ধরন শুনেই বোঝা গেল মূল কাহিনি থেকে সরার ইচ্ছা নেই হিগসের। 'জান বাঁচাতে ফাংদের গ্রাম থেকে পালালেন আপনি, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকলেন জঙ্গলের কোথাও, আবাটিরা উদ্ধার করল আপনাকে। তারপর?'

'তারপর তেমন বিশেষ কিছু না। আমার ছেলেকে উদ্ধারের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলাম আবাটিদের, কিন্তু আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল ওরা। একজন, মাত্র একজন মন দিয়ে শুনল আমার কথা। আর এই একজনের নামই হচ্ছে ওয়ালদা নাগাসটা, মানে রাজকন্যা। নাম না-বলে পদবী বললে বোধহয় মানায়

বেশি। উত্তরাধিকার সূত্রে আবাটিদের শাসন করছেন তিনি। আরও একটা পদবী আছে তাঁর—টাকলা ওয়ারদা, মানে গোলাপের কুঁড়ি। তবে তাঁর আসল নাম মাকেডা। তিনি যেমন সুন্দরী তেমনই প্রাণবন্ত একজন যুবতী। যা-হোক, আমি ডাক্তার বলে প্রায়ই দেখা হতো আমাদের, তখন কথা হতো এটা-সেটা নিয়ে। একদিন জানতে পারলাম স্ফিংক্সের মতো দেখতে বিশাল একটা মূর্তি নাকি আছে ফাংদের গ্রামে। আমি অবশ্য কখনও দেখিনি মূর্তিটা...'

'কী!' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল হিগস, 'উত্তর মধ্য আফ্রিকায় স্ফিংক্স! ...হতেও পারে, অসম্ভব কী? আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে নাকি প্রথমদিকের ফারাওদের যোগাযোগ ছিল। ...ডাক্তার অ্যাডামস, আমার মনে হয় আপনার ওই স্ফিংক্সের মাথাটা ভেড়ার মতো। তা-ই না?'

'না,' মাথা নাড়লাম, 'ভেড়ার মতো না। আর দশটা স্ফিংক্স যেরকম হয় সেরকমই—সিংহের মতো। যা-হোক, রানি মাকেডা একদিন বললেন মূর্তিটার নাম হারমা...'

'হারমা!' আবারও আমার মুখের কথা কেড়ে নিল হিগস। 'মানে হারমাচিস! ভোরের দেবতা!'

'কীসের দেবতা জানি না। শুধু জানি, জানি মানে রানি মাকেডা আমাকে বলেছেন, এই হারমাচিস যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে ফাংরা নাকি ওই এলাকা ছেড়ে মুরের দক্ষিণে বিশাল যে-নদীটা আছে সেটা পার হয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে চিরদিনের জন্য। নদীটার নাম মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, তবে আমার মনে হয় ওটা নীল নদের কোনো শাখা হবে। রানি মাকেডার লোকরা মূর্তিটা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে না কেন জিজ্ঞেস করলাম তখন তাঁকে। শুনে হাসলেন তিনি, বললেন, কাজটা নাকি ওদের জন্য অসম্ভব। মূর্তিটা নাকি ছোটখাটো একটা পাহাড়ের সমান, তা ছাড়া কাজটা করার সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই আবাটিদের।

নিজেদের পর্বত-ঘেরা উর্বর জমিতে শুয়ে-বসে দু'বেলা খাওয়া, আগেরদিনের বীরত্বের গল্প বলে সময় কাটানো, আর কিয়ামতের অপেক্ষা করাটাই ওদের কাজ।

'রানি মাকেডার সঙ্গে ততদিনে অন্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার, তাই সাহস করে বলেই ফেললাম, "আপনাকেও দেখি শুয়ে-বসে সময় কাটাতে। আপনি কেন কাজটা করার উদ্যোগ নেন না?'"

'মাকেডা বললেন, "শুয়ে-বসে সময় কাটাই কথাটা ঠিক না। আমার লোকদের নিয়ে ভাবি, কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারি না। ওদেরকে যে সংগঠিত করবো সে-সামর্থ্যও নেই—একজন পুরুষের কাজ তো আর একা একটা মেয়েকে দিয়ে হয় না।" তারপর হঠাৎ করেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন তিনি, বললেন, "ফাংদের কবল থেকে আমাকে, আমার লোকদেরকে বাঁচান আপনি। কাজটা করতে পারলে এমন পুরস্কার দেবো আপনাকে যেটা আপনি কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। আমাদের এই শহরের উপর ফাংদের এত লোভ কেন বোঝেন না? এখানে আছে অমূল্য সব গুপ্তধন। আমরা এখানে আসার অনেক আগেই সেসব সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেছেন এখানকার রাজারা। আমরা জানি কোথায় আছে ওগুলো, কিন্তু জানলেও লাভ নেই আসলে; কারণ যত দামিই হোক আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। বাইরের দুনিয়ার কারও সঙ্গে কোনো লেনদেন নেই আমাদের, কিন্তু আমি শুনেছি আপনারা, মানে বাইরের দুনিয়ার লোকরা নাকি বলতে গেলে পাগল ওসবের জন্য।"

'"গুপ্তধনের দরকার নেই আমার," বললাম আমি, "আমার ছেলেকে বন্দী করে রেখেছে ফাংরা, ওকে কোনোরকমে উদ্ধার করে দেশে ফিরতে পারলেই আমি খুশি।"

'"তা হলে ওই মূর্তিটা ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করুন আমাদেরকে। নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো উপায় জানা আছে

আপনার?”

‘তখন ডিনামাইট আর অন্যান্য শক্তিশালী বিস্ফোরক সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে লাগলাম রানি মাকেডাকে। শুনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি, বললেন, “তা হলে দেরি না-করে চলে যান আপনার দেশে। নিয়ে আসুন ওসব জিনিস। দরকার হলে আপনার দু'চারজন বন্ধুকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। খাতির-যত্ন করার দায়িত্ব আমার। ফাংদের কবল থেকে যদি আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন আপনারা তা হলে মুরের গুপ্তধন থেকে যত চাইবেন তত সম্পদ দিয়ে দেবো আপনার বন্ধুদেরকে। আর আপনি ফিরে পাবেন আপনার ছেলেকে। কথা দিলাম।”'

‘তারপর?’ অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল অলিভার। ‘শেষপর্যন্ত কী হলো?’

‘কিছু সোনা দিল ওরা আমাকে। তারপর উটের ছোট একটা বহরে করে রওনা হলাম আমি। পর্বতের ভিতর দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে-তৈরি-হওয়া গোপন একটা রাস্তা ধরে নামতে লাগলাম নীচে, যাতে ফাংরা দেখতে না-পায় আমাদের। আমার সঙ্গে যারা এসেছিল, আমাকে মরুভূমি পার করিয়ে দিল ওরা, তারপর নিরাপদেই ফিরতে পারলাম আসোইউয়ানে। মুর থেকে আসোইউয়ানে আসতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগেছে আমার। এখনও ওখানেই আছে ওরা, আমার ফেরার অপেক্ষা করছে। ষোলোদিন হলো ছেড়ে এসেছি ওদেরকে। আজ সকালে পা রাখলাম লণ্ডনে, তোমার নামটাই প্রথমে মনে পড়ল, হিগস। একটা হোটেলে উঠে রেফারেন্স বই চাইলাম, “হু'স হু” নামের একটা বই দিয়ে গেল ওরা। ওই বই ঘেঁটে পেয়ে গেলাম তোমার নাম-ঠিকানা। তারপর সোজা হাজির হয়ে গেলাম এখানে।’

‘কিন্তু আমার কাছে এলেন কেন?’ জিজ্ঞেস করল হিগস। ‘কী করতে পারি আমি আপনার জন্য?’

‘তোমার কাছে এসেছি কারণ আমি জানি পুরনো কিছু দেখলে

boiRboi.net

বা এমনকী নাম শুনলে কেমন উৎসুক হয়ে ওঠো তুমি। শুধু তা-ই না, তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই আমি।'

'কীসের সুযোগ?'

'একই সঙ্গে অমূল্য সব ধন-রত্ন আর নাম কামানোর সুযোগ। সাদা চামড়ার মানুষ হিসেবে, ইংল্যাণ্ডের মতো সভ্য দেশের নাগরিক হিসেবে আমি জানি মুর দেশটা খুবই সুন্দর এক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। ওরকম পর্বত-ঘেরা মনোরম জায়গা সারা পৃথিবীতে আর ক'টা আছে অথবা আদৌ আছে কি না জানি না। কাজেই তুমি যদি ওখানে গিয়ে সব দেখে বিস্তারিত বর্ণনা লিখে ছাপাতে পারো, তা হলে একনামে তোমাকে চিনতে শুরু করবে লোকে।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল হিগস। 'ধরুন গেলাম মুর-এ। লিখতেও শুরু করলাম আপনার কথা মতো। তারপর একদিন ফাংরা পাকড়াও করল আমাকে, গলাটা স্রেফ দু'ফাঁক করে ফেলল। আমি নিশ্চিত গহীন জঙ্গলে পড়ে থাকবে আমার লাশ, কবরও জুটবে না, শেয়াল-কুকুরের খাবারে পরিণত হবো নাম কামাতে গিয়ে।'

'তা হলে বরং এক কাজ করো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তোমার পরিচিত এমন কেউ যদি থাকে, যে বিস্ফোরক সম্বন্ধে জানে প্রচুর এবং ফাংদের ওই মূর্তিটা উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে আমাকে, তা হলে ওই লোকের নাম-ঠিকানা দাও। ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

'হুঁ, এই কাজটা সহজ।' পাইপ দিয়ে অলিভারের দিকে ইঙ্গিত করল হিগস, 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে সে। আবার একজন সৈনিক এবং খুব ভালো কেমিস্ট। আরবীও ভালো জানে, ছোটবেলায় বেশ কয়েক বছর ছিল মিশরে। কাজেই ওর চেয়ে ভালো আর কাউকে আপনি পাবেন বলে মনে হয় না।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম অলিভারকে, 'পারবে কাজটা?'

আমার প্রশ্নটা শুনে বোধহয় কিছুটা লজ্জা পেল অলিভার। বলল, 'কথাটা গতকাল জিজ্ঞেস করলে মানা করে দিতাম। কিন্তু আজ বলছি, প্রফেসর হিগস যদি আমাদের সঙ্গে যান আর কোনো কোনো ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দান করতে যদি রাজি থাকেন আপনি, তা হলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি, ইঞ্জিনিয়ার, সৈনিক বা কেমিস্ট—আমি কিন্তু কোনোটাতেই পেশাদার নই। অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে কেবল।'

'একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে,' বললাম আমি। 'গতকাল জিজ্ঞেস করলে মানা করতে অথচ আজ রাজি হয়ে গেলে—ব্যাপারটা কী?'

আবারও লজ্জা পেল অলিভার, এবার আগের চেয়ে বেশি। 'ব্যাপারটা বলতে খারাপই লাগবে আমার, তবুও যখন জিজ্ঞেস করলেন বলছি। আমার এক চাচা ছিলেন, বিশাল বড়লোক। কিন্তু চাচা অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। গতকাল পর্যন্ত জানতাম তাঁর সব সম্পত্তি আর টাকা-পয়সা আমিই পাবো, কারণ ছোটবেলা থেকে ওই কথাটাই জানানো হয়েছে আমাকে; তাঁর সবচেয়ে কাছের আত্মীয় হিসেবে, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে লালন-পালন করা হয়েছে আমাকে। আমি ছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায়, চাচা গুরুতর অসুস্থ শুনে ছুটে এলাম লণ্ডনে। লাভ হলো না, শেষ দেখা হলো না চাচার সঙ্গে, আমার আসার আগে কোনো উইল না-করেই মারা গেলেন তিনি। পরে শুনি তিনি নাকি গোপনে বিয়ে করেছিলেন গত বছর, তাঁর চেয়ে বংশমর্যাদায় অনেক নিচু এক মহিলাকে। তাঁদের নাকি একটা সন্তানও আছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী সব সম্পত্তি আর টাকা-পয়সার মালিক এখন ওই বাচ্চাটা। গেল এক নম্বর কারণ। দু'নম্বর কারণ হচ্ছে, এতদিন "ভালোবাসি, ভালোবাসি" বলতে বলতে যে-মেয়ে আমার কান ঝালাপালা করে দিয়েছিল, সে গতকাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অ্যান্থনি অলিভারের ভাতিজা অলিভার ওর্মকে বিয়ে করতে আপত্তি

আছে তার, কারণ চাচার একটা ফুটো পয়সাও জুটছে না আমার কপালে। আমার কাছে সব মিলিয়ে এখন কত আছে জানেন? মাত্র দশ হাজার পাউণ্ড। যা-হোক, ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল আমার, ভেঙে গেছে সেটা। দোষ কি ওই মেয়ের, নাকি ওর আত্মীয়দের ঠিক বুঝতে পারছি না,' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে, পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল হিগস, তারপর হঠাৎ করেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। 'শালা...' এরপর ওই মেয়েটাকে নিয়ে, ওর আত্মীয়দের নিয়ে, অলিভারের চাচাকে নিয়ে এমন সব কথা বলল যে, আমি যদি এখন সেসব লিখি তা হলে পাঠকরা বাকি কাহিনি না-পড়ে বই বন্ধ করে রেখে দেবেন। শুধু একটা কথা বলি, হিগস যেমন মেধাবী তেমন বদরাগী, ওর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ যেমন আকর্ষণীয় ওর গালিগালাজ তেমনই লজ্জাজনক—ওর সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা ভালো করেই জানে কথাটা।

একচোট গাল দেয়ার পর মাথা ঠাণ্ডা হলো হিগসের, আমাকে বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যটা বুঝলাম না ঠিকমতো। কেন আপনি আমাদেরকে এসব প্রস্তাব দিচ্ছেন?'

'আমার উদ্দেশ্য একটাই—আমার ছেলেকে উদ্ধার করা, যদি সে বেঁচে থাকে। আমার বিশ্বাস বেঁচে আছে সে। হিগস, আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে নিয়ে ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা। তুমি বুড়ো এক বাবা, একটা ছেলে ছাড়া এই দুনিয়ায় এমন আর কেউ নেই যে তোমার সেবাযত্ন করবে, খোঁজখবর রাখবে। ওই ছেলেটাকেই অপহরণ করে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা। বছরের পর বছর ধরে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি, আজ এখানে তো কাল ওখানে শুনতে পাচ্ছ ওর কণ্ঠ, কখনও কখনও এক পলকের জন্য হলেও দেখতে পাচ্ছ ওকে—ভেবে বলো তো কেমন লাগবে তোমার? ওকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করবে না তুমি? কিন্তু বাঁচাতে

গিয়েও সমস্যা—প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয় নিজেকেই। সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা নিয়ে কাপুরুষের মতো এমন এক জায়গায় ছিলাম যেখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই ছিল আমার ছেলেটা, কিন্তু যাদের সঙ্গে ছিলাম তারা আমার চেয়েও বড় কাপুরুষ—নিজেদেরকেই বাঁচাতে পারে না, অন্যের ছেলেকে বাঁচানো তো দূরের কথা।'

'নিজেকে কাপুরুষ বলছেন কেন?' হিগসের কণ্ঠে বিরক্তি, 'ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি প্রাণ যেত আপনার তা হলে কার কী লাভটা হতো? আরও বড় কথা, যদি আপনার ছেলেটার কিছু হয়ে যেত? তখন আমও যেত ছালাও যেত।'

'ঠাণ্ডামাথায় অনেক ভেবেছি আমি ব্যাপারটা নিয়ে। বুঝেছি একা কিছু করার ক্ষমতা নেই আসলে আমার। কারও সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলাম, সুযোগটা এসে গেল হঠাৎ করেই। এই ওয়ালদা নাগাসটা, বা মাকেডা যেটাই বলো না কেন, সাহায্য চাইলেন আমার কাছে। বললেন, "আমিও আপনাকে সাহায্য করবো। আমার লোকদেরকে রক্ষা করুন, আমি চেষ্টা করবো আপনার ছেলেকে বাঁচাতে। শুধু তা-ই নয়, আপনার অথবা আপনি যাঁদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন তাঁদের সবার পরিশ্রমের মূল্য দেবো।"

'বললাম, "লাভ হবে না। কারণ আমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ।" তখন হাতের আঙুল থেকে ওই আংটিটা খুলে আমাকে দিলেন রানি মাকেডা। বললেন, "প্রথম মাকেডা, মানে রানি শেবার আমল থেকে এই আংটিটা ছিল আমার মা, নানী, নানীর মা কিংবা তাঁর মা'র হাতে। জানি না আপনি যাঁদের সঙ্গে থাকেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী কেউ আছে কি না, থাকলে এই আংটিতে লেখা রানি শেবার নামটা পড়তে পারার কথা। তখন তিনি বুঝবেন আমি মিথ্যা বলি না। নিন, এটা দিলাম আপনাকে, প্রমাণ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যান, কাউকে দেখানোর দরকার মনে করলে

দেখাবেন। আপনার প্রয়োজনমতো সোনাদানাও দিয়ে দিচ্ছি, কী জিনিসের নাম বললেন আমি তো উচ্চারণ করতে পারবো না, ওটা জ্বালালে নাকি পাহাড় উড়াল দেবে আকাশে—গিয়ে কিনে নিয়ে আসবেন যত লাগে। দক্ষ আর বিশ্বস্ত লোকও আনবেন, তবে দু'তিনজনের বেশি না—আমার অভিজ্ঞতা বলে মরুভূমি পার হয়ে এর বেশি লোক নিয়ে ফিরতে পারবেন না।"

'এই হলো গিয়ে আমার গল্প, হিগস। এখন চিন্তাভাবনা করে বলো কাজটা করবে কি না। নইলে অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাকে, দক্ষ আর বিশ্বস্ত লোক তো আর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। একটা কথা, হ্যাঁ বা না যেটাই বলো তাড়াতাড়ি বোলো, কারণ বর্ষাকালের আগে মুরে পৌঁছাতে হলে যত জলদি সম্ভব রওনা হতে হবে আমাদেরকে।'

'আপনার কথা সত্যি হলে আপনার সঙ্গে তো কিছু সোনাদানা থাকার কথা,' বলল হিগস। 'আছে নাকি?'

কোটের পকেট থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ বের করলাম। মুখ উপুড় করে কয়েক টুকরো সোনা ঢাললাম টেবিলের উপর। হাতে নিল হিগস, একনজর দেখেই বলল, 'রিং মানি। অ্যাংলো-স্যাক্সন হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। কোন্ আমলের বুঝতে পারছি না। খাদ মেশানো আছে, সম্ভবত রুপা।' পকেট থেকে আংটিটা বের করল সে। শক্তিশালী একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ভালোমতো দেখতে লাগল আংটি আর সোনার টুকরোগুলো। তারপর বলল, 'ঠিকই আছে মনে হয়। এসব আপনার জিনিস, আপনার কাছেই রাখুন। যা-হোক, একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি, জবাবে কিছু বলতে হয়। কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ, আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে সোজা বলে দিতাম, ব্যাটা তোর দরকার, তুই মুরে গিয়ে মরে যা। কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত সে-কাজের কোনো পারিশ্রমিক নেননি। কাজেই আজ আপনার যখন সাহায্যের

প্রয়োজন তখন খালি-হাতে ফেরাবো না আপনাকে।...তুমি কী বলো, অলিভার?'

জেগে জেগে যেন স্বপ্ন দেখছিল অলিভার, হিগসের ডাকে চমকে উঠল তাই। বলল, 'লণ্ডন ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি আমি এখন, কোথায় যাচ্ছি না-যাচ্ছি সেটা কোনো ব্যাপার না।'

দুই

অলিভারের কথা শেষ হলো কি হলো না, তীব্র একটা হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। এক ঝটকায় খুলে গেল সদর দরজা, একটা ক্যাব রওয়ানা হলো আচমকা, কান-ফাটানো শব্দে বেজে উঠল কোনো এক পুলিশের বাঁশি, ভারী পদশব্দ শুনতে পেলাম সিঁড়িতে। বুঝলাম ওজনদার কেউ একজন উঠে আসছে পুরো বাড়ি কাঁপিয়ে, জলদগম্ভীর কণ্ঠে কারও সঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে। আরও কারা যেন চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

'গজবটা পড়েছে কার উপর?' রাগে ফেটে পড়ল হিগস। 'আমার বাড়িতে নরক গুলজার করতে আসার ইচ্ছা হলো কার হঠাৎ?'

'গলার আওয়াজ শুনে তো মনে হয় স্যামুয়েল, মানে সার্জেন্ট কুইক,' সতর্ক কণ্ঠে বলল অলিভার। 'কিন্তু এখানে কী চায় সে? ...আজ বিকেলে যে-মমিটা খোলা হয়েছে সেটার ব্যাপারে কিছু বলবে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় খুলে গেল ঘরের দরজা। সৈন্যদের মতো দেখতে, লম্বা, বিশালদেহী, মধ্যবয়স্ক এক লোক ভারী

পদক্ষেপে হেঁটে এসে ঢুকল ভিতরে। চাদরে-পেঁচানো একটা মরদেহ নিয়ে আসছে সে হাতে করে। আমাদের কাছে এসে লাশটা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর, মদের গ্লাসগুলো ঘেঁষে।

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' অলিভারকে উদ্দেশ্য করে বলল সার্জেন্ট কুইক। 'এই বেটির মাথাটা বিনা-নোটিশে আলগা হয়ে গেল! নীচে, সিঁড়িতে দাঁড়ানো পুলিশদের কাছে জিনিসটা আছে বোধহয়। ওদেরকে এই লাশ দিয়ে পেটানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার! আমাকে ধরে বসেছিল ওরা, পারলে খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় আর কী! হাতিয়ার হিসেবে নেহাত খারাপ না লাশটা—যথেষ্ট শক্ত আর মজবুত!'

দরজাটা খুলে গেল আরেকবার। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল দুই পুলিশ, দু'জনের পোশাকই এলোমেলো হয়ে আছে। ধূসর একটা মমির মাথা, বলা ভালো খুলির সঙ্গে লেগে থাকা লম্বা চুল ধরে মাথাটা ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে একজন।

'এসবের মানে কী?' চিৎকার করে উঠল হিগস। 'আমার বাড়িতে এভাবে ঢুকলেন কেন আপনারা? ওয়ারেন্ট কোথায় আপনাদের?'

'ওই যে!' আঙুলের ইশারায় টেবিলের উপরের মমিটা দেখিয়ে দিল এক পুলিশ।

'আর এই যে!' ছিন্ন মাথাটা উঁচু করে ধরল দ্বিতীয় পুলিশ। 'এই লাশ নিয়ে রাস্তা দিয়ে চোরের মতো পালাচ্ছিল লোকটা। কর্তব্যের খাতিরে ওকে ধরলাম আমরা। ব্যাপার কী জানতে চাইলাম। জবাব না-দিয়ে উল্টো আমাদেরকেই ধমকাধমকি করতে লাগল সে। কাজেই গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে ওকে।' সার্জেন্ট কুইকের দিকে তাকাল লোকটা। 'জনাব, দয়া করে কি এবার আসবেন আমাদের সঙ্গে? নাকি জোর খাটাতে হবে?'

প্রশ্নটা শুনে রেগে গেল সার্জেন্ট কুইক, একলাফে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের উপর রাখা লাশের পাশে। দেখে মনে হলো

boiRboi.net

আবার হাতে তুলে নিতে চায় সে মরদেহটা, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছে আছে বোধহয়। খাপ থেকে ব্যাটন বের করল দুই পুলিশ।

'থামুন!' তাড়াতাড়ি দু'পক্ষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল অলিভার। 'পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনারা? এই লাশটা একজন মহিলার এবং আজ থেকে চার হাজার বছর আগে মারা গেছেন তিনি।'

'ঈশ্বর!' মাথা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা বলল। 'তার মানে এটা আমাদের ব্রিটিশ যাদুঘরের কোনো মমি নাকি? আমার কিন্তু আগে থেকেই মনে হচ্ছিল জিনিসটা কেমন পুরনো পুরনো!' হাতের ছিন্ন মাথাটার দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকাল সে, তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সেটা। এরপর কয়েক গ্লাস করে মদ খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করল দু'জনই। সাদা কাগজে মমিটার বর্ণনা এবং আমাদের সবার নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে বিদায় হলো।

'পুলিশের বাচ্চা পুলিশ,' সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেয়ে গজ গজ করতে শুরু করল সার্জেন্ট কুইক, 'আমার কথা শুনে যা। চোখে যা দেখিস সেটাই সবসময় সত্যি বলে ধরে নিবি না। রাস্তার উপর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেই তাকে মাতাল ভাবা ঠিক না। লোকটা মোটা হতে পারে, হাঁটাচলায় সমস্যা থাকতে পারে, পাগল হতে পারে, ক্রুদ্ধ হতে পারে, এমনকী মৃগীরোগী হতে পারে। আর লাশ মানেই যে খুন করা লাশ তা-ও কিন্তু না। আর গর্দভের বাচ্চা গর্দভ, চার হাজার বছর আগে মরেছে, শরীর তো ঠাণ্ডা আর শক্ত হবেই! এটা মমি, বুঝলি, যেন-তেন কোনো লাশ না। আরে, আমি যদি তোদের ওই নীল কোট পরে ঘুরে বেড়াই তা হলেই পুলিশ হয়ে গেলাম নাকি? ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন পুলিশের চাকরি করতে হয় না আমাকে, আমি হলাম গিয়ে একজন রিজার্ভ সেনাসদস্য। আরে, তোদের মতো পুলিশদের

দরকার মানুষের স্বভাব-চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা, আর পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়ানো। তা হলে একনজর দেখেই বুঝতে পারবি সদ্য দাফন করা লাশ আর চার হাজার বছর আগের মমির মধ্যে পার্থক্যটা কী! আমার কথা মগজে গেঁথে নিয়ে যা হাঁদারামরা, তা হলে রাস্তার মাতাল খেদানোর চাকরি করে দু'পয়সার পেনশনের অবসর নেয়ার বদলে তাড়াতাড়ি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হতে পারবি।'

বকবকানি শেষ হলো সার্জেন্ট কুইকের। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। আমরাও চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল পরিবেশ। মমিটা ইতোমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হিগসের বেডরুমে। কারণ অলিভার বলছিল মুণ্ডুহীন ওই লাশের সামনে বসে কথা বলা নাকি সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

যা-হোক, আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য, প্রাপ্য অর্থ-সম্পদের সমান বণ্টন, আমাদের কারও মৃত্যু হলে ওই ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ কে কতটুকু করে পাবে সে-সব নিয়ে প্রথমেই একটা চুক্তিনামা লিখে ফেললাম। কী লিখতে হবে না-হবে সে-ব্যাপারে মাঝেমধ্যে পরামর্শ দিল হিগস।

আমার প্রাপ্য অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও কথা উঠল। বললাম, 'টাকা-পয়সার উপর মোহ নেই আমার। রডরিক উদ্ধার পেলেই আমি খুশি। আমার কিছু লাগবে না।'

হিগস বলল, 'আজ হয়তো দরকার নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে। তখন কী করবেন? কিংবা ধরুন রডরিককে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন, হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলো আপনার। তখন?'

ভেবে দেখলাম কথাটা ভুল নয়। তাই শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

অলিভার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কার কাজ কী হবে?'

জবাবে বললাম, 'আমি হবো তোমাদের গাইড। যেহেতু প্রাচীন ভাষা আর জিনিসপত্রের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান হিগসের,

তাই আমাদের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে সে। আর অলিভার, সেনাবাহিনীতে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তোমার, কাজেই ওই দায়িত্বটা তুমি পালন করলেই ভালো হয়। আরেকটা কথা, আমাদের মধ্যে যদি কখনও কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তা হলে তিনজনের মধ্যে দু'জন যেটা সমর্থন করবে, বাকি একজনকে সেটা মেনে নিতে হবে।'

খসড়া চুক্তিনামাটা অন্য একটা কাগজে সুন্দর করে লেখা হলো আবার। স্বাক্ষর করে হিগসের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে, রানি শেবার আংটিটা হাতে নিয়ে টানা এক মিনিট তাকিয়ে থাকল সেটার দিকে, তারপর স্বাক্ষর করে কাগজটা ঠেলে দিল অলিভারের দিকে।

'এক মিনিট,' হাতে কলম নিয়েও রেখে দিল অলিভার, 'একটা কথা মনে পড়েছে। আমার পুরনো ভৃত্য সার্জেন্ট কুইককে সঙ্গে নিতে চাই আমি। দরকারের সময় লোকটা খুব কাজের। তা ছাড়া বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করেছে অনেকবার, ওর ভালো হাত আছে এ-ব্যাপারে। আপনারা রাজি থাকলে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারি আমাদের সঙ্গে যেতে কোনো অসুবিধা আছে কি না ওর। মনে হয় আশপাশেই কোথাও আছে সে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলাম। যে-লোক হাতের মমি দিয়ে পুলিশ পিটিয়ে পালাতে পারে, সে যে কাজের হবে তাতে আর সন্দেহ কী!

দরজা খুলে সার্জেন্ট কুইককে ভিতরে ডেকে নিয়ে এল অলিভার। ওর হুকুমের অপেক্ষায় মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকল কুইক। অলিভার বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি?'

'জী। আপনাদের সব কথা শুনেছি।'

আমাদের দিকে একবার তাকাল অলিভার। তারপর আবার

boiRboi.net

কুইককে বলল, 'উত্তর-মধ্য আফ্রিকায় যাচ্ছি আমরা, বিশেষ একটা কাজে। তুমি সঙ্গে যেতে পারবে?'

'পারবো।'

'কখন রওনা হতে পারবে?'

ঘুরিয়ে জবাব দিল কুইক, 'যদি মিশর হয়ে যান তা হলে ব্রিন্দিসি মেইল ছাড়বে আগামীকাল রাতে। কিন্তু তিউনিস হয়ে গেলে শনিবার সকাল সোয়া সাতটায় ট্রেনে উঠে পড়া যাবে চ্যারিং ক্রস থেকে। যেহেতু বিস্ফোরক আর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে হবে আমাদের, এমনভাবে প্যাক করতে হবে যাতে ফাঁকি দেয়া যায় কাস্টমসকে। এতে অবশ্য সময় নষ্ট হতে পারে কিছুটা।'

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আমরা যখন পরিকল্পনা করছি কীভাবে যাবো তুমি তখন অর্ধেক চলে গেছ!' বলল অলিভার। 'কুইক, যা বলছ বুঝেশুনে বলছ তো? কাজটা কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। প্রাণ নিয়ে ফেরার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কি এর আগে করিনি আমরা? মনে আছে, একবার এক নদীতে আমাদের নৌকার উপর হামলা হয়েছিল? আমি, আপনি আর মাঝি ছাড়া বাকি সবাই মারা গেল? দেখুন, নিরাপদেই কিন্তু ফিরতে পেরেছি আমরা। একটা কথা বলি, বেয়াদবি হয়ে গেলে মাফ করবেন, ঝুঁকি বলে কোনো কথা নেই। মানুষের জন্ম আর মৃত্যু নির্ধারিত, এর মাঝখানে সে কী করবে না-করবে সেটাও নির্ধারিত, কাজেই কোন্ কাজে ঝুঁকি আছে আর কোন্ কাজে নেই সে-সব নিয়ে কথা বলারও কোনো মানে নেই। আমাদের কাজ হলো কাজ করে যাওয়া।'

বুঝলাম, কাজ জানলেও কথা বেশি বলে এই সার্জেন্ট কুইক।

'ক্ষমা করবেন,' বলে চলল সে, 'খরচাপাতির ব্যাপারটা আরেকবার ফয়সালা করে নিলে হয় না? আমি বিয়েশাদী করিনি, কিন্তু কয়েকটা বোন আছে আমার। পেনশনের টাকায় টানাটানি করে চলতে হয় আমাদের। আমাকে লোভী ভাববেন না, আসলে

কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো কাগজে-কলমে লেখা থাকলে পরে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়,' চুক্তিনামাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'খাঁটি কথা,' বলল অলিভার। 'তুমি কী চাও, সার্জেন্ট?'

'এই অভিযান থেকে আমরা যদি কিছু না-পাই, তা হলে আমারও কোনোকিছুর দরকার নেই। কিন্তু কিছু পেলে আমি যদি পাঁচ শতাংশ দাবি করি তা হলে কি খুব বেশি হয়ে যাবে?'

'পাঁচের বদলে দশ হলে ভালো হয়,' বললাম আমি। 'কারণ আমাদের মতো সার্জেন্ট কুইকেরও প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা আছে।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' সত্যিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল সার্জেন্ট কুইকের কণ্ঠে, 'কিন্তু দশ আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে যায়। পাঁচ শতাংশের বেশি নেবো না আমি।'

আর জোরাজুরি করলাম না আমরা। চুক্তিনামায় নতুন করে লেখা হলো, এই অভিযান থেকে আমাদের যা লাভ হবে, তার শতকরা পাঁচ ভাগ পাবে সার্জেন্ট স্যামুয়েল কুইক। শর্ত দুটো: ভালো ব্যবহার করতে হবে ওকে সবসময় এবং আমাদের আদেশ মানতে হবে। চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে দিল সে, তারপর খানিকটা পানি দিয়ে হুইস্কি খেল আমার সবার স্বাস্থ্য কামনা করে।

ওকে বসার ইঙ্গিত করল হিগস, কিন্তু বিনীতভাবে প্রত্যাখান করে বলল সে, 'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে, বসে আরাম পাই না আজকাল আর। যদি অনুমতি দেন, তা হলে দু'-একটা কথা জানতে চাই।'

অনুমতি দেয়া হলো।

'শুনলাম বিশাল একটা মূর্তি নাকি উড়িয়ে দেবেন ডিনামাইট ফাটিয়ে। মূর্তিটা কত বড়?'

'জানি না,' জবাব দিলাম আমি। 'দেখিনি কখনও। শুধু জানি মূর্তিটা বিশাল, সম্ভবত সেইন্ট পল'স ক্যাথেড্রালের মতো হবে।'

boiboi.net

'তার মানে মূর্তিটা যদি নিরেট হয় তা হলে ডিনামাইট ফাটাতে হবে অনেকগুলো। কিন্তু অতগুলো ডিনামাইট উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমি পাড়ি দেয়াটা সহজ কথা না। আচ্ছা ক্যাপ্টেন, পিকরিক অ্যাসিড থেকে বানানো শক্তিশালী বিস্ফোরক পিকরেট ব্যবহার করলে কেমন হয়? বোয়া যুদ্ধের কথা মনে আছে আপনার? শালারা এমন পিকরেট বোম ফাটিয়েছিল যে, আমাদের বেশিরভাগ তো ওই বোমের ঠেলাতেই কাত। বাকিরা আক্রান্ত হলো বিষক্রিয়ায়।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল অলিভার। 'কিন্তু এখন আরও শক্তিশালী জিনিস আছে—অ্যাযো-আইমাইড নাম সম্ভবত, নাইট্রোজেনের নতুন আর ভয়ঙ্কর একটা যৌগ। এসবের ব্যাপারে আগামীকাল থেকে খোঁজখবর শুরু করবো, সার্জেন্ট।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। কিন্তু কথা হলো, ডিনামাইট, পিকরেট বা অ্যাযো-আইমাইড যা-ই কেনেন না কেন, টাকা লাগবে। তা ছাড়া রাইফেল কিনতে হবে, বুলেট কিনতে হবে। আরও জিনিসপত্র তো আছেই। সব মিলিয়ে আমার তো মনে হয় না পনেরোশ' পাউন্ডের নীচে খরচ হবে। এত টাকা পাবেন কোত্থেকে?'

'আমি দেবো,' সঙ্গে সঙ্গে বললাম। 'রানি মাকেডা আমাকে যে-পরিমাণ সোনা দিয়েছেন তাতে কাজ হয়ে যাবে মনে হয়।'

'আমার কাছে টেনেটুনে পাঁচশ' পাউন্ডের মতো আছে,' আমাকে বলল অলিভার। 'যদি আপনার টাকায় না-হয় তা হলে দিতে পারবো। আসলে টাকাটা কোনো ব্যাপার না এখন। কোনো না কোনোভাবে ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আমার কথা হচ্ছে, ফলাফল যা-ই হোক, বাঁচি বা মরি, কিছু পাই বা না-পাই, মন থেকে আমাদের সবার এই অভিযানে অংশ নিতে ইচ্ছা আছে কি না?'

সবাই একবাক্যে বললাম আছে।

'তা হলে আর কারও কি কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে চাই,' বললাম আমি। 'মরুভূমি পাড়ি দেয়াটাই অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে আমাদের জন্য, তাই বলছি যদি কখনও মুরে পৌঁছাতে পারি, ওয়ালদা নাগাসটার দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না তোমাদের কেউ। প্রেম-ভালোবাসার বয়স আর নেই আমার, তাই তোমাদেরকে সতর্ক করছি; মেয়েটাকে ওর লোকজন খুবই সম্মান করে, পবিত্র বলে মনে করে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া বাইরের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না সে। যদি করে তা হলে সোজা কথায় বলি, আমাদের গলা কাটা যাবে।'

'শুনেছ, অলিভার?' বলল হিগস। 'আমার মনে হয় আসলে তোমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলেছেন ডাক্তার অ্যাডামস। তাঁর তো প্রেম-ভালোবাসার বয়স নেই, আমার আবার প্রেম-ভালোবাসায় কোনো রুচিই নেই। আর সার্জেন্ট কুইকও মনে হয় আমার মতোই চিরকুমার অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দিতে চায়, নাকি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল কুইক।

'আসলে,' হিগসের কথায় লজ্জা পেয়েছে অলিভার, 'মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র দেখার পর আমারও মন উঠে গেছে এসবের উপর থেকে। তা ছাড়া গহীন আফ্রিকার কোন্ জায়গার অশিক্ষিত এক কুচকুচে কালো মেয়েকে ভালোবাসবো—ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন যেন লাগছে আমার!'

'এত বড় বড় কথা বলবেন না, ক্যাপ্টেন, বলবেন না দয়া করে,' শুরু হয়ে গেল সার্জেন্ট কুইকের "জ্ঞানগর্ভ" বক্তৃতা। 'স্রষ্টার আজব এক সৃষ্টি এই নারী। এরা এমন এক জিনিস যার ব্যাপারে আপনি আগে থেকে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারেন না। এরা আজ বিষ তো আগামীকাল মধু। এক ঈশ্বর ছাড়া ওদের মনের কথা বলতে পারবে না কেউ। এখন অবজ্ঞা করে বলছেন "কালো মেয়ে", "অশিক্ষিত" ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু প্রেম-

ভালোবাসা এমন জিনিস যে, এমনও হতে পারে ওই মেয়ের সামনে নতজানু হয়ে থাকতে হবে আপনাকে। ওদেরকে ঘৃণা করি বলে কথাটা বলছি এমন কিন্তু না; বরং আপনাকে সতর্ক করার জন্য, ভবিষ্যতে আবার যাতে আপনাকে অপমানিত হতে না-হয় সেজন্য বলছি কথাগুলো। ...ঝুঁকিপূর্ণ কাজ পারলে যত খুশি করুন, কিন্তু মেয়েমানুষের কাছেও ঘেঁষতে যাবেন না। এর চেয়ে বড় ঝুঁকির কাজ আর নেই। কারণ একবার যদি ওরা আপনাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, তা হলে আপনি আর আপনি থাকবেন না।'

'ঠিক আছে,' হাত নেড়ে কুইককে থামাল অলিভার, শীতল কণ্ঠে বলল, 'তোমার উপদেশ মনে রাখার চেষ্টা করবো। এবার দয়া করে বকবকানি বন্ধ করে একটা ক্যাব ডেকে নিয়ে এসো।'

বরাবরের মতো কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল হিগস, অলিভারের কোন্ কথায় মজা পেল সে বুঝতে পারলাম না। রানি মাকেডার কথা মনে পড়ে গেল আমার। কী বলল ওকে অলিভার? কালো? অশিক্ষিত? মুচকি হাসলাম। ওর লোকরা ওকে "টাকলা ওয়ারদা", মানে গোলাপের কুঁড়ি নামে ডাকে। কেন ডাকে সেটা আমি বুঝেছিলাম প্রথম যেদিন আমাদের দেখা হলো সেদিন, আমাকে দেখে যখন চেহারা থেকে নেকাব সরালেন তিনি তখন। আর কী আন্তরিক ভঙ্গিতে যে কথা বলেন তিনি, না-শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

রানি মাকেডার মিষ্টি, স্নিগ্ধ, অনিন্দ্যসুন্দর চেহারাটা দেখার পর অলিভারের মতো যুবকের কী অবস্থা হতে পারে ভেবে হাসলাম মনে মনে।

boiRboi.net

তিন

শুরু হলো আমাদের যাত্রা। মরুভূমি পার হলাম আমরা, পার হলাম ঘন জঙ্গল, অবশেষে হাজির হলাম পাহাড়-ঘেরা মুরের সমতলভূমিতে। বেশ কিছু ঘটনা ঘটল, গুরুত্বপূর্ণ দু'-একটা সংক্ষেপে না-বললেই নয়। পাঠকরা যদি আমার কথা শুনে বিরক্ত হন, বাহুল্য মনে করেন, তা হলে ক্ষমা করবেন।

আসোইউয়ানের ঘটনা দিয়েই শুরু করি। ওখানে পৌঁছানোর পর একটা চিঠি আর কিছু টেলিগ্রাম এল ক্যাপ্টেন অলিভারের নামে। আগের চেয়ে অনেক সহজ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ততদিনে আমাদের মধ্যে, তাই আমাকে ওসব দেখাতে দ্বিধা করল না সে। পড়ে জানতে পারলাম, ওর চাচার "গোপন" সেই সন্তান অসুস্থ হয়ে হঠাৎ করেই নাকি মারা গেছে। সুতরাং, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছি–অলিভারের এই চিন্তার অবসান ঘটল। আবার বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল সে। আইন অনুযায়ী অল্প কিছু জমিজমা পেল ওর "চাচী", এবং সেসব নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন তিনি, আরও কিছু পাওয়ার আশায় মামলা-মকদ্দমায় গেলেন না।

অলিভারকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, 'কিছু মনে কোরো না, তোমার তো আর আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

'কেন? যখন চুক্তিতে সই করেছিলাম তখন হয়তো আমার কিছু ছিল না। এখন সব ফিরে পেয়েছি বলে কি চুক্তি বাতিল হয়ে

গেছে?'

'শোনো,' বোঝানোর চেষ্টা করলাম ওকে, 'পারিপার্শ্বিকতার কারণে অনেক কিছুই বদলে যায় অনেক সময়। সাহসী আর উদ্যমী কারও পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার করা যত সহজ, সফল হওয়ার সবরকম সুযোগ আছে এমন কারও পক্ষে কিন্তু ততটা সহজ না। ভালো বংশে জন্মেছ তুমি, শিক্ষিত আর বুদ্ধিমান ছেলে, ক্যারিয়ার রেকর্ড ভালো, আর এখন তো অগাধ সম্পত্তির মালিক। ইংল্যাণ্ডে থাকলে তুমি যা-খুশি তা-ই করতে পারতে এখন। ডিউক, ব্যারন বা আর্ল হতে পারতে কিংবা সংসদ-সদস্য হিসেবে দেশ শাসন করতে পারতে। মোদ্দা কথা, তোমার খাটতে হতো কম, ফল পেতে অনেক বেশি। আর আমাদের সঙ্গে গেলে কী হতে পারে? মরুভূমিতে পিপাসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে পারো, কিংবা গলাটা কাটা যেতে পারে অজানা-অচেনা কোনো উপজাতীয় গোত্রের বিরুদ্ধে লড়ার সময়। ...রূপার চামচ মুখ থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো না, অলিভার।'

'দেখুন,' বিনীতভাবে বলল সে, 'যেদিন জানলাম চাচার সম্পত্তিতে অধিকার নেই আমার সেদিন কিন্তু হাউমাউ করে কাঁদিনি। আবার আজ, সব ফিরে পাওয়ার পর খুশিতে গলা ছেড়ে গাইতেও ইচ্ছা করছে না। হতে পারে আমি এখন অগাধ সম্পত্তির মালিক, কিন্তু সেটা আমার কাছে বড় কোনো ব্যাপার না। বড় ব্যাপার হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি, শেষপর্যন্ত আপনাদের সঙ্গেই থাকবো এবং চুক্তিনামা অনুযায়ী আমাকে আপনারা বাধা দিতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, সম্পত্তিটা যাতে বেহাত হয়ে না-যায় কিংবা সেটার কোনো ক্ষতি যাতে না-হয় সেজন্য উইল করবো যত তাড়াতাড়ি পারি। তারপর উইলটা পোস্ট করে পাঠিয়ে দেবো লণ্ডনে, আমার উকিলের কাছে।'

এক আরব চোরাকারবারিকে সঙ্গে নিয়ে হিগস হাজির হলো এমন সময়। প্রাচীন একটা জিনিস নিয়ে দর কষাকষি চলছে

দু'জনের মধ্যে। লোকটা চলে যাওয়ার পর হিগসের কাছে অলিভারের ব্যাপারটা বললাম আমি। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় নজর দেওয়ার মতো অবকাশ হয় না হিগসের, তাই ওকে এক অর্থে উদাসীই বলা চলে; কিন্তু আমি দেখেছি বড় কোনো ব্যাপারে যখন মাথা ঘামায় সে তখন নিঃস্বার্থভাবে করে কাজটা। তাই অলিভারের ব্যাপারটা শোনার পর আমার সঙ্গে একমত হলো সে এবং অলিভারকে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে বলল।

'আমি বাচ্চাছেলে না,' রেগে গেল অলিভার। 'আমার ব্যাপারে না-ভেবে আপনাদের ব্যাপারে ভাবুন।' বলতে বলতে হিগসের দিকে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিল সে। পড়ে দেখলাম, যে-মেয়ের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছিল ওর সে-মেয়ে পাঠিয়েছে চিঠিটা। কী লিখেছে সে-সব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বললাম না, তবে মেয়েটা অলিভারকে বিয়ে করতে রাজি আছে এ-ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে ওই চিঠিতে।

'উত্তর দিয়েছ?' জানতে চাইল হিগস।

'না, দিইনি। দেবোও না। এসব মেয়েদের চেনা হয়ে গেছে আমার। বাদ দিন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, ভাগ্যে যতদিন লেখা আছে থাকবো। আশা করি এ-ব্যাপারে আর কিছু বলবেন না আমাকে। ...এখানে একটা জলপ্রপাত দেখেছি, তার আশপাশে নাকি পাথরের কিছু ভাস্কর্য আছে, সেগুলো দেখতে যাচ্ছি এখন।'

পরে সার্জেন্ট কুইকের সঙ্গেও কথা বললাম ব্যাপারটা নিয়ে। আমার কথা শুনে উপহাসের হাসি হেসে বলল সে, 'আপনি যা বলছেন সেটা একইসঙ্গে ঠিক, আবার ভুল। বুঝতে পারছি ক্যাপ্টেন অলিভারের জন্য খারাপ লাগছে আপনার, হয়তো ভাবছেন টাকা ছিল না বলে টাকা কামানোর আশায় ঘুরে যেতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। এখন সব ফিরে পেয়েছেন তাই ফিরে

যাওয়া উচিত তাঁর। কিন্তু আমার মতে ফিরে না-গেলেই ভালো করবেন ক্যাপ্টেন। কারণ যে-মেয়েটার সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছিল তাঁর সে-মেয়েটাকে চিনি আমি। মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারি না আমি, তাই একটু খোলামেলাভাবেই বলছি, ওই মেয়ে দেখতে সুন্দরী হলে কী হবে, আসলে একটা কালসাপ। ক্যাপ্টেন অলিভার যদি এখন ফিরে যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে বসবে ওকে, বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতে থাকবে। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে যাওয়াটাই ভালো হবে ক্যাপ্টেনের জন্য। আমার যা বলার ছিল বললাম, এবার কাজে যাই। উটগুলোকে খাওয়াতে হবে, চোখে চোখে রাখতে হবে আপনার আবাটি ছোকরাগুলোকে। সবগুলো চোর, বুঝলেন, জাত চোর। গতকাল কী দেখলাম জানেন? পিকরিক সল্টের ক্যানেস্তারা হাতড়াচ্ছে ওরা। ছাগলগুলো বোধহয় মনে করেছিল জ্যাম-জেলি কিছু একটা হবে, একটু চেখে দেখি!'

ভাষণ শেষ করে কাজে চলে গেল সার্জেন্ট কুইক।

পরে আমরাও যথাসময়ে রওয়ানা হলাম মুরের উদ্দেশে। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে মাস চারেক সময় লেগেছিল আমাদের, উল্লেখ করার মতো বড় আরেকটা ঘটনা ঘটল দু'মাস পার হওয়ার পর।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলছিল আমাদের ক্লান্তিকর, একঘেয়ে মরুযাত্রা। যিউ নামের একটা মরূদ্যানে হাজির হলাম একদিন। খুব একটা বড় নয় মরূদ্যানটা। সুন্দর সুন্দর কয়েকটা ঝরনা আছে, আছে বেশ কিছু খেজুর গাছ। এখানে আগেও এসেছিলাম আমি, যে-আরব শেখ এটার মালিক তাঁর অফথ্যালমিয়া রোগের চিকিৎসা করেছিলাম। ওই শেখের জনা কয়েক অনুচরও চিকিৎসা পেয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার দেয়া ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছিল সবাই। তাই সেখানে পৌঁছানোর পর বেশ খাতির-যত্ন পেলাম সেখানকার লোকজনের

পক্ষ থেকে। যা-হোক, আমি চাইছিলাম যাত্রা বিরতি না-দিয়ে এগিয়ে যেতে। কিন্তু দেখলাম একটানা পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বাকিরা। কাজেই আমাদের কাফেলার উট-চালকদের সর্দার, শ্যাডর‍্যাক নামের ধূর্ত এক আবাটি যখন বলল যিউতে ক্যাম্প করে সপ্তাহখানেক জিরিয়ে নিলে আমাদেরও ক্লান্তি দূর হবে আর উটগুলোও চাঙা হবে, সবার কথা ভেবে রাজি হয়ে গেলাম।

শ্যাডর‍্যাককে ওর সহচররা ডাকত "বিড়াল" বলে। কেন জানতাম না তখন। ওর চেহারায় বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে– তিনটা ক্ষতচিহ্ন। কারণ জিজ্ঞেস করলাম একদিন, বলল, সিংহের থাবা খেয়েছিল একবার। যিউ-এর অধিবাসীদের কাছে সিংহ মানে দু'চোখের বিষ। বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে যখন খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়, মরূদ্যান থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত, পুব থেকে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সারি সারি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে সিংহের দল, মরুভূমি পার হয়ে সোজা হাজির হয় এখানে, নির্বিচারে হামলা চালায় যিউবাসীদের ভেড়া, উট আর অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপর। কখনও কখনও মানুষ খুন করতেও ছাড়ে না। গরীব যিউবাসীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কেনার মতো টাকা নেই, সুতরাং সিংহের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয় ওদের। কী ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে দিন কাটে ওদের না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। পাথরের দেয়াল-ঘেরা খোঁয়াড়ে গৃহপালিত জন্তুগুলোকে বন্দী করে রাখে ওরা, আর নিজেরা সূর্যাস্ত থেকে ভোর পর্যন্ত বন্দী হয়ে থাকে কুঁড়েঘরের ভিতরে। সিংহ তাড়ানোর জন্য মরূদ্যানের এখানে-সেখানে জ্বালিয়ে রাখা আগুন উস্কে দেয়া ছাড়া, রাতের বেলায় অন্য কোনো কাজের জন্য ঘর থেকে বাইরে বেরই হয় না বলতে গেলে।

আমরা যখন যিউতে তখন "সিংহের মৌসুম" চলছে। তবে প্রথম পাঁচদিন একটা সিংহেরও দেখা পেলাম না। সন্ধ্যার পর

ওগুলোর ডাক শুনতে পেলাম শুধু, তা-ও আবার দূর থেকে। ষষ্ঠ রাতে, আমরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, যিউ'র বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কারও বিলাপের আওয়াজ। লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। সিকি মাইল দূর থেকে আসছে শব্দটা। ব্যাপার কী জানার জন্য ছুটে যেতে ইচ্ছে করল, কিন্তু এই অন্ধকারে কাজটা উচিত হবে না ভেবে রয়ে গেলাম তাঁবুর ভিতরেই।

ভোরের আলো ফুটল আকাশে, তখন রওয়ানা হলাম যিউবাসীদের গ্রামের উদ্দেশে। দেখলাম, হতাশায় মুষড়ে পড়া একদল লোক এগিয়ে আসছে। সবার আগে ধূসরচুলো বৃদ্ধ সর্দার। তাঁর পিছনে বিলাপ করতে করতে আসছে কয়েকজন মহিলা। উত্তেজনার কারণে হোক অথবা শোক প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে হোক, প্রসাধন ব্যবহার করেনি কেউই। চারজন শক্তসমর্থ পুরুষও আছে, গাছের ডাল দিয়ে বানানো দরজা স্ট্রেচারের মতো ব্যবহার করে বীভৎস কিছু একটা বহন করে নিয়ে আসছে ওরা।

ঘটনা জানতে পারলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দু'-তিনটা সিংহ ঢুকে পড়েছিল সর্দারের কুঁড়েঘরের তালপাতা-দিয়ে-বানানো ছাদ ভেঙে। সর্দারের একটা বউকে সামনে পেয়ে আক্রমণ করে বসে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় মহিলা। এরপর সিংহগুলো গিয়ে ধরে সর্দারের এক ছেলেকে, কামড়ে ধরে টেনেহিঁচড়ে কুঁড়ের বাইরে নিয়ে যায় ওকে। সেই থেকে ছেলেটা নিখোঁজ।

আমাদের দেখামাত্র কান্নায় ভেঙে পড়ে সর্দার বললেন, 'আপনাদের কাছে বন্দুক আছে, দয়া করে সাহায্য করুন আমাদের। মানুষের রক্তমাংসের স্বাদ পেয়ে গেছে সিংহগুলো, হত্যা করা না-হলে আরও মানুষ খুন করবে ওরা।'

উত্তেজিত কণ্ঠে আর অসংলগ্ন ভাষায় কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল আমাদেরকে এক যিউ দোভাষী। কারণ যিউবাসীদের অদ্ভুত ভাষা এমনকী হিগসও ঠিকমতো বুঝতে পারে না। দোভাষী

লোকটা আরও বলল, অনতিদূরের কয়েকটা বালির-পাহাড়ে আপাতত আছে ওই সিংহগুলো। ছোট্ট একটা ঝরনা আছে সেখানে, আগাছা আর নলখাগড়ার জঙ্গলও আছে হালকামতো।

আমি শিকার করতে পছন্দ করি, তারপরও চুপ করে থাকলাম। কারণ চাইছিলাম না আমাদের কেউ জড়িয়ে পড়ুক সিংহ-শিকারের মতো একটা ঘটনার সঙ্গে। আমার মতে শিকারের নির্দিষ্ট সময় ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত। সব শিকার সবসময় করা যায় না। আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী, খাবারের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে আমাদের শিকার করা সাজে না। কিন্তু আমার মৌনতা কাজে লাগল না, যা আশঙ্কা করছিলাম তা-ই ঘটল—দোভাষীর মুখ থেকে সাহায্যের আবেদন শোনামাত্র কাজটা করতে রাজি হয়ে গেল অলিভার আর হিগস। এই অভিযানে আসার আগে জীবনে কোনোদিন রাইফেল ধরেছে কি না হিগস জানি না, ইদানীং চালানো শিখছে সে, গুলি করে নিশানা ফুটো করতে কতটা পারদর্শী হয়ে উঠেছে সেটা যাচাই করার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইল না তাই। বড় গলায় বলল, 'সিংহ শিকারের মতো সুযোগ জীবনে দু'বার পায় ক'জন? তা ছাড়া আমার মনে হয় সিংহ আসলে একটা ভীতু জীব। লোকে ওদের ব্যাপারে যা বলে বাড়িয়ে বলে।'

বুকের ভিতরে কেমন করে উঠল আমার, টের পেলাম খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমিও যেতে চাই জানালাম। কারণ দুটো—অনেকদিন হলো সিংহ শিকার করিনি এবং এই মরুভূমি হিগস বা অলিভারের চেয়ে অনেক ভালো করে চেনা আছে আমার।

রাইফেল আর যথেষ্ট পরিমাণ বুলেট নিলাম সঙ্গে। নিলাম পানির বড় বড় দুটো বোতল। আবার কখন খেতে পাই না-পাই ভেবে পেট ভরে নাস্তা করলাম তিনজনই। রওয়ানা হবো, এমন সময় হাজির হলো শ্যাডর্যাক; জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছি।

boiboi.net

সংক্ষেপে জবাব দিলাম।

শ্যাডর‍্যাক বলল, 'এসব বন্য বর্বর যিউদের উপকার করে লাভটা কী আপনার? ওদের দু'-একজন মরলে কী আসে যায়? আপনার যদি সিংহ শিকারের এতই ইচ্ছা থাকে তা হলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই তো শত শত সিংহ পাবেন। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, যতদূর জানি এই মরুভূমি সুবিধার জায়গা না, যে-কোনো সময় বড় বিপদ হতে পারে আপনাদের।'

'এত বকবক না-করে আমাদের সঙ্গে গেলেই তো হয়,' বলে বসল হিগস। 'এই মরুভূমি যদি তোমার চেনা থাকে তা হলে আমরাও একজন পথপ্রদর্শক পাই।'

'না,' মাথা নাড়ল শ্যাডর‍্যাক। 'আমি আর আমার লোকরা এখানেই থাকবো। বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ থাকার পরও পাগল ছাড়া আর কেউ এই গরমে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সিংহ শিকার করতে যাবে না, তা-ও আবার বলতে গেলে অকারণে। দিনের পর দিন মরুভূমিতে থাকতে থাকতে শখ মিটে গেছে আমার, সিংহ কী জিনিস সেটাও জানা আছে ভালোমতো। আপনাদের জায়গায় আমি থাকলে শিকারের কথাটা মাথাতেই আনতাম না।'

'মরুভূমিতে থাকতে আমাদেরও ভালো লাগছে না,' বলল অলিভার, 'কিন্তু শিকারের সুযোগ যখন পাওয়া গেছে সেটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। যাও, গিয়ে শুয়ে থাকো, নাক ডাকো আরাম করে, আমাদের কাজে যাই আমরা। এই যিউরা অনেক খাতির-যত্ন করেছে আমাদের, এখন বিপদে পড়েছে বেচারারা, সামর্থ্য থাকার পরও যদি ওদের উপকার না-করি তা হলে খারাপ দেখায়।'

বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসল শ্যাডর‍্যাক। 'যা ভালো মনে হয় করুন। আমার যতটুকু বলার ছিল বলেছি।' চেহারার ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাল সে। 'সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে এই দাগ। কাজটা কিন্তু একটা সিংহের। প্রার্থনা করি,

ঈশ্বর আপনাদেরকে সিংহের কবল থেকে রক্ষা করুন। ...আমাদের উটগুলো তাজা হয়ে উঠেছে এতদিনে, আবহাওয়া ভালো থাকলে আর আপনারা চাইলে আগামী পরশু রওনা হতে পারি আবার।' মাথার উপরে হাত তুলে বাতাসের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করল সে। 'বালির-পাহাড়ের দিক থেকে বাতাস বইলে বুঝবেন খারাপ হবে আবহাওয়া। মরুভূমি কাকে বলে টের পাবেন তখন,' ঘোঁতঘোঁত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করল সে, তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হয়ে গেল একটা কুঁড়েঘরের আড়ালে।

কিছুটা দূরে এঁটো থালা-বাসন ধুচ্ছিল সার্জেন্ট কুইক। আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছিল শোনেনি বোধহয়। ওকে ডাকল অলিভার। কাছে এল সে, অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। দেখে ওই পরিস্থিতিতেও কৌতুক বোধ করলাম। লম্বা একটা মানুষ, পরনে আধা-সামরিক পোশাক। খোদাই করা কাঠের মূর্তির মতো চেহারাটা নিখুঁতভাবে কামানো। পমেড বা ওই জাতীয় কিছু ব্যবহার করে সুন্দর করে আঁচড়িয়ে একেবারে পরিপাটি করে রেখেছে লৌহ-ধূমল চুল। দেখতে লাগছে সেকেলে সৈন্যদের মতো। সারা দেহ স্থির, কেবল ধূসর দুই চোখ চঞ্চল—বেজির মতো সারাক্ষণ তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

'আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি?' জানতে চাইল অলিভার।

'আদেশ করলে আমি যেতে বাধ্য, ক্যাপ্টেন। শিকার করতে আমারও নেহাত খারাপ লাগে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা সবাই যদি চলে যাই, তা হলে মালসামান পাহারা দেবে কে? আপনার কুকুরটা রেখে যান আমার কাছে, দু'জনে মিলে দেখে রাখবো সব।'

'ঠিকই বলেছ, সার্জেন্ট,' একমত হলো অলিভার। 'এক কাজ করো, আমার কুকুরটাকে বেঁধে ফেলো। নইলে আমাকে যেতে দেখলে আবার পিছু নেবে।' কুইককে উসখুস করতে দেখে বলল,

'কিছু বলতে চাও মনে হয়?'

'জী। এদের ভাষাটা ঠিকমতো বুঝি না আমি। কখন কী বলে ওরা ধরতে পারবো না হয়তো। একমাত্র ভরসা ছিল "বিড়াল", মানে শ্যাডর‍্যাক, কিন্তু ব্যাটার মতিগতি সুবিধার মনে হয় না আমার কাছে। আমাদের এই অভিযান একটুও পছন্দ করছে না সে। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি, শ্যাডর‍্যাক আর যা-ই হোক, বোকা না নিঃসন্দেহে।'

'কিছু করার নেই, সার্জেন্ট।'

কথা আর না-বাড়িয়ে কাজে লেগে গেল কুইক। দ্রুত নজর বুলাল আমাদের জিনিসপত্রের উপর, দরকারি কোনো কিছু ফেলে যাচ্ছি কি না দেখল। আমাদের রাইফেলগুলো পরীক্ষা করল, নিশ্চিত হলো ঠিকমতো কাজ করছে ওগুলো। সব ঠিক আছে জানিয়ে থালা-বাসন ধোওয়ার কাজে ফিরে গেল।

দেরি না-করে গ্রাম ছেড়ে বের হলাম আমরা। মরুভূমির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হলাম মাইলখানেক। তীর-ধনুক আর বর্শায় সজ্জিত কয়েকজন যিউ আছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের নেতৃত্বে আছেন যিউদের সর্দার। ট্র্যাকারের দায়িত্বটা পালন করছেন তিনিই। বউ আর ছেলেকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন বেচারা, একটা কথাও বলছেন না কারও সঙ্গে।

যিউতে যাওয়া পর্যন্ত মরুভূমির চেহারা ছিল একরকম, আর এখন আরেকরকম। এখানে-সেখানে বড় বড় আর খাড়া খাড়া বালির-পাহাড়। কোনো কোনোটা এমনকী তিনশ' ফুটের মতো উঁচু। গভীর, বাতাসে-কাটা অসংখ্য উপত্যকা আলাদা করেছে একটা পাহাড় থেকে আরেকটাকে।

যিউ'র ঈষৎ আর্দ্র বাতাস যতদূর পৌঁছাতে পেরেছে, কিছু-না-কিছু হলেও শ্যামলিমার ছোঁয়া পেয়েছে মরুভূমি। কয়েক জাতের গাছ নজরে পড়ল। যত এগোচ্ছি তপ্ত বালির নিষ্প্রাণ বিস্তার তত বাড়ছে, একবার এই ঢাল বেয়ে উঠছি তো পরেরবার ওই ঢাল

বেয়ে নামছি।

এ-রকম এক ঢালের মাথায় চড়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন সর্দার। তর্জনীর ইশারায় দূরের পানিভর্তি একটা গর্ত দেখালেন। এরকম গর্তকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বলে "ভ্লাই"। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি জমে থাকে এসব অগভীর গর্তে, প্রখর রোদেও টিকে থাকে অনেকদিন।

সর্দারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগাছা আর নলখাগড়ার ঝোপে ঢাকা ওই গর্তটা কিছুটা হলেও সবুজের ছোঁয়া পেয়েছে। আরও কিছুক্ষণ ভালোমতো দেখলেন সর্দার, চারপাশ জরিপ করলেন সতর্ক দৃষ্টিতে, তারপর বললেন দূরের ওই ঝোপজঙ্গলের আড়ালেই লুকিয়ে আছে খুনী সিংহগুলো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিলাম আমরা নিজেদের মধ্যে। আমি রয়ে গেলাম ঢালের মাথায়, সুবিধাজনক একটা জায়গায় পজিশন নিলাম রাইফেল হাতে। ঢাল বেয়ে নেমে গেল হিগস আর অলিভার, কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দু'দিকে সরে গেল দু'জন, তারপর নিজেদের সুবিধামতো জায়গায় বসে পড়ল। দু'দিক থেকে গর্তটা কভার করছে ওরা এখন। এবার ঢাল বেয়ে নেমে ধীর পায়ে সিকি মাইলের মতো চওড়া ঝোপজঙ্গলের দিকে এগোতে লাগল যিউরা। সিংহগুলোকে তাড়িয়ে আমাদের দিকে নিয়ে আসবে ওরা, তখন গুলি চালাবো আমরা।

গত বর্ষার বৃষ্টির স্পর্শে ঘন হয়ে উঠেছে আগাছা আর নলখাগড়ার জঙ্গল। পা টিপে টিপে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে অতি সতর্ক যিউরা। ওরা সেখানে পৌঁছাতে-না-পৌঁছাতেই যিউ ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলে উঠল কেউ। আপনাথেকেই ঘাড়টা উঁচু হয়ে গেল আমার।

দু'-এক মিনিট পর দেখি, সর্দারের ছেলের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশ টেনে বের করছে ওরা ঝোপজঙ্গলের ভিতর থেকে। ঠিক তখনই আরেকটা জিনিস নজরে পড়ল। আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এসেছে

বিশাল এক সিংহ, চুপিসারে এগোচ্ছে বালির-পাহাড়গুলোর দিকে। হিগসের থেকে দু'শ' গজের মতো দূরে আছে সিংহটা। সে যদি গুলি করে এখন লাভ হবে না কোনো, কারণ হিগসের মতো আনাড়ির জন্য দূরত্বটা অনেক বেশি। কিন্তু জীবনের প্রথম শিকার, তা-ও আবার সিংহ—উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে রাইফেল তুলেই ফেলল হিগস, কাঁধে ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ নিশানা করেই টান দিল ট্রিগারে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চমৎকার কোনো দুর্ঘটনাই হবে এটা বোধহয়—হিগসের এক্সপ্রেস রাইফেল থেকে বের-হওয়া বুলেট গিয়ে আঘাত করল সিংহটার কাঁধের কিছুটা পিছনে। তারপর, এত দূর থেকেও টের পেলাম, আরও ভিতরে ঢুকে গিয়ে জন্তুটার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিল সেই বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পড়ল সিংহটা, মরে পড়ে রইল পাথরের মতো।

'দ্যাখ্ শালা!' উল্লাসে ফেটে পড়ল হিগস, 'নিশানা কাকে বলে দ্যাখ্।' বলতে বলতেই ঝেড়ে দৌড় দিল সে, রাইফেলের খালি ব্যারেল রিলোড করার কথা মনেও থাকল না। ততক্ষণে বিস্ময় ভুলে দৌড়াতে শুরু করেছি আমি আর অলিভার।

ঝোপজঙ্গলের কিনারা ধরে দৌড়াচ্ছে হিগস, আর একশ' গজের মতো বাকি আছে, নলখাগড়ার ঝাড় টপকে এমন সময় হঠাৎ বের হলো একটা সিংহী, ছুটে আসতে লাগল সোজা হিগসের দিকে। থমকে দাঁড়াল হিগস, চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল। নিশানা না-করেই তাড়াহুড়ো করে গুলি করল। ছুটন্ত সিংহীর কাছ দিয়েও গেল না বুলেট। থমকে দাঁড়ালাম আমরাও, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই আঁতকে উঠে দেখি, হিগসের উপর লাফিয়ে পড়েছে সিংহীটা। চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল বেচারা। ওর বুকের উপর দু'পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল জন্তুটা, লেজ দিয়ে ক্রমাগত বাড়ি মারছে বালিতে, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ছে একের পর এক।

আপনাথেকেই অচল হয়ে গিয়েছিল আমাদের পা, এবার

দৌড় দিলাম আবার। চিৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল যিউরাও। এত হইচই শুনে ঘাবড়ে গেল সিংহীটা, হিগসকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার বদলে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার এদিক পরেরবার ওদিক দেখতে লাগল। ততক্ষণে হিগসের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছি আমি। ইচ্ছা করলেই সিংহীটাকে গুলি করা যায়, কিন্তু খুব বড় ঝুঁকির কাজ হয়ে যায় সেটা, কারণ তাড়াহুড়োয় নিশানা একচুল এদিক-ওদিক হলে ফুটো হয়ে যাবে হিগস নিজেই।

বিচলিত ভাব কাটিয়ে উঠে হিগসের দিকে আবার তাকাল সিংহীটা। হাতের সামনে কিছু না-পেয়ে ওটার মুখে ঘুসি চালাল হিগস। কিন্তু যুতসই হলো না আঘাতটা, মুখ নামাল সিংহী, হিগসের মাথায় কামড় বসাবে এখনই!

বুঝলাম, গুলি করতেই হবে এবার, কারণ আর এক মুহূর্তও দেরি করলে এমনিতেই মারা যাবে হিগস। সিংহীটা আকারে হিগসের চেয়ে অনেক বড়। ওটার শরীরের পিছনের দিক, বেঁটে হিগসের পা ছাড়িয়ে গেছে। সাবধানে নিশানা করেই টান দিলাম ট্রিগারে। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হলো সিংহীটা, ভয়ঙ্কর একটা গর্জন করে সরে দাঁড়াল হিগসকে ছেড়ে দিয়ে। পিছনের একটা পা বেকায়দাভাবে ঝুলছে ওটার। ওই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সবচেয়ে কাছের বালির-পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল।

এবার আমার পিছন থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি গুলি করেছে অলিভার। কিন্তু নিশানায় লাগল না বুলেট, ছুটন্ত সিংহীর পেটের নীচে বালি ছিটকে উঠল শুধু। অলিভারের রাইফেলটা রিপিটার, মুহূর্তের ব্যবধানে আবারও গুলি করতে পারে, কিন্তু সে-সুযোগ পেল না সে, একটা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সিংহীটা।

ওই জন্তুটার ব্যাপারে আর মাথাব্যথা নেই আমাদের।

হিগসের দিকে ছুটে গেলাম দু'জনই। ভেবেছিলাম গুরুতর আহত হয়েছে বেচারা, কিন্তু আমরা কাছে যাওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। নীল চশমাটা এখনও সেঁটে আছে ওর নাকে। রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে ছুটতে লাগল সে, আহত সিংহীটা যে-টিলার আড়ালে উধাও হয়েছে সে-টিলার দিকে যাচ্ছে।

'ফিরে আসুন,' হিগসের পিছু পিছু দৌড়াতে দৌড়াতে চেঁচিয়ে বলল অলিভার।

'না,' চেঁচিয়েই জবাব দিল হিগস। 'আজ আমার একদিন কি ওই সিংহীর একদিন। আমার পেটের উপর চড়ে বসে! দেখাচ্ছি মজা!'

কিন্তু সবচেয়ে কাছের চড়াইটা পার হওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল অলিভার। আমিও পৌঁছে গেলাম কিছুক্ষণ পর। সিংহীটার পিছু না-নেয়ার ব্যাপারে হিগসকে বোঝাতে লাগল অলিভার, কিন্তু ওর কথা কানেই তুলল না হিগস! ওর দিকে ভালোমতো তাকালাম। নাকের উপর সামান্য একটা আঁচড় ছাড়া কোনো ক্ষতিই হয়নি ওর। কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে, আর এ-কারণেই এত রেগে গেছে সে।

'তোমাদের যদি এতই ভয় লাগে, তা হলে নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকো,' রাগ আরও বেড়েছে হিগসের। 'একা যেতে তেমন একটা অসুবিধা হবে না আমার।'

কথা আর বাড়তে না-দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, চলো। সিংহীটাকে না-মারা পর্যন্ত শান্তি হবে না তোমার বুঝতে পারছি।'

হাঁটা ধরলাম আবার। বালির উপর ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে আছে রক্ত, ওগুলো অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম আমরা। একের পর এক ঢাল বেয়ে উঠলাম আর নামলাম টানা আধ ঘণ্টা ধরে। সিংহীটাকে দেখতে পেলাম হঠাৎ করেই। আমাদের থেকে পাঁচশ' গজ দূরে একটা ঢালের উপর বসে আছে। ধীর হয়ে এসেছিল আমাদের গতি, সতর্ক পদক্ষেপে আগে বাড়তে লাগলাম

আবার, এমন সময় খেয়াল করলাম এতক্ষণ নিঃশব্দে আমাদেরকে অনুসরণ করছিল যিউরা, এবার আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। কেমন মূর্তির মতো ওদের হাবভাব, শিকারের তেমন কোনো আগ্রহ নেই কারও চোখেমুখে।

সময় যাচ্ছে, তাল রেখে বাড়ছে রোদের তেজ। গরম একসময় এত বেড়ে গেল যে, কাঁপতে লাগল মরুর বাতাস। যেদিকেই তাকাই, দেখি বাতাসে কম্পন। প্রতিটা বালির-পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালে মনে হয় লক্ষ লক্ষ ডাঁশ যেন উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সূর্যের দেখা নেই; অদ্ভুত একজাতের কুয়াশায় ঢেকে আছে আকাশ। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করেই, কারণটা বুঝতে পারলাম না। মরুর প্রকৃতি সচরাচর এতটা নিস্তব্ধ হয় না। আকাশ আর মাটি যেন থমকে আছে একসঙ্গে। আশপাশের বালির-পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে খসে খসে পড়ছে বালি, এমনকী সে-শব্দও শোনা যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গের যিউরা অস্বস্তি বোধ করছে, হাতের বল্লম দিয়ে একবার উপরের দিকে, তারপর অনেক পিছনে ফেলে-আসা ওদের মরূদ্যানের দিকে কী যেন নির্দেশ করছে সবাই। ব্যাপার কী কিছুই বুঝতে পারছি না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম আমরা তিনজন। তারপর আবার যখন তাকিয়েছি যিউদের দিকে, অবাক বিস্ময়ে দেখি, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমন চুপিসারেই উধাও হয়ে গেছে ওরা মুহূর্তের মধ্যে।

বুঝলাম, কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো একটা ঘাপলা আছে। তা না-হলে এরকম অদ্ভুত আচরণ করত না যিউরা। সিংহীটাকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল হিগস। আমার সঙ্গে আসবে নাকি হিগসের সঙ্গে যাবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে না-পেরে কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার, চুপ করে থাকল।

'যিউরা গেছে, যাক,' চশমা মুছতে মুছতে বলল হিগস,

তাকিয়ে দেখি মুখ মলিন হয়ে গেছে ওর, 'ওরকম একদল কাপুরুষ সঙ্গে থাকার চেয়ে না-থাকাই ভালো। যত্তোসব ছিঁচকে চোরের দল! ...দেখুন, দেখুন, ওই যে, সিংহীটা! পালাচ্ছে। চলুন, ওই বালি-পাহাড়টার দিকে এখনই দৌড়াতে শুরু করলে ধরতে পারবো হারামজাদীকে।'

দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা। বালির উপর রক্তের টাটকা দাগ; সে-দাগ ধরে এদিক-ওদিক করতে করতে কয়েক মাইল এগোলাম, একসময় হিগসের একগুঁয়েমি আর সহিষ্ণুতার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম আমি আর অলিভার। শেষপর্যন্ত এমনকী হিগসও আশা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, এমন সময় সিংহীটাকে কোণঠাসা করে ফেললাম আমরা। একটা গর্তের ভিতর আটকা পড়ে গেল বেচারী। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে আসার চেষ্টা করছে, সে-সুযোগ দিলাম না ওটাকে, কয়েকবার গুলি করলাম। অলিভারের বুলেট গিয়ে বিঁধল জায়গামতো, উল্টে পড়ে গড়ান খেল জন্তুটা, তারপর গজরাতে গজরাতে চার পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো আবার।

আরও কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। বিশাল এক কুকুরের মতো দেখাচ্ছে এখন সিংহীটাকে। দাঁত বের করে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করছে ওটা, বাতাসে থাবা মারছে একটু পর পর। এসব ছাড়া করার আর কিছু নেইও ওটার, কারণ এত বেশি আহত হয়েছে যে, হাঁটতে পর্যন্ত পারছে না।

'এবার আমার পালা,' বলেই গুলি করল হিগস এবং মাত্র পাঁচ গজ দূরে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ওর। আবার গুলি করল সে। এবার জায়গামতো গিয়ে লাগল বুলেট, উল্টে পড়ে মারা গেল সিংহীটা।

'চলুন,' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল হিগস, 'গিয়ে চামড়া ছাড়াই ওটার। আমার ওপর চড়ে বসেছিল হারামজাদী। আমিও চড়ে বসতে চাই ওর উপর।'

boiRboi.net

ছাল ছাড়াতে শুরু করলাম আমরা। কিন্তু কাজটা করতে একটুও ইচ্ছা করছে না আমার। এই মরুভূমির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়, আবহাওয়ার হঠাৎ এই পরিবর্তন ভালো লাগছে না। বুঝতে পারছি সিংহীটা যেখানে যেভাবে আছে সেখানে সেভাবে ফেলে রেখে মরূদ্যানে ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু পারছি না। কারণ চামড়া না-নিয়ে কিছুতেই যাবে না হিগস, আর আমি ছাড়া অন্য কারও এই কাজের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতাও নেই।

একসময় শেষ হলো আমাদের কাজ। একটা রাইফেলের সঙ্গে দু'ভাঁজ করে পেঁচিয়ে নিলাম ছালটা। সিদ্ধান্ত নিলাম, রাইফেলের দু'প্রান্ত পালা করে দু'জন ধরে বয়ে নিয়ে যাবো। পানির বোতল থেকে অল্প করে পানি খেয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম মরূদ্যানের উদ্দেশে। মুখের রক্ত আর দু'হাত ধুয়ে নিল হিগস একফাঁকে। পাতলা কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক, সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে, তাড়াহুড়ো করতে দিয়ে কম্পাসও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি, অনুমানের উপর ভর করে চলতে লাগলাম আমরা।

আধ মাইল এগিয়েই টের পেলাম, পথ ভুল করেছি। থামলাম, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে-ঢালে মেরেছি সিংহীটাকে ফিরে যাবো সেখানে, তারপর নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে হাঁটতে থাকবো।

সিংহীর চামড়া কম ভারী নয়, বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের তিনজনেরই। হাঁসফাঁস করতে করতে গিয়ে হাজির হলাম একটা ঢালের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ভুল করেছি, এই ঢাল থেকে গুলি চালাইনি আমরা সিংহীটার উপর। নেমে গিয়ে উঠলাম আরেকটা ঢালে। এবারও টের পেতে দেরি হলো না, ভুল জায়গায় এসেছি।

হতাশ হয়ে উপলব্ধি করলাম, মরুভূমিতে হারিয়ে গেছি আমরা।

boiRboi.net

চার

'এখন কথা হচ্ছে,' বিজ্ঞের মতো বলল হিগস, 'জঘন্য এসব বালির-পাহাড় দেখতে একইরকম। আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। ...পানির বোতলটা দিন তো, অ্যাডামস। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'না,' সোজা মানা করে দিলাম, 'এখনই সব পানি শেষ করে ফেললে পরে কী অবস্থা হবে আমাদের?'

'পরে হয় যিউরা খুঁজে বের করবে আমাদেরকে, নইলে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা। এত চিন্তার কী আছে?'

ওর কথা শেষ হলো কি হলো না, অদ্ভুত একটা গুঞ্জন শুরু হলো বাতাসে হঠাৎ করেই। অবর্ণনীয় কোনো সুরের মতো লাগল আমার কাছে গুঞ্জনটা, মনে হলো যেন ঘর্ষণ শুরু হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ বালিকণার মধ্যে। কোত্থেকে আসছে শব্দটা দেখার জন্য ঘুরে তাকালাম আমরা। দেখলাম, অনেক দূরে তৈরি হয়েছে মেঘের কয়েকটা মোচাকৃতির স্তম্ভ; অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

'বালিঝড়,' বলল হিগস, ফেকাসে হয়ে গেছে ওর লাল মুখ, 'কী করবো আমরা এখন? ঝড় না-থামা পর্যন্ত আশ্রয় নেবো কোনো পাহাড়ের পাদদেশে?'

'এখানেই থামতে হবে এখন আমাদেরকে,' বললাম আমি, 'আর এগোনো যাবে না। এগোলে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে সবার।'

banglaboi.net

কাছের একটা বিশাল বোল্ডারের দিকে ইঙ্গিত করলাম, প্রবল বাতাসের কারণে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে পাথরটার একপ্রান্ত। 'চলো তাড়াতাড়ি। সিংহের চামড়াটা সঙ্গে নিয়ে যাবো, মাথার উপর দিয়ে রাখবো। তা হলে নাক-মুখ দিয়ে বালি ঢুকে দম আটকে মরবো না হয়তো।'

মেঘের মতো দেখতে বালির-স্তম্ভগুলো এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। শুনতে এখন আর গুঞ্জন নয়, বন্য কোনো পশুর গর্জনের মতো লাগছে। বোল্ডারের আড়ালে পৌঁছে গেলাম আমরা, বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে বসলাম, বালিঝড় থেকে বাঁচার জন্য উট যেভাবে উবু হয়ে বসে মুখ লুকায় সেভাবে বসে পড়লাম। মাথা আর শরীর ঢাকলাম সিংহের চামড়া দিয়ে, শক্ত করে ধরে থাকলাম যাতে উড়ে না-যায় ঝোড়ো বাতাসে।

আমাদের উপর হামলে পড়ল মরুঝড়। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলাম আমরা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বাতাসের প্রচণ্ড আওয়াজের কারণে কথাও বলতে পারছি না। বেশ কিছুক্ষণ পর পর হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে নড়েচড়ে বসতে হচ্ছে, জমাট বালি তখন খসে পড়ছে আমাদের উপর থেকে। হারিকেনের গতিতে উড়ন্ত সুচালো বালি আঘাত করছে আমাদেরকে, জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে আমাদের পাতলা জামাকাপড়, বালির সঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণের কারণে খসখসে হয়ে যাচ্ছে চামড়া।

'মিশরীয় ভাস্কর্যগুলো এত চকচকে হয় কী করে এতদিনে বুঝলাম!' নিখাদ আর্তনাদের মতো শোনাল হিগসের ব্যঙ্গ। সিংহ মারার কারণেই আমাদের এই দুর্দশা—জানিয়ে একটানা কিছুক্ষণ বিড়বিড় করল, তারপর গুঙিয়ে উঠতে লাগল একটু পর পর। দেখে মনে হলো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে বেচারা।

ঝড় চলছে। সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছি আমরা। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, টানা বিশ ঘণ্টা ধরে চলেছিল ওই ঝড়।

একসময় অচেতন হয়ে পড়লাম সবাই, সংজ্ঞা থাকার কথাও নয় অবশ্য। তবে মনে আছে, বাতাসে চাবুক ঘোরালে যে-রকম আওয়াজ হয় সে-রকম আওয়াজ শুনছিলাম, আর আমার ছেলের চেহারাটা বার বার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। গরম লোহার মতো তপ্ত বাতাস যেন ছ্যাঁকা দিচ্ছিল শরীরে, খররোদ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল চামড়া।

চোখের পাতার উপর পুরু-হয়ে-জমা বালি পরিষ্কার করে অনেকক্ষণ পর পাশে তাকালাম। সাদা পাথর দিয়ে বানানো মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে আমার দুই সঙ্গী। অলিভার উঠে দাঁড়াল একসময়, আমার কাছে মনে হলো সে যেন বালি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে। আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, তারপর হিগসের দিকে ইঙ্গিত করে বলল অলিভার, 'মরে গেছে নাকি?'

'তা-ই তো মনে হয়,' ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম। 'দেখতে হবে।' দু'জনে এগিয়ে গেলাম হিগসের দিকে, বালি খুঁড়ে বের করতে লাগলাম বেচারাকে।

সিংহের চামড়ায় ঢাকা ছিল হিগসের শরীরটা; ওটা সরিয়ে দেখি, কালো আর বীভৎস হয়ে গেছে ওর চেহারা। কিন্তু সুখের বিষয়, মারা যায়নি সে–কাতর একটা আওয়াজ বের হলো ওর গলা দিয়ে, সামান্য নড়ে উঠল একটা হাত।

আমার দিকে তাকাল অলিভার। বললাম, 'পানি খেলে ঠিক হয়ে যাবে বেচারা।'

দু'বোতল পানি ছিল আমাদের সঙ্গে, ঝড় শুরু হওয়ার আগেই খালি হয়ে গিয়েছিল এক বোতল। রেশমী কাপড়ে মোড়ানো শক্ত চামড়ার, ভালকানাইটের মুখওয়ালা আরেকটা বড় বোতল ছিল; তাতে সাড়ে তিন লিটারের মতো পানি থাকার কথা, ওটা দেখার পর হঠাৎ করেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম–প্রচণ্ড তাপে এতক্ষণে হয়তো উবেই গেছে বেশিরভাগ পানি!

বোতলটা হাতে নিল অলিভার, দাঁত দিয়ে কামড়ে কর্ক খুলল। উঁকি দিয়ে দেখি, সামান্য পানি বাকি রয়ে গেছে, প্রচণ্ড তাপে বাষ্পীভূত হয়ে যায়নি। চুমুক দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল অলিভার, এত জোরে কামড়ে ধরল নিজের ঠোঁট যে, দেখে আমার মনে হলো কেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে আসবে। বোতলটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি বয়সে বড়, যা ভালো বোঝেন করুন।'

প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছিল আমার, ইচ্ছা হচ্ছিল একচুমুকে শেষ করে ফেলি সবটুকু পানি। নিজেকে সংযত করতে কষ্ট হলো। বোতলটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম হিগসের পাশে। প্রচণ্ড তাপে আর পানির অভাবে ফুলে গিয়ে কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে ওর ঠোঁট, একটু একটু করে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম সেখান দিয়ে।

যাদুর মতো কাজ হলো। মিনিটখানেকের মধ্যেই উঠে বসল হিগস, দু'হাত বাড়িয়ে ধরল বোতলটা, দুর্বল হাতে টানাটানি করতে লাগল আমার সঙ্গে, পারলে ছিনিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে! কিন্তু সফল হলো না সে, একটানে বোতলটা নিয়ে নিলাম আমি।

'নিষ্ঠুর জানোয়ার কোথাকার!' আহাজারির মতো শোনাল হিগসের কণ্ঠ। 'স্বার্থপর!'

'দেখো, হিগস,' কিছুটা কঠোর গলায় বললাম, 'অলিভার আর আমারও পানি দরকার। কিন্তু এক ফোঁটাও খাইনি আমরা। তোমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে যদি সবটুকু পানির দরকার হতো, তা হলে সবটুকুই ঢেলে দিতাম তোমার মুখে। কিন্তু দরকার হয়নি। আমাদের অবস্থাটা ভেবে দেখো। অচেনা এক মরুভূমিতে হারিয়ে গেছি আমরা। বোতলের এই সামান্য পানিটুকু ছাড়া আর এক ফোঁটা পানিও নেই আমাদের সঙ্গে। এখনই যদি সব শেষ করে ফেলো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার পিপাসা লাগবে তোমার

এবং তখন পানি না-পেয়ে মরতে হবে আমাদেরকে।'

কিছুক্ষণ ভাবল হিগস, তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে আমার, ক্ষমা চাই। ...বোতলে এখনও যথেষ্ট পানি আছে; কিছুটা করে খেয়ে নিই আমরা। তা না-হলে চলার মতো শক্তিও থাকবে না শরীরে।'

মন্দ বলেনি সে। আমাদের সঙ্গে রাবারের একটা ছোট কাপ ছিল, ওই কাপের তিন কাপ পানি খেলাম তিন জনে। একবারে শেষ না-করে সময় নিয়ে অল্প অল্প করে খেলাম, তাতে তৃপ্তিও হলো এবং মনে হলো এক কাপ নয় এক গ্যালন করে পানি খেয়েছি সবাই। শক্তি ফিরে পেলাম অনেকখানি।

উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। মনে হলো, ভয়াবহ ঝড়ে পাল্টে গেছে সবকিছু। আগে যেখানে কম করে হলেও একশ' ফুট উঁচু বালির-পাহাড় ছিল, এখন উধাও হয়ে গেছে সব–নীচের বালির সঙ্গে মিশে গেছে। আর আগে যেখানে ফাঁকা জায়গা ছিল, এখন সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকৃতির সব বালির-পাহাড়। আমরা যে-উঁচু ঢালের উপর শুয়ে ছিলাম ঝড়ের সময়, শুধু সেটাই অবিকৃত আছে। কারণ দুটো–পাহাড়ি এই ঢালটা আর সবগুলোর চেয়ে উঁচু এবং এটা শুধুই বালি-নির্মিত নয়, ভিতরে পাথরও আছে। সূর্যের অবস্থান দেখে মরূদ্যানটা কোথায় বোঝার চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু পারলাম না। আরও বড় সমস্যা— আমাদের কারও ঘড়িই কাজ করছে না, কাজেই ক'টা বাজছে বুঝতে পারছি না। আবার, এই ঊষর জনহীন অচেনা প্রান্তরে কম্পাস কাজে লাগিয়ে দিক নির্ণয় করা না-করা সমান কথা।

মরূদ্যানটা কোথায়, তা নিয়ে বাকযুদ্ধ শুরু হলো হিগস আর অলিভারের মধ্যে। একজন বলে, আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাঁ-দিকে যেতে হবে, আরেকজন বলে ডান দিকে। ওদের সেই কথা-কাটাকাটিতে যোগ দিলাম না আমি, থামানোর চেষ্টাও করলাম না। বালির উপর বসে পড়লাম,

সিংহগুলো যে-পাহাড়ে দেখেছিল ইহুদিরা সে-পাহাড়গুলো কোথায় হতে পারে দেখতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে। একসময় মনে হলো সে-রকম কয়েকটা পাহাড় যেন দেখতে পাচ্ছি দূরে, যদিও নিশ্চিত নই পুরোপুরি, ওগুলো অন্য পাহাড়ও হতে পারে।

'শোনো,' ডাকলাম হিগস আর অলিভারকে, 'দূরের ওই পাহাড়গুলোয় যদি সিংহ থেকে থাকে, তার মানে ওগুলোর আশপাশে কোথাও পানি আছে। চলো যাই ওখানে। যেতে যেতে মরূদ্যানটা চোখে পড়তেও পারে আমাদের।'

শুরু হলো আমাদের নীরস যাত্রা। শুকিয়ে বোর্ডের মতো শক্ত হয়ে গেছে সিংহের-চামড়া; ওটা ফেলে দিলাম আমরা, তবে রাইফেলগুলো সঙ্গে নিলাম। বালিয়াড়ির চড়াই-উতরাই বেয়ে খুবই ধীর গতিতে হাঁটতে লাগলাম সারাটা দিন ধরে, বলা ভালো বয়ে বেড়ালাম আমাদের ক্লান্ত দেহগুলোকে, এক চুমুক করে পানি খাওয়ার জন্য থামলাম বেশ কিছুক্ষণ পর পর। যখনই কোনো ঢালের মাথায় গিয়ে চড়লাম, মনে আশা জাগল—উদ্ধারকারী কোনো দল নিয়ে এখনই বুঝি হাজির হবে কুইক, অথবা সামনেই দেখতে পাবো মরূদ্যানটা। একবার এক পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মাইল তিনেক সামনে চকচকে সবুজ কিছু একটার দেখাও পেলাম, কিন্তু কাছে গিয়ে হতাশ হতে হলো আমাদেরকে—মিলিয়ে গেছে মরীচিকা।

সন্ধ্যা ঘনাল শেষপর্যন্ত। অনেক দূরের ওই পাহাড়গুলো অনেক দূরেই রয়ে গেছে এখনও। আর এক কদম হাঁটার মতো শক্তিও নেই আমাদের শরীরে। বালির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। তপ্ত বালি আর জ্বলন্ত রোদের কারণে বলতে গেলে ফোসকা পড়ে গেছে আমাদের পিঠ আর পাছায়, তাই বসতেও পারছি না, চিত হয়ে শুতেও পারছি না। যতটুকু পানি ছিল সঙ্গে, সব শেষ হয়ে গেছে প্রায়।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ টের পেলাম কনুই দিয়ে

কে যেন গুঁতো দিচ্ছে আমাকে। তাকিয়ে দেখি, হিগস। হাত উঁচু করে সামনের দিকে দেখাল সে। যেদিকে দেখাচ্ছে, সেদিকে তাকালাম এবার। গজ ত্রিশেক সামনে, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলেছে এক পাল অ্যান্টিলোপ, সন্দেহ নেই এক চারণভূমি থেকে আরেক চারণভূমির দিকে যাচ্ছে।

'তোমরা গুলি করো,' নিচু কণ্ঠে বলল হিগস, 'আমি গুলি করলে মিস্ হতে পারে, তখন ভয় পেয়ে পালাবে সবগুলো হরিণ।'

ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসলাম আমি আর অলিভার। একটা ছাড়া বাকি সবগুলো হরিণ বালিয়াড়ির আড়ালে চলে গেছে ইতোমধ্যে, যে-কোনো কারণেই হোক দল থেকে আলাদা হয়ে বিশ গজের মতো পিছনে পড়ে গেছে নিঃসঙ্গ প্রাণীটা। নিশানা করে ট্রিগার টানল অলিভার, কিন্তু কিছুই হলো না। বুঝলাম, বালি ঢুকে অকেজো হয়ে গেছে ওর রাইফেল, পরিষ্কার না-করা পর্যন্ত কাজ হবে না।

রাইফেল তুলেছিলাম আমিও, তাক করে ছিলাম হরিণটার দিকে। কিন্তু মরুভূমির কড়া রোদে লম্বা সময় ধরে থাকার পর সূর্যাস্তের পর থেকেই কেমন যেন আবছা দেখছি, যতটা না অন্ধকার তারচেয়ে বেশি আঁধার লাগছে চোখে। কাহিল লাগছে, হরিণটা মারতে পারবো কি না সে-চিন্তায়ও উত্তেজিত হয়ে আছি কিছুটা। যদি বলি আমার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে আমাদের জীবন তা হলে বোধহয় ভুল হবে না, কারণ খাবার বলতে কিছুই নেই আমাদের সঙ্গে। কিন্তু এতকিছুর পরও তাড়াহুড়ো করলাম না, আরও যত্ন নিয়ে নিশানা স্থির করলাম। কিন্তু আর দেরি করাটা ঠিক হবে না—তিন কদম এগোলেই চোখের আড়ালে চলে যাবে হরিণটা।

গুলি করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে আমার। সারাদিনের উত্তেজনা আর পরিশ্রম, কিছুক্ষণ আগের

উদ্বেগ, বয়স—সব একসঙ্গে যেন চেপে বসল আমার উপর, জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, বালিয়াড়ির আড়ালে চলে গিয়েও আবার ফিরে আসে হরিণটা, থমকে দাঁড়ায়, রাইফেলের আওয়াজ কখনও শোনেনি বলে বোধহয় মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলের কারণেই ঘুরে তাকায় আমাদের দিকে।

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়েছি আমি। আমাদের সামনে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হরিণটা। চরম হতাশা নিয়ে গুলি করলাম আবার, বলতে গেলে নিশানা না-করেই। কিন্তু এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না—বুলেট গিয়ে ঢুকল হরিণটার গলার নীচে। নিশ্চল প্রাণীটা সচল হলো হঠাৎ, কিন্তু ততক্ষণে প্রাণ বেরিয়ে গেছে ওটার, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিষ্প্রাণ পাথরের মতো। হামাগুড়ি দিয়ে হরিণটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা এবং ওটাকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে কাঁচাই খেতে লাগলাম মাংস। ঘটনাটা মনে পড়লে এখনও গা গুলিয়ে উঠে আমার। যা-হোক, কপাল ভালো ছিল আমাদের—মরার অল্প কিছুক্ষণ আগে পেট ভরে পানি খেয়েছিল জন্তুটা, তাই তৃষ্ণাও মিটিয়ে নিতে পারলাম আমরা।

ওই বন্য আর ভয়ঙ্কর উপায়ে ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ করার পর হরিণটার মরদেহের পাশেই শুয়ে পড়লাম আমরা, ঘুমিয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য। জেগে উঠে টের পেলাম, বেশ ভালো লাগছে—দুর্বলতা কেটে গেছে, আগের মতো অসহায়ও মনে হচ্ছে না নিজেদেরকে। বেশ বড় দেখে এক ফালি মাংস কেটে আলাদা করে নিলাম, সঙ্গে নিয়ে যাবো, পরে কাজে লাগবে। যাত্রা শুরু করলাম আবার। আকাশে তারার অবস্থান দেখে অনুমান করার চেষ্টা করলাম মরূদ্যানটা কোথায় হতে পারে। মনে হলো পুবদিকে হবে সম্ভবত। কিন্তু ওই উদ্যান আর আমাদের মাঝখানে মাইলের পর মাইল ধরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে একের পর এক

বালির-পাহাড়। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তারপরও মনে হচ্ছে যতই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ততই রূপ পাল্টেছে এই মরুভূমির। সিংহ ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীর দেখা পাইনি এ-পর্যন্ত, তাই আপাতত নিরাপদ মনে হচ্ছে জায়গাটা, তবে সামনে কী আছে জানি না।

সারা রাত ধরে হাঁটলাম আমরা। রান্না করার সরঞ্জাম নেই সঙ্গে, তাই সঙ্গে নিয়ে আসা কাঁচা মাংসই খেলাম আবার ভোরের দিকে। খাওয়ার আগে মাংস ধুয়ে নিতে হলো, কাজটা করার পর আর এক ফোঁটাও পানি বাকি থাকল না আমাদের কাছে।

পিছনে তাকিয়ে দেখি, বালির-পাহাড়ের সারি পার হয়ে এসেছি। দাঁড়িয়ে আছি নুড়িপাথরে ভরা এক সমতলভূমিতে। অনতিদূরে দিগন্ত-বিস্তৃত অনেকগুলো পর্বতের পাদদেশ। দেখে যদিও মনে হচ্ছে কাছে, কিন্তু আসলে এখনও অনেক দূরে আছে ওই পর্বতগুলো। যত এগোচ্ছি তত শক্তি হারাচ্ছি আমরা, আমাদের হাঁটা দেখলে যে-কেউ বলবে আসলে খোঁড়াচ্ছি আমরা। তবে সে-কথাটা বলার মতো চতুর্থ কারও দেখা পেলাম না, পানির কোনো খোঁজও পেলাম না। এখানে-সেখানে গজিয়ে আছে ছোট ছোট ঝোপ, বেছে বেছে কিছু ঝোপ থেকে আঁশযুক্ত সুগন্ধী আর ভেজা পাতা তুলে নিয়ে চিবাতে লাগলাম। এতে তৃষ্ণা কিছুটা হলেও মিটল, কিন্তু মুখ আর গলার ভিতরটা হয়ে গেল ফিটকিরির মতো।

হিগস, আমাদের তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে কম কষ্টসহিষ্ণু। বহন করতে না-পেরে কখন যেন নিজের রাইফেলটাও ফেলে দিয়েছে সে, খেয়াল করিনি। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না এখন, পড়ে যাচ্ছে বার বার। ওর একটা হাত কাঁধে তুলে নিল অলিভার, আরেকটা তুলে নিলাম আমি। আমাদের উপর ভর দিয়ে এগোতে লাগল হিগস।

আধ ঘণ্টা পর আমারও শক্তি ফুরিয়ে গেল। বাড়িয়ে বলছি

না, বয়স হলেও এখনও যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ আমি, মরুভূমি পাড়ি দেয়ার মতো কঠিন কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু এখন আর পারছি না। একটু পর পর থেমে দাঁড়াতে হচ্ছে আমাকে, আমাকে পিছনে ফেলে রেখে হিগসকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করছি অলিভারকে বার বার। শেষপর্যন্ত বাঁ হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল অলিভার। ধরলাম ওর হাত, কারণ মুখে যে যা-ই বলুক সবাই বাঁচতে চায়। আমিও চাই, কারণ আমি না-বাঁচলে আমার ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবো না।

এগিয়ে চলেছি আমরা। এগিয়ে চলেছি মানে অলিভারের দু'কাঁধে ভর দিয়ে আছি আমি আর হিগস, আমাদের দু'জনকে বলতে গেলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। অলিভারের শক্তি আর মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা করতেই হয়—অন্য কেউ হলে হাল ছেড়ে দিত এতক্ষণে, অথচ সে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে।

হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অলিভার, দেখে মনে হলো গুলি খেয়েছে। পড়েই থাকল অজ্ঞানের মতো। পড়ে গেলাম আমি আর হিগসও। পড়ামাত্র বোধহয় মাথাটা খালি হয়ে গেল হিগসের, উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করল। আমাদের এই অভিযান পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, সিংহ দুটোকে হত্যা করার জন্যই এত দুর্ভোগ আমাদের—এরকম আরও অনেক কথা বলতে লাগল সে। কিছুক্ষণ একটানা বকবক করার পর উঠে বসল সে, হাঁটু গেড়ে বসল আমার সামনে যেভাবে লোকে গির্জার যাজকের সামনে বসে সেভাবে। তারপর সারাজীবনে যত পাপ করেছে সব একে একে স্বীকার করতে লাগল আমার কাছে। ওর বেশিরভাগ কথাই এখন আর মনে নেই আমার, কারণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি সব; নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে এতটাই নিশ্চিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার পাপের চিন্তাও পেয়ে বসেছিল আমাকে।

অদ্ভুত এক আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। মনে হলো, সান্ত্বনা

না-দিলে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে হিগস। ধর্মীয় জ্ঞান বলতে যা ছিল আমার, সব উগড়ে দিতে লাগলাম ওর কানে। তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ শুনল সে, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল অলিভারের পাশে, নড়ল না আর। ভাবলাম, অলিভারের মতোই মরে গেছে বেচারা, অথবা মারা যাচ্ছে।

সন্দেহ নেই, মারা যাচ্ছি আমিও। হাত-পা কাঁপছে, অদ্ভুত এক অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমার সত্ত্বাকে, বুক থেকে শুরু করে মগজ পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শৈশবের ধূসর স্মৃতিগুলো জেগে উঠছে একে একে। মনে পড়ে গেল, একবার এক ক্রিসমাস পার্টিতে ছোট্ট একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। ডাইনির সাজে সেজে এসেছিল মেয়েটা। সে ছিল নীল-নয়না। প্রথম দেখাতেই ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, যদিও সপ্তাহ দু'-এক পর কেটে যায় আমার সে-ঘোর।

কী করা যায় এখন? এই নিস্তেজ শরীর নিয়ে কী করতে পারি আমি আসলে? আগুন জ্বালানো যায়; ফলে আমরা মারা যাওয়ার আগে অন্তত আমাদের উপর হামলা করতে পারবে না সিংহ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী। অসহায় অথচ সজ্ঞান অবস্থায় ওদের ধারালো দাঁতের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার শরীরে এত শক্তিও নেই যে, উঠে গিয়ে কাঠ বা লাকড়ি কিছু যোগাড় করে এনে আগুন জ্বালাবো। অনেক দূর হাঁটতে হবে আমাকে, যা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এখন। আমার রিপিটিং রাইফেলে বুলেটও আছে মাত্র তিনটা, বোঝা কমানোর জন্য বাকিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি অনেক আগেই। কী করবো ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, শিকার করা অথবা হিংস্র জন্তু ঠেকানো—কোনো কাজেই যখন কাজে লাগবে না বুলেটগুলো তখন খরচ করে ফেলবো ওগুলো, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিরতিতে গুলি করবো, এই

সীমাহীন মরুভূমিতে কারও কানে গেলেও যেতে পারে রাইফেলের আওয়াজ, আর যদি না-যায় তা হলে ভাগ্যে যা আছে মেনে নেবো।

উঠে বসলাম। রাইফেলটা আকাশের দিকে তাক করে গুলি করলাম, খরচ করলাম প্রথম কার্ট্রিজ। বাচ্চাদের মতো ভাবতে লাগলাম, কোথায় গিয়ে পড়বে বুলেটটা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের জন্য। হায়েনার ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি, খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে জন্তুটা, অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলছে ওটার। রাইফেল তুলে নিশানা করেই গুলি করলাম। ব্যথায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হায়েনাটা, উধাও হয়ে গেল কোথায় যেন। ভাবলাম, হয়তো আর কোনোদিনই খাবারের দরকার হবে না ক্ষুধার্ত জন্তুটার।

হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, সুনসান হয়ে গেছে চারদিক। মরুভূমির এই নিস্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে। এবং একসময় ব্যাপারটা এত অসহনীয় হয়ে উঠল যে, প্রার্থনা করতে লাগলাম অন্তত আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য হলেও আবার যেন ফিরে আসে হায়েনাটা। আবার আকাশের দিকে তাক করলাম আমার রাইফেল, ট্রিগার টানলাম, খরচ হয়ে গেল তৃতীয় ও শেষ কার্তুজটা। তারপর হিগসের একটা হাত তুলে নিলাম আমার হাতে। আস্তে আস্তে চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল আমার, মনে হলো কালো একটা পর্দার আড়ালে চলে এলাম যেন।

ঠোঁটে পানির স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙল আমার। কেউ একজন পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করছে আমাকে! ঈশ্বর! ধরেই নিলাম মরার পরে স্বর্গে ঠাঁই পেয়েছি, কারণ স্বর্গ ছাড়া অন্য কোথাও পানি পাওয়া যায় না এ-রকম একটা চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আমার মনে ওই সময়ে। যে বা যারা আমার মুখে পানি ঢালছিল, যতক্ষণ ঢালল, ততক্ষণ গিলে চললাম। তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে

বসে তাকালাম চারদিকে।

মরুর আবহাওয়া অস্বাভাবিকরকম পরিষ্কার। আকাশে তারার উজ্জ্বল আলো। ওই আলোয় আমার-উপর-ঝুঁকে-থাকা সার্জেন্ট কুইকের চেহারাটা চিনতে একটুও বেগ পেতে হলো না আমাকে। অলিভারকেও দেখি উঠে বসে আছে, বোকার মতো তাকিয়ে আছে কুইকের দিকে। ম্যাস্টিফের মতো মাথাওয়ালা বিশাল এক হলুদ কুকুর একটু পর পর চেটে দিচ্ছে অলিভারের হাত। দেখামাত্র চিনতে পারলাম কুকুরটাকে–একদল ভবঘুরে আদিবাসীর কাছ থেকে কিনেছে অলিভার, নাম ফারাও। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দুটো উট। তার মানে, এখনও মরিনি, পৃথিবীতেই আছি।

ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদেরকে খুঁজে পেলে কীভাবে, সার্জেন্ট?'

'আমার নয়, কৃতিত্বটা ফারাও-এর,' বলল কুইক। 'এসব ক্ষেত্রে একজন মানুষের চেয়ে একটা কুকুর অনেক বেশি কাজের। আমরা যা দেখি না, ঘ্রাণ শুঁকে ঠিকই সে-জিনিসের হদিস পেয়ে যায় ওরা। ...এখন যদি সুস্থ বোধ করেন, মিস্টার হিগসকে একটু দেখুন। আমার মনে হয় মারা গেছেন বেচারা।'

তাকালাম হিগসের দিকে। প্রথম দেখায় মনে হলো, ঠিকই বলেছে কুইক। মুখ হাঁ হয়ে আছে হিগসের, একটুও নড়ছে না, সংজ্ঞা নেই। ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না কালো চশমাটার কারণে।

ওর দিকে ইশারা করে কুইককে বললাম, 'পানি।'

হিগসের মুখে কিছুটা পানি ঢেলে দিল কুইক।

তবুও নড়ল না হিগস। শার্টের বোতাম খুলে ওর বুকের বাঁ দিকে হাত রাখলাম। প্রথমটায় বোঝা গেল না কিছুই, একটু পর টের পেলাম খুবই ধীরগতিতে চলছে বেচারার হৃৎপিণ্ড।

আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাকিরা, ওদের না-বলা কথার জবাবে বললাম, 'আশা আছে এখনও। তোমার কাছে ব্র্যাণ্ডি আছে, কুইক?'

'আছে মানে? ওই জিনিস ছাড়া কখনও কোথাও যাই নাকি আমি?' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ধাতব ফ্ল্যাস্ক বের করল কুইক।

'হিগসকে খাওয়াও কিছুটা,' বললাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাস্কটা হিগসের মুখের উপর উপুড় করে ধরল কুইক।

যাদুর মতো কাজ হলো। ভীষণ কাশতে কাশতে লাফিয়ে উঠে বসল হিগস, কাশির চোটে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। হাঁপাতে হাঁপাতে নিচু কিন্তু ভারী কণ্ঠে বলল, 'ব্র্যাণ্ডি! মদ ছেড়ে দিয়েছি আমি আর আমাকে খাওয়ানো হলো ব্র্যাণ্ডি? কোনোদিন ক্ষমা করবো না তোমাদেরকে। ...পানি, পানি দাও আমাকে...'

পানি দেয়া হলো ওকে। সমানে গিলতে লাগল সে। শেষে বাধ্য হয়ে ওর কাছ থেকে বোতল কেড়ে নিতে হলো। তারপর একটু একটু করে কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেল সে। এতক্ষণ ধরে পরে থাকা কালো চশমাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কুইকের দিকে। স্বভাবসুলভ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছিলটা কী?'

কিন্তু কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো অবসর নেই কুইকের। আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। ছোট্ট একটা চুলাও বানিয়ে ফেলেছে, তাতে চাপিয়ে দিয়েছে একটা ক্যাম্প-কেটলি। এখন দেখি, শুকনো গরুর-মাংসের একটা টিন খুলছে; আমাদেরকে খুঁজে পেলে কী খাওয়াবে ভেবে হয়তো আমাদের রসদ থেকে টিনটা নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে সুপ হয়ে গেল। এত ভালো লাগল খেতে যে কী আর বলবো! ভাবিইনি জীবনে আর কোনোদিন সুপ খেতে পারবো। যা-হোক, আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর, উটের পিঠে রাখা মাল-সামান থেকে দুটো কম্বল নিয়ে এল কুইক, খুলে বিছিয়ে দিল আমাদের গায়ে। বলল, 'আপনারা শুয়ে

পড়ুন। ক্যাপ্টেন অলিভারের কুকুর ফারাওকে সঙ্গে নিয়ে পাহারায় থাকছি আমি।'

মনে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম সার্জেন্ট কুইকের দিকে। ধার্মিক মানুষ সে; বালির উপর হাঁটু গেড়ে বসে একমনে প্রার্থনা করছিল। ধর্মকর্মে তেমন একটা ভক্তি নেই আমার, তাই পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে; জবাবে সে বলেছিল, আসলে যা ঘটার তা ঘটবেই, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন এড়াতে পারবো না। কিন্তু যিনি ঘটাচ্ছেন তিনি যেহেতু ভালো সেহেতু আমাদের জন্য খারাপ কিছু করবেন না। আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো ঘটনা আমাদের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, কারণ আমাদের জ্ঞান কম, কিন্তু একসময়-না-একসময় যে-কোনো ঘটনার ভালো ফল আমরা পাবোই।

কুইকের উল্টোদিকে বসে ছিল ফারাও। ঘুম ঘুম চোখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল ধ্যানমগ্ন একটা মূর্তি যেন, যার একটা চোখ সবসময় মনিব অলিভারের দিকে।

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল আমাদের। টিন থেকে বেকন বের করে আগুনে ঝলসাচ্ছে কুইক। ওর দিকে, অথবা ঝলসানো বেকনগুলোর দিকে গত রাতের মতোই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফারাও।

পর্বতগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বলল অলিভার, 'দেখুন, এখনও অনেক মাইল দূরে আছে ওগুলো। ওখানে পৌঁছানোর চিন্তা করা মানে পাগলামি করা।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, তারপর ঘুরে তাকালাম হিগসের দিকে। ঘুম থেকে মাত্র উঠছে সে। দেখতে হাস্যকর লাগছে ওকে। ওর আগুনের মতো লাল চুলগুলো ঢেকে গেছে সাদা বালিতে, চলতে কষ্ট হচ্ছিল বলে ট্রাউজারের প্রায় পুরোটাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে, প্রচণ্ড রোদে ফোস্কা পড়ে গেছে ধবধবে সাদা সারা শরীরে, এমনকী চেহারাতেও। আসলে ওর আদল এতটাই

পাল্টে গেছে যে, ওর সবচেয়ে বড় শত্রুও ওকে এখন আর চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। হাই তুলল সে, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর গোসল করতে চাইল।

'হাজার চাইলেও কোনো উপায় নেই,' বলল কুইক। 'বালি দিয়েই কাজ সারতে হবে আপনাকে, সার। গোসল করার মতো পর্যাপ্ত পানি নেই আমাদের কাছে। তবে এক টিউব হ্যাযেলিন, একটা চিরুনি আর একটা আয়না আছে আমার কাছে,' বলতে বলতে জিনিসগুলো বের করল সে। 'নিন, কাজে লাগবে আপনার।'

জিনিসগুলো নিতে নিতে বলল হিগস, 'এই খটখটে শুকনো পানিশূন্য দেশে গোসল করার কাজে পানির ব্যবহার...ভ্রষ্টাচারই বলা যায়, নাকি?' হাতে ধরা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখল সে। আপনাথেকেই মুঠো আলগা হয়ে গেল ওর, বালির উপর পড়ল আয়নাটা। 'ঈশ্বর!' যেন বলতে ভয় পাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল সে। 'কী অবস্থা হয়েছে আমার!'

'সাবধান, সার,' কিছুটা কঠোর গলায়ই বলল কুইক। 'আপনিই কিন্তু বলেছিলেন আয়না ভেঙে যাওয়া নাকি কুলক্ষণ। তা ছাড়া আমার কাছে ওই জিনিস একটাই আছে।'

'নিয়ে যাও তোমার আয়না,' বলল হিগস। 'আমার আর লাগবে না ওটা। ...ডাক্তার অ্যাডামস, আমার চেহারায় কি হ্যাযেলিন মালিশ করে দেবেন?'

মালিশের কাজ শেষ করে নাস্তা খেতে বসলাম আমরা।

ছোট ধাতব কাপে চা খাচ্ছিলাম, পর পর পাঁচ কাপ চা শেষ করে কুইকের দিকে তাকাল অলিভার। 'এবার সার্জেন্ট, তোমার কাহিনিটা বলো তো। আমাদেরকে খুঁজে পেলে কীভাবে?'

'কাহিনি তেমন কিছুই না। আপনাদেরকে ছাড়াই ফিরে এল ওই ইহুদিরা। ওদের ভাষা তো কিছুই বুঝি না, তাই হড়বড় করে কী বলছিল মাথায় ঢুকল না। আকার-ইঙ্গিত দেখে যা বুঝলাম,

ওরা বলছিল, মরণ-ঝড়ের কবলে **পড়ে** প্রাণ হারিয়েছেন আপনারা, কাজেই আপনাদেরকে খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। রিভলভারটা বের করে ঠেকালাম তখন ইহুদিদের দলনেতা শ্যাডর‍্যাকের বুকে, বললাম, "তুইও মরতে চাস্ কি না বল্?" কথা আর বাড়াল না ব্যাটা, রওনা হলো, পিছন পিছন চলতে লাগলাম আমিও।

'প্রথমে মনে হচ্ছিল ওদের কথাই ঠিক—মরে বালির নীচে চাপা পড়ে আছেন আপনারা। সাংঘাতিক ঝড় মোকাবেলা করে উটগুলোও চলতে চাচ্ছিল না। তা ছাড়া এক আবাটি উটচালকেরও কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না, এবং ব্যাটা এখন পর্যন্ত নিখোঁজ। বুঝলাম, পরিস্থিতি বেগতিক, একা সামলাতে পারবো না। মরূদ্যানে গিয়ে হাজির হলে হয়তো আর কোনোদিনই খুঁজে পাবো না আপনাদেরকে, আবার আপনাদেরকে খুঁজতে বের হলে যে-কোনো সময় নিজের লোকদের নিয়ে যে-কোনো কিছু করে বসতে পারে শুয়োর শ্যাডর‍্যাক। কাজেই দুটো উট, টুকটাক কিছু জিনিস আর ফারাওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একাই।

'কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে আপনাদের তা নিয়ে ভাবছিলাম আগে থেকেই, যদিও কথাটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারিনি আবাটিদের কাছে। বেঁচে থাকলে পর্বতের দিকেই রওনা হবেন আপনারা, কারণ আমি জানি, আপনাদের কাছে কম্পাস নেই এবং অন্য কোনো জায়গাও চেনেন না কেউ। কাজেই, মরুভূমি আর পর্বতের মাঝখানের সমতলভূমি ধরে এগোতে লাগলাম। তবে যেখানেই বালিয়াড়ি দেখেছি, থেমে কাছে গিয়েছি, আপনাদেরকে খুঁজেছি। এভাবে সারাটা দিন পার হওয়ার পর রাতে বাধ্য হয়ে থামতে হলো আমাকে, কারণ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। যা-হোক, বসে ছিলাম উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, ভাবছিলাম কী করা যায়, এক কি দু'ঘণ্টা পর দেখি কান খাড়া করে কী যেন শুনছে বা শোনার চেষ্টা করছে ফারাও, একটু পর

পরই তাকাচ্ছে পশ্চিমদিকে। দেরি না-করে রওনা হয়ে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর মনে হলো মৃদু একটা আলোর ঝলকানি দেখলাম যেন, আকাশের দিকে উঠে গেল আলোটা, তার মানে কোনো তারা খসেনি। ভাবলাম, অনেক দূরে কেউ গুলি করেছে, সম্ভবত রাইফেল দিয়ে, তাই আলো দেখা গিয়েছে শুধু, শব্দ শোনা যায়নি।

'কান খাড়া করলাম, কিন্তু এমন কিছু শুনতে পেলাম না যার দ্বারা মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। তখন ফারাওকেও দেখি উৎকর্ণ হয়ে আছে—কিছু শুনতে পেয়েছে যেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আলোর ঝলকানিটা যেদিকে দেখেছিলাম সেদিকে রওনা হলাম উটের পিঠে চড়ে। দু'ঘণ্টার মতো চললাম, আকাশের দিকে তাক করে রিভলভার দিয়ে গুলি করলাম কিছুক্ষণ পর পর। কোনো জবাব পেলাম না। কেউ শুনতে পায়নি, তার মানে আমার উদ্দেশ্য মাঠে মারা গেছে ভেবে গুলি করা বন্ধ করে থামলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল ফারাও-এর আচরণ। একটানা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল সে, কী যেন শুঁকতে লাগল বাতাসে আর বার বার সামনের দিকে দৌড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল আমার কাছে। তারপর একসময় দৌড়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে, একশ' গজ মতো গিয়ে থেমে ডাকতে লাগল একটানা। মনে হয় আমাকেই ডাকছিল, কে জানে! পিছু নিলাম ওর এবং তারপর খুঁজে পেলাম আপনাদেরকে। প্রথমে ভেবেছিলাম মরে গেছেন সবাই, পরে বুঝলাম...। যা-হোক, এ-ই হলো আমার কাহিনি।'

'এবং সুখের কথা হলো, দুঃখজনক কোনো সমাপ্তি নেই কাহিনিটায়,' হেসে বলল অলিভার। 'তোমার কাছে সারাজীবনের জন্য ঋণী হয়ে থাকলাম আমরা। আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি।'

'মাফ করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, ক্যাপ্টেন,' বিনয়ী কণ্ঠে বলল কুইক। 'কৃতজ্ঞতা যদি প্রকাশ

করতে চান তা হলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন সবার আগে। আমাদের জন্মের আগেই সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন তিনি। আর ফারাও-এর কথাও ভুলে যাবেন না। সামান্য একটা কুকুর হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে, যদিও কখনও কখনও খুব ক্ষেপে যায়। এক বোতল হুইস্কি আর ছ'পেনি দামের একটা পকেটনাইফের বিনিময়ে ওকে কিনে ঠকেননি আপনি।'

পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু করলাম আবার। গতি খুব ধীর আমাদের, কারণ পালা করে উটের পিঠে চড়তে হচ্ছে আমাদেরকে। দুটো উটকে ঠিকমতো চালানোর জন্য একটা উটের পিঠে সবসময় বসে আছে কুইক, আরেকটার পিঠে একবার চড়ছি আমি, আরেকবার হিগস বা অলিভার। বেশিরভাগ সময় উটের পিছন পিছন হাঁটতে হচ্ছে আমাদেরকে। তখন আমাদের গতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য অনেক ধীরে উট চালাচ্ছে কুইক। তা ছাড়া ঠিকমতো খেতে না-পেয়ে উটগুলোও কাহিল হয়ে পড়েছে, চলতে চলতে থেমে দাঁড়াচ্ছে বার বার।

এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ লাগাম টানল কুইক, অনেক দূরের একরাশ ধুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমাদের। বলল, 'দেখে মনে হয় আরব, ডাক্তার অ্যাডামস।'

'যদি তা-ই হয়,' বললাম আমি, 'যেভাবে যাচ্ছি সেভাবেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। ওরা যাতে ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করতে না-পারে। যদি মেজাজ ঠিক থাকে ওদের তা হলে আমাদেরকে কিছুই বলবে না ওরা, কিছু করবেও না।'

অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এরকম যা কিছু ছিল আমাদের সঙ্গে, প্রস্তুত করে নিয়ে এগোতে লাগলাম। দূর থেকে যাদেরকে আরব বলে মনে করেছিলাম, কাছাকাছি হওয়ার পর তাদেরকে দেখে আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। কাফেলাটার নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্যাডর্যাক! আমার একটা উট ছিল, সেটার পিঠে বসে আছে আরাম করে! আমাকে চেনামাত্র থামল সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকল আমার দিকে। কিছুক্ষণ পর, ওর বিস্ময়ভাবটা কেটে যাওয়ার পর বলল, 'আরন! আমি যা দেখছি ঠিক দেখছি নাকি? আমরা তো ভেবেছিলাম মরে গেছেন আপনারা!'

'দেখতেই পাচ্ছ বেঁচে আছি,' বললাম আমি। উটের পিঠে বোঝাই করা আমাদের জিনিসপত্রের দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'মালসামানসহ যাচ্ছিলে কোথায়? তোমাদের বিদায় দিল কে?'

খুব স্বাভাবিকভাবেই, মনগড়া কিছু ব্যাখ্যা দিল শ্যাডর‍্যাক এবং বার বার ক্ষমা চাইল আমাদের কাছে। শেষে বিরক্ত হয়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল অলিভার, 'হয়েছে, হয়েছে। তুমি দেখি ভাষণ শুরু করে দিয়েছ! তোমার ইচ্ছাটা কী বলো এবার। থাকবে আমাদের সঙ্গে, নাকি চলে যাবে?'

থাকতে চাইল শ্যাডর‍্যাক।

'তা হলে আর দেরি না-করে পথ দেখিয়ে মরূদ্যানে নিয়ে চলো আমাদেরকে। সেখানে গিয়ে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবো আমরা।'

কথাটা শুনে মুখ কালো হয়ে গেল শ্যাডর‍্যাকের। সেই প্রথম থেকে দেখে আসছি, মরূদ্যানে যাওয়ার ব্যাপারে কেন যেন খুব অনীহা ওর, সুযোগ পেলেই এড়াতে চায় বার বার। এবারও মিনমিন করে কিছু একটা বলতে চাইছিল, ওকে সে-সুযোগ দিলাম না। রানি মাকেডার সেই প্রাচীন আংটিটা বের করলাম পকেট থেকে। ওর চোখের সামনে সেটা ধরে বললাম, 'আমাদের কথা না-শুনলে কী হবে তোমার জানো? আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তিনি যখন দেখবেন মরুভূমি পর্যন্ত এসে পথ না-চিনে হারিয়ে গেছি আমরা অথবা না-খেতে পেয়ে মরেছি আমরা, তখন তোমার কী অবস্থা করবেন তিনি বুঝতে পারছ?'

আর একটা কথাও বলল না শ্যাডর‍্যাক। ওদের গোত্রের কায়দায় স্যালুট করল আংটিটাকে, তারপর আবার পথপ্রদর্শকের

ভূমিকা পালন করতে লাগল।

যিউতে ফিরে চললাম আমরা।

পাঁচ

আরও ছ'সপ্তাহের মতো কেটে গেল। বিরান এই দেশটার প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। শেষ হয়ে এসেছে মরুর শত শত মাইলব্যাপী রাজত্ব। লম্বা এই সময়টাতে উল্লেখ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি, অন্তত আমার দৃষ্টিতে। হিগস বা অলিভার হয়তো একমত হবে না আমার সঙ্গে, কারণ মরুভূমিতে এই প্রথম এত লম্বা একটা সময় অতিবাহিত করছে ওরা, ওদের চোখে সবকিছুই তাই নতুন, সাধারণ কোনো দৃশ্য বা ঘটনাও ব্যতিক্রমী।

দিনের পর দিন ধরে বালির এই সমুদ্র পাড়ি দেয়া আসলে এতই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার যে, এই দেড়মাসে ভবঘুরে কোনো বেদুইনের সঙ্গেও দেখা হয়নি আমাদের। না-হওয়াটাই বরং স্বাভাবিক। সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট করে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয় কারও? দিনের পর দিন সেই একই দৃশ্য—পুবাকাশ লাল করে সকালে সূর্য ওঠে, সারাদিন আগুন ঝরায়, তারপর পশ্চিমাকাশ লাল করে অস্ত যায় বিকেলের পর। রাতের পর রাত সেই একই ঘটনা—মেঘহীন আকাশে জ্বলজ্বল করে চাঁদ; আমাদের চারপাশের বালির সমুদ্র তখন এত বেশি চকচক করতে থাকে যে, মনে হয় পৃথিবী থেকে অন্য কোনো গ্রহে পৌঁছে গেছি যেন। পরিষ্কার আবহাওয়ায় চোখ তুলে তাকালেই দেখা যায় লক্ষ তারার মেলা। পথ চলতে চলতে ভাবি, এই

বিশাল জনমানবশূন্য মরুপ্রান্তরের কোথাও-না-কোথাও এককালে জনপদ ছিল, তা যত ছোটই হোক না কেন। সেসব জনপদের অধিবাসীরাই এককালে হেঁটে বেড়াত এই মরুর বুকে, আজ ওদেরকে কেউ স্মরণও করে না বোধহয়; ওরাই নিজেদের প্রয়োজনে কুয়া খনন করেছিল জায়গায় জায়গায়, যেখান থেকে আমাদের পানির প্রয়োজন মিটিয়ে নিই আমরা।

কোনো এক সেনাবাহিনীও কোনো এক কারণে অভিযান চালিয়েছিল এই মরুভূমিতে, কোনো এক সময়। চলতে চলতে এমন একটা জায়গায় হাজির হলাম আমরা একদিন, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে আঘাত হেনেছিল ভয়ঙ্কর কোনো মরুঝড়। জায়গায় জায়গায় উধাও হয়ে গেছে বালি, দেখে মনে হয় বিশাল কোনো দানব থাবা দিয়ে দিয়ে খুবলে তুলে নিয়ে গেছে যেন। নিরাবরণ হয়ে গেছে মরু, বেরিয়ে পড়েছে নীচের পাথর। বেরিয়ে পড়েছে হাজার হাজার কঙ্কালও—মরে পড়ে আছে অসংখ্য সৈন্য, একজনের উপর আরেকজন। মরে পড়ে আছে তাদের মালসামানবাহী জন্তু-জানোয়ারগুলোও। পরে আছে তীর, তলোয়ার, বর্ম এবং রঙ-করা কাঠের ঢাল।

জানি না, হয়তো আলেকযান্ডার পাঠিয়েছিলেন এই সৈন্যগুলোকে, কোনো একটা রাজ্য জয় করার জন্য। অথবা অন্য কোনো নাম-না-জানা সম্রাটের বাহিনীও হতে পারে, পৃথিবী ভুলে গেছে যাঁকে। এই কঙ্কালগুলোর কেউ একদিন ছিল দুর্দান্ত কোনো ক্যাপ্টেন, কেউ বা লড়াকু সৈনিক। আবার কেউ মনোরঞ্জনকারিণী উপপত্নী বা রক্ষিতা, কারণ কোনো কোনো কঙ্কাল দেখেই আমি চেনেছি সেগুলো নারীদেহের। কোনো কোনো খুলির সঙ্গে এখনও লেপ্টে আছে লম্বা লম্বা চুল। ভাবলাম, এই কঙ্কালগুলো যদি কথা বলতে পারত, তা হলে না জানি কত অভিনব সব ঘটনা জানা যেত!

মরুভূমিতে ছোট ছোট কয়েকটা শহরও চোখে পড়ল

boighar.net

আমাদের। শহর মানে আদ্যিকালের শহর, এখন এককথায় ধ্বংসস্তূপ। একসময় একের বেশি মরূদ্যান ছিল একেকটা শহরে, এখন বলতে গেলে চিহ্নমাত্র নেই সেগুলোর। বালি দিয়ে ঢেকে গেছে সব, একটা কি দুটো মৃত ঝরনা মাথা তুলে আছে কোনোরকমে। দুটো শহরের ভিত্তিও দেখতে পেলাম দু'বার—কাদা বা পাথর দিয়ে বানানো বহু পুরনো সব দেয়াল। দেখা মিলল কালের ছোবলে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বহু পুরনো কিছু ঘরবাড়ির, বলা ভালো ঘরবাড়ির কঙ্কালের। ছোবলের পর ছোবল দিয়ে বালির কবর থেকে এসব কঙ্কাল তুলে এনেছে যেন মরুর বাতাস। ভাবলেই উদাস হয়ে যায় মন—এই ঘরগুলোই একদিন ছিল একশ্রেণীর লোকের আশা আর ভয়ের নাট্যশালা, এই ঘরগুলোতেই একদিন মানুষ জন্মাত, ভালোবাসত, তারপর একসময় মরে যেত, ছোট ছোট বাচ্চারা খেলত।

এক সন্ধ্যায় পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে দেখতে পেলাম ঘোড়ার-নালের মতো আকৃতি বিশিষ্ট সুউচ্চ এক পর্বতশ্রেণীর। কাছিয়ে আসছে মুর, যদিও এখন অনেক অনেক মাইল দূরে আছি আমরা। নিভু নিভু আশা নতুন করে জ্বলে উঠল যেন মনের ভিতরে—শহরটার দেখা পাই বা না-পাই, শহরটাকে ঘিরে রাখা পর্বতগুলোর দেখা পেয়েছি তো অন্তত!

পরদিন সকালে জঙ্গলে ছাওয়া বিস্তৃত এক ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম আমরা, চওড়া একটা নদীর দিকে যাচ্ছি। নিশ্চিতভাবে জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, নীল নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এই নদীটা।

তিন দিন পর, বহুল ব্যবহৃত আর অনেক পুরনো একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছালাম নদীর তীরে। জায়গায় জায়গায় প্রচুর পরিমাণে গজিয়ে আছে রসালো ঘাস আর ঝোপঝাড়; দেখে ভয় হলো, এতদিন ধরে বলতে গেলে না-খেয়ে থাকা উটগুলো না আবার আমাদেরকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়ে হামলে

পড়ে ওসবের উপর!

দূর থেকে দেখতে পেলাম, মুরের পর্বতগুলোকে ঢেকে ফেলেছে ভারী কালো মেঘ, ওই পর্বতগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমিতে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। বুঝলাম, বর্ষাকাল শুরু হয়েছে এখানে। আমাদের পৌঁছাতে যদি আর একটা সপ্তাহও দেরি হতো, প্রবল বন্যার কারণে এই নদীটাই পার হতে পারতাম না হয়তো। নদীর কোন্ অংশটা সবচেয়ে অগভীর দেখে নিলাম, তারপর পার হলাম সেদিক দিয়ে। উটগুলোর হাঁটুর নীচেই থাকল পানি।

তীরে পৌঁছে আলোচনায় বসলাম আমরা। ফাংদের রাজত্বে প্রবেশ করেছি, আমাদের আসল বিপদ শুরু হয়েছে এতদিনে। এখনও পঞ্চাশ মাইলের মতো দূরে আছে মুর, কাজেই এই পঞ্চাশ মাইল কীভাবে গেলে খারাপ কিছু ঘটবে না আমাদের কপালে সেটাই হলো প্রশ্ন। শ্যাডর‍্যাককেও ডেকে নিয়ে বসালাম আমাদের সঙ্গে। দূরের পর্বতগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে যা বলল সে তার সারমর্ম হচ্ছে, আবাটিরা থাকে পর্বতের ওপাশে। আর এপাশে, মানে সমতলভূমিতে এবং এবুর, মানে নদীটার দুই তীরে থাকে বর্বর ফাংরা। দশ হাজারের মতো যোদ্ধা আছে ওদের। বিদেশিদের কাছে যদিও গ্রাম বলে মনে হয়, আসলে ফাংদের প্রধান শহরের নাম হারম্যাক; আর শহরের বাইরে, পার্বত্য উপত্যকায় সেই আদিকাল থেকে বসে আছে ওদের দেবতা হারম্যাকের বিশাল সেই পাথরের মূর্তি। "রাজধানীর" মতো এই মূর্তিটার নামও হারম্যাক।

'হারম্যাক মানে আসলে হারমাচিস,' জ্ঞান বিতরণের সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইল না হিগস। 'মিশরীয়দের প্রভাতের দেবতা। ফাংরা এই হারমাচিসকে পূজা করে, তার মানে প্রাচীন মিশরের কোনো একটা ধর্মের অনুসারী ওরা, অথবা প্রাচীন মিশরের কোনো একটা গোত্রের বংশধর।'

'কিছু মনে করবেন না, প্রফেসর,' বিরক্ত হয়ে বলল অলিভার, 'ধর্মতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে। আগে জানটা বাঁচানো যায় কীভাবে সে-আলোচনা করা যাক। ...শ্যাডর‍্যাক যা বলছিল বলুক, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যেতে পারে।'

সুতরাং আবার বলতে শুরু করল শ্যাডর‍্যাক, 'ফাংদের এই দেশে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারের মতো অধিবাসী আছে। মুর পর্বত-ঘেরা, পর্বতের গায়ে সৃষ্ট ফাটলই সেখানে ঢোকার প্রবেশপথ, আর সেই পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে এই ফাংরা।'

'তার মানে মুরে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই?' জানতে চাইল অলিভার।

'আছে। কিন্তু সেখানে অনেক বেশি পাথর। তা ছাড়া জায়গাটাও অনেক উঁচু-নিচু, উট বা মালসামান কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা।'

'অন্য কোনো উপায়? গোপন কোনো রাস্তা?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল শ্যাডর‍্যাক। 'উত্তরদিকে, এখান থেকে আট দিনের পথ দূরে। কিন্তু বছরের এই সময়টাতে যাওয়া যাবে না ওখানে। কারণ ওই জায়গাটাও পর্বতে ঘেরা, আর সেখানে বিশাল এক হ্রদ আছে। ওই হ্রদ থেকেই এবুর নদী বের হয়েছে, তারপর দুই ভাগে ভাগ হয়ে ঘিরে ফেলেছে ফাংদের পুরো সমতলভূমিকে। বর্ষা মৌসুম চলছে, তার মানে এতদিনে টইটম্বুর হয়ে গেছে হ্রদটা; মুর আর ওই হ্রদের মাঝখানের সমতলভূমি এখন অনতিক্রম্য এক জলাভূমি।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না অলিভার, পারার কথাও নয়। 'উট বা মালসামান ছাড়া যে-রাস্তা দিয়ে ঢোকা যাবে বলছ, সে-জায়গার বর্ণনা দাও তো।'

'জায়গাটা অনেক খাড়া আর আলগা পাথরে ভরা, অনেকটা প্রপাতের মতো। আগে থেকেই যদি খবর দিয়ে রাখা যায়

আবাটিদের, তা হলে হয়তো ওদের সাহায্য নিয়ে ওই খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে পারবেন, কিন্তু উট বা মালসামান ফেলে যেতে হবে।'

'উট না-হয় ফেলে গেলাম,' তিক্ত হাসল অলিভার, 'কিন্তু মালসামান ফেলে যাওয়া যাবে না। কারণ ওগুলো ফেলে গেলে এত কষ্ট করে এত দূরে আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই—মালসামান আর জানসহ মুরে পৌঁছা। এবং কাজটা করতে হলে ফাংদের এলাকা দিয়েই যেতে হবে আমাদেরকে। সেটা কি সম্ভব, শ্যাডর‍্যাক?'

'ঈশ্বর যদি চান তা হলে সবই সম্ভব, মিস্টার অলিভার। ...দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে, পথ চলতে হবে রাতে। আরেকটা কথা। প্রতি বছর বসন্তকাল বিদায় নেয়ার পর একটা ভোজের আয়োজন করে ফাংরা, ওদের ভাষায় "বসন্ত-ভোজ"। আমার মনে হয় আগামীকাল সূর্যাস্তের পর হারম্যাক শহরে ওই ভোজের আয়োজন করবে ওরা। তার আগে ভোরে দলে দলে যাবে দেবতা হারম্যাকের মূর্তির সামনে, বলি দিতে। সূর্যাস্তের পর তো বলতে গেলে হুঁশই থাকবে না একেকজনের–যত পারে তত খাবে, গলা পর্যন্ত মদ গিলবে, ইচ্ছামতো নাচানাচি আর ফুর্তি করবে। তখন পাহাদাররাও গিয়ে যোগ দেয় সবার সঙ্গে, কেউ কিছু বলে না।'

'ওই ভোজটা যে আগামীকালই করবে ওরা জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'চাঁদের এই মাসের বয়স দেখে। ...ঈশ্বর যদি সাহায্য করেন, আগামীকাল রাতে হারম্যাক পার হবো আমরা এবং পরদিন ভোরে গিয়ে হাজির হবো মুরে যাওয়ার রাস্তায়। আমাদের যাওয়ার কথাও জানিয়ে রাখবো আবাটিদের, যাতে সাহায্যের দরকার হলে এগিয়ে আসতে পারে ওরা।'

'জানাবে কীভাবে?' আবারও জানতে চাইল অলিভার।

‘নলখাগড়ায় আগুন লাগিয়ে,’ আশপাশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকা মৃত ঝোপঝাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল শ্যাডর‍্যাক।

‘কিন্তু নলখাগড়ার আগুন দেখে আবাটিরা বুঝবে কীভাবে ওই আগুন তুমিই লাগিয়েছ? জানবে কীভাবে সাহায্যের দরকার তোমার?’

‘অনেক, অনেক মাস আগে, যখন মুর ছেড়ে চলে আসি, তখন বলে এসেছিলাম আমার লোকদের। নদীর তীরে যদি কখনও নলখাগড়ার আগুন দেখে ওরা, বুঝে নেবে এসে গেছি আমি, সাহায্যের দরকার হয়েছে আমার।’

‘কিন্তু ফাংরাও যদি দেখে ফেলে ওই আগুন?’

‘দেখলে ভাববে ভবঘুরে কোনো জেলে করেছে ওই কাজ। সন্দেহ করবে না।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। ‘এখন শ্যাডর‍্যাক, কথা হচ্ছে, এই এলাকা আর এখানকার লোকদেরকে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো করে চেনো তুমি। কাজেই তুমি যা বলবে তা-ই করতে হবে আমাদের। কিন্তু আগামীকাল রাতের ব্যাপারে যা বললে, তা তত সহজ বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। পাহারা যতই শিথিল হোক না কেন, একবার যদি ধরা পড়ি ফাংদের হাতে, পৃথিবীর আলো-বাতাস আর দেখতে পাবো না কোনোদিন।’

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হাসল শ্যাডর‍্যাক। ‘হুঁ, ব্যাপারটা বিপজ্জনক, মানলাম। কিন্তু আমি জানি আপনারা ইংল্যাণ্ডের মানুষ, আর ইংল্যাণ্ডের লোকরা নাকি কাপুরুষ হয় না।’

‘কাপুরুষ!’ রাগে ফেটে পড়ল হিগস। ‘এত বড় কথা বলার সাহস হলো কী করে তোর?’ সার্জেন্ট কুইকের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ‘দ্যাখ্, ওই যে সার্জেন্ট, সামান্য এক সরকারি চাকর মাত্র, ওর হাতের একটা আঙুলে যত সাহস আছে তোর সারা শরীরেও তো তত সাহস নেই! আর তুই তো দূরের কথা, তোদের সব

আবাটিদের মধ্যেও অত সাহস নেই।'

'বড় কথা আমি না, আপনিই বলছেন,' উদ্ধতভাবে বলল শ্যাডর‍্যাক। হিগসকে দেখতে পারে না সে, কারণ সুযোগ পেলেই ওকে অপদস্থ করে হিগস। 'ফাংদের হাতে যদি ধরা পড়ি আমরা, তখনই প্রমাণিত হয়ে যাবে কে কত বড় বীরপুরুষ।'

'ওর মুখে একটা ঘুসি মারবো, সার?' হিগসের কাছে অনুমতি চাইল কুইক।

'থামুন তো আপনারা,' বাধা দিয়ে বলল অলিভার। 'সামনে অনেক বিপদ আমাদের, কাজেই এখন সমস্যা আর না-বাড়ানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ফাংদের কবল থেকে বের হবার পর বিবাদ নিষ্পত্তি করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।' শ্যাডর‍্যাকের দিকে তাকাল সে। 'মাথা গরম কোরো না। তুমি আমাদের এই দলটার গাইড, যেদিক দিয়ে গেলে ভালো হবে বলে মনে হয় তোমার, যেভাবে গেলে বিপদ কম হবে, সেদিক দিয়ে সেভাবে আমাদেরকে নিয়ে চলো তুমি। শুধু একটা কথা মনে রেখো, যদি লড়াই বেধে যায় ফাংদের সঙ্গে, তা হলে কিন্তু আমার নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, কারণ আমি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, লড়াই-এর কৌশল জানা আছে আমার। আর আমার নেতৃত্বের ব্যাপারে আমার সঙ্গীদের কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। আরেকটা জিনিস ভুলে যেয়ো না—আমাদের এই অভিযানের পরিণতি যা-ই হোক না কেন, শেষে কিন্তু তোমাদের শাসক, মানে রানি ওয়ালদা নাগাসটার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে। ...কথা বাড়িয়ে কাজ নেই আর, এবার পথ দেখাও।'

কোনো প্রতিবাদ না-করে অলিভারের কথাগুলো শুনল শ্যাডর‍্যাক। তারপর ওকে বাউ করল, তবে গোমড়ামুখে। হিগসের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ঘুরে চলে গেল নিজের কাজে।

boighar.net

'আমাকে ওর মুখে ঘুসি মারতে দিলেই ভালো হতো,' স্বগতোক্তি করল কুইক। 'তাতে শুধু আমাদেরই না, ওরও উপকার হতো—অনেক সমস্যা থেকে বাঁচতে পারত সে। সত্যি বলছি, ওই ইহুদিটাকে আর এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না আমি।'

উটগুলোর পরিচর্যা করতে চলে গেল সে। কাজটা শেষ হলে আমাদের অস্ত্রগুলো ঝাড়ামোছা করবে। আমরা বাকিরা ফিরে গেলাম আমাদের তাঁবুতে, কিছুক্ষণ ঘুমানো দরকার। কিন্তু ভালোমতো ঘুমাতে পারলাম না আমি, কারণ বিভিন্নরকম দুশ্চিন্তা ভর করেছে আমার মনে। একটা চিন্তা বার বার ফিরে আসছে—আমাদের রাইফেল, গুলিবারুদ আর বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিয়ে অন্য কোনো পথে মুরে ঢোকা এককথায় অসম্ভব, আবার সবচেয়ে সহজ পথে গেলে যদি ভাগ্য বিরূপ হয় তা হলে মরণ!

আরেকটা কথা। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, জেদের বশে অথবা ঈর্ষাপ্রবণ হয়ে সবচেয়ে সহজ রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে শ্যাডর‍্যাক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন করছে সে কাজটা? ইংরেজদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে তাই? নাকি অন্য কোনো গোপন ব্যাপার আছে? যতক্ষণ না মুরে পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ ওর কথামতো চলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই আমাদের। কারণ আমি যখন এবং যেভাবে মুরে গিয়েছিলাম তখন বলতে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না আমার, কাজেই এখন চাইলেও আমাদের এই দলটার গাইডের ভূমিকা পালন করতে পারবো না। আর জোর করে যদি কিছু করতে যাই, তখন নিঃসন্দেহে নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে রাতারাতি পালাবে শ্যাডর‍্যাক। ফলে উট আর মালসামান সামলানোর দায়িত্ব এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে।

সূর্য ডুবছে, এমন সময় আমার তাঁবুতে এসে হাজির হলো কুইক। জানাল, আবার সব মালসামান চাপানো হচ্ছে উটের পিঠে।

টুকটাক কিছু জিনিস গোছানোর ছিল আমার, সেগুলো গুছিয়ে

boiRboi.net

নিতে লাগলাম। আমাকে সে-কাজে সাহায্য করতে করতে বলল কুইক, 'কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে আমার কাছে, ডাক্তার অ্যাডামস। শ্যাডর‍্যাককে একটুও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। ওর চ্যালারা ওকে কী নামে ডাকে জানেন? বিড়াল। নামটা অবশ্য ভালোই মানিয়েছে ওকে। এতদিনে নিজের আসল চেহারাটা দেখাতে শুরু করেছে সে। মুখে যত মিষ্টি কথাই বলুক, আমাদেরকে একটুও সহ্য করতে পারে না। দেখবেন, আগের বার যা করেছিল এবারও ঠিক তা-ই করবে—আমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে যাবে। প্রফেসর হিগসের দিকে কীভাবে যে তাকায় সে একবার যদি দেখতেন! ক্যাপ্টেন অলিভার কেন যে বাধা দিতে গেলেন তখন! শয়তানটার মুখে জোরে একটা ঘুসি মারা দরকার ছিল। মার না-খেলে শয়তানি কমবে না ওর।'

কপালের লিখন যায় না খণ্ডন—ঠিক ঠিকই মার খেল শ্যাডর‍্যাক, কিন্তু কুইক নয়, আরেকজনের হাতে। কীভাবে, বলছি।

নলখাগড়ায় আগুন লাগাবে, আগেই বলেছিল শ্যাডর‍্যাক। কাজটা করল সে, তারপর আর দেরি না-করে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা। চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমাদের পিছনে, সহসাই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন নদীর তীর। পুরনো আর ভাঙাচোরা একটা রাস্তা ধরে তারার আলোয় এগিয়ে চললাম আমরা।

ভোরের আলো ফুটে ওঠামাত্র রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়লাম সবাই, পরিত্যক্ত একটা শহরের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে ক্যাম্প করলাম। জায়গাটা বলতে গেলে মুরের সেই প্রপাতের-মতো-খাড়া-ঢালওয়ালা পর্বতের নীচে। এ-পর্যন্ত এসেছি, সৌভাগ্যবশত কেউ দেখে ফেলেনি আমাদেরকে, কোনো বাধার সম্মুখীনও হইনি আমরা। আগুন জ্বালানোটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে, তাই ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে নাস্তা সেরে নিলাম সবাই। তারপর পাহারায় বসলাম আমি,

আর বাকিরা গেল ঘুমাতে। ক্রমেই বাড়তে লাগল রোদের তেজ, আস্তে আস্তে পাতলা হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল ভোরের কুয়াশা। আমার ফিল্ডগ্লাসটা লাগালাম চোখে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, ঘনবসতিপূর্ণ একটা এলাকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি আমরা। আমাদের নীচে, পনেরো কি ষোলো মাইল দূরে, হারম্যাক শহর। আগের বার যখন এসেছিলাম তখন দেখিনি শহরটা, কারণ রাতের বেলায় বলতে গেলে কিছুই চোখে পড়েনি আমার।

পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকার শহরগুলো যেরকম হয় সাধারণত, হারম্যাকও অনেকটা সেরকম। বড় খোলা জায়গা আছে, দেখেই বোঝা যায় হাট বসে সেখানে। রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত। সমতল ছাদওয়ালা হাজার হাজার বাড়ি, সব সাদা রঙের। বেশিরভাগ বাড়ির চারপাশেই বাগান। রোদে-পোড়া ইট দিয়ে বানানো উঁচু আর পুরু একটা দেয়াল ঘিরে রেখেছে শহরটাকে। তোরণ বা প্রবেশপথের সামনে চৌকোনা দুটো টাওয়ার। বুঝলাম, শহরের রক্ষণ-দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় টাওয়ার দুটো। শহরের বাইরের সমতল আর উর্বর ভূমিতে চলছে চাষাবাদ। ভুট্টা এবং আরও কয়েক জাতের ফসলের নতুন চারায় সবুজ হয়ে আছে ক্ষেতগুলো।

গরুবাছুর, ঘোড়া এবং অন্যান্য কিছু চারপেয়ে তৃণভোজী প্রাণী নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়াচ্ছে এসব ফসলী জমি ছাড়িয়ে আরও দূরে। আগের বার যখন ঘুরে গিয়েছিলাম, শুনেছিলাম ফাংদের নাকি আগ্নেয়াস্ত্র নেই, অথবা থাকলেও সংখ্যায় নগণ্য; এখন মনে হলো কথাটা ঠিক, কারণ ওদের রাইফেল বা বন্দুক থাকলে জনবসতির এত কাছে আসত না হরিণ বা যেব্রার পাল।

অনেক অনেক দূরে, এমনকী দিগন্তের কাছেও দেখা যাচ্ছে আরও কতগুলো শহর আর গ্রাম। ফাংরা যে সংখ্যায় আসলেই অনেক, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন। আবাটিরা কেন এত ভয় পায়

এদেরকে, তা-ও বোঝা গেল। কিন্তু তারপরও, শহর আর গ্রাম, আবাদি জমি, বাড়িঘর, গবাদি পশু—এসব দেখে আপাতদৃষ্টিতে বর্বর বলে মনে হয় না ফাংদের।

এগারোটার দিকে অলিভার এসে বসল পাহারায়। ফিরে যাচ্ছি, পিছু ডেকে আমাকে থামাল কুইক। অলিভারের সঙ্গে সে-ও এসেছে। এটা ওর খুব ভালো একটা গুণ—কেউ বলে না-দিলেও নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব তুলে নেয় সে। বিশ্রাম নেয় সবার চেয়ে কম, অথচ কাজ করে সবার চেয়ে বেশি। কখন কোন্ কাজটা করে রাখলে আমাদের দলের জন্য ভালো হবে বুঝে নিয়ে, পারলে একাই করে ফেলে কাজটা।

যা-হোক, শ্যাডর‍্যাকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল সে, 'দেখুন, শয়তানটাকে দেখুন একবার, ডাক্তার অ্যাডামস।'

দেখলাম শ্যাডর‍্যাককে। দূরে, বিশাল এক গাছের ছায়ায় আরাম করে বসে আছে সে। খুব আগ্রহ নিয়ে নিচু কণ্ঠে কী নিয়ে যেন কথা বলছে ওর দুই চ্যালার সঙ্গে। একটা বর্ণও কানে আসছে না আমাদের। কেন যেন মিটিমিটি হাসছে সে, আর ওই সেই হাসি যত দেখছি তত বাড়ছে আমার অস্বস্তিটা।

'জাত হারামি বলে যদি কখনও কিছু বানিয়ে থাকেন ঈশ্বর,' বলল কুইক, 'তা হলে ওই লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন। আমার বিশ্বাস, যিউতে আমাদের খসাতে চেয়েছিল সে, যাতে আমাদের মালসামান চুরি করতে পারে। আজ রাতে কী করবে কে জানে! আমরা তো পরের কথা, ফারাও পর্যন্ত দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে।'

কথাটা শুনে মনে পড়ে গেল মরুভূমির সেই রাতের কথা। মুমূর্ষু হয়ে পড়ে ছিলাম আমরা তিন জন, অলিভারের বিশাল হলুদ হাউন্ড ফারাওকে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করে কুইক। আমাদেরকে খুঁজে পেয়ে খুশিতে ক্রমাগত লেজ নাড়াচ্ছিল ফারাও, কিন্তু শ্যাডর‍্যাককে দেখামাত্র মেজাজ বিগড়ে যায় ওর,

লেজ নাড়ানো থামিয়ে দেয়, চাপা গলায় ডাকতে শুরু করে, দাঁড়িয়ে যায় ওর পিঠের লোমগুলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথর তুলে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারে শ্যাডর‍্যাক। পাথরটা গিয়ে লাগে ফারাও-এর পায়ে। তখন এক মুহূর্তও দেরি না-করে শ্যাডর‍্যাকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল কুকুরটা। জন্তুটাকে সে-রাতে আমরা সবাই মিলে টেনে না-সরালে নির্ঘাত মারা যেত শ্যাডর‍্যাক।

হাঁপাতে হাঁপাতে, মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ নিয়ে যখন উঠে বসে সে, ওর চেহারাটা হয় দেখার মতো। ক্রোধ আর আতঙ্কের মিশ্র আবেগে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো হয়ে গিয়েছিল মানুষটা।

এসব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আরও ভারী হয়ে গেল আমার মন। আজ রাতে ফাংদের দেশে ঢুকতে হবে আমাদের এবং আগামীকাল সকাল হওয়ার আগেই গিয়ে হাজির হতে হবে মুরে। না-পারলে মরতে হবে, কিংবা ফাংদের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কোনো কিছু, যেমন ওদের দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হবে সারাজীবনের জন্য অথবা ওদের দেবতার বলিতে পরিণত হতে হবে।

এ-পর্যন্ত তেমন কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি আমাদের বলা যায়। অভিজ্ঞ গাইড আছে সঙ্গে, তাই রাতের অন্ধকারেও পথ চিনে চলতে পেরেছি; তা ছাড়া জায়গাটাও অনেক বড় এবং যে-রাস্তা ধরে এসেছি সেটা নির্জন আর স্বল্প-ব্যবহৃত। কাজেই আজ রাতে যদি পান-ভোজে মত্ত থাকে ফাংরা এবং যে-রকম বলা হয়েছে আমাদেরকে—পাহারাদারদেরও সরিয়ে নেয়া হবে সে-রকম যদি সত্যিই ঘটে, তা হলে ফাংদের ফাঁকি দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বেরিয়ে যেতে পারবে আমাদের এই ছোট্ট কাফেলা। দেখে মনে হয় শ্যাডর‍্যাক ইচ্ছা করেই এই পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে, কিন্তু ওর মর্জিমতো এগোনো ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই আমাদের আপাতত। লোকটাকে আমিও বিশ্বাস করি না; এমনকী

রানি মাকেডারও আস্থা নেই ওর উপর।

মুর ছেড়ে চলে আসার আগে আমাকে বলেছিলেন রানি মাকেডা, শ্যাডর‍্যাক ধূর্ত কিন্তু সাহসী। এই যুবক বয়সেই মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে সে একাধিকবার, তাই পথঘাট চেনে ভালোমতো। তারপরও লোকটার উপর চোখ রাখতে বলেছিলেন তিনি আমাকে।

কিন্তু চোখ আর রাখতে পারলাম কই? বরং ওর দিকে যতবার তাকাই ততবার মনে হয় সে-ই যেন লুকিয়ে থেকে দেখছে আমাদেরকে এবং গোপন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে সবসময় ঘুরছে আমাদের সঙ্গে।

তাঁবুতে ফিরে গেলাম আমি। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না, যদিও ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবছিলাম এই ঘুমই আমার জীবনের শেষ ঘুম কি না। আমার ছেলে, যাকে উদ্ধার করতে এসে এই বয়সে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে আমাকে, তাকে কি আবার দেখতে পাবো? কোথায় আছে সে এখন? কত মাইল দূরে? বেঁচে আছে, না মরে গেছে?

ভীষণ এক কোলাহল শুনে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল বিকেলের দিকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে হিগস, কাকে যেন গাল দিচ্ছে সমানে। একটানা ঘেউ ঘেউ করছে ফারাও। চাপা কণ্ঠে কাতরাচ্ছে এক আবাটি, আর একটু পর পর অভিশাপ দিচ্ছে। এক দৌড়ে বের হলাম তাঁবু থেকে। চোখের সামনের দৃশ্যটা দেখে থমকে যেতে হলো।

বাঁ হাত দিয়ে শ্যাডর‍্যাকের ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে হিগস, ডান হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে সমানে ঘুসি মারছে লোকটার নাকেমুখে। ফারাও-এর কলার চেপে ধরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে কুইক, ওর আবেগহীন চেহারাটায় খেলা করছে নিষ্ঠুর এক আনন্দ। আরও দু'-একজন আবাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দৃশ্যটা, কিন্তু তারা বাধা দিচ্ছে না হিগসকে, অথচ অক্ষম রাগে ফুঁসছে আর

নিজেদের কায়দায় অঙ্গভঙ্গি করে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। অলিভার নেই, পরে জেনেছিলাম ঘুমিয়ে ছিল সে এই ঘটনার সময়।

'কী করছ, হিগস?' চেঁচিয়ে জানতে চাইলাম।

'দেখতে...পাচ্ছেন...না?' থেমে থেমে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করল হিগস এবং প্রতি বারের বিরতির সময় একটা করে ঘুসি মারল শ্যাডর‍্যাকের চেহারায়। 'পেটাচ্ছি শুয়োরটাকে।' আরও কয়েকটা ঘুসি মেরে ছেড়ে দিল সে শ্যাডর‍্যাককে।

কাটা গাছের মতো মাটিতে পড়ে গেল আমাদের গাইড, হাঁপাতে লাগল। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর চ্যালারা, তারপর হঠাৎ করেই ছুরি বের করল একজন, তখন সবাই মিলে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে লাগল হিগসের দিকে।

'বাছাধন,' যে আবাটি ছুরি বের করেছে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল কুইক, 'আগের জায়গায় ঢুকিয়ে ফেলো জিনিসটা। নইলে এখনই ছেড়ে দেবো কুকুরটাকে। ডাক্তার অ্যাডামস, আপনার রিভলভারটা আছে সঙ্গে?'

জানি কুইকের একটা কথারও মানে বুঝল না লোকটা, তবে এটুকু বুঝল ভয়ঙ্কর কোনো কিছু করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে কুইক। ছুরিটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখল সে, তারপর সবাই মিলে পিছু হটে গেল। মাটি থেকে উঠল শ্যাডর‍্যাক, এগিয়ে গেল ওর লোকদের দিকে। তবে কয়েক কদম গিয়ে থামল সে, ঘুরে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল হিগসের দিকে, তারপর বলল, 'আজকের এই ঘটনা সারাজীবন মনে থাকবে আমার। এবং যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, উপযুক্ত জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।'

এই পর্যায়ে হাই তুলতে তুলতে নাটকীয়ভাবে হাজির হলো অলিভার। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল হিগস। 'তেমন কিছু না আসলে। ফারাওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা

boiRboi.net

করছিল আমাদের গাইড শ্যাডর‍্যাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য শয়তানটার–টেরও পায়নি ওর উপর নজর ছিল আমার। দেখলাম, স্ট্রিকনিনের টিনে এক টুকরো মাংস ভালোমতো ডুবিয়ে কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হয়ে গেলাম ফারাও-এর সামনে, নইলে আরেকটু হলেই কামড় বসাতে যাচ্ছিল সে মাংসের টুকরোটায়। ওটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দূরে। ওখানে কোথাও পড়ে আছে,' তর্জনী দিয়ে একদিকের দেয়ালের দিকে ইশারা করল সে। 'ইচ্ছা হলে দেখে আসতে পারো। যা-হোক, শ্যাডর‍্যাককে জিজ্ঞেস করলাম কাজটা কেন করল। বলল, ফাংদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুরটা যাতে কোনো আওয়াজ করতে না-পারে সেজন্য। ফারাও নাকি বুনোই রয়ে গেছে এখনও, ওকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে একাধিকবার, কাজেই ওটাকে সঙ্গে না-রাখাই নাকি ভালো। শুনে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, ছুটে গিয়ে ধরলাম হারামজাদাকে, বিশ বছর আগে বক্সিং ছেড়ে দিয়েছি অথচ কায়দা-কানুন জানা আছে এখনও, তাই দিলাম কয়েকটা ঘুসি জায়গামতো। ...আমাকে এক কাপ পানি দাও তো, কুইক।'

'শ্যাডর‍্যাককে ধরে মার দেয়ার কাজটা আমরা মুরে পৌঁছার পর করলে ভালো হতো,' বলল অলিভার। 'কিন্তু এখন বলেও লাভ নেই, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। প্রফেসর যা করেছেন, ফারাওকে কেউ বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে আমিও তা-ই করতাম।' বলতে বলতে কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল সে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল।

শুধু অলিভার কেন, আসলে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি ফারাওকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, অলিভারের জন্য বলতে গেলে জান দিয়ে দেয় কুকুরটা, অথচ আমাদেরকে তেমন একটা সহ্য করতে পারে না।

boighar.net

'ডাক্তার অ্যাডামস,' বলে চলল অলিভার, 'আপনি বরং শুশ্রূষা

করুন আমাদের গাইডকে। আমাদের উপর খুব ক্ষেপে গেছে সে. ওর সঙ্গে কথা বলে কিছুটা হলেও হালকা করার চেষ্টা করুন ওকে। তাতে আমাদেরই ভালো হবে। ...আপনারা জানেন কি না জানি না, আমাদের মালপত্রের ভিতর থেকে একদিন একটা কারবাইন চুরি করার চেষ্টা করছিল সে, হাতেনাতে ধরে ফেলি ওকে তখন। ওকে বলবেন, বলবেন মানে মিথ্যা আশ্বাস দেবেন. মুরে পৌঁছানোমাত্র ওকে একটা রাইফেল দেবো আমরা। বলা যায় না, রাইফেলের টোপটা কাজে লেগে যেতেও পারে।'

এক বোতল আর্নিকা আর কিছু প্লাস্টার সঙ্গে নিয়ে গেলাম শ্যাডর‍্যাকের কাছে। দেখি, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওর সাঙ্গপাঙ্গরা, কেউ কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে ওকে, "গুরুর" এত বড় অপমান সহ্য করতে না-পেরে এমনকী কাঁদছেও কেউ কেউ।

শ্যাডর‍্যাকের চেহারায় আর্নিকা লাগানোর সময় বললাম, 'তোমার এই অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী আসলে। কাজটা করার কোনো দরকার ছিল না। ফারাও তোমাকে কামড়াতে চেয়েছিল, তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছ তুমি। কোনো মানে হয় এসবের?'

'আগেও বলেছি,' শীতল কণ্ঠে বলল শ্যাডর‍্যাক, 'আবারও বলছি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মারতে চাইনি কুত্তাটাকে। ফাংদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে—এই আশঙ্কায় সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ওটাকে।'

'দেখো, শ্যাডর‍্যাক,' শীতল গলায় বললাম, 'আমি বাচ্চা না। তোমার কোন্ কথাটা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা বুঝতে অসুবিধা হয় না আমার। যেটা সত্যি সেটা সবার সামনে বলবে তুমি এখনই, ক্ষমা চাইবে তোমার অপরাধের জন্য। তোমার মতো একটা শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে ফাংদের এলাকা পার হওয়ার চেয়ে গুলি করে তোমাকে এখানেই মেরে রেখে যাওয়াটা অনেক ভালো হবে আমাদের জন্য। ভেবো না তোমাকে ছাড়া একেবারে অসহায় হয়ে

যাবো আমরা। হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু কপালে থাকলে ঠিকই পৌঁছাতে পারবো মুরে। পথঘাট তোমার মতো ভালো চিনি না আমি, কিন্তু মাত্র একবারের জন্য হলেও গিয়েছি সেখানে। তুমি না-থাকলে বিকল্প কোনো উপায় বের করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না আমাদের।'

কথাগুলো শোনামাত্র নরম হয়ে গেল শ্যাডর‍্যাক। ওর ঔদ্ধত্য উধাও হলো নিমেষে, নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করল সে। তারপর ড্রেসিং শেষ হওয়ামাত্র গিয়ে হাজির হলো হিগসের কাছে, বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল, চুমুর পর চুমু খেতে লাগল হিগসের হাতে। বলল, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সে, সব ভুলে গেছে; ভাই-এর প্রতি ভাই-এর যে-রকম টান থাকে, ওর মনে নাকি হিগসের জন্য সে-রকম একটা টান আছে এখন।

যতই বদরাগী হোক, কারও প্রতি বিদ্বেষ পুষে রাখতে দেখিনি কখনও হিগসকে। তাই শ্যাডর‍্যাকের কথার জবাবে বলল সে, 'খুব ভালো কথা। ফারাওকে আর কখনও বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা কোরো না। আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি, তুমি যদি নতুন কোনো শয়তানি না-করো, মুরে পৌঁছানোর পর তোমার মতোই সব ভুলে যাবো আমি।'

'দেখলেন ডাক্তার অ্যাডামস্, মুহূর্তের মধ্যেই কত ভালোমানুষ হয়ে গেছে হারামিটা,' শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলল আমার পাশে দাঁড়ানো কুইক। 'যে-মানুষটা আগে ছিল আগুনের মতো এখন সে মাটির মানুষ, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত ছিল যার মনের কথা, তার চুমুর পর চুমু দেখলে মনে হয় মানুষটা চোর থেকে সাধু হয়ে গেছে রাতারাতি। কিন্তু যত যা-ই বলুক আর যা-ই করুক, ওকে এক বিন্দুও বিশ্বাস করি না আমি, করবোও না কোনোদিন, বিশেষ করে আজ রাতে।'

কিছু বললাম না। কারণ, বলার মতো কিছু নেই আসলে। তা ছাড়া কুইক যা বলেছে তার সঙ্গে পুরোপুরি না-হলেও কিছুটা

একমত আমি। এ-ব্যাপারে কথা বাড়ালে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু করা হবে না বুঝতে পেরে চলে গেলাম নিজের কাজে।

এদিকে ধীরে ধীরে উত্তাপ হারাচ্ছে দিনটা, কমছে রোদের তেজ, গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেন বিকেলটা, এগিয়ে আসছে ঝোড়ো একটা রাত। কারণ মেঘ জমেছে আকাশে, ক্রমেই ঘন হচ্ছে, বাড়ছে বাতাসের বেগ। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পর রওয়ানা হওয়ার কথা আমাদের। আমার ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। ওই কাজে হিগসকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। তারপর বের হলাম অলিভার আর কুইকের খোঁজে। ছাদহীন একটা বাড়ির ভিতরে, একটা কামরায় খুঁজে পাওয়া গেল দু'জনকে—দূর থেকে দেখে খুব ব্যস্ত বলে মনে হলো। তামাক বা বেকিং-পাউডারের কতগুলো টিন গুছিয়ে নিচ্ছে কুইক এবং একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারি আর কয়েক কুণ্ডলী অন্তরিত তার নিয়ে কী যেন করছে অলিভার।

'ঘটনাটা কী?' জানতে চাইল হিগস।

'আপনি যা ঘটিয়েছেন তার চেয়ে ভালো,' জবাব দিল অলিভার।

'আমি যা ঘটিয়েছি মানে?'

'শয়তানের পাল্লায় পড়ে সব আলস্য ভুলে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন হঠাৎ করেই,' কাজ করতে করতে বলে চলল অলিভার, 'এবং হাতের কাছে পেয়ে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছেন শ্যাডর্যাককে। এখন দয়া করে আপনার পাইপটা নিভিয়ে ফেলুন, আমাদের হাতের কাছের এই অ্যাযো-আইমাইড যৌগগুলোয় একবার যদি আগুন লাগে তা হলে আর দেখতে হবে না। এত গরম বা এতদিনের যাত্রায় এদের গাঠনিক কোনো পরিবর্তন ঘটে গিয়ে থাকলে অবশ্য অন্য কথা।'

কথাটা শোনামাত্র চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল হিগস, তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল গজ পঞ্চাশেক, তারপর একটা

পাথরের উপর নিজের পাইপ আর ম্যাচবাক্সটা রেখে ফিরে এল।

'কিছু জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবেন না দয়া করে,' হিগস ফিরে আসার পর ওর উপস্থিতি টের পেয়ে বলল অলিভার। 'আমিই বুঝিয়ে বলছি। অদ্ভুত একটা অভিযানে অংশ নিতে যাচ্ছি আমরা আজ রাতে। অদ্ভুত বলছি, কারণ চার জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে এই অভিযানে সামিল হয়েছে সঙ্করজাতের আর মানুষ নামের ডজনখানেক অপদার্থ, যাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ আছে আমার। কাজেই সাবধানের মার নেই ভেবে কুইককে নিয়ে এই জিনিসগুলো বানিয়ে রাখলাম। হয়তো কোনো কাজেই লাগবে না এগুলো, আবার লাগলেও ব্যবহার করার মতো সময় আমরা না-ও পেতে পারি। ক্যানেস্তারা দিয়ে সব মিলিয়ে মোট দশটা বোমা বানিয়েছি। ...কুইক, পাঁচটা বোমা, একটা ব্যাটারি আর তিনশ' গজ তার নাও তুমি। আমি নিচ্ছি বাকি পাঁচটা। তোমার সবগুলো বোমায় ডেটোনেটর বসিয়ে দিয়েছি না? ...হুঁ,' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমারগুলোতেও বসানো হয়ে গেছে।' কথা আর না-বাড়িয়ে কোট আর প্যান্টের পকেটে বোমাগুলো ঢুকিয়ে নিল সে, ওর দেখাদেখি কুইকও। তারপর বাক্সপেটরা গুছিয়ে নিয়ে সেগুলো একটা উটের পিঠে চড়িয়ে দিল দু'জন মিলে।

ছয়

BoiRboi.net

আমাদের পরিকল্পনাটা ছিল এরকম: কাফেলায় সবার আগে থাকবে একজন আবাটি গাইড, লোকটা নাকি এই এলাকার

প্রতিটা ইঙ্গি চেনে। তারপর বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বহনকারী দুটো উট নিয়ে এগোবে অলিভার আর সার্জেন্ট কুইক। এদের পিছনে আমি। আমার এক চোখ থাকবে উট দুটোর দিকে, আরেক চোখ অলিভার আর কুইকের দিকে। তারপর থাকবে বাকি উটগুলো; আমাদের খাবার, কাপড়চোপড়, তাঁবু আর টুকটাক জিনিস বহন করছে যেগুলো। সবার পিছনে হিগস আর শ্যাডর্যাক, সঙ্গে আরও দুই আবাটি।

নিজে কেন সবার আগে থাকল না সে-ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝিয়ে বলল শ্যাডর্যাক। সে যদি সামনে থাকে, আর যদি কোনো ভুল হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলে সে নির্দোষ হলেও সব দোষ গিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ে, কারণ আমাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। কাজেই ওর জন্য নাকি পিছনে থাকাটাই ভালো, তাতে আর কিছু না-হোক অন্তত দায়মুক্ত থাকতে পারবে সে।

আগেই বলেছি, হিগস বদরাগী হলেও উদার প্রকৃতির, তাই শ্যাডর্যাকের ওই ব্যাখ্যা শুনে সরল মনে বলল, পিছনে সে-ও থাকবে, সঙ্গ দেবে শ্যাডর্যাককে, আর পিছন থেকে নজর রাখবে আমাদের সবার উপর। কথাটা শোনামাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানাল শ্যাডর্যাক, মনে হলো হিগসের সারল্য দেখে কিছুটা হলেও থতমত খেয়ে গেছে সে। অলিভার, আমাদের অঘোষিত দলনেতা, তখন সামাল দিয়ে বলল, হিগস যা বলছে ঠিকই বলছে—আবাটিদের সঙ্গে আমাদের একজন কারও থাকা দরকার।

যতদূর বুঝতে পারছি, কথাটা ওর মুখের, মনের নয়। আমাদের চারজনের, মানে চার শ্বেতাঙ্গের একসঙ্গে থাকাটাই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু কাজটা করলে অসুবিধাও আছে। সবসময় একসঙ্গে থাকতে পারবো না চার জন, কাউকে না কাউকে কখনও-না-কখনও সামনে পিছনে থাকতেই হবে। রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে উটগুলোর সঙ্গে তাল রাখাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে

তখন আমাদের পক্ষে। বেঁচে থাকাটা এখন যত জরুরি আমাদের জন্য, উটগুলোও ঠিক ততটাই জরুরি; একটাও যদি হারিয়ে যায় তা হলে এই শত্রু-এলাকায় ভীষণ বিপদে পড়তে হবে।

ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক, কীভাবে কী করবো আমরা তার একটা ছক কষে নিলাম। সূর্য ডুবল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নামল একসময়, তারপর হঠাৎ করেই শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি। যাত্রা শুরু করলাম আমরা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে এখনও কিছু টের পায়নি ফাংদের কেউ।

প্রাচীন ওই শহরটার ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হলাম আমরা, বহু পুরনো একটা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। একটা কথাও বলছে না কেউ, কেউ কোনো শব্দও করছে না। এমনকী উটগুলো যে হাঁটছে তারও কোনো আওয়াজ হচ্ছে না; হাঁটার সময় সাধারণত নিঃশব্দেই হাঁটে ওই জন্তুগুলো। আমাদের সামনে, বাঁ দিকে, বেশ কিছুটা দূরে হারম্যাকের আলো। কখনও উজ্জ্বল হচ্ছে আবার কখনও মিইয়ে যাচ্ছে সে-সব আলো, কারণ কখনও বাড়ছে আবার কখনও কমছে বৃষ্টি, কখনও থমকে গিয়ে একটু পরই হয়তো দমকা হচ্ছে বাতাস।

এ-জীবনে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, কিন্তু এই অভিযানের মতো এত উত্তেজনাপূর্ণ আর বেখাপ্পা কোনো যাত্রার কথা মনে করতে পারি না। বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আর দমকা বাতাসের কারণে হারম্যাকের আলোগুলো হারিয়ে যাওয়ামাত্র আমাদের উপর যেন জেঁকে বসছে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে আমাদের আলখাল্লা, এমনকী ভিতরের পানি-নিরোধকও আটকিয়ে রাখতে পারেনি বৃষ্টির পানিকে। দমকা বাতাস যখন বইছে তখন হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছে একেকজনের। আসলে দিনের পর দিন ধরে শরীর-পোড়ানো রোদ সহ্য করতে করতে এই বাতাসই অনেক বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।

টানা তিন ঘণ্টা চললাম। হারম্যাকের আলোগুলো আগের

boiRboi.net

চেয়ে অনেক কাছে এখন। ডান দিকে তাকালে আবছাভাবে চোখে পড়ছে নির্জন একটা উপত্যকা। কোনো বিপদ হয়নি এ-পর্যন্ত, চলার সময় বিশেষ প্রয়োজনে ফিসফিস করে কথা বলেছি আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে।

হঠাৎ করেই, হারম্যাকের আলোগুলোর থেকে আরও কাছে, দপ্‌ করে জ্বলে উঠল একটা আলো। চমকে উঠলাম আমি। ফিসফিস করে আদেশ করল কেউ, 'থামো!' থমকে দাঁড়ালাম আমরা।

সবার সামনে যে-আবাটিটা ছিল, চুপিসারে হাজির হলো সে আমাদের কাছে। নিচুকণ্ঠে জানাল, কয়েকজন অশ্বারোহী ফাং সৈন্য হাজির হয়েছে সামনে, ওদেরই কেউ একজন আগুন জ্বালিয়েছে কোনো এক প্রয়োজনে। কী করা যায় তা নিয়ে জরুরি আলোচনা শুরু করলাম আমরা। এমন সময় উপস্থিত হলো শ্যাডর‍্যাক, যোগ দিল আমাদের আলোচনায়। বলল, অপেক্ষা করাটাই ভালো হবে আমাদের জন্য, কারণ ওই সৈন্যরা কিছুক্ষণ এখানে থেকে হয়তো চলে যাবে অন্য কোথাও। ভেবে দেখলাম, চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই আসলে এখন, তাই যার যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ফারাওকে একটা বিশাল ঝুড়িতে করে বহন করছি আমরা। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই ঝুড়িতে করে প্রায়ই বহন করা হয় কুকুরটাকে। অলিভারের উটের একপাশে কায়দা করে বাঁধা আছে ঝুড়িটা, তাতে এমনভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কুকুরটাকে যাতে অসুবিধা না-হয় ওর। যা-হোক, আমরা সবাই চুপচাপ অপেক্ষা করছি, ফারাও-এরও কোনো সাড়াশব্দ নেই, এমতাবস্থায় অলিভারের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেল শ্যাডর‍্যাক। আর তখনই ঘটল ঘটনাটা।

শ্যাডর‍্যাক, অলিভারের উটের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র "শত্রুর"

গন্ধ পেয়ে গেল ফারাও। ব্যস, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল সে। কী করবো ভেবে না-পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমরা। ফারাও-এর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তীরের মতো ছুট লাগাল শ্যাডর‍্যাক, ফিরে গেল নিজের জায়গায়—সবার পিছনে। আমাদের সামনের আলোটা নড়ে উঠল হঠাৎ, চলতে শুরু করল—স্পষ্ট বুঝতে পারছি সৈন্যরা এগিয়ে আসছে সোজা আমাদের দিকে। সামনের দিকের উটগুলো নেমে পড়ল রাস্তা ছেড়ে, মানে নামিয়ে নেয়া হলো ওগুলোকে।

জানি না কীভাবে, কিছুক্ষণ পরই দেখি, অন্ধকারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি আমি, অলিভার আর কুইক। ভাবলাম, হিগসও আছে আশপাশেই কোথাও। কিন্তু আমার সেই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। শুনতে পেলাম, কারা যেন চেঁচাচ্ছে, বিজাতীয় অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে; একটা বর্ণও বুঝতে পারছি না। বিদ্যুতের একটা আঁকাবাঁকা রেখা পুরো আকাশটাকে চিড়ে দিল যেন এমন সময়, একসঙ্গে অনেক কিছু চোখে পড়ল।

আমাদের থেকে দশ গজ দূর দিয়ে, রাস্তা আর আমাদের মাঝখানের সমতলভূমি ধরে এগিয়ে চলেছে হিগসের উটটা। জন্তুটার গায়ের রঙ যেমন অদ্ভুত, তেমন অদ্ভুত সেটার চলার ভঙ্গি–মাথা একদিকে কাত করে রাখে সব সময়; তাই একবার দেখলে সারাজীবন মনে রাখবে যে-কেউ। যা-হোক, উটটার পিঠে যে-লোক বসে আছে একনজর দেখেই বলে দেয়া যায় সে আর যে-ই হোক হিগস নয়। তখনই নিশ্চিত হলাম আমাদের সঙ্গে নেই হিগস। খারাপ চিন্তাটাই আগে আসে মনে, সুতরাং ধরেই নিলাম কিছু একটা হয়েছে আমাদের প্রফেসরের।

'ফাংরা কব্জা করে ফেলেছে হিগসকে,' বললাম আমি। 'ওর উটের পিঠে চড়ে বসেছে কেউ।'

'না,' প্রতিবাদ করল কুইক সঙ্গে সঙ্গে, 'শ্যাডর‍্যাক গিয়ে বসেছে ওখানে। ওর কুৎসিত চেহারাটা দেখেছি আমি বিদ্যুতের

আলোয়।'

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। এবার দেখি, আমাদের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে আমাদের মালপত্রবাহী উটগুলো। সাদা আলখাল্লা পরা একদল লোককে দেখা যাচ্ছে সামনে, পথ আটকে রেখেছে ওরা, ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে উটগুলোকে।

'চলে আসুন,' চাপা কণ্ঠে আদেশ দিল অলিভার। 'উটগুলোর পিছন পিছন যেতে হবে আমাদেরকে। প্রফেসর হিগস হয়তো ওই জন্তুগুলোর সঙ্গেই আছেন।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলাম অলিভারের আদেশ। একটা ক্ষেত বা ওই রকম কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম; বিশ গজ মতো এগোতে-না-এগোতেই শুনি, সামনে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে কারা যেন, আমি নিশ্চিত লোকগুলো আবাটি নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমরা যেমন দেখেছি, বিদ্যুতের আলোয় আমাদেরকেও তেমনই দেখে ফেলেছে ফাংরা, এবং এখন আমাদেরকে মারতে অথবা ধরতে আসছে ওরা।

করার মতো কাজ একটাই আছে—ঘুরে পালানো। এবং দেরি না-করে, যার যার উটের লাগাম ধরে জন্তুগুলোকে টানতে টানতে দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা। কোথায় যাচ্ছি জানি না, তবে এখন পর্যন্ত একসঙ্গে আছি তিন জন।

দশ কি পনেরো মিনিট পর, হাজির হলাম তাল বা ওই জাতীয় কোনো গাছে ভরা একটা জঙ্গলে। গাছপালা এত ঘন হয়ে জন্মেছে এখানে যে, সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাল আবার, তবে আগের মতো উজ্জ্বল হলো না আলোটা। ঘন কালো মেঘের বিস্তার আরও এগিয়ে গেছে ইতোমধ্যে, গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে মুরের পর্বতগুলোর উপর। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি ছিলাম সবার পেছনে, বিদ্যুৎ যখন চমকাল তখন ঘাড় ঘুরিয়ে ক্ষীণ আলোয় দেখি, বেশি হলে পঞ্চাশ গজ দূরে আছে ফাং ঘোড়সওয়ারেরা, আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে আমাদেরকে, লম্বা

এক সারি করে এগিয়ে আসছে। ঘন জঙ্গলের কারণে যেমন অসুবিধা হচ্ছে আমাদের, আবার সুবিধাও হয়েছে অন্তত একটা—আমি নিশ্চিত যে, আমরা কোথায় আছি বুঝতে পারেনি ফাংরা এখনও।

'এগিয়ে চলো,' নিচু কণ্ঠে তাগাদা দিলাম, 'যদি থামি তা হলে আমাদেরকে ধরে ফেলতে সময় লাগবে না ওদের।'

'আপনার উটটাকে নিজের মতো চলতে দিন, ক্যাপ্টেন অলিভার,' পরামর্শ দিল কুইক। 'অন্ধকারে আমাদের চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছে সে, পথ চিনে নিতে পারবে হয়তো। এই ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোথায় যাবো কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

ওর কথামতো কাজ করল অলিভার। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার চারপাশে, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে; উটটাকে নিজের মতো চলতে দেয়ায় কাজ হলো। যেভাবেই হোক দিক চিনতে পারল জন্তুটা, ফলে চলার গতি বাড়ল আমাদের। এক লাইনে এগোচ্ছে আমাদের উট তিনটা, এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে-যাওয়া একটা রাস্তায় হাজির হতে পারলাম আমরা একসময়। অন্ধকারে ভালোমতো দেখতে না-পেলেও বুঝতে পারলাম পথটা যে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না সে-রকম নয়।

যা-হোক, টানা অনেকক্ষণ ধরে এগোলাম আমরা। একসময় কমে গেল বৃষ্টি, ভাবলাম থেমে গেছে বোধহয়, কারণ গায়ে পানির স্পর্শ পাচ্ছি না বেশ কিছুক্ষণ থেকে। ভেজা রাস্তায় চলার সময় শব্দ হচ্ছে উটগুলোর ক্ষুর থেকে, সেই আওয়াজ পাল্টে গেল হঠাৎ, বুঝলাম সম্পূর্ণ নতুন কোনো জায়গায় হাজির হয়েছি। একবার মনে হলো, ধনুকাকৃতির খিলানের মতো কোনো তোরণ পার হলাম যেন। আরও কিছুদূর এগোনোর পর, আধো অন্ধকারে কী যেন দেখতে পেলাম সামনে, পাকা বাড়ির মতো লাগল আমার কাছে। আলো জ্বলছে না একটা বাড়িতেও, যদিও নিশ্চিত জানি না

ওগুলো আসলেই বাড়ি কি না; বাড়ির মালিকরা বোধহয় ইচ্ছে করেই নিভিয়ে রেখেছে বাতিগুলো, কারণ রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে ভোর হচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা ধারণা তখন জাগল আমার মনেঃ যেভাবেই হোক হারম্যাকে হাজির হয়ে গেছি আমরা!

আমার আশঙ্কার কথাটা জানালাম, শুনে ফিসফিস করে বলল অলিভার, 'অসম্ভব কিছু না। হতে পারে, এই উটগুলো এই জায়গারই, তাই এত তাড়াতাড়ি হাজির হতে পেরেছে এখানে। এখন হয়তো এগোচ্ছে ওদের আস্তাবলের দিকে। করার মতো কাজ একটাই আছে আমাদের—এগিয়ে চলা।'

একটানা অনেকক্ষণ ধরে এগোলাম আমরা। মাঝেমধ্যে ধীর হলো আমাদের চলার গতি, কারণ কয়েক জায়গায় আমাদেরকে দেখে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল কয়েকটা কুকুর। ভাগ্য ভালো—"ভিনদেশী" ওই সব কুকুরের বিরক্তিকর চেঁচামেচি শুনেও যেন শোনেনি আমাদের ফারাও। খেয়াল করে দেখেছি, কুকুরটার স্বভাব কিছুটা অন্যরকমঃ স্বজাতীয়রা চেঁচাতে থাকলে কিছু না-বুঝে নিজেও ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে না, এবং অন্য কোনো কুকুর কামড়াতে না-এলে নিজে যেচে পড়ে মারামারি করতে যায় না কারও সঙ্গে।

যা-হোক, আরও কিছুক্ষণ পর, খিলানসদৃশ আরেকটা তোরণ পার হলাম আমরা। তারপর আরও একশ' পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়াল আমাদের উটগুলো। নামল কুইক, একটু পর শুনলাম নিচু কণ্ঠে বলছে সে, 'দরজা। হাত দিয়ে ধরে বুঝতে পারছি পিতলের কাজ করা আছে। উপরে টাওয়ারও আছে মনে হয়। আর দু'দিকে দেয়াল। আমরা বোধহয় কোনো ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছি। ভোর না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাদেরকে।'

নামলাম আমরা। একটার সঙ্গে আরেকটা উটের দড়ি বাঁধলাম

যাতে এদিক-ওদিক কোথাও যেতে না-পারে। টাওয়ার বা ওই জাতীয় যা-ই থাকুক না কেন মাথার উপরে, গিয়ে দাঁড়ালাম সেটার নীচে, বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচালাম নিজেদেরকে—মাঝখানে একবার থেমে গেলেও আবার শুরু হয়েছে আকাশের বারিবর্ষণ। কাকভেজা হয়ে গেছি প্রত্যেকে, ঠাণ্ডায় বলতে গেলে জমে গেছি। আমাদের সঙ্গে স্যাডলব্যাগে কিছু টিনজাত খাবার আর বিস্কুট ছিল, নিয়ে এলাম সেগুলো, খেতে লাগলাম ধীরেসুস্থে। কুইকের ব্র্যাণ্ডির ফ্ল্যাস্ক থেকে আধ আউন্স করে ব্র্যাণ্ডি খেলাম সবাই। একটুখানি হলেও গরম হলো শরীর, তবে আমার মনে হয় ওই আবহাওয়ায় এক বোতল করে ব্র্যাণ্ডি খাওয়া দরকার ছিল আমাদের প্রত্যেকের।

হিগসের কথা মনে পড়ল। আমাদের সঙ্গে নেই বেচারা। হারিয়ে গেছে, হয়তো মারা পড়েছে এতক্ষণে। সুযোগ নিয়েছে আবাটিরাও—আমাদেরকে একা ফেলে পালিয়েছে। আর, আপাতদৃষ্টিতে দুর্গ বলে প্রতীয়মান হয় এমন একটা জায়গায় হাজির হয়েছি আমরা তিন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ; এগোনোর কোনো উপায় নেই, আবার পিছিয়ে গিয়ে কোথাও যাবো তা-ও জানি না। ফাঁদে আটকা পড়া পাখির মতো অবস্থা হয়েছে আমাদের। সকালে যাদের হাতে ধরা পড়বো তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে আমাদের বাঁচা-মরা। ভেবে দেখলাম, অবস্থাটা মোটেও সুখকর নয় আমাদের জন্য।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার এই সব চিন্তাভাবনা পেয়ে বসল আমাকে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম প্রথমে, তারপর ঢুলতে শুরু করলাম ঘুমে। কেন যেন চুপ করে আছে অলিভার অনেকক্ষণ থেকে, একটা কথাও বলছে না। আমার তন্দ্রা ছুটে গেল একবার, তাকিয়ে দেখি, এককোনায় সরে গেছে কুইক, বিড়বিড় করে নিজেকেই বলছে এত চিন্তা করার কিছু নেই—যা হবার তা হবেই, আর একটু পর পর গুনগুন করে গাইছে কোনো একটা স্তুতিগানের

কয়েকটা চরণ:

সুখ-শান্তি আছে জেনো শত দুঃখ-কষ্টের পরে,
আবার হাসবে ওই দুঃখী অশ্রু যার চোখে ঝরে।

কথাটা ঠিক না বেঠিক জানি না, তবে আমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও কমল একসময়—ভোরের কিছু আগে থেমে গেল বৃষ্টি। পরিষ্কার হয়ে এল আকাশ, বেশ কিছু তারার দেখা মিলল। মুক্তার দ্যুতির মতো অপূর্ব সুন্দর এক আলোয় আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে শুরু করল পুবাকাশ। তবে কুয়াশার একটা ঘন চাদর এখনও ঝুলে আছে আমাদের চোখের সামনে, তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না সবকিছু। তারপর একসময়, কুয়াশার এই বিশাল সমুদ্র ভেদ করে আস্তে আস্তে মাথা তুলল গোল থালার মতো সূর্য। কোথায় আছি দেখার জন্য তাকালাম চারদিকে, কিন্তু কুয়াশা এখনও অনেক পুরু, আশপাশে কয়েক গজের বেশি দেখা যায় না।

সম্ভবত পঞ্চাশতমবারের মতো গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল কুইক, 'সুখ-শান্তি আছে জেনো শত দুঃখ-কষ্টের পরে...'

বুঝলাম, এই একটা স্তুতিগানই জানে সে। তবে স্বীকার করতেই হবে, আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে গেছে গানটা।

যা-হোক, গান গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল কুইক, তারপর বলে উঠল, 'আরে! সামনে দেখি একটা সিঁড়ি! ক্যাপ্টেন অলিভার, আপনি অনুমতি দিলে ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠবো আমি, কোথায় যাওয়া যায় দেখবো।' কিন্তু অলিভার কিছু বলার আগেই রওয়ানা হয়ে গেল সে।

মিনিটখানেক পর শুনি মৃদু কণ্ঠে ডাকছে সে আমাদেরকে, 'চলে আসুন, দেখে যান একবার।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমরাও। যেমনটা আশা করেছিলাম, তোরণের উপরে বানানো দুটো টাওয়ারের একটার

boiRboi.net

মাথায় গিয়ে হাজির হলাম। টাওয়ার দুটো প্রকৃতপক্ষে ওয়াচ টাওয়ারের মতো—দেখে মনে হয় শহর রক্ষার কাজে নিয়োজিত সৈন্যরা চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে এখানে, পাহারা দেয় হারম্যাক শহরটাকে। এখানে যে-দরজাটা আছে সেটা শহরের দক্ষিণ দিকের দরজা।

কুয়াশার চাদর ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে তাকালে চোখে পড়ছে মুরের দৈত্যাকৃতির পর্বতগুলো, বলতে গেলে আমাদের ঠিক উল্টোদিকেই। ওগুলোর মাঝখানে গভীর একটা উপত্যকা; এতদূর থেকে এত বেখাপ্পা লাগছে যে, মনে হচ্ছে কেউ যেন জোর করে বসিয়ে দিয়েছে ওটা সেখানে।

সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে উপত্যকাটা। বিস্ময়কর, কিন্তু একইসঙ্গে ত্রাসোদ্দীপক একটা বিশাল মূর্তি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পায়ের উপর শরীর রেখে মাথা উঁচু করে বসে আছে কালো-পাথর দিয়ে বানানো মূর্তিটা, সেটার ভিত্তি ঘিরে আছে তরঙ্গসঙ্কুল জলীয়বাষ্প। মূর্তির সিংহের-মতো মাথায় পরানো আছে ইউরিয়াস, মানে প্রাচীন মিশরের রাজা-বাদশারা তাঁদের আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে সাপের শরীরখচিত যে-রকম মুকুট পরতেন সে-রকম একটা মুকুট। এখনও এক মাইলের মতো দূরে আছি, তাই চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম না মূর্তিটা আসলে কত বড়। তবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা যা-ই হোক, একটা মাত্র পাথরখণ্ড কেটে বানানো এত বড় ভাস্কর্য, এর আগে দেখা তো দূরে থাক, কখনও শুনিওনি।

মিশরের রাজধানী কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, নীল নদের পশ্চিম তীরে গিযা নামের একটা শহর আছে, সেখানে বিশাল কিছু স্ফিংক্স দেখা যায়; কিন্তু আমাদের সামনের ওই মূর্তিটার তুলনায় ওই সব স্ফিংক্স প্রকৃতপক্ষে খেলনামাত্র। আমার মনে হয়, ছোটখাটো একটা পাহাড় কেটে ওই সিংহ-মাথার দৈত্যটা বানিয়েছে অত্যন্ত কুশলী আর ধৈর্যশীল কিছু লোক। বাতাসে পাক

খেয়ে উড়ন্ত কুয়াশা আর দূরের গম্বুজসদৃশ পর্বতগুলোতে প্রতিফলিত হওয়া ভোরের লাল রোদে একইসঙ্গে রাজকীয় আর ভয়াবহ দেখাচ্ছে দূরের ওই মূর্তিটা, অবর্ণনীয় কিছু একটা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। খেয়াল করলাম, কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি তিন জনই, কথা যেন হারিয়ে গেছে আমাদের মুখ থেকে।

'ফাংদের সেই মূর্তি!' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম নিচু কণ্ঠে। 'ওই অশিক্ষিত বর্বর লোকগুলো কেন এই মূর্তিটাকে দেবতা বলে মনে করে, বুঝলাম এতদিনে।'

'পাথর কেটে বানানো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য,' বিড়বিড় করল অলিভার। 'ইস্‌স্! প্রফেসর হিগস যদি বেঁচে থাকতেন এখন! মূর্তিটা দেখামাত্র খুশিতে আটখানা হয়ে যেতেন তিনি। তাঁর বদলে যদি আমাকে ধরে নিয়ে যেত ফাংরা! তাঁর বদলে যদি আমি মরতাম তা হলে কতই না ভালো হতো!' দুঃখে নিজের হাত মোচড়াতে লাগল সে।

'ওই মূর্তিটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যই এখানে এসেছি আমরা,' নিজেকেই যেন বলল কুইক।

'চলুন, নীচে নামি,' বলল অলিভার। 'জানা দরকার কোথায় আছি আমরা। কুয়াশা কেটে যেতে সময় লাগবে, এর মধ্যে পালানোর কোনো উপায় পেয়ে যেতে পারি কপাল ভালো থাকলে।'

'একটু দাঁড়াও,' রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল ওরা দু'জন, পিছু ডেকে থামালাম আমি, 'ওটা দেখেছ?' যে-উপত্যকায় আছে ফাংদের মূর্তিটা, সেটা ছাড়িয়ে মাইলখানেক দক্ষিণে, কুয়াশার চাদর ভেদ করেছে একটা পর্বত, এতদূর থেকে মোটা একটা সুই-এর মতো লাগছে দেখতে, হাতের ইশারায় পর্বতটা দেখালাম। 'ওটার নাম সাদা পাহাড়, যদিও পাহাড়টা আসলে সাদা না। ওই পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলো শকুনের-বাসা আছে, তাই দূর

থেকে দেখলে সাদা দেখায়। আমি আগে কখনও দেখিনি পাহাড়টা, কারণ একবারই গিয়েছিলাম সেখান দিয়ে, আর তখন ছিল রাত। কিন্তু এটা জানি, ওই পাহাড়ের দু'দিকের দেয়ালের মাঝখানে ফাটলের মতো আছে, আর ওই ফাটলটাকেই মুরের প্রবেশদ্বার বলে অনেকে। তোমাদের মনে আছে কি না জানি না, শ্যাডর‍্যাকও কিন্তু একবার এটার ব্যাপারে বলেছিল আমাদেরকে। এখন কথা হচ্ছে, ওই সাদা পাহাড়ে গিয়ে যদি হাজির হতে পারি আমরা, ওই ফাটল দিয়ে যদি ঢুকতে পারি মুরে, তা হলে বাঁচার একটা সম্ভাবনা আছে আমাদের।'

পাহাড়টা কিছুক্ষণ দেখল অলিভার, তারপর হঠাৎ করেই জরুরি কণ্ঠে বলল, 'নীচে নামুন তাড়াতাড়ি। আগে খেয়াল করিনি—এই জায়গায়, এত রোদে আমাদেরকে যে-কেউ যে-কোনো সময়ে দেখে ফেলবে।'

নীচে নামলাম আমরা। হাতে সময় কম, তাই তাড়াহুড়ো করে তাকাতে লাগলাম এদিকে-ওদিকে যাতে অন্তত বুঝতে পারি কোথায় হাজির হয়েছি।

তোরণের ভিতরে চলে এসেছি আমরা এখন। টাওয়ারের নীচে, তোরণের গায়ে তামা বা ব্রোঞ্জের পাত বসানো দুটো বিশাল পাল্লা লাগানো আছে। পাতগুলো অদ্ভুত, আগে এরকম দেখিনি কোথাও—ছাঁচে ফেলে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাণী বা মানুষের আদল দেয়া হয়েছে প্রত্যেকটাকে। দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়স হয়েছে এসব ধাতবখণ্ডের। বিশাল পাল্লাগুলোর সুবিধাজনক জায়গায় গ্রিল লাগানো আছে যাতে সৈন্যরা উঁকি দিয়ে বাইরে দেখতে পারে অথবা প্রয়োজনের সময় তীর মারতে পারে শত্রুপক্ষের দিকে। আরেকটা ব্যাপার, পাল্লা দুটোয় তালার কোনো ব্যবস্থা নেই, ব্রোঞ্জের পুরু হুড়কো আর দণ্ড দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

'চলুন, কুয়াশা কেটে যাওয়ার আগেই পালাই,' আবারও

পরামর্শ দিল অলিভার। 'কপালে থাকলে মুরে পৌঁছাতেও পারি।'

কিছু বললাম না আমি বা কুইক, বলার কিছু নেইও আসলে, কারণ করার মতো কাজ ওই একটাই আছে এখন আমাদের হাতে। তোরণের বাইরে বেঁধে রাখা আছে আমাদের উটগুলো, আরাম করে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা; ওগুলোকে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছি, এমন সময় আমাকে পিছু ডেকে থামাল কুইক, বলল, 'গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখুন, ডাক্তার অ্যাডামস!'

দেখলাম। বাইরে ঘন কুয়াশা, তারপরও বোঝা যায়, একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

'বোকার মতো টাওয়ারের উপরে গিয়ে চড়েছিলাম আমরা, আমাদেরকে দেখে ফেলেছে ওরা,' বলল অলিভার।

গ্রিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে, কথা শেষ করে সরেছে কি সরেনি; কুয়াশার চাদর ভেদ করে সাঁই করে উড়ে এল একটা বল্লম ওর দিকে, গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ঢুকে কিছুদূর গিয়ে বিঁধল মাটিতে। ঘটনা কী বোঝার জন্য আবারও তাকালাম বাইরে। দেখি, একের পর এক বল্লম উড়ে আসছে আমাদের দিকে; তবে সবগুলো বিদ্ধ হলো দরজার গায়ে, ব্রোঞ্জের পাতের সঙ্গে বল্লমের ফলার সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ শোনা যেতে লাগল বার বার। চট করে সরে গেলাম আমি।

'কপাল খারাপ আমাদের!' এবার আর নিচু কণ্ঠে নয়, চেঁচিয়ে বলল অলিভার। 'আমাদেরকে ধরার জন্য না, মেরে ফেলার জন্য হাজির হয়ে গেছে ওরা। পালানোর রাস্তা নেই, যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ লড়তে হবে। ...সার্জেন্ট কুইক, ডাক্তার অ্যাডামস, যার যার রাইফেল নিন। সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে যান, তারপর গুলি করতে থাকুন যতক্ষণ না বুলেট শেষ হয়ে যায়।'

একটা মুহূর্তও নষ্ট করলাম না আমরা, পজিশন নিয়ে যার যার রাইফেলের ট্রিগার টানতে লাগলাম বার বার। ঘোড়া থেকে নেমে সোজা দরজার দিকে দৌড়ে আসছিল ফাং সৈন্যরা, বোধহয় ইচ্ছে

ছিল এক ধাক্কায় খুলে ফেলবে দরজা, এপাশে থাকা আমাদের তিন জনকে কাবু করে ফেলবে এক নিমেষেই। কিন্তু রাইফেল কী জিনিস জানে না ওরা, জানার কথাও নয়।

আমাদের কাছে যে-রিপিটিং রাইফেলগুলো আছে সেগুলোতে পাঁচটা করে বুলেট থাকে। বারুদের ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পরে সামনে তাকিয়ে দেখি, দরজার ওপাশে মরে পড়ে আছে আধ-ডজন ফাং, আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাচ্ছে কয়েকজন, দেখেই বোঝা যায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ওরা। ঘোড়া থেকে যারা নামেনি তাদের কয়েকজনকে নামতে হয়েছে, তবে ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়; কারণ বুলেট গিয়ে লেগেছে ওদের শরীরেও। মরে পড়ে আছে কেউ, আবার কেউ চেষ্টা করছে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় যেতে। কয়েকটা ঘোড়াকেও পড়ে থাকতে দেখা গেল, তার মানে গুলি লেগেছে ওগুলোর গায়েও।

কয়েক মুহূর্তব্যাপী এই যুদ্ধের ফলাফল হলো দারুণ—অবশ্যই আমাদের জন্য। ফাংরা সাহসী হতে পারে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ম্যাগাজিন রাইফেলের সঙ্গে পরিচিত নয় ওরা। বিশাল এক নদী-বেষ্টিত হয়ে সারা দুনিয়া থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা লোকগুলো রাইফেলের কথা শোনেনি, আর আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে বেশি হলে গাদা বন্দুক পর্যন্ত দেখেছে। ওদের দু-একজনের কাছে থাকতেও পারে ওরকম কোনো বন্দুক, কারণ ব্যবসার সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অনেক সময় অনেক যাযাবর তাদের ব্যবহার্য জিনিস দিয়ে দেয় ফাংদের মতো বর্বর উপজাতীয় লোকদেরকে। কিন্তু রাইফেলের এই তাণ্ডবলীলা চাক্ষুষ করে স্পষ্টতই ঘাবড়ে গেছে ওরা, এত অল্প সময়ে এত বেশি ক্ষতিতে উবে গেছে ওদের সাহস, মৃত বা আহত সঙ্গীদের ফেলে রেখে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে।

আমাদের মাথাতেও পালিয়ে জান বাঁচানোর চিন্তাটা আবার ফিরে এল। কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলাম, কারণ ফাংরা আসলেই

চলে গেছে কি না বুঝতে পারছি না। আবার এমনও হতে পারে, পিছু হটে গেছে আপাতত, কিন্তু সুবিধাজনক কোনো জায়গায় গিয়ে ওত পেতে আছে আমাদের জন্য। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতে লাগল আমাদের, আর এই সময়ে অনেকখানি পাতলা হয়ে এল কুয়াশা। কোথায় আছি সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা পেলাম এতক্ষণে।

আমাদের সামনে, শহরের দিকে, বিশাল এক উন্মুক্ত প্রান্তর। শহরের নিরাপত্তা প্রাচীর এসে শেষ হয়েছে এখানে। ফলে গির্জার দ্বারমণ্ডপ অথবা বড় কোনো বাড়ির উপকক্ষের মতো অবস্থা হয়েছে এই তোরণের, না-জেনে না-বুঝে যেখানে হাজির হয়ে গেছি আমরা রাতের অন্ধকারে।

খেয়াল করলাম, আমাদের এই তোরণ আর হারম্যাকের সুরক্ষাপ্রাচীর একসঙ্গে কল্পনা করলে পুরো স্থাপনাটা দেখায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো। তোরণের যে-দিক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারে উঠে তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এখানে হাজির হয়েছি আমরা, তার ঠিক উল্টোদিকে আরও দুটো বিশালাকৃতির পাল্লা আছে। কী কারণে জানি না, পাল্লা দুটো খুলে রাখা হয়েছে। ওগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে অলিভার বলল, 'চলুন গিয়ে দেখি পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়া যায় কি না। ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে আসতে না-পারবে, ততক্ষণ এই জায়গা কব্জা করে রাখতে পারবো আমরা।'

তিনজনে দৌড় দিলাম একসঙ্গে। তোরণের পিছনের দিকের পাল্লা দুটোর কাছে পৌঁছে দেখি, এগুলো আসলে সামনেরগুলোর চেয়েও বড়। ভেবেছিলাম দু'-একটা ফাং হয়তো ঘাপটি মেরে আছে কোথাও-না-কোথাও, কিন্তু কারও দেখা পেলাম না। যা-হোক, তিনজনে মিলে বহুকষ্টে ঠেলে লাগিয়ে দিলাম পাল্লা দুটো। তারপর হুড়কো আটকে ব্রোঞ্জের বিশাল দণ্ড বসিয়ে দিলাম জায়গামতো। তিন জনের জায়গায় যদি দু'জন হতাম আমরা, তা

হলে কোনোদিনও করতে পারতাম না কাজটা—শক্তিতে কুলাত না। যা-হোক, কাজ শেষে আগের দরজাটার কাছে ফিরে এলাম, তিনজনে মিলে খুলে বাইরে গিয়ে ভিতরে নিয়ে এলাম আমাদের উটগুলোকে। তারপর আবার আটকে দিলাম দরজাটা। আপাতত বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝে দানাপানি কিছু দিলাম পেটে। খেতে খেতে কুইক বলল, খালি পেটে মরার চেয়ে নাকি ভরা পেটে মরা ভালো।

টাওয়ারের মাথায় যখন গিয়ে চড়েছিলাম আমরা, তখন থেকেই পাতলা হতে শুরু করেছিল কুয়াশা। কিন্তু সূর্য ওঠার পর বৃষ্টিভেজা মাটি থেকে জলীয়বাষ্প উঠতে শুরু করল, কিছু সময়ের জন্য আবার পুরু হলো কুয়াশার চাদর।

'সার্জেন্ট কুইক,' আমাদের খাওয়া শেষ হলে বলল অলিভার, 'ফাংরা যে আমাদের আক্রমণ করবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এ-ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই, পালিয়ে বাঁচতে পারবো না আমরা। কাজেই ফাংদের হামলার জবাবে পাল্টা হামলা করতে হবে আমাদেরকে। এমন কিছু করতে হবে যাতে কম পরিশ্রমে ফল হয় বেশি।'

'কী?' জানতে চাইল কুইক।

'বিস্ফোরক। আবার গাঢ় হয়েছে কুয়াশা, এই সুযোগে কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাদের যাতে ব্যাটারা বুঝতে না-পারে কী করছি আমরা।'

'বিস্ফোরকের কথা আমিও ভাবছিলাম, ক্যাপ্টেন,' বলল কুইক। 'চলুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করে দিই।'

'আমি ততক্ষণ নজর রাখি উটগুলোর উপর,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললাম, 'একইসঙ্গে পাহারা দিই। কোনো ফাংকে যদি দেখি উঁকিঝুঁকি মারতে, ব্যাটা রাইফেলের আওতায় থাকলে সোজা গুলি করবো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল অলিভার, তারপর কুইককে সঙ্গে

নিয়ে তারের কুণ্ডলী আর তামাকের টিনের মতো দেখতে জিনিসগুলো বের করল আমাদের মালপত্রের ভিতর থেকে। তোরণের যেদিকের দরজা দিয়ে বের হলে ফাংদের সীমানা থেকে বের হওয়া যায়, দু'জনে এগিয়ে গেল সেদিকে। খুব সাবধানে খুলে ফেলল দরজাটা, তারপর একটুখানি ফাঁক করে পুরু কুয়াশার উপর ভরসা রেখে বেরিয়ে গেল বাইরে। দরজার এপাশে, রিপিটিং রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি মূর্তির মতো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, অলিভার আর কুইক ছাড়া অন্য কাউকে রাইফেলের আওতায় পাওয়ামাত্র গুলি করবো।

আগেই বলেছি, তোরণের বাইরে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, তবে দু'পাশে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেয়াল বানিয়ে রেখেছে ফাংরা—জানি না কেন। যা-হোক, তোরণ ছাড়িয়ে খানিকটা এগোলে বেদির মতো দেখতে বিশাল একটা পাথরখণ্ড আছে। তবে আমার মনে হয় পূজা বা ওই ধরনের কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না সেটা, বরং বক্তৃতামঞ্চ বা স্থানীয় নিলামদারদের নিলামের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে দাস আর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে ওরা। যা খুশি তা-ই করুক, কোনো মাথাব্যথা নেই আমার, অলিভার আর কুইকের উপর নজর রাখার সময় হঠাৎ করেই দেখি, একপাশের দেয়ালের উপর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটা শিরস্ত্রাণ।

আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, কখন যেন অনেক কাছে চলে এসেছে লোকটা, যে-দরজা দিয়ে বের হয়েছে অলিভার আর কুইক সেখান থেকে বেশি হলে একশ' পঞ্চাশ কদমের মতো দূরে আছে। তার মানে অলিভার আর কুইক যেরকম কুয়াশার আড়াল ব্যবহার করছে, ফাংরাও তেমন করছে। একবার মনে হলো চেঁচিয়ে সতর্ক করি ওদের দু'জনকে, তারপর ভাবলাম হয়তো ওদেরকে দেখতেই পায়নি শিরস্ত্রাণধারী লোকটা—দেখলে এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ত দলবল নিয়ে। যা-হোক, ধৈর্য ধরে

অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটুও নড়ছি না, শুধু রাইফেলের ট্রিগারে নিশপিশ করছে তর্জনী।

কিছুক্ষণ পর, বোধহয় আরেকটু বেশি দেখার আশায়, অনেকখানি উঁচু হলো শিরস্ত্রাণধারী লোকটা। তখন দেখি, যেটাকে শিরস্ত্রাণ বলে মনে করছিলাম সেটা আসলে চমৎকার একটা উষ্ণীষ। দামি গাউনের মতো জামা পরে আছে সে; ফাংদের মতো উপজাতিদের গোত্রপতিরাই ওরকম জামা পরে সাধারণত। সৈন্যরা যেভাবে কুচকাওয়াজ করে সেরকম ভঙ্গিতে কয়েকবার উঠবস করল সে দেয়ালের উপর, তারপর হাতের বল্লমটা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে নাড়াতে নাড়াতে চেঁচাতে শুরু করল। ঘন কুয়াশার পটভূমিতে বোকা লোকটার এই হাস্যকর আস্ফালন দেখে ওর প্রতি কিছুটা হলেও করুণা জাগল আমার মনে।

বুঝতে ভুল হয়েছে আমার—কুচকাওয়াজ নয়, রণনৃত্য পরিবেশন করছে লোকটা। মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে বার বার, জানি না এটা তার নাচের কোনো অংশ কি না, আবার এমনও হতে পারে দু'পাশের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চেলাচামুণ্ডাদের খুঁজছে। চিৎকার থামেনি ওর, মনে হয় নিজের লোকদেরকে কিছু বলছে সে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, নাচতে নাচতে বিপদ ভুলে এগিয়ে আসছে সোজা দরজার দিকে, রাইফেলের পাল্লার আরও ভিতরে, তবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের উপরই।

এ-ই সুযোগ। সময় নিয়ে নিশানা স্থির করলাম, মনে হলো যেন এমন কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছি যেখানে টার্গেট ফুটো করার জন্য মাত্র একবার গুলি করার সুযোগ আছে আমার। বুলেটের ধাক্কায় রাইফেলের নল উপরের দিকে উঠে গিয়ে যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হয় সেজন্য কিছুটা নীচের দিকে তাক করলাম। তারপর আলতো করে টান দিলাম ট্রিগারে। বিস্ফোরিত হলো কার্ট্রিজ, বেরিয়ে গেল বুলেট, থেমে গেল দেয়ালের উপরের ওই ফাংটার নাচ আর চিৎকার, থমকে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল

সে। আমি নিশ্চিত বুলেটের আওয়াজ শুনেছে লোকটা, এমনকী বুলেট ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের ধাক্কাও হয়তো লেগেছে ওর শরীরে, কিন্তু একটুও আহত হয়নি। কারণ ওকে খুন করার জন্য গুলি করিনি আমি, ভড়কে দিতে চেয়েছি আসলে।

লিভার টেনে রাইফেলের চেম্বার থেকে শূন্য কার্তুজটা ফেলে দিলাম বাইরে, প্রস্তুত হলাম আবার গুলি করার জন্য। কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখি দরকার নেই কাজটা করার—পায়ের পাতার উপর ভর করে হাস্যকর ভঙ্গিতে চক্কর খাচ্ছে ফাং লোকটা, লাটিমের মতো। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তিন-চারবার ঘুরল লোকটা, তারপর দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে মুখটা নীচের দিকে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেয়ালের উপর থেকে, অনেকটা ডাইভারদের ভঙ্গিতে, কিন্তু সামনের দিকে নয়, পিছনের দিকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তাকিয়ে থাকলাম একদৃষ্টিতে, কিন্তু আর দেখতে পেলাম না লোকটাকে। আতঙ্ক আর ক্রোধমিশ্রিত অদ্ভুত কিছু বিলাপধ্বনি ভেসে এল সামনের উন্মুক্ত প্রান্তরের দু'পাশের দেয়ালের পিছন থেকে।

এরপর আর কোনো ফাং-এর সাহস হলো না দেয়ালের উপরে চড়ার, আগের মতোই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকল ওরা। সামনের দিক থেকে আপাতত বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝে পিছনের দিকের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলাম আমি। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি, চার কি পাঁচশ' গজ দূরে, পাথুরে একটা ঢালের উপর অবস্থান নিয়েছে বেশ কয়েকজন ফাং ঘোড়সওয়ার। কুয়াশা নেই ওই দিকটায়, তাই নিশানা করতে অসুবিধা হলো না আমার—গ্রিলের ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল বের করে ট্রিগার টানতে লাগলাম সমানে। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে স্যাডল থেকে মাটিতে পড়ে গেল এক ফাং সৈন্য। লোকটার কী হয়েছে দেখার জন্য স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল আরেকজন,

ছুটে গেল আহত বা নিহত লোকটার কাছে, তারপর এই তোরণের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল সঙ্গীদেরকে। ওর কথা শুনে এদিকে ছুটে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে লোকগুলো বুঝতে পেরে আবার গুলি করতে শুরু করলাম। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা, ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে অদৃশ্য হলো, অশিক্ষিত বর্বর ফাংদের বিরুদ্ধে রাইফেলের ক্ষমতা দেখে মুচকি হাসলাম আমি।

আমাদের সামনের-পিছনের দু'দিকের রাস্তাই এখন পরিষ্কার। কিন্তু আফসোস, পালানোর উপায় নেই—অলিভার আর কুইক দু'জনই বোমা বসানোর কাজে ব্যস্ত। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ডাকবো ওদেরকে; এখন পালাতে না-পারলে আর কখনই পালানো যাবে না। উল্টোদিকের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ করেই দেখি, ফিরে আসছে ওরা দু'জন। ফিরে আসছে না-বলে বলা ভালো পিছু হটছে, কারণ ওদের পিঠ আমার দিকে, তারের কুণ্ডলী বালির নীচে চাপা দিতে দিতে উবু হয়ে হাঁটছে ওরা। আঁচমকা বজ্রপাতের মতো একটা আওয়াজে চমকে উঠতে হলো, অন্যদিকের দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখি একসঙ্গে ছুটে আসছে অনেক ফাং সৈন্য, কেউ ঘোড়ায় চেপে আবার কেউ দৌড়াতে দৌড়াতে, ছুটন্ত অবস্থায়ই ভয়ঙ্কর রণহুঙ্কার ছাড়ছে একেকজন। ওরা বুঝে গেছে রাইফেল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না আমরা ওদেরকে, তাই চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। দৌড়াতে দৌড়াতেই তোরণের দিকে বল্লম ছুঁড়ে মারছে কেউ কেউ, ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের কেউ কেউ তীর মারছে ধনুক থেকে, কিন্তু সেসব বল্লম বা তীরের সবগুলোই দরজা থেকে বেশ কিছুটা দূরের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে। ঠিক এই সময়ই ভিতরে এসে ঢুকল অলিভার আর কুইক। ফাংদের আক্রমণের খবরটা জানালাম ওদেরকে।

'খুব ভালো,' শুনে মন্তব্য করল অলিভার, তেমন একটা বিচলিত মনে হলো না ওকে। 'সার্জেন্ট কুইক, তারের এই

প্রান্তগুলো ব্যাটারির সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে এখন আমাদেরকে। খেয়াল রাখবে, শক্ত করে যাতে আটকায়, আলগা থাকলে কিন্তু কাজ হবে না। ডাক্তার অ্যাডামস, উটগুলো নিয়ে আসবেন?'

বিনা বাক্য ব্যয়ে নিয়ে এলাম উটগুলোকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মতলবটা কী, বলো তো অলিভার?'

'আতশবাজি দেখেনি কখনও ফাংরা, ওদের দেখিয়ে দিতে চাই সেটা,' ওর কথা শেষ হলো কি হলো না, সামনের দরজার উপর একযোগে হামলে পড়ল ফাং সৈন্যরা। আবারও আমার মনে হলো বজ্রপাত হয়েছে বোধহয়, টের পেলাম ধাতব দরজার উপর অনেকগুলো কুড়াল বা ওই জাতীয় অস্ত্রের বারংবার আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি।

'উটগুলো নিয়ে ওই দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, ডাক্তার অ্যাডামস,' যে-দরজাটা এখনও অক্ষত আছে ফাংদের কবল থেকে সেটা দেখাল আমাকে অলিভার, 'যাওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, বালির নীচে চাপা দেয়া তারে যাতে পা না-পড়ে উটগুলোর।' পিছনের দিকে তাকাল সে। 'দরজাটা আর মিনিটখানেকও টিকবে কি না সন্দেহ।'

বাইরে বের হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়ালাম আমরা। কেউ নেই এদিকে, অথবা হয়তো আছে কিন্তু রাইফেলের ভয়ে লুকিয়ে আছে কোথাও, পাতলা কুয়াশায় আবৃত হয়ে খাঁ খাঁ করছে আমাদের সামনের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি। দু'দিকের দেয়ালের আড়ালের লোকগুলো চলে গেছে কি না বুঝতে পারছি না।

'মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন,' হাতে সময় নেই বুঝতে পেরে তাড়াহুড়ো করে বলল অলিভার, 'আমি বলামাত্র উটগুলো নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন আপনারা। পঞ্চাশ গজ কিংবা পারলে আরও কিছুদূর গিয়ে অপেক্ষা করবেন আমার জন্য। মনে রাখবেন, দূরত্বটা যাতে পঞ্চাশ গজের চেয়ে কম না-হয়, কারণ এ-ধরনের বিস্ফোরক নিয়ে আগে কাজ করিনি আমি, এগুলোর

রেঞ্জ কতখানি ঠিক জানি না। এমনও হতে পারে যতখানি ভাবছি আমি, বিস্ফোরণের ধাক্কাটা তারচেয়েও বেশি দূরে গিয়ে লাগবে। যা-হোক, আমিও যাবো আপনাদের পিছু পিছু, কিন্তু বুঝতেই পারছেন নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পর্যন্ত গিয়ে থামতেই হবে আমাকে, কারণ পুঁতে রাখা বোমার উপরে ফাংরা হাজির হওয়ামাত্র বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। তারপর যদি ভাগ্যে থাকে তা হলে দেখা হবে আবার। যদি দেখা না-হয়, যদি খারাপ কিছু ঘটে আমার, একটা মুহূর্তও দেরি করবেন না, যত দ্রুত পারেন গিয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন সাদা পাহাড়ে। মুরে পৌঁছাতে পারলে আমার অভিবাদন জানিয়ে দেবেন রানি ওয়ালদা নাগাসটাকে। আর শ্যাডর‍্যাককে যদি দেখেন, চেপে ধরবেন, প্রফেসর হিগসের মৃত্যুর জন্য যদি দায়ী হয় সে তা হলে রানিকে বলে সোজা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন শয়তানটাকে।'

'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন,' বলল কুইক, 'আপনার সঙ্গে আমিও আছি। উটগুলো নিয়ে রওনা হয়ে যাক ডাক্তার অ্যাডামস, কোনো অসুবিধা হবে না তাঁর।'

'সেনাবাহিনীর নিয়ম জানা নেই তোমার, সার্জেন্ট কুইক?' কঠোর গলায় বলল অলিভার। 'যখন যা আদেশ করা হয় তা-ই পালন করতে হয়, কোনো প্রশ্ন করা যায় না, আদেশটা ভুল হলেও কোনো পরামর্শ দেয়া যায় না। তর্ক করার সময় নেই এখন। যদি চাও আমাদের মধ্যে অন্তত একজন গিয়ে হাজির হোক মুরে, তা হলে আমার বা তোমার মধ্যে যে-কোনো একজনকে অপেক্ষা করতেই হবে এখানে, আর চলে যেতে হবে বাকি দু'জনকে।'

'তা হলে ব্যাটারিগুলো আমার হাতে দিয়ে আপনি চলে যান ডাক্তার অ্যাডামসের সঙ্গে?'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল অলিভার। 'ওই যে শোনো,' দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল সে, 'এখন আর কুড়াল দিয়ে কোপাচ্ছে না বরং কাঁধ দিয়ে ধাক্কা

দিচ্ছে ফাংরা। তার মানে দরজাটা প্রায় ভেঙে ফেলেছে ওরা। যাও, আর দেরি কোরো না, রওনা হয়ে যাও। না-হলে মরতে হবে তিনজনকেই।'

কথা আর বাড়ালাম না আমরা। যার যার রিপিটিং রাইফেল হাতে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসলাম আমি আর কুইক। যেদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, তার উল্টোদিকের দরজাটা প্রায় ভেঙে ফেলেছে ফাংরা; ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি, সংখ্যায় ওরা এত বেশি যে, এখন গুলি করতে শুরু করলে ফসকানোর সম্ভাবনা নেই, যার গায়ে গুলি লাগবে সে নিহত না-হলেও গুরুতর আহত যে হবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো কোথায় গেছে বুঝলাম এতক্ষণে। পিছু হটে গেছে ওরা, গিয়ে যোগ দিয়েছে ফাং সৈন্যদের সঙ্গে যাতে সংখ্যায় বাড়তে পারে, বিচ্ছিন্নভাবে রাইফেলের মোকাবেলা না-করে একসঙ্গে লড়াই করতে চায়। দরজাটা ভেঙে ফেলল ওরা, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, আমাদের দিকে ছুটে আসছে না, বরং এগিয়ে আসছে সারি করে, একজনের পর একজন। বন্যার পানির স্রোত যেভাবে ধেয়ে আসে, ফাংদের এগিয়ে আসাটাও সেরকম মনে হলো আমার কাছে। রাইফেলের আওয়াজ কানে এল এমন সময়—পিছু হটতে হটতে গুলি করছে বীর অলিভার, আর অল্প কয়েক গজ হটলেই ব্যাটারির কাছে পৌঁছে যাবে সে, কিন্তু হাজার হাজার ফাং সৈন্যের স্রোতের বিরুদ্ধে ওর রিপিটিং রাইফেলটা বড় অসহায় মনে হলো এবার।

তারপর একসময়, উত্তেজনা, ক্রোধ বা দানবীয় আক্ষেপ—যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে রণহুঙ্কার দিয়ে উঠল ফাংরা। দূর থেকে ভেসে আসা সেই গর্জন শুনে আমার মনে হলো ভূমিধ্বস শুরু হয়েছে বুঝি। ছুটন্ত উটের পিঠে বসে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, তলোয়ার-বল্লম-তীর-

ধনুক-চাপাতি-কুড়াল নিয়ে ছুটে আসছে হাজার হাজার ফাং; একেকজনের চেহারায় ফুটে থাকা জিঘাংসা যেন দেখতে পাচ্ছি এতদূর থেকেও। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কোনো আশা নেই অলিভারের, স্রেফ কচুকাটা হয়ে যাবে সে। আমরাও মরবো, অলিভারের মৃত্যুর বেশি হলে দশ-পনেরো মিনিট পর।

'বিদায়,' আমাদের দিকে ফিরে চিৎকার করতে করতে হাত নাড়ছে অলিভার, 'বন্ধুরা, আর হয়তো দেখা হবে না। বিদায়!'

পাশে তাকিয়ে দেখি, অক্ষমতার লজ্জা আর অসহায় ক্রোধ সহ্য করতে না-পেরে কাঁদছে কুইক, টপটপ করে পানি পড়ছে ওর চোখ থেকে। 'চার চারটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছি আমি,' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, 'পাঁচবার পদক পেয়েছি। আর আজ তিন হাজার নিগ্রোর বিরুদ্ধে একা লড়াই করার জন্য আমার ক্যাপ্টেনকে ফেলে আমাকেই পালাতে হচ্ছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে? ...ডাক্তার অ্যাডাম্স, আপনি যান, আমি ফিরে যাচ্ছি, একা মরতে দেবো না ক্যাপ্টেন অলিভারকে।'

ওর কথা শুনে উটের লাগাম টানতে হলো আমাকে। থেমে দাঁড়ালাম আমরা, আবার তাকালাম পিছনে।

তোরণের পরে, বেদির মতো জায়গাটা এখন যেন পরিণত হয়েছে জনসমুদ্রে–রোববারে লণ্ডনের হাইড পার্কের অবস্থা যে-রকম হয় অনেকটা সে-রকম। ফাং যোদ্ধাদের প্রথম সারিটা ইতোমধ্যেই অতিক্রম করে ফেলেছে বেদিটা, এগিয়ে যাচ্ছে তোরণের দিকে। ঘিরে ফেলেছে ওরা তোরণটা, ছেঁকে ধরেছে পিঁপড়ার মতো। আমরা দু'জন যে পালিয়ে গেছি বুঝতে পারেনি, পারলে ছুটে আসত আমাদের পিছু পিছু। অলিভারকে দেখা যাচ্ছে না, যাওয়ার কথাও নয়, হয়তো...

আর কিছু ভাবার সুযোগ পেলাম না। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর আওয়াজে বলতে গেলে কানে তালা লেগে গেল। ভীষণ জোরে কেঁপে উঠল মাটি, ভাবলাম ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে

boiRboi.net

বোধহয়! তোরণের কাছে আচমকা জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখায় যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল দূরের আকাশ। উন্মুক্ত প্রান্তরের দু'পাশের দেয়াল সচল হয়ে উঠল যেন—মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়াল দিল শত শত ইট। কব্জা থেকে আলগা হয়ে সামনের দিকে ছিটকে এল ব্রোঞ্জের-পাত-লাগানো বিশাল এক পাল্লা। উড়ে এল অনেকগুলো মরদেহ এবং মরদেহের খণ্ডাংশ, যেমন বল্লম আঁকড়ে ধরে-রাখা একটা কাটাহাত। ভয়ে আমাদের উটগুলোর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল সম্ভবত, দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতে লাগল। শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরে রেখে থামালাম ওগুলোকে।

কী করবো বুঝতে পারছি না, ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘে ঢেকে যাওয়া তোরণটার দিকে তাকিয়ে আছি বিমূঢ় হয়ে, হঠাৎ দেখি ওই মেঘের আড়াল থেকে মাতালের মতো টলতে টলতে বের হয়ে আসছে অলিভার। গান-পাউডার আর ধুলোয় কালো হয়ে গেছে ওর চেহারা, অর্ধেকের মতো উধাও হয়ে গেছে গায়ের পোশাক, কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। তারপরও ছোট একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারি ধরে আছে সে ডান হাতে। দেখেই বুঝলাম বড় কোনো ক্ষতি হয়নি ওর, তবে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগছে।

কিছুক্ষণ পরই দৌড়াতে শুরু করল সে, ছুটে আসছে আমাদের দিকেই। কাছে এসে নিজের উটের পিঠে চড়তে চড়তে বলল, 'খুব কাজে দিয়েছে বোমাগুলো। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে ফাংরা, এমনকী আমাদেরকে ধরার কথাও ভুলে গেছে যেন। কিন্তু দেরি করা যাবে না, আমাদেরকে ধরার জন্য আসবেই ওরা।'

ছুটতে শুরু করলাম আমরা। ক্লান্তি পুরোপুরি দূর হয়নি আমাদের উটগুলোর, তাই দুলকি চালে এগোচ্ছে ওগুলো; সাদা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি আমরা। ক্ষতিগ্রস্ত তোরণের কাছে পড়ে থাকা মৃত ফাংদের স্তূপের মধ্য থেকে সম্মিলিত একটা আর্তনাদ

ভেসে এল এমন সময়। যেমনটা আশা করেছিলাম তা-ই ঘটল—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একদল ফাং বেশ দূরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, যাতে আমরা পালানোর চেষ্টা করলে আমাদেরকে বাধা দেয়ার শেষ চেষ্টাটা করতে পারে। মুশকিলের কথা হচ্ছে, আমাদের রাইফেলের পাল্লার বাইরে আছে ওরা; এখন যেখানে আছি সেখান থেকে গুলি করলে সুবিধা করতে পারবো না। কিন্তু আমাদেরকে দেখামাত্র কেন যেন ঘাবড়ে গেল লোকগুলো, বাধা দেয়ার কোনো নমুনা দেখা গেল না ওদের মধ্যে, বরং ছোটাছুটি শুরু করল এদিকে-সেদিকে। বুঝলাম, অশিক্ষিত অসভ্য ফাংদের কাছে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুতে পরিণত হয়েছি আমরা; প্রথমে রাইফেল পরে বোমার ক্ষমতা দেখে সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও মনোবল ভেঙে পড়েছে ওদের।

সুযোগটা নিলাম আমরা। দিক না-পাল্টে এগিয়ে চললাম সাদা পাহাড় অভিমুখে। আপাতত কোনো ক্ষতি না-হলেও বিস্ফোরণের ধাক্কাটা এখনও সামলাতে পারেনি অলিভার, ওর সমস্যা হতে পারে ভেবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জোরে ছুটতে পারছি না। সাদা পাহাড়টা আর আধ মাইলের মতো দূরে আছে, এমন সময় কী মনে হতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, শ'খানেক ফাং যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে আমাদের পিছু পিছু। যেভাবেই হোক একত্রিত হয়েছে ওরা, সাহস সঞ্চয় করেছে এবং আমাদের শেষ দেখে নেয়ার জন্য ধেয়ে আসছে।

'চাবকাও উটগুলোকে,' চেঁচিয়ে বললাম কুইককে, 'না-হলে ধরা পড়ে যাবো আমরা।'

চাবুকের বাড়ি খেয়ে গতি বাড়ল উটগুলোর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটছে ওরা এখন। কিন্তু উটের চেয়ে অনেক জোরে দৌড়ায় ঘোড়া; মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর আবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, অনেক কাছে চলে এসেছে ফাং যোদ্ধারা, মিনিটখানেকের মধ্যে

ধরে ফেলবে আমাদেরকে। আর আশা নেই, হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময় সাদা পাহাড়ের পিছন থেকে হঠাৎ করেই বের হয়ে এল আরেকদল ঘোড়সওয়ার, ছুটে আসতে লাগল সোজা আমাদের দিকে।

পানির স্পর্শে যেভাবে চাঙা হয়ে ওঠে ক্ষরায় ফাটা মাটি, সেভাবে আবার আশা জাগল আমার মনে। নতুন ঘোড়সওয়ারবাহিনীর সবার সামনের লোকটার হাতে একটা পতাকা, সোনালি হিব্রু অক্ষর আর সিংহাসনে-উপবিষ্ট সলোমনের আদল খচিত সবুজ রঙের ত্রিভুজাকৃতির ওই পতাকা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না আমি; তাই দেখামাত্র চিনতে পারলাম আবাটিদের। পতাকাবাহীর ঠিক পিছনেই দেহরক্ষী-পরিবেষ্টিত হয়ে ছুটে আসছেন ধবধবে সাদা কাপড় পরা কমনীয় এক নারী। একনজর দেখেই চিনতে পারলাম এঁকেও—রানি মাকেডা, বংশ-পরম্পরায় যিনি এবং যাঁর আগের রানিরা শেবার রানি বলে পরিচিত সবার কাছে।

ফাংরা ধরতে পারল না আমাদেরকে। দু'মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে গেলাম আবাটিদের কাছে, বলা ভালো আবাটিরা ঘিরে ধরল আমাদেরকে। আবাটিদেরকে দেখেই গতি কমিয়ে দিয়েছিল ফাং যোদ্ধারা, তাই বেঁচে গেলাম। ওরা ফিরে যাচ্ছে কি না দেখার জন্য তাকালাম পিছনে। হ্যাঁ, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সবাই, কারণ এখন দলে ভারী হয়ে গেছি আমরা, লড়াই শুরু হলে আমাদের সঙ্গে পারবে না ওরা।

রানি মাকেডা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। 'স্বাগতম, বন্ধু,' আমাকে বললেন তিনি, আমি যেমন তাঁকে দেখামাত্র চিনেছি তিনিও তেমন আমাকে চিনেছেন, 'আপনাদের দলনেতা কে?'

আধখোলা চোখে উটের পিঠে বসে টলছিল অলিভার, ওকে দেখিয়ে দিলাম আমি।

boighar.net

অলিভারের দিকে তাকালেন রানি। 'যদি সম্ভব হয় আপনার পক্ষে, কী ঘটেছিল খুলে বলুন আমাকে। আমি আবাটিদের রানি, আমার নাম মাকেডা, ওরফে ওয়ালদা নাগাসটা, লোকে আমাকে সম্মান করে বলে "রাজাদের কন্যা"। দেখুন,' বলে মাথার ঘোমটা খুলে ফেললেন তিনি, 'আমার এই মুকুটটা দেখুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন সত্যি কথা বলছি আমি।'

সূর্যের আলোয় যেন জ্বলে উঠল রানি মাকেডার মাথার অত্যন্ত দামি আর খুবই সুন্দর ওই মুকুট। সত্যিই, "রাজাদের কন্যা" ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ওই মুকুট পরা সম্ভব নয়।

সাত

রানি মাকেডার কণ্ঠ যেমন নরম আর মিষ্টি, উচ্চারণও তেমন সুস্পষ্ট আর অভিজাত। অলিভারের আধখোলা চোখ খুলে গেল পুরোপুরি, রানির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে।

'খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন,' শুনলাম বিড়বিড় করে বলছে সে। 'খুবই সুন্দরী নারী। সোনার ওই মুকুটটা ওর কালো চুলে দারুণ মানিয়েছে!'

আমার দিকে তাকালেন রানি। 'আপনার সঙ্গী কী বললেন?'

তাঁকে প্রথমেই জানালাম যে, হুঁশ পুরোপুরি নেই অলিভারের, কারণ বিস্ফোরণের ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি বেচারা। তারপর, একটু আগে অলিভার যা যা বলেছে হুবহু অনুবাদ করে শোনালাম রানিকে। শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন তিনি, তাঁর নীল চোখের দৃষ্টি নত হলো, তাড়াহুড়ো করে ঘোমটা

তুলে দিলেন মাথায়।

অলিভারকে বোঝানোর জন্য কুইক বলে উঠল, 'আপনার ভুল হচ্ছে, ক্যাপ্টেন। রানি মাকেডা কোনো অপ্সরা নন, রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু নিঃসন্দেহে দারুণ সুন্দরী। আমার জীবনে এত সুন্দরী মেয়েমানুষ আর দেখিনি, যদিও তিনি, আমার মনে হয় অশিক্ষিত একজন আফ্রিকান ইহুদি। ...জেগে উঠুন, ক্যাপ্টেন, জেগে উঠুন; আপনার ফাটানো বোমায় মরেছে ফাংরা, আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি।'

ঠিক তখনই, আমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে, যে-ঢাল অতিক্রম করে সাদা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছিলাম আমরা, সে-ঢালের মাথায় হঠাৎ দেখা গেল তিন ফাং ঘোড়সওয়ারকে। আমাদেরকে কিছুক্ষণ দেখল ওরা, তারপর ঢাল বেয়ে মধ্যম গতিতে ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে। পোশাক দেখে বুঝতে পারলাম ফাংদের কোনো-না-কোনো গোত্রের সর্দার তিন জনই। লম্বা একটুকরো কাপড় দিয়ে নাকমুখ ঢেকে রেখেছে একজন, শুধু চোখের সামনে বড় বড় দুটো গোল ছিদ্র।

'দূত,' লোকগুলোকে কিছুক্ষণ দেখার পর মন্তব্য করলেন রানি। 'দেখুন, বর্শার ফলার সঙ্গে সাদা পতাকা বেঁধে নিয়ে আসছে ওরা। তার মানে আলোচনা করতে চায় আমাদের সঙ্গে। ডাক্তার, আপনি আর আপনার বন্ধুরা কি আসবেন আমার সঙ্গে ওই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্য?' আমাদের জবাবের অপেক্ষা না-করেই ঘোড়া ছোটালেন তিনি, পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে গিয়ে থামলেন, উট ছুটিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম আমরা কিছুক্ষণ পর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়ার রাশ টানল তিন ফাং, খেয়াল করলাম আমাদের দিকে বর্শা তাক করে রেখেছে তিন জনই।

'ভয়ের কিছু নেই,' আমরা যাতে উত্তেজিত হয়ে কিছু করে না-বসি সেজন্য আমাদেরকে বললেন রানি, 'আমাদের কোনো

ক্ষতি করবে না ওরা।'

বর্শা তুলে আরবদেশীয় ভঙ্গিতে রানি মাকেডাকে সম্মান জানাল তিন ফাং। তারপর ওদের মধ্যে একজন প্রাচীন একটা ভাষায় কথা বলতে লাগল রানির সঙ্গে। ভাষাটা অনেকটা আরবির মতোই, আর যেহেতু দীর্ঘদিন মরুভূমিতে এসব বর্বর উপজাতির সঙ্গে থাকতে হয়েছে আমাকে তাই যত গোত্র আছে সব গোত্রের ভাষা মোটামুটি জানা আছে, সেহেতু বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারলাম।

'ওয়ালদা নাগাসটা,' বলল লোকটা, 'আমাদের রাজা বারুং-এর দূত আমরা। আপনার তিন সাহসী অতিথিকে কিছু কথা বলতে চান আমাদের রাজা, তাই তিনি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে। আপনাদের মতো সাদা চামড়ার মোটা একটা লোককে ধরে ফেলেছি আমরা, কিন্তু আপনাদেরকে ধরতে পারিনি। কারণ আপনারা বীর—মাত্র তিন জন মিলে ঠেকিয়ে দিয়েছেন আমাদের হাজার হাজার যোদ্ধাকে, আপনাদের কাছে যে-অস্ত্রই থাকুক না কেন সেটা দিয়ে দূর থেকে হত্যা করেছেন আমাদের অনেক সৈন্যকে। সবশেষে কী যাদু করলেন জানি না—বজ্রপাতের মতো আওয়াজ হলো আর ভূমিকম্প শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল আমাদের কয়েকশ' সৈন্য, আহত হলো আরও বেশি। যে-দেয়াল কেউ কোনোদিন ভাঙতে পারবে না বলে গর্ব করতাম আমরা, গুঁড়িয়ে দিলেন সে-দেয়াল এবং আমাদেরকে হতভম্ব করে দিয়ে পালিয়ে গেলেন নিরাপদে।

'এখন, সাদা মানুষরা, আমাদের রাজা আপনাদেরকে বলতে চান, আবাটিদেরকে ওদের ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। এই আবাটিরা আসলে বেবুনের জাত, কথা বলা আর কাপড় পরা ছাড়া মানুষের মতো আর কিছু করতে পারে না এরা। ও হ্যাঁ, আরেকটা কাজ পারে, পাহাড়ি খরগোসের মতো লুকিয়ে থাকতে পারে পাহাড়ের গর্তে। এদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে

আসুন আমাদের রাজার কাছে। তিনি শুধু আপনাদেরকে আপনাদের জীবনই নয়, আপনাদের মন যা যা চায় তার সবই দেবেন—জমিজমা, গণ্ডা গণ্ডা বউ, ডজন ডজন ঘোড়া। আপনারা যোগ দেবেন তাঁর মন্ত্রীসভায়, শলা-পরামর্শ দেবেন তাঁকে এবং বিনিময়ে আপনাদেরকে পরম সুখ দিয়ে যাবেন তিনি। আপনাদের যে-ভাই ধরা পড়েছে আমাদের হাতে, আপনাদের খাতিরে তাঁকে হত্যা না-করে তাঁর জীবন ভিক্ষা দিতেও রাজি আছেন রাজা বারুং। আপনাদেরকে শোনানোর জন্য এ-কথাগুলোই বলেছিলেন তিনি, তাই আমাদের আর কিছু বলার নেই।'

আবাটিদের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করায় অপমানে অনেক আগেই মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল রানি মাকেডার, আমি যখন দূতের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনালাম অলিভার আর কুইককে তখন আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে অলিভার বলল, 'ডাক্তার অ্যাডামস, এই তিন শয়তানকে বলুন ওদের বুড়ো রাজার কাছে গিয়ে বলতে যে, আমাদের এত ভালো চাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। শুধু তা-ই না, বাধ্য হয়ে অখেলোয়াড়সুলভ উপায়ে কয়েক শ' ফাং যোদ্ধাকে মেরে ফেলার জন্য আমাদের দুঃখেরও কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু ওই কাজটা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না আমাদের, কারণ ওদেরকে না-মারলে আমাদেরকে মরতে হতো। হ্যাঁ, রাজা বারুং-এর প্রস্তাব খুবই লোভনীয় মনে হচ্ছে আমার কাছে; কিন্তু বেবুন বা পাহাড়ি খরগোসের মতো অসহায় লোকগুলোকে দেখার পর, আর তাদের রানি...' বলে রক্তাক্ত মাথা নুইয়ে রানি মাকেডাকে সম্মান করল সে, 'মাকেডার মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ওই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না আমি। আমরা তাঁর নুন খেয়েছি, বলা ভালো খেতে যাচ্ছি, তাঁকে সাহায্য করার জন্যই এতদূর থেকে এসেছি, এত দুর্গম একটা মরুভূমি যাতে পাড়ি দিতে পারি সেজন্য লোক আর উট

দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তিনি, সুতরাং যতক্ষণ তিনি আমাদেরকে সঙ্গে রাখতে চান ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকা আমাদের কর্তব্য।'

অলিভারের কথাগুলো হুবহু অনুবাদ করে শোনালাম সবাইকে। প্রত্যেকে, বিশেষ করে রানি মাকেডা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল তিন ফাং দূত, আমাদের তিন জনের ব্যাপারে যা বোঝার বুঝে নিল, তারপর এতক্ষণ কথা বলছিল যে-লোকটা, রানির দিকে তাকাল সে। বলল, 'মুরের রানি, আপনার অতিথিদের জন্য আমাদের রাজা যা প্রস্তাব করেছেন তার সব কিছু আপনাকেও দিতে চান তিনি। শুধু একটা কাজ করতে হবে আপনাকে–বিয়ে করতে হবে তাঁকে। আপনাকে তিনি তাঁর প্রধান পত্নী বানাতে চান। তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যদি তাঁকে পছন্দ না-হয় আপনার,' বলে বোধহয় দুর্ঘটনাক্রমে অলিভারের দিকে তাকাল লোকটা, 'তা হলে যাকে খুশি তাকে বেছে নিতে পারেন জীবনসঙ্গী হিসেবে।'

কিছু বললাম না আমরা কেউ, রানি কী বলেন শোনার জন্য তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে। কিন্তু তিনিও চুপ করে থাকলেন, রাগে বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন বোধহয়।

'আপনার পাহাড়ি খরগোসদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে চলে আসুন, মহান রানি,' বলে চলল লোকটা। 'আপনার লোকরা কতটা কাপুরুষ ভেবে দেখুন একবার। 'আমরা মাত্র তিন জন এসেছি, তা-ও আবার আপনার সঙ্গে শুধু কথা বলার জন্য এবং বলতে গেলে নিরস্ত্র অবস্থায়। তারপরও আমাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস হয়নি ওদের। এই তিন ভিনদেশী আপনার সঙ্গে না-এলে একাই আসতে হতো আপনাকে। আপনার এই সাহস, শুধু আপনার এই সাহসের কারণেই বার বার চেষ্টা করেও মুর দখল করতে পারিনি আমরা। তা না হলে তিন বছর আগেই

আপনার শহর কব্জা করে ফেলতাম আমরা। অবশ্য শহরটা একসময় আমাদেরই ছিল, আপনার লোকরাই ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয় এখানে, তারপর সুযোগ বুঝে ঘাঁটি গাড়ে। এমন এক জায়গা বেছে নিয়েছেন আপনারা যে, সংখ্যায় আপনাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হওয়ার পরও হামলা করে সুবিধা করতে পারি না আমরা। নিজের উপর থেকে দেবতা হারম্যাকের ক্ষমতা কীভাবে সরিয়ে দিলেন জানি না, যাদু-জানা এই তিন ভিনদেশীকেই বা কোত্থেকে হাজির করলেন বলতে পারবো না, তবে এটা জানি কাজের বিনিময়ে ওদেরকে অনেক সোনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনি, যেসব সোনার বেশিরভাগই আছে প্রাচীন রাজাদের কবরের ভিতরে।'

'এসব কথা কে বলল আপনাদেরকে?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রানি, আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আরেকজন সঙ্গী আছে এঁদের, সে? যাকে আপনারা মোটা বলছিলেন?'

'না, না, তিনি এসবের কিছুই বলেননি। এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেও তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে পারিনি আমরা এখনও। তবে হ্যাঁ, আমাদের দেবতার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন তিনি আমাদেরকে, শুনলে মনে হয় আমাদের দেবতাকে অনেক আগে থেকেই ভালোমতো চেনেন তিনি। খবর দেয়ার আলাদা লোক আছে আমাদের,' বলে বাঁকা হাসি হাসল লোকটা। 'কখনও কখনও কারও কারও সঙ্গে কিছু ব্যবসা করতে হয় আমাদের, আর যারা ভীতু প্রকৃতির তারা দু'পয়সা কামানোর সুযোগ পেলে গোপন কথা ফাঁস করতে দ্বিধা করে না। যেমন, আমরা কিন্তু আগেই জানতাম যে, এই সাদা লোকগুলো আসছেন আমাদের এলাকায়, কিন্তু তাঁদের কাছে যে "যাদুর আগুন" আছে সে-কথা জানা ছিল না আমাদের। যদি জানতাম তা হলে আমাদের এলাকা পার হয়ে আপনার দেশে ঢুকতে পারতেন না এঁরা...। যা-হোক, রানি ওয়ালদা নাগাসটা, মুরের গোলাপ, মহান

রাজা বারুং-এর প্রস্তাবের জবাবে কি কিছু বলবেন আপনি?'

তিক্ত হাসি হাসলেন রানি। 'জীবন দিয়ে হলেও নিজের দেশকে রক্ষা করার কসম খেয়েছি আমি। নিজে সুখী হতে গিয়ে আমি যদি নিজেকেই বিলিয়ে দিই তা হলে আমার দেশের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং প্রকৃতপক্ষে কোনোদিনই সুখী হতে পারবো না। আপনাদের রাজার বাঁদি হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে আমাকে।'

'দেখবেন, দেশকে বাঁচাতে গিয়ে না আবার সত্যিই জীবন দিতে হয় আপনাকে,' দূতের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'কসম আমরাও খেয়েছি, রানি ওয়ালদা নাগাসটা, আমাদের প্রাচীন আর গোপন শহর মুরকে আপনার বেবুন আর খরগোসদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেয়ার। একদিন না একদিন হামলা চালাবোই আমরা, এবং জিতবোই; সেদিন কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষা করতে হলে মহান রাজা বারুং-এর প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে আপনাকে।'

'আপনি ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে?' রেগে গেছেন রানি। 'হামলা করবেন আপনারা আমার লোকদের উপর? যুদ্ধ তো শুরু হয়েই গেছে। অস্বীকার করতে পারেন, প্রথম দফায় পরাজয় হয়েছে আপনাদের? এতজন মিলেও ঠেকাতে পারেননি আমার তিন অতিথিকে? বরং অসহায়ের মতো মরতে হয়েছে আপনাদের অনেক সৈন্যকে?'

'না,' মাথা নাড়ল দূত। 'অস্বীকার করবো না। করার কোনো উপায়ও নেই। প্রথম দফায় সত্যিই পরাজিত হয়েছি আমরা। বলা ভালো আপনার সাদা অতিথিদের যাদুর কাছে পরাজিত হয়েছি। শুনে আবার ভাববেন না ভয়ে কাবু হয়ে গেছি আমরা, দেশ ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছি। আপনি তো জানেনই, আমাদের দেবতা হারম্যাক একজন "জাগ্রত" দেবতা, এখানে যদি থাকতে ভালো না-লাগে তাঁর তা হলে একদিন তিনি উঠে দাঁড়াবেন আসন ছেড়ে, উড়াল দেবেন; সেদিন যেখানেই তিনি যান আমাদেরকেও যেতে

হবে পিছু পিছু। কাজেই যতদিন না উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি, যতদিন না চলে যাচ্ছেন অন্য কোথাও ততদিন এই উপত্যকা আর শহর দখল করে রাখতে হবে আমাদেরকে, দরকার হলে আজীবন।'

'আজীবন?' রানির কণ্ঠে সন্দেহ। 'আজ সকালের কথা মনে করে দেখুন। আপনাদের শহর, শহরের রক্ষাপ্রাচীর, তোরণ—সবকিছু নিয়ে কতই না গর্ব ছিল আপনাদের। কী হলো শেষপর্যন্ত? পাখির পালক যেভাবে উড়ে বাতাসে সেভাবে উড়াল দিল আপনাদের তোরণের দরজা, ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল ওই তোরণের দু'দিকের রক্ষাপ্রাচীর। আপনাদের দেবতা হারম্যাকেরও যদি সে-রকম কিছু হয়ে যায় তা হলে কেমন হয়? যদি আর কোনোদিন দেখা না-যায় তাঁকে? যদি ফাঁক হয়ে গিয়ে মাটি গিলে নেয় তাঁকে? যদি নরকে ঠাঁই হয় তাঁর তা হলে আপনারা, মানে তাঁর অনুসারীরা কি পারবেন তাঁর পিছু পিছু সেখানে যেতে? আবার এমনও তো হতে পারে, ওই উপত্যকার পর্বতগুলো ভেঙে পড়ল তাঁর মাথার উপর, কবর দিয়ে দিল তাঁকে, আপনাদের দৃষ্টির আড়লে চলে গেলেন তিনি চিরদিনের জন্য? অথবা যদি বাজ পড়ে তাঁর উপর, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যান তিনি তা হলেই বা কী করবেন?'

রানির এসব অলক্ষুণে কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল তিন দূত। একটা মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হলো আমার, রক্ত সরে গেছে ওদের চেহারা থেকে।

'যদি সত্যিই সে-রকম কিছু হয় তা হলে মেনে নেবো আপনার দেবতা, আমাদের দেবতার চেয়েও বড় আর শক্তিশালী এবং আমাদের এতদিনের গৌরব আর অহংকার সব মিথ্যা,' বলে থামল লোকটা, তাকাল ওর সঙ্গী সেই লোকটার দিকে যে একটুকরো কাপড় দিয়ে এতক্ষণ বেঁধে রেখেছিল নাকমুখ, আড়াল করে রেখেছিল নিজের চেহারাটা আমাদের সবার কাছ থেকে।

দূতের কথা শেষ হওয়ামাত্র হঠাৎ নড়ে উঠল লোকটা,

একটানে খুলে ফেলল নিজের নেকাব। অভিজাত একটা চেহারা দেখতে পেলাম আমরা। দুই সঙ্গীর মতো কালো নয় সে, বরং তামাটে বলাই ভালো। বয়স পঞ্চাশের মতো। একজোড়া গভীর জ্বলন্ত চোখ, বড়শির মতো বাঁকানো নাক, লম্বা দাড়ি। সোনার গলবন্ধনী আর কপালের সোনার অলঙ্কার দেখলে বোঝা যায় লোকটা সম্ভ্রান্ত কেউ। ওর কপালের ওই সোনার অলঙ্কারটা মনে হয় কোনো রাজবংশের প্রতীক, কারণ প্রাচীন মিশরীয় ফারাওরা ওরকম অলঙ্কার পরত বলে শুনেছি। এর আগে কোথায় দেখেছি ভাবতে গিয়ে চট করে মনে পড়ে গেল—ফাংদের সিংহ-মাথার দেবতা হারম্যাকের মূর্তির কপালে, নাম ইউরিয়াস, ফণা তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ছোবলোদ্যত দুটো সাপ।

লোকটা নেকাব সরানোমাত্র তার দুই সঙ্গী বলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল তার পায়ের কাছে, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করতে করতে বলতে লাগল, 'বারুং! বারুং!' লোকটার আসল পরিচয় জানা হয়ে গেল আমাদের। ইচ্ছা করছিল না, তারপরও সম্মান দেখালাম তাঁকে, মাথা নোয়ালেন রানি মাকেডাও।

হাতে ধরা বর্শা উঁচিয়ে আমাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন রাজা বারুং। তারপর গম্ভীর মাপা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ওয়ালদা নাগাসটা এবং তিন সাদা ভিনদেশী, আমার চাকরদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললেন আপনারা, সবই শুনলাম। ওদের কথার সঙ্গে শুধু এটুকু যোগ করতে চাই, গতরাতে আমার সেনাপতিরা তিন ভিনদেশীকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, সেজন্য আমি দুঃখিত। একমনে পূজা করছিলাম তখন, না-হলে ওরকম ঘটতে পারত না। যা-হোক, হাতেনাতে ফল পেয়েছি আমরা, আমাদের অনুচিত কাজের সাজা হয়েছে—এত বড় একটা সেনাবাহিনী হত্যা করতে চেয়েছিল মাত্র চার জন লোককে, তা-ও লোকগুলো আবার গোপন ক্ষমতার অধিকারী, ফলে যারা খুন করতে গিয়েছিল তাদের অনেকেই আর বেঁচে নেই এখন। যা-

হোক, তিন ভিনদেশী আর মুরের গোলাপ রানি শেবা, আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ করছি, আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করুন। তা না-হলে কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো আমি এবং সে-কারণে হয়তো মারাও যেতে পারেন আপনারা। মূল্যবান জীবন তো হারাবেনই তখন, আপনাদের প্রজ্ঞা আর সম্পদও নষ্ট হবে।'

আমরা কেউ কিছু বললাম না।

রানির দিকে তাকিয়ে রাজা বারুং বলে চললেন, 'ওয়ালদা নাগাসটা, হারম্যাকের দেবতাকে, রাজবংশকে অবজ্ঞা করেছেন আপনি। কিন্তু এই বংশ যে আপনার চেয়ে কত শক্তিশালী সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই আপনার। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, যাঁরা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে দেয়াল বা দুর্গ গুঁড়িয়ে দিতে পারে, যারা মুহূর্তের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে শত শত সৈন্য, তাদের চেয়েও বেশি ওই বংশের ক্ষমতা। আমাদের প্রাণপ্রিয় দেবতাকে ধ্বংস করে ফেলারও ইঙ্গিত দিয়েছেন আপনি, ওয়ালদা নাগাসটা,' বলতে বলতে কঠোর হলো রাজার কণ্ঠ, 'যদি সত্যিই সে-রকম কিছু হয়, তা হলে আমার রাজবংশ আর আমার বাপ-দাদা যাঁরা শুয়ে আছেন মুরের গুহায় তাঁদের নামে কসম করে বলছি, যতদিন বেঁচে থাকবো, যেখানেই থাকবো, একজন একজন করে খুঁজে বের করবো আবাটিদেরকে এবং হত্যা করবো তাদেরকে। এমনকী মাকেডা, আপনাকেও খুন করবো, কারণ আমার কাছে আপনার চেয়ে আমার দেবতা বড়। এতদিন বড় কোনো সামরিক অভিযান চালাইনি আপনার বিরুদ্ধে, আপনারই কারণে—আপনার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং ভেবেছিলাম সে-রকম কোনো যুদ্ধ লাগলে যত ছোটই হোক না কেন, ক্ষতি হতে পারে আপনার। কিন্তু এবার আর কোনো ছাড় দেবো না আমি। আরেকটা কথা, যুদ্ধ যদি শুরু হয় এবং আপনার তিন ভিনদেশী অতিথি যদি নিহত না-হয়ে ধরা পড়েন আমার সৈন্যদের

হাতে, তা হলে তখন কিন্তু করুণা ভিক্ষা করলে কোনো লাভ হবে না, তাঁদের তিন জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আর তাঁদের ভাই, সাদা চামড়ার আরেক বিদেশি, নাকের উপর সবসময় ঝুলে-থাকা কালো রঙের কী একটা জিনিস দিয়ে যেন দেখেন তিনি আর সেজন্য তাঁকে "কালো জানালা" বলে ডাকি আমরা, তাঁকে বলি দেয়া হবে দেবতার উদ্দেশ্যে। আপনারা আত্মসমর্পণ না-করলে আমি করবোই কাজগুলো। তাই আবারও বলছি, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন, একজন আবাটিও মরবে না, আপনাদের মধ্যে কেউ হবেন রাজবংশের সম্মানিত বউ, কেউ রাজসভার মন্ত্রী, আপনাদের মতো জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে হারম্যাকের গৌরবও বাড়বে।'

'না,' ঘোড়ার জিনে চাপড় দিলেন রানি, 'হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে একজন আবাটিও বাঁচবে না, কিন্তু ক্রীতদাসের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে স্বাধীন অবস্থায় মরা অনেক ভালো। যারা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়তে চায় না, যারা সবসময় ভয়ে কাবু হয়ে থাকে, আমার মনে হয় তাদের এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় এসেছে,' বলতে বলতে ধরে এল তাঁর গলা। 'আর আমার কথা বলি—আপনার বউ হয়ে কৃত্রিম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার চেয়ে আমার সহজ-সরল প্রজাদের নিয়ে কষ্ট করে দিন কাটানো অনেক ভালো। ক্ষমা করবেন; আমার ঈশ্বর, পূর্বপুরুষ আর প্রজাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না আমি। ...যদি আমাকে হত্যা করেন আপনি, যদি সত্যিই সে-রকম কিছু লেখা থাকে আমার ভাগ্যে, তা হলে একটাই অনুরোধ থাকবে আমার—কথাগুলো ভাববেন দয়া করে। আমার জায়গায় যদি অন্য কোনো নারী থাকত এবং সে যদি আমারই মতো দৃঢ়চেতা হতো তা হলে বোধহয় একই জবাব দিত আপনাকে।'

'আর কিছু বলার নেই আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা

বারুং।

'আছে,' আবেগ সামলে নিয়েছেন রানি, তাঁর কণ্ঠ এখন স্বাভাবিক, 'আমার এই ভিনদেশী তিন অতিথিকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন তাঁরা, সেই চুক্তি থেকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলাম তাঁদেরকে। আমার জন্য, আবাটিদের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন নষ্ট করবেন কেন? বরং নিজেদের জ্ঞান আর ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা যদি যোগ দেন আপনার সঙ্গে, আমাকে পরাস্ত করা আপনার জন্য মুহূর্তের ব্যাপার হবে; আবার তাঁদের তিন জনেরই জীবন বাঁচবে। বাঁচতে পারবেন তাঁদের সেই ভাই-ও, যাঁকে আটকে রেখেছেন আপনি। আরেকটা কথা, আপনার একটা ক্রীতদাস আছে, "মিশরের গায়ক" নামে যাকে ডাকে লোকে। এই তিন ভিনদেশীর কোনো একজনের সঙ্গে ওই ছেলেটার সম্পর্ক আছে; যদি এঁরা আপনার সঙ্গে হারম্যাকে যায়, আমার অনুরোধ থাকবে ওই ছেলেটাকে আপনি তুলে দেবেন এঁদের হাতে।'

থামলেন রানি, কিছু শোনার আশায় তাকিয়ে থাকলেন রাজা বারুং-এর দিকে, কিন্তু চুপ করে থাকলেন রাজা।

আমাদের দিকে তাকালেন রানি মাকেডা। 'বন্ধুরা, যান, রাজা বারুং-এর অতিথি হয়ে হারম্যাকে যান। আমার জন্য অনেক কষ্ট করে, অনেক দূর থেকে এসেছেন আপনারা, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। খালিহাতে বিদায় দেবো না আমি আপনাদেরকে, তবে এখন দেয়ার মতো কিছু নেইও আমার কাছে, তাই পরে লোক মারফত সোনার কিছু অলঙ্কার পাঠিয়ে দেবো আপনাদের কাছে; সেগুলো যাতে ঠিকমতো পান আপনারা সে-ব্যাপারটা দেখবেন রাজা বারুং আশা করি। আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারলে অনেক কিছু জানতে পারতাম, শিখতে পারতাম। কিন্তু কপাল খারাপ, হলো না। হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের—যুদ্ধের ময়দানে। আজ আমাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছেন আপনারা, তখন

হয়তো এই আমাকেই খুন করার জন্য এগিয়ে আসবেন সবার আগে। ...যান, দেরি হয়ে যাচ্ছে আপনাদের। বিদায়।'

থামলেন রানি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পাতলা নেকাবের আড়াল থেকে আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। রাজা বারুং-ও তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, হাত বোলাচ্ছেন দাড়িতে, অদ্ভুত এক দৃষ্টি খেলা করছে তাঁর দু'চোখে। বোঝাই যায়, এই "নাটক" পছন্দ হয়েছে তাঁর, পরিণতি কী হয় দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন তিনি।

রাজা বারুং আর রানি মাকেডার কথোপথনের সারাংশ বুঝিয়ে বললাম আমার সঙ্গীদের, তখন মুখ খুলল অলিভার, 'প্রফেসর হিগসকে চিনি আমি। যে-উদ্দেশ্যে এসেছি আমরা এখানে তা বাদ দিয়ে যদি এখন তাঁকে উদ্ধার করার কাজে লেগে যাই তা হলে আমাদেরকে কোনোদিনই ক্ষমা করবেন না তিনি। আত্মত্যাগ জাতীয় বড় বড় ব্যাপারগুলোয় আসলে কোনো আগ্রহই নেই তাঁর। আমার মনে হয় না আমি যা সিদ্ধান্ত নেবো তাতে কোনো আপত্তি করবে সার্জেন্ট কুইক। ...ডাক্তার অ্যাডামস, আপনার জন্যই এই অভিযানে আসতে রাজি হয়েছি আমরা, কারণ আপনার স্বার্থ জড়িত আছে এর সঙ্গে। আপনিই সিদ্ধান্ত নিন কী করবেন।'

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার,' আবেগে বুজে আসতে চাইছে গলা, জোর করে শান্ত রাখলাম নিজেকে, 'আমার সেই সিদ্ধান্তে আমার ছেলেও কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে সম্ভবত, কিন্তু সামান্য এক গায়ক ছেলের চেয়ে এতগুলো নিরীহ আবাটির জীবন নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান। তা ছাড়া আমার ছেলের ব্যাপারে এখনও কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি রাজা বারুং।'

'দেখুন কেমন ড্যাবড্যাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ব্যাটা,' রাজাকে ইঙ্গিত করে বলল অলিভার। 'আপনার মতামত জানিয়ে দিন। মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করছে আমার, মাটির উপরে বা নীচে যেখানেই হোক না কেন একটু ঘুমাতে চাই আমি।'

কী করবো আমরা সে-ব্যাপারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম রাজা বারুংকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় বুকের ভিতরে বার বার মোচড় দিচ্ছিল আমার, মনে হচ্ছিল কেউ যেন ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডে। বছরের পর বছর ধরে খুঁজে খুঁজে শেষপর্যন্ত আমার ছেলের সন্ধান পেয়েছি, ওর আশাতেই বেঁচে ছিলাম এতদিন, না-হলে হয়তো মরে যেতাম অনেক আগেই, তারপর সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু কর্তব্যের খাতিরে যোগ দিতে হচ্ছে এমন এক নারীর সঙ্গে যে বলতে গেলে একদল কাপুরুষের দুঃসাহসী দলনেত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। কথা ছিল ঘুরে আসবো আমরা, তারপর বুঝেশুনে হামলা করবো ফাংদের উপর, কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের কথা ফাঁস হয়ে গেল ওদের কাছে, যে-ক্ষমতা দেখানোর কথা ছিল ওদের সেই সিংহমাথার দেবতার উপর তা প্রয়োগ করতে হলো নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর কাজে। আবাটিদেরকে ওদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজা বারুং-এর সঙ্গে গেলে আমার ছেলেকে মুক্ত করতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু ওকে যে অন্তত এক নজর দেখতে পেতাম সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এখন আর সেটাও সম্ভব নয়, এ-জীবনে আর কখনও সম্ভব হবে কি না জানি না।

'একটা অনুরোধ করবো,' আমার বক্তব্যের শেষপর্যায়ে বললাম রাজা বারুংকে, 'আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হলো, প্রফেসর হিগস, মানে আমাদের যে-লোকটাকে আটকে রেখেছেন আপনারা, তার সবই জানাবেন তাঁকে দয়া করে। তা হলে আসল ঘটনা বুঝতে অসুবিধা হবে না তাঁর।'

'যদি বলি,' মুখ খুললেন রাজা, 'রানি মাকেডা পথ দেখিয়ে এ-পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন আপনাদেরকে তা হলে বোধহয় ভুল হবে না। কাজেই তাঁর মতো একজন নারীর সাহচর্য ছেড়ে আমার সঙ্গে আসবেন আপনারা—এরকম ঘটলে আসলেই আশ্চর্য হতাম। যদিও বার বার বলছি ভিনদেশী, আসলে আমি ঠিকই জানি

আপনারা ইংরেজ; আর ইংরেজরা কেমন, শুনেছি আগেও—আরবের লোকজন আর যাদের সঙ্গে ব্যবসা আছে আমাদের তারা মাঝেমধ্যে নানা গল্প বলে আপনাদের ব্যাপারে। এক ইংরেজের ব্যাপারে একবার শুনি, নীল নদের তীরে অবস্থিত খার্তুম নামের একটা শহর বাঁচাতে গিয়ে নাকি জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল লোকটা। মহৎ মৃত্যু, সন্দেহ নেই, এবং তাঁর আত্মত্যাগও বৃথা যায়নি, কারণ আপনারা, মানে ইংরেজ সৈন্যরা পরে ওখানে গিয়ে কচুকাটা করে ফেলে শত্রুদের, পূর্ণ করে নিজেদের প্রতিশোধ-স্পৃহা।

'গল্পটা বিশ্বাস করিনি আমি। তাই আপনাদের ব্যাপারে যখন শুনলাম তখন যাচাই করে দেখতে চাইলাম। যাচাই করা হয়ে গেছে আমার, এবং এখন আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের মোটা ভাই, কালো জানালা নাম যাঁর, তাঁকে যদি ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছুঁড়ে ফেলি তা হলেও আপনাদের গুণগান গেয়ে যাবেন তিনি, তাঁর মন কী বলবে জানি না কিন্তু মুখে খুব গর্ব করবেন তিনি আপনাদের নিয়ে। চিন্তা করার কিছু নেই—আমাদের মধ্যে যা যা কথা হয়েছে তার প্রত্যেকটা শব্দ তাঁকে বলা হবে। মিশরের গায়ককে দিয়ে বলাবো আমি; ছেলেটাকে দিয়ে গানও বানাবো, হয়তো কোনোদিন আপনাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে গাইবে সে গানটা। আর কিছুই বলার নেই আমার, আপনাদের কথাও বোধহয় শেষ, এখন এখানেই কিছু ঘটে যাওয়ার আগে মনে হয় বিদায় নেয়া উচিত আমাদের। অবশ্যই আবার দেখা হবে, যেখানেই হোক, কিন্তু আফসোস সেদিন আমার পক্ষ থেকে এত বন্ধুত্বপূর্ণ কথা শুনতে পাবেন না আপনারা কেউ। ...বিশ্রাম দরকার আপনাদের,' অলিভারের দিকে ইঙ্গিত করলেন রাজা, 'আপনাদের মধ্যে যিনি আহত হয়েছেন বিশেষ করে তাঁর।' রানি মাকেডার দিকে তাকালেন তিনি, 'রাজকন্যা, ওয়ালদা নাগাসটা, আপনাদের হাতে সম্ভবত শেষবারের মতো চুমু খাওয়ার অনুমতি

চাই। আর যদি আপত্তি না-থাকে আপনার তা হলে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসতে চাই আপনাকে। ...জানেন, মাঝেমধ্যে সত্যিই মনে হয় আমার, যদি আপনি রানি হতেন আর আমরা হতাম আপনার প্রজা তা হলে কতই না ভালো হতো!'

একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন মাকেডা। হাতটা ধরলেন রাজা বারুং, আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালেন রানির আঙুলে। তারপর হাতটা ধরে রেখেই পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন মুরের সেই প্রবেশপথের দিকে।

এগিয়ে চলেছি আমরা, আরও কাছিয়ে আসছে মুর, প্রবেশপথ ঘিরে থাকা আবাটিদের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। 'রাজা বারুং! রাজা বারুং!' জোরে জোরে বলছে কেউ কেউ। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সৈন্যকে উত্তেজিত কণ্ঠে কী যেন বলল যশুয়া।

আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনল অলিভার, ফিসফিস করে বলল, 'যদি ভুল না-হয় আমার, ওই হাঁদারামটা কাজ বাড়াবে এখন।'

অলিভারের কথা শেষ হলো কি হলো না, খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করে ভীষণ জোরে রণহুঙ্কার দিয়ে উঠল যশুয়া আর ওর সঙ্গের কয়েকজন সৈন্য, তারপর ঘোড়া দাবড়িয়ে সোজা আমাদের দিকে ছুটে এসে ঘিরে ধরল আমাদেরকে মুহূর্তের মধ্যেই।

'আত্মসমর্পণ করো, বারুং!' ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল যশুয়া। 'আত্মসমর্পণ করো, না হলে তোমাকে হত্যা করা হবে এখনই, এখানেই।'

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রাজা বারুং। তারপর বললেন, 'মানুষের পোশাক পরা শুয়োর, আমার হাতে যদি কোনো অস্ত্র থাকত, (হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি রানির হাত ধরার সময়) তা হলে আমাদের মধ্যে যে-কোনো একজন অবশ্যই মরত এখনই, এখানেই।' রানির দিকে তাকালেন তিনি। 'রাজকন্যা, শান্তির পতাকা নিয়ে

হাজির হয়েছিলাম আমি, সসম্মানে আপনাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিলাম আপনার শহরের কাছে; আপনার এই কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতক লোকগুলো কি এখন আমাকে নিরস্ত্র আর একা পেয়ে বীরত্বের পরিচয় দিতে চাচ্ছে?'

'না, না,' চিৎকার করে উঠলেন রানি শেবা। 'যশুয়া চাচা, রাজা বারুং-এর কাছে আমাকে অপমানিত করলেন আপনি। এমনিতেই বদনাম আছে আবাটিদের, আপনি আরও কলঙ্কিত করলেন তাদেরকে। সরে দাঁড়ান, ফাংদের রাজাকে ফিরে যেতে দিন।'

কিন্তু রানির আদেশ মানল না যশুয়া এবং ওর সঙ্গের কোনো সৈন্য। এত সহজে এত বড় "শিকার" হাতছাড়া করতে বাধছে ওদের মতো হায়েনাদের।

'ওরা যদি রাজার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে,' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চিৎকার করে আমাদেরকে বলতে লাগল অলিভার, 'উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবেন সবগুলোকে। ...সার্জেন্ট কুইক, আপনি এগিয়ে যান, গিয়ে দাঁড়ান একেবারে সামনে; ওই যশুয়া যদি আর কোনো চালাকি করার চেষ্টা করে তা হলে সোজা গুলি করবেন ওকে।'

দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হলো না। রাইফেলের বাঁট দিয়ে উটের পাঁজরে গুঁতো দিল কুইক, কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল যশুয়ার ঘোড়ার, তারপর চিৎকার করে যশুয়ার উদ্দেশ্যে বলল, 'যা ভাগ্, মোটকা কোথাকার!'

কানের কাছে হঠাৎ এত জোরালো চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেল যশুয়ার ঘোড়া, পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সামলাতে পারল না যশুয়া, জিন থেকে পিছলে গিয়ে ধপাস করে পড়ল মাটিতে। জমকালো পোশাক আর বর্ম পরা সেনাপতিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে নিজের অজান্তেই হেসে ফেললাম আমি।

কী করবে ভেবে পেল না যশুয়ার অনুগত সৈন্যরা। সুযোগটা নিলাম আমরা। মুহূর্তের মধ্যে ঘেরাও করে ফেললাম রাজা বারুংকে। এক হাতে নিজের উটের, আরেক হাতে রাজার ঘোড়ার লাগাম ধরল অলিভার, তারপর দুটো জন্তুকেই বের করে নিয়ে চলে এল নিরাপদ দূরত্বে। পাশ থেকে আর পিছন থেকে রাজাকে আড়াল করে রাখলাম আমি আর কুইক যাতে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে না-পারে কেউ। থামলাম না, সোজা এগিয়ে গিয়ে হাজির হলাম রাজার দুই দূতের কাছে, ওদের হাতে তুলে দিলাম রাজাকে। কোনো একটা সমস্যা হয়েছে টের পেয়েছিল ওরা, তাই ছুটে আসছিল আমাদের দিকে, রাজাকে দেখে রাশ টানল।

'আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন বারুং। 'পারলে আরেকটা উপকার করুন আমার। বর্ম পরা ওই শুয়োরটার কাছে ফিরে গিয়ে বলুন আমি বারুং, ফাংদের রাজা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি ওকে। বর্ম পরে আছে সে, আমি পরিনি, হাতে তলোয়ার আছে ওর, আমার নেই; তারপরও যদি সাহস থাকে তা হলে আসুক সে এখানে, চ্যালেঞ্জ করলাম ওকে। কেউ গিয়ে বলুন আমি অপেক্ষা করছি এখানে, ওর জন্য।'

দেরি না-করে বার্তাটা নিয়ে গেলাম আমি। কিন্তু যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়েও বড় কাপুরুষ যশুয়া, তার চেয়েও বেশি ধূর্ত; আমার কথা শুনে বলল, 'ওই কুত্তাটার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতে পারলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হতো না। কিন্তু এখন কিছু করবো না আমি, সময় এলে টের পাওয়াবে ওকে যশুয়া কী জিনিস; আসলে দোষ আপনাদেরই—আপনাদের কারণেই ঘাবড়ে গিয়েছিল আমার ঘোড়াটা, আর পড়ে গিয়ে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি আমি। ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারছি না, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা তো দূরের কথা। আমাকে ওভাবে ফেলে না-দিলে হারম্যাকে গিয়ে খুন করে আসতাম হারামি বারুংকে!'

ফিরে এলাম সঙ্গীদের কাছে, কী বলেছে যশুয়া জানিয়ে দিলাম রাজাকে। শুনে মুচকি হাসলেন বারুং, কিছু বললেন না। গলায় সোনার একটা হার পরে ছিলেন তিনি, সেটা খুলে দিয়ে দিলেন কুইককে। তারপর মাথা নুইয়ে একে একে আমাদের তিন জনকেই সম্মান করলেন, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ছুটতে লাগলেন হারম্যাকের উদ্দেশে।

এভাবে হঠাৎ করেই অসভ্য ফাংদের রাজা বারুং-এর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় আমাদের। প্রথম দেখায় লোকটাকে পছন্দ করতে পারিনি আমি, কিন্তু পরে টের পাই, বেশ কিছু ভালো দিক আছে তাঁর। তিনি সাহসী, মহৎপ্রাণ এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যেও যদি ওই গুণগুলো লক্ষ করেন তা হলে সাদা মনে প্রশংসা করেন। অন্য কোনো ফাং-এর মধ্যে এই গুণগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। পরে জেনেছিলাম, মা'র কাছ থেকে এই গুণগুলো পেয়েছিলেন রাজা বারুং। আরবের এক সম্ভ্রান্ত উঁচু বংশে জন্মেছিলেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু ফাংদের সঙ্গে একবার এক যুদ্ধে হেরে যায় আরবরা, তখন তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেন রাজা বারুং-এর বাবা।

আট

মুরে ঢোকার প্রবেশপথটা সমতলভূমির উপর, কিন্তু পথ যত এগিয়েছে জমি তত উঁচু হয়েছে; এবং বলাই বাহুল্য সুন্দর থেকে আরও সুন্দর হয়েছে আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য। সারা পৃথিবী থেকে এই অধিত্যকাকে যেন আড়াল করে রেখেছে প্রকৃতি, আর

কোথাও এত চমৎকার প্রাকৃতিক সুরক্ষা দেখেছি কি না সন্দেহ। এখন যে রাস্তা ধরে উঠছি আমরা, দেখেই বোঝা যায়, অনেক আগের কোনো বন্যার কারণে মূল সমতলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাস্তাটা। এককালে এই পুরো পার্বত্য এলাকাকে হয়তো ঘিরে রেখেছিল বড় কোনো হ্রদ, আর সেই হ্রদের পানি উপচিয়েই বন্যা হয়েছিল। হ্রদটা আছে এখনও, তবে আগের মতো বিশাল নেই আর—লম্বায় বিশ মাইল আর প্রস্থে দশ মাইলের মতো হবে বলে অনুমান করলাম।

রাস্তাটা বেশ চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে প্রথম এক বা দু'মাইলের মতো। বন্ধুর নয়, তাই চলতে কষ্ট হয় না; মনে আছে যে-রাতে ফাংদের শহরে আমার ছেলেকে দেখি, সে-রাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হই এই রাস্তায় এবং ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া এই রাস্তা ধরে এগোতে তেমন কোনো কষ্ট হয়নি আমার ঘোড়ার। কিন্তু ফাংদের কবল থেকে পালাতে পারলেও একদল ক্ষুধার্ত সিংহের কবল থেকে বাঁচতে পারিনি—এই রাস্তারই এক জায়গায় আমার ঘোড়ার উপর হামলে পড়ে জন্তুগুলো, আমি কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচি কিন্তু ওদের খোরাকে পরিণত হয় অসহায় প্রাণীটা। যা-হোক, খেয়াল করলাম, ঠিক ওই জায়গা থেকেই পাল্টে গিয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে রাস্তাটা। ক্রমশ সরু হয়ে গেছে; কখনও কখনও এত বেশি সরু যে, দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারবে না। দু'পাশে শত শত ফুট উঁচু পাহাড়ি দেয়াল। এই জায়গা দিয়ে চলতে চলতে উপরের দিকে তাকালে নীল একটা ফিতার মতো মনে হয় আকাশটাকে, আর নীচের দিকে তাকালে অন্ধকার দেখায় রাস্তাটা। জায়গায় জায়গায় ঢাল, সেসব ঢালের কোনো কোনোটা এত বেশি খাড়া যে, পিঠে বোঝা নিয়ে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে মালবাহী জন্তুগুলোর। দেখা গেল, আমাদেরকে পিঠে নিয়ে এরকম এক ঢাল বেয়ে উঠতে পারছে না উটগুলো, তখন

আবাটিদের ধার-দেয়া ঘোড়ায় চাপতে হলো—পাহাড়ি এই পথের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় আছে ঘোড়াগুলোর। যত এগোচ্ছি গতি তত কমছে আমাদের, কারণ পর্বতের অনেক উঁচু একটা কিনারা এসে মিশেছে রাস্তার সঙ্গে, বিস্তৃত কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা বাঁক তৈরি হয়েছে। এখান দিয়ে এগোনো যেমন কঠিন তেমনই এগোতে এগোতে হঠাৎ পিছানোটাও দারুণ মুশকিলের কাজ, কারণ বাঁকগুলো কোনো কোনো জায়গায় আয়তক্ষেত্রের কোণের রূপ ধারণ করেছে। ওই কোণগুলোতে জনা বারো লোক দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে বাধা দিলেই আটকে যাবে বিশাল এক সেনাবাহিনী। বেশ কয়েক জায়গায় কয়েকটা সুড়ঙ্গ পার হতে হলো আমাদেরকে, তবে আপাতদৃষ্টিতে সুড়ঙ্গগুলো ঠিক প্রাকৃতিক বলে মনে হলো না আমার কাছে।

প্রাকৃতিক বাধাগুলোর কথা তো বললাম, ফাংদের ঠেকানোর জন্য আবাটিরা কী করেছে বলি এবার। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর মজবুত তোরণ বানিয়ে রেখেছে তারা, দেখতে অনেকটা হারম্যাকের সেই তোরণের মতো যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি, কুইক আর অলিভার। সবগুলো তোরণের উপরে টাওয়ার আছে, দিন-রাত প্রহরী মোতায়েন করা থাকে সেখানে। কোনো কোনো তোরণের সামনে গভীর পরিখা খনন করা আছে, বসানো আছে টানাসেতু; ওই সেতু ছাড়া ওসব পরিখা পার হওয়া এককথায় অসম্ভব।

ঘুরে আসার আরেকটা রাস্তা আছে, যেমনটা বলেছিল শ্যাডর‍্যাক, কিন্তু বিশাল এক জলাভূমি পার হয়ে উঠে আসতে হয় ওই রাস্তায়; অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে ওই জলাভূমি পার হওয়া সম্ভব নয়। পার হতে গেলে চোরাবালিতে ডুবে মরতে হবে নির্ঘাত, আর যদি আসতেও পারে তা হলে পর্বতের উপরে থাকা আবাটিদের তীর-ধনুকের সহজ শিকারে পরিণত হতে হবে।

ফাংরা কেন বার বার চেষ্টা করেও মুর দখল করতে পারেনি বুঝতে পারলাম।

আবাটিদের প্রাকৃতিক এই "রক্ষাপ্রাচীর" থেকে চোখ সরিয়ে তাকালাম নিজেদের দিকে। শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, অদ্ভুত এক শোভাযাত্রা হয়েছে আমাদের। প্রথমেই আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবাটি সৈন্য, যাদের বেশিরভাগই ঘোড়সওয়ার; বহু বর্ণে বর্ণিল হয়ে লম্বা লাইন করে এগিয়ে চলেছে ওরা, সূর্যের আলোয় চকচক করছে ওদের ধাতব বর্মগুলো। শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই ওদের মধ্যে, তাই নিজেরা নিজেরা বকবক করতে করতে পথ চলছে; ওদের সেই বকবকানিতে মুখরিত হয়ে গেছে পুরো এলাকা। তারপর আরেকদল ঘোড়সওয়ার, এদের সবার হাতে ঝকঝকে বর্শা। এই ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ঠিক মাঝখানে রানি ওয়ালদা নাগাসটা আর আমরা তিন জন। রানির সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সভাসদ এবং সেনাবাহিনীর কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সবার পিছনে পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা, যাদের কাজ হলো চলতে চলতে নির্দিষ্ট সময় পর পর পিছন ফিরে দেখা এবং চিৎকার করে বলা কেউ পিছু নিয়েছে কি না আমাদের।

বেশিরভাগ আবাটির মুখে হাসি—যেন এইমাত্র ফাংদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতেছে কিংবা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ছিনিয়ে এনেছে আমাদের তিন জনকে ওই বর্বরদের হাত থেকে। কিন্তু হাসি নেই আমাদের মুখে। আসলে যে-কোনো কারণেই হোক পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারছি না আমরা কেউই। ফাংদের হাতে ধরা পড়েছে হিগস, ওর কী অবস্থা করেছে ওরা জানি না। আর কোনোদিন দেখতে পাবো কি না আমার ছেলেটাকে তা-ও জানা নেই। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই এতদূর আসতে পেরেছে অলিভার, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিস্ফোরণের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি বেচারা, যত সময় যাচ্ছে তত দুর্বল

হয়ে পড়ছে সে। জ্ঞান হারিয়ে জিন থেকে পড়ে গিয়ে যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না-যায় সেজন্য ওর দু'পাশে দু'জন ঘোড়সওয়ার নিযুক্ত করে দিয়েছেন রানি মাকেডা।

চুমকি বসানো নেকাব পরে আছেন রানি, তাই তাঁর চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি না স্পষ্ট। তারপরও তাঁর দেহভঙ্গিতে এমন কিছু একটা প্রকাশ পাচ্ছে যা থেকে বুঝতে পারছি চরম লজ্জা আর হতাশা কাজ করছে তাঁর ভিতরে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে, কুঁজো হয়ে গেছে পিঠ। তাঁর কিছুটা পিছনে, এক পাশে আছি আমি; মনে হয় অলিভারের ব্যাপারেও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি। কারণ ইতোমধ্যেই একাধিকবার ঘুরে তাকিয়েছেন অলিভারের দিকে, যেন প্রত্যেকবারই বুঝতে চেয়েছেন কেমন আছে আহত লোকটা। আরেকটা কথা, আমি নিশ্চিত, যশুয়া আর ওর সাঙ্গপাঙ্গ, যারা ঘিরে ধরেছিল রাজা বারুংকে, তাদের উপর এখনও ক্ষুব্ধ তিনি। কারণ যশুয়াকে কয়েকবার দেখলাম আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে রানি মাকেডার সঙ্গে, কিন্তু একবারও ওর কোনো কথার জবাব দেননি রানি, বরং এমন ভঙ্গি করেছেন যেন দেখতেই পাননি কাপুরুষটাকে। আরেকবার তাঁকে কী যেন বলল যশুয়া, জবাবে শরীরটা শুধু সোজা করলেন তিনি জিনের উপর, কিন্তু কিছুই বললেন না।

যশুয়ার মেজাজটাও খুব একটা ভালো বলে মনে হলো না আমার কাছে। কিন্তু ওর পিঠের ব্যথাটা বোধহয় সেরে গেছে। কারণ চলতি পথে খাড়া একটা ঢাল পার হওয়ার সময় ঘোড়া থেকে সহজেই নামতে পারল সে, এবং ঘোড়ার পিছন পিছন সহজভঙ্গিতে হেঁটে গেল বেশ কিছুদূর। ওর অধীনস্থ কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে এলেই খেঁকিয়ে উঠল সে এবং চাপাকণ্ঠে গালও দিল কয়েকবার। আর আমাদের সঙ্গে কোনো কথাই বলল না, বলার দরকারও ছিল না অবশ্য; এমন দৃষ্টিতে আমাদের, বিশেষ করে কুইকের দিকে বার বার তাকাল যে, দৃষ্টি দিয়ে যদি কাউকে

খুন করা যেত তা হলে বোধহয় আমরা তিন জনই কয়েকবার করে মরতাম মুরের প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছানোর আগে।

যে-গিরিপথ ধরে এগোচ্ছিলাম আমরা, এই দরজাটা আসলে সেই পথের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত প্রাকৃতিক একটা সুড়ঙ্গবিশেষ। আমাদের সামনে, নীচে পর্বত-ঘেরা সুবিস্তৃত সমতলভূমি; সূর্যের আলোয় দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। বলতে গেলে আমাদের পায়ের নীচেই মুর শহরটা, তাল আর অন্যান্য গাছের কারণে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না, তবে আয়তনে যে খুব একটা ছোট নয় তা বোঝা যাচ্ছে। সবগুলো বাড়ির ছাদ সমতল, সেগুলো ছোট বা বড় যে-রকমই হোক না কেন, এতদূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে শহরটা যেন একটা বাগান আর বাড়িগুলো একেকটা ফুলগাছ। ফাংদের মতো রক্ষাপ্রাচীর তৈরি করতে হয়নি বলে পুরো জায়গাটা আরও বেশি প্রাকৃতিক, আরও বেশি সুন্দর লাগছে। শহর ছাড়িয়ে উত্তরদিকে, দিগন্তের যত দূরে চোখ যায়, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে বিশাল সেই হ্রদের সঙ্গে মিশেছে জমি। উজ্জ্বল সূর্যালোকে চিকচিক করছে পানি, পাশেই ফসলের ক্ষেত। ওখানে, শহরের উপকণ্ঠে, একটা-দুটো বিচ্ছিন্ন বাড়ি এবং ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাম।

আবাটিদের দোষ যা-ই হোক না কেন, পূর্বপুরুষদের মতো তারাও যে খুব ভালো কৃষক সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ওদের ক্ষেতগুলোর দিকে একবার তাকালেই যে-কেউ বলবে কথাটা। "দেশের" বাইরের লোকদের সঙ্গে কোনো লেনদেন নেই ওদের, তাই দেশকে নিয়েই যত আগ্রহ ওদের, বলা ভালো দেশের ফসলী জমিগুলোই ওদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বোঝাই যায়, যেহেতু মুরের বাইরে বসতি স্থাপন করতে পারেনি ওরা সেহেতু এখানে যার যত জমি তার তত ক্ষমতা, যার জমির পরিমাণ কম তার দামও কম, আর যার কোনো জমি নেই সে বলতে গেলে ক্রীতদাসের মতো দিন কাটায়। দেশটার নিজস্ব

আইন আছে, বিনিময়-প্রথা আছে, তবে কোনো মুদ্রা-ব্যবস্থা নেই। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ফসল বা অন্য কোনো উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করে ওরা। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কখনও আবার কাজে লাগায় ঘোড়া, উট অথবা একর একর ফসলী জমি।

প্রকৃতি যখন যাকে কিছু দেয়, এত বেশি পরিমাণে দিয়ে ফেলে যে, অন্য কেউ দেখলে মনে করে এত দেয়ার কী দরকার ছিল। প্রাকৃতিক রক্ষাপ্রাচীর, অতি উর্বর ফসলী জমি আর অপার সৌন্দর্য তো আছেই, আরও একটা মহামূল্যবান সম্পদ আছে মুরের—সোনা। আর শুধু সোনাই নয়, অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও পাওয়া যায় এখানে, প্রচুর পরিমাণে। হিগস একবার বলেছিল, প্রাচীন মিশরীয়রা এখান থেকে বছরে যে পরিমাণ বুলিয়ন তুলত, তার দাম নাকি কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ডের সমান হবে! শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা মিথ্যা নয়, কারণ আমাদের চোখের সামনেই কাজ চলছে অনেক পুরনো কিছু সোনার-খনিতে, আর প্রায় প্রতিটা খনির বাইরে একেবারে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে তাল তাল সোনা।

মূল কাহিনিতে ফিরে আসি। শহরে ঢোকার শেষ বা প্রধান দরজার কাছে পৌঁছানোর পর যশুয়া, কাজ আর সাজ দেখলে যাকে আবাটিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলে মনে হয়, আরও সাহসী হওয়ার ব্যাপারে বার বার উপদেশ দিতে লাগল দ্বাররক্ষীদের। ওর কথা কতটা গুরুত্বসহকারে শুনল লোকগুলো জানি না, তবে দরজা খুলে দিল ওরা, ভিতরে ঢুকে উৎফুল্ল একদল জনতার মাঝে হাজির হলাম আমরা। দেখেই বোঝা যায় খুব খুশি সবাই—যেন যুদ্ধ জয় করেছি আমরা, আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত হয়েছে ওরা দলে দলে।

আমাদের মিছিলটা শহরতলীতে পৌঁছানোর পর আমাদের দিকে দৌড়ে এল অনেক মহিলা, যাদের কেউ কেউ দারুণ সুন্দরী, জড়িয়ে ধরল যার যার স্বামী বা প্রেমিককে। কোলের

বাচ্চাকে দু'হাতে উঁচু করে ধরল কেউ কেউ যাতে ঘোড়ায় বসে-থাকা বাবা চুমু দিতে পারে। আরও কিছুদূর এগোনোর পর হাজির হলো একদল শিশু, খুশিতে লাফাতে লাফাতে গোলাপ আর ডালিমফুল ছিটাতে লাগল আমাদের দিকে।

মনে মনে হাসলাম আমি। আবাটিদের এত আয়োজন কীসের জন্য? কী করেছে ওদের সৈন্যরা? জমকালো রণপোশাক পরে নেমেছে শহর থেকে, তিন ইংরেজকে বরণ করে এনেছে, আমাদের পিছু ধাওয়া করে এসেছিল ফাংরা, কিন্তু মারতে বা ছিনিয়ে নিতে পারেনি আমাদেরকে, বলতে গেলে স্বেচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ নিজেদের কৃতিত্বে আবাটিদের এই দেশে হাজির হয়েছি আমরা। তাতেই এত আনন্দ ওদের? সত্যি বললে, সফল এক কুচকাওয়াজ ছাড়া আর কিছুই করেনি ওদের সেনাবাহিনী।

'আমরা তো দেখি নায়ক হয়ে গেছি!' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে মন্তব্য করল কুইক।

প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে চলল আমাদের শোভাযাত্রা। শেষপর্যন্ত শহরের মাঝখানের বিশাল এক খোলা জায়গায় এসে থামলাম আমরা। চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে বসিয়ে দিয়েছে শত প্রজাতির ফল আর ফুলের গাছ। খোলা জায়গাটার শেষমাথায় দাঁড়িয়ে আছে সাদা দেয়াল আর সোনালি-গিলটি-করা গম্বুজবিশিষ্ট বড় কিন্তু নিচু একটা ভবন। বিশাল এক পর্বতের খাড়া দেয়াল শুরু হয়ে গেছে ওই ভবনের ঠিক পিছন থেকেই। বাকি তিন দিকে পরিখা খনন করা হয়েছে নিরাপত্তার জন্য; খেয়াল করলাম, পরিখার মধ্যে টলমল করছে পরিষ্কার পানি।

এটাই রানির প্রাসাদ। এর আগে যখন এসেছিলাম মুরে, একবার কি দু'বার ঢুকতে পেরেছিলাম সেখানে, আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাজির করা হয়েছিল ওয়ালদা নাগাসটার সামনে। যা-হোক, রানির প্রাসাদ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে

বানানো হয়েছে আরও কিছু বড় বড় বাড়ি; দেখলেই বোঝা যায় মন্ত্রী অথবা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা থাকেন সেখানে। প্রতিটা বাড়ির সামনেই সুন্দর সুন্দর বাগান। খোলা জায়গাটার পশ্চিমপ্রান্তে একটা সিনাগগ, মানে ইহুদিদের মন্দির। মনে পড়ে গেল, জেরুযালেমে ওরকম একটা মন্দির আছে, তবে অনেক বড়; ওটার আদলেই ছোট করে বানানো হয়েছে মন্দিরটা।

প্রাসাদের দরজায় থামলাম আমরা। ঘোড়া হাঁটিয়ে রানি মাকেডার দিকে এগিয়ে গেল যশুয়া। আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই বিদেশিদেরকে কোথায় নিয়ে যাবো? অতিথিদের জন্য পান্থশালা আছে শহরের পশ্চিমপ্রান্তে, ওখানে?'

'না,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন রানি। 'সম্মানিত অতিথিদের থাকার জন্য অতিথি-কক্ষ আছে আমার প্রাসাদে, সেখানেই থাকবেন এঁরা।'

'অতিথি কক্ষে?' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল যশুয়া, বিশাল তুর্কি মোরগের মতো ওর শরীরটা ফুলে উঠল যেন, 'কিন্তু...এটা তো নিয়মবিরুদ্ধ। একটু ভেবে দেখুন, কাজটা করা কি উচিত হবে? আপনি এখনও অবিবাহিত। এমনকী আমিও থাকি না আপনার সঙ্গে, যদিও জানি থাকাটা উচিত, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য...'

'কে বা কারা আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে জানা হয়ে গেছে আমার। তা ছাড়া নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় সেটাও জানি আমি। এখন দয়া করে আর কথা বাড়াবেন না। আমার মনে হয় আমার এখন যতটা নিরাপদে থাকা দরকার, এই তিন বিদেশিরও ততটা নিরাপদে থাকা দরকার এবং তাঁদের মালসামানও রাখা উচিত এমন কোনো জায়গায় যেখান থেকে হারানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। ...চাচা, আপনি নিজেই বলেছেন আপনি নাকি গুরুতরভাবে আহত, আমার মনে হয় বাড়িতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়াটাই ভালো হবে আপনার জন্য। আমার রাজ-

চিকিৎসককে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, আপনার সমস্যার কথা খুলে বলবেন ওর কাছে। ...আপনি সেরে ওঠার পর আলোচনায় বসবো আমরা, আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার।' কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল যশুয়া, যাতে বলতে না-পারে সেজন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রানি, 'না, না, আমার প্রতি আপনার কত মমতা তা আর নতুন করে বলতে হবে না, আমি বুঝি। যান, তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন বিছানায়, আর মনে মনে হাজারবার ধন্যবাদ দিন ঈশ্বরকে। তাঁর কৃপায় কত বড় বড় বিপদ কত বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পেরেছেন আপনি। শুভরাত্রি।'

নিদারুণ এই উপহাসে যশুয়ার চেহারা পুরো ছাইবর্ণের হয়ে গেল। আবারও তুর্কি মোরগের কথা মনে পড়ে গেল আমার—পাখিটার লাল ঝুঁটি কখনও কখনও সাদা হয়ে যায়। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে প্রাসাদের খিলান-সদৃশ তোরণের ভিতরে পা রাখলেন রানি মাকেডা, তারপর দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন বেশ কিছুদূর। সুতরাং আমাদেরকে, বিশেষ করে কুইককে অভিশাপ দেয়া ছাড়া করার মতো আর কিছু থাকল না যশুয়ার। কিন্তু কপাল খারাপ ওর–আরবি ভাষা মোটামুটি জানে কুইক, তাই যশুয়া কী বলছে তা সহজেই বুঝতে পারল সে; এবং বোঝামাত্র খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর্। আর একটা বাজে কথা বলবি তো তোর দুই চোখ বের করে ফেলবো কোটর থেকে, মোটকু কোথাকার!'

ভাঙা ভাঙা আরবিতে দেয়া কুইকের এই ধমক বুঝতে পারল যে বা যারা, তারা ফেটে পড়ল হাসিতে।

এরপর কে কী বলেছিল ঠিক মনে পড়ছে না, কারণ একবার টলে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল অলিভার, আর ওকে ধরার জন্য একলাফে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমি। সুন্দর পোশাক পরা কয়েকজন ভৃত্য এসে হাজির হলো কখন যেন, আমার সঙ্গে ধরাধরি করে অলিভারকে ভিতরে নিয়ে গেল ওরা।

আমাদের জন্য বরাদ্দ-করা কামরায় হাজির হলাম। ঘরগুলো বড় বড়, ঠাণ্ডা; বিচিত্র রঙের আর সুন্দর নকশার চকচকে টালি চারদিকের দেয়ালে। যেসব আসবাব না-হলেই নয় শুধু সেই আসবাবগুলোই আছে; সবই ভারী কাঠের আর সুন্দরভাবে রঙ করা।

খেয়াল করলাম, প্রাসাদের এই অংশটা, গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্য কয়েকটা কামরা বানানো আছে যেখানে, মূল ভবন থেকে আসলে আলাদা। পৃথক একটা বাড়িই বলা যায়, কারণ চলাচলের আলাদা রাস্তা এবং আলাদা দরজা আছে; উপরন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্যাসেজ চোখে পড়েনি যেটা দিয়ে হাজির হওয়া যায় রানির প্রাসাদে। ছোট একটা বাগান আছে এই "অতিথি-ভবনের" সামনে। পিছনে প্রশস্ত উঠান, সেখানে ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি। একজন ভৃত্য জানাল ওই বাড়িগুলোর একটা নাকি আস্তাবল, আর আমাদের উটগুলো এনে রাখা হয়েছে ওখানে। রাত ঘনাচ্ছে, তাই আর তেমন কিছু চোখে পড়ল না; দেখার সুযোগও নেই, কারণ অলিভারের অবস্থা ভালো নয়।

সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, এমনকী আমাদের কাঁধে ভর দিয়েও হাঁটতে পারছে না। তারপরও আমাদের মালসামান নিয়ে চিন্তার শেষ নেই ওর। মালপত্র রাখার জন্য তামার দরজার একটা সিন্দুক পাঠানো হয়েছে আমাদের কাছে, যে অফিসাররা নিয়ে এসেছে তাদের সহায়তায় খুলে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। শুয়ে পড়ার জন্য বার বার তাগিদ দিলাম ওকে, কিন্তু আমাদের কথা কানেই তুলল না সে। উটের পিঠ থেকে লোক-মারফত মালপত্র নামিয়ে নিয়ে এসে কুইককে দিয়ে সব ঢুকাতে লাগল সিন্দুকের ভিতরে।

মাল তোলা শেষ হলে কুইককে বলল সে, 'গুনে দেখো তো, ঠিক আছে কি না।'

কামরার খোলা দরজার কাছে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক

অফিসার, লোকটার কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে এসে সিন্দুকের সামনে দাঁড়াল কুইক। তারপর গুনতে শুরু করল। কাজ শেষে বলল, 'ঠিকই আছে সব, সার। কোনো গরমিল নেই।'

'খুব ভালো,' বলল অলিভার। 'তালা মেরে চাবি রেখে দাও তোমার কাছে।'

কাজটা করা হয়ে গেলে আর সুযোগ দিলাম না অলিভারকে, ধরাধরি করে ওকে নিয়ে গেলাম বিছানায়। সে বলল, ওর মাথায় নাকি অসহ্য ব্যথা হচ্ছে এবং দুধ বা পানি ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবে না। লণ্ঠনের আলোয় আমার ডাক্তারিবিদ্যা প্রয়োগ করতে লাগলাম ওর উপর। কিন্তু ওর মাথায় গুরুতর কোনো ক্ষত দেখতে পেলাম না। সামান্য কাটাছেঁড়া আছে যা শুকিয়ে যাবে আপনাথেকেই। যখনই কোথাও যাই, ছোট্ট একটা ওষুধের-বাক্স থাকে আমার সঙ্গে; বাক্সটা খুলে একজাতের কড়া ঘুমের-ওষুধ বের করলাম, তারপর খাইয়ে দিলাম ওকে। বিশ মিনিটের মধ্যেই কাজ হয়ে গেল—মড়ার মতো ঘুমাতে শুরু করল অলিভার। কয়েক ঘণ্টার আগে ওর এই ঘুম ভাঙবে না।

হাতমুখ ধুয়ে নিলাম আমি আর কুইক। কিছু খাবার দেয়া হয়েছিল, খেতে বসে গেলাম দেরি না-করে। তারপর ঘুমাতে গেলাম আমি, আর অলিভারের কাছে জেগে বসে থাকল কুইক। ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল সে, হাতমুখ ধুয়ে গিয়ে বসলাম অলিভারের কাছে।

সকাল ছ'টার দিকে ঘুম ভাঙল অলিভারের। পানি খেতে চাইল, নিয়ে এসে দিলাম ওকে। তারপর আবার শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করল সে। জ্বর মাপলাম ওর—একশ' পাঁচ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল বেচারা। তবে একটানা ঘুমাতে পারল না আর, জেগে উঠতে লাগল একটু পর পর এবং প্রতিবারই ঘুম ভাঙার পর পানি খেতে চাইল।

ওর অবস্থা কেমন জানার জন্য রাতে দু'বার এবং সকালে একবার লোক পাঠালেন রানি মাকেডা। প্রত্যেকবারই বলে পাঠালাম, ভালো নয়। শেষে সকাল দশটার দিকে তিনি নিজেই হাজির হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সুবেশী দুই মহিলা, অনুমান করলাম তাঁর একান্ত সহচরী হবে হয়তো। লম্বা দাড়িওয়ালা এক বুড়োও আছে, এ-লোকটাই সম্ভবত রাজ-চিকিৎসক।

'ওঁকে একটু দেখতে পারি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন রানি।

তিনি আসছেন শুনে অলিভারের কামরা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাঁর প্রশ্নের জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'জী। কিন্তু আপনি বা আপনার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা কোনো আওয়াজ করতে পারবেন না, কারণ তাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে আমার বন্ধুর।' কথা শেষ করে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম তাঁদেরকে অলিভারের কামরায়।

ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। অলিভারের খাটের কাছে, মাথার পাশে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুইক। রানি ঢোকামাত্র তাঁকে স্যালুট করল সে নিঃশব্দে। জ্বরে লাল হয়ে আছে অলিভারের চেহারাটা, পোড়া বিস্ফোরক-পদার্থের কালো দাগ লেগে আছে কপালে; ওর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রানি। তখন দেখি, পানি চলে এসেছে তাঁর চোখে, পরম মমতায় দেখছেন তিনি অলিভারকে। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ঝড়ের গতিতে বের হয়ে গেলেন কামরা ছেড়ে। তাঁর পিছু পিছু গেলাম আমি।

দুই সহচরীকে চলে যেতে বলে আমার দিকে তাকালেন তিনি, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'তিনি কি বাঁচবেন?'

'জানি না,' সত্যি কথাটাই বললাম, কারণ তখন আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি অলিভারের অবস্থা এত খারাপ কেন। ওর কপালে কী আছে তা-ও জানা ছিল না আমার। 'বিস্ফোরণের ধাক্কাটা

সামলাতে পারেনি সে, সঙ্গে যোগ হয়েছে এত লম্বা পথ পাড়ি দেয়ার ক্লান্তি, আবার এসেছে জ্বর। কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে ওর খুলিতে যদি চিড় ধরে থাকে তা হলে...'

'ওকে বাঁচান,' কাতর কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন রানি, 'আপনি যা চান তা-ই দেবো...' কথা শেষ করার আগেই নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। 'ক্ষমা করবেন, আপনার মতো একজন উদার হৃদয়ের বন্ধুকে দেয়ার মতো আসলে কিছুই নেই আমার। আপনি ওঁর সত্যিকারের বন্ধু, জানি আমি কিছু না-দিলেও বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য যা যা করার দরকার তার সবই করবেন আপনি। দয়া করে ওঁকে বাঁচান আপনি।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করবো,' কথা দিলাম। 'তবে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারটা কিন্তু আমার হাতে না...' কথা শেষ করতে পারলাম না, কোনো একটা কারণে রানির সহচরীরা এগিয়ে এল তাঁর দিকে, সমাপ্তি ঘটল আমাদের আলোচনার।

রাজচিকিৎসকের কথাটা একটু বলি এই ফাঁকে। এখনও ওর কথা যতবার মনে পড়ে আমার, মনে হয় ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি যেন। ডাক্তারি বিদ্যার কিছুই জানে না, অথচ তারপরও লোকজনের চিকিৎসা করে এরকম যত লোক দেখেছি আমি তাদের সবার মধ্যে ওই বুড়ো এক নম্বরে। রানি চলে যাওয়ার পর আমার পিছনে লেগেই থাকল সে, কী কী ওষুধ দেয়া যায় অলিভারকে সে-ব্যাপারে পরামর্শ দিতে লাগল। কিন্তু যেসব ওষুধের কথা বলল সে, সেসব এমনকী মধ্যযুগের লোকরাও ব্যবহার করত কি না সন্দেহ আছে আমার। ওর পরামর্শগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ছিল অলিভারের জন্য সেটা বলি। বুড়ো বলল, সদ্যপ্রসূত কিন্তু মৃত কোনো বাচ্চা যোগাড় করতে হবে, তারপর বাচ্চাটার হাড়গুলো আলাদা করে গুঁড়ো করতে হবে। ওই হাড়চূর্ণের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে বানাতে হবে প্লাস্টার। তারপর এই প্লাস্টারের প্রলেপ দিতে হবে অলিভারের

মাথায়। সঙ্গে খাওয়াতে হবে মন্দিরের যাজকদের "পানি-পড়া"।

ভাগ্য ভালো, শেষপর্যন্ত খসাতে পারলাম বুড়োকে। তারপর আবার ফিরে গেলাম অলিভারের কামরায়, বসে পড়লাম ওর বিছানার পাশে। হতাশায় ভরে গেছে মন, অসহায় বোধ করছি, কারণ উন্নত চিকিৎসার অভাবে কাতরাচ্ছে আমারই বন্ধু, আর আমি ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সুস্থ করে তুলতে পারছি না ওকে। আরেকটা কথা স্বীকার করে নেয়া ভালো, আমার ডাক্তারিজ্ঞান কিন্তু সেকেলে। পাস করার পর পেশাজীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই মরুভূমিতে কাটিয়ে দিয়েছি, তাই আধুনিক বিজ্ঞান কোথায় গিয়েছে জানার সুযোগ পাইনি। আমার জায়গায় অন্য কোনো শহুরে ডাক্তার থাকলে হয়তো দেখামাত্র ধরতে পারত অলিভারের সমস্যাটা, আবাটিদের মতো অসভ্য উপজাতিদের মধ্যে থেকেও হয়তো ভালো কোনো ব্যবস্থা করতে পারত বেচারার জন্য।

তিনটা দিন কেটে গেল এভাবে। চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হলো দিনগুলো। যদিও কারও কাছে বলিনি এখনও, কিন্তু আমার মনে হয় অলিভারের খুলিতে সত্যিই চিড় ধরেছে। শেষপর্যন্ত ওকে বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। আর যদি না-ও মারা যায় সে, মস্তিষ্কে লাগা ওই আঘাতের কারণে পঙ্গু হয়ে কাটাতে হতে পারে ওকে বাকিটা জীবন। কিন্তু আশা ছাড়ল না কুইক। বলল এ-রকম রোগী নাকি আগেও দেখেছে সে। আরও বড় বোমার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল বেচারাদের; একজনের অবস্থা নাকি অলিভারের মতোই হয়েছিল, তবে আরেকজন সেরে উঠেছিল, কিন্তু কয়েকদিন পর নাকি মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয় লোকটার, তারপর থেকে নাকি একরকম উন্মাদের মতো দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু কুইকের কথায় নয়, আমার হতাশা কেটে গেল রানি মাকেডার কারণে। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার সময় এলেন তিনি অলিভারের কামরায়, কিছু সময়ের জন্য বসলেন ওর পাশে, তাঁর

boiboi.net

সহচরীরা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুটা দূরে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কামরা থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন রানি, এমন সময় দেখি, খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাঁর চেহারা; কৌতূহলের কাছে পরাজিত হয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম কী হয়েছে।

'তিনি বাঁচবেন,' জবাব দিলেন রানি।

'জানলেন কীভাবে?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ চোখ খুলে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন আমাকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন আমার চোখের রঙ কী। বললাম, একেক রঙের আলোয় একেক রকম লাগে। তিনি বললেন, না, আমার চোখ দুটো নাকি সবসময়ই নীল, একেবারেই অন্য রকম একটা রঙ, ভায়োলেটের মতো। ...আচ্ছা ডাক্তার অ্যাডামস, ভায়োলেট কী?'

'আমাদের দেশে বসন্তকালে একজাতের ফুল ফোটে। শহরে দেখা যায় না তেমন একটা, বনেজঙ্গলে জন্মায় বেশিরভাগ। দেখতে খুবই সুন্দর, আর ঘ্রাণটাও খুব মিষ্টি। ওই ফুলের নামই ভায়োলেট। গাঢ় নীল রঙ, অনেকটা আপনার চোখের মতো।'

'ফুলটা কোনোদিন দেখিনি আমি, দেখবো কি না তা-ও জানি না। কিন্তু তাতে কী? আপনার বন্ধু বাঁচবেন, আর সেটাই আসল কথা। একজন মুমূর্ষু লোক একজন নারীর চোখের রঙ নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঘামানোর অবকাশ নেই তার। আবার যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে অথবা স্মৃতি নষ্ট গেছে তারও কিন্তু কোনো রঙ দেখে বলতে পারার কথা না কোন্ ফুলের সঙ্গে মিল আছে ওই রঙের।'

'আপনি কি খুশি হয়েছেন, রানি?'

'অবশ্যই। আগুন নিয়ে কারবার আপনাদের, আর আমাকে বলা হয়েছে শুধু ওই লোকটাই নাকি পারে ওসব জিনিস নাড়াচাড়া করতে। কাজেই তিনি যদি বেঁচে উঠেন তা হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কে হতে পারে?'

boighar.net

'বুঝলাম। প্রার্থনা করুন যেন সত্যিই বেঁচে যায় সে। কিন্তু...একটা কথা বলি...আমার জানামতে আগুন বিভিন্ন রকমের হয়। যেসব আগুন থেকে গাঢ় নীল শিখা বের হয়, আমার বন্ধু কিন্তু সেসব আগুনের ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি। যে-আগুনের মোকাবেলা করেছে সে, দেখতেই পাচ্ছেন সে-আগুনের ধাক্কা সামলানো সম্ভব হতেও পারে, কিন্তু যে-নীল আগুনের কথা বলছি আমি, আমার বন্ধু কি পারবে ওই আগুনের ধাক্কা সামলাতে? এই দেশে ওই কাজটা কি খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে না ওর জন্য?'

কথাটা শোনামাত্র ঝট করে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন রানি। দেখলাম, রাগে লাল হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। ভাবলাম, কড়া কিছু কথা শুনতে হবে আমাকে, কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ করেই হেসে ফেললেন তিনি। কিছুই বললেন না, ইশারায় ডাকলেন সহচরীদের, তারপর বেরিয়ে গেলেন অতিথি-ভবন থেকে।

'মেয়েমানুষের মন, সার,' পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কুইক মন্তব্য করল হঠাৎ, কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে সে টের পাইনি, 'কী বলে বা করে ওরা বোঝা মুশকিল।'

'হুঁ! রানি যে-সুপটুকু নিয়ে এসেছিলেন অলিভারের জন্য, খেয়েছে সে?'

'খেয়েছেন মানে? এক ফোঁটাও বাকি রাখেননি। খাওয়া শেষে আবার চুমুও খেতে চেয়েছেন রানির হাতে। ...হায় রে দুনিয়া! মাথা ঘোলা হয়ে গেছে আমাদের ক্যাপ্টেনের, কী করতে কী করছেন তিনি নিজেও বোধহয় জানেন না ঠিকমতো। মাথা যখন পরিষ্কার হবে তাঁর তখন এসব ভেবে কী অবস্থা যে হবে বেচারার!'

'যাও, চাইলে ঘুরে আসতে পারো তুমি বাইরে থেকে। অলিভারের পাশে থাকছি আমি, এখন আমার পালা।'

অলিভারের জন্য রানি মাকেডার সুপ নিয়ে আসাটাই ছিল ওর

boiRboi.net

অসুস্থতার ক্রান্তিলগ্ন। ওই দিন থেকে দ্রুত সেরে উঠতে লাগল সে, দেখে আমার মনে হলো খুলিতে চিড় ধরার যে-শঙ্কা করেছিলাম সেটা আসলে ভুল। প্রতিদিন কয়েকবার করে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে লাগলেন রানি, বিশেষ করে বিকেলে তো অবশ্যই। কিন্তু যতবারই আসতেন সঙ্গে বেশ কয়েকজন সহচরীকে নিয়ে আসতেন, অর্থাৎ অলিভার আর রানির সাক্ষাতটা হতো সবসময়ই আনুষ্ঠানিক।

তবে সবসময়ই যে আনুষ্ঠানিক দেখা-সাক্ষাৎ চলে তাঁদের মধ্যে তা কিন্তু নয়। মোটামুটি সেরে ওঠার পর অলিভারকে নিয়ে গিয়ে দরবার-কক্ষে বসিয়ে দিলেন রানি; প্রায়ই দেখা যায় তাঁর সভাসদরা বসে আছেন কক্ষের একপ্রান্তে, আরেকপ্রান্তে অলিভারের পাশে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে খোশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন তিনি। অলিভার পুরোপুরি সেরে না-ওঠা পর্যন্ত করার মতো তেমন কিছু নেই আমাদের বুঝে প্রতিদিনই বেরিয়ে পড়ি আমি আর কুইক, শহরের ভিতরে-বাইরে ঘুরে বেড়াই।

অনেকেই হয়তো জানতে চাইবেন, কী নিয়ে কথা হয় রানি মাকেডা আর অলিভারের মধ্যে। আমি নিজেও স্পষ্টভাবে কিছু জানি না, তবে শুনেছি মুরের রাজনীতি এবং ফাংদের সঙ্গে ঘনিয়ে-আসা যুদ্ধের ব্যাপারে নাকি কথা বলেন দু'জনে। তবে আরও অনেক প্রসঙ্গ থাকতে পারে; আসলে কোনো জুটি যদি চায় মন খুলে কথা বলতে তখন প্রসঙ্গ কোনো ব্যাপার নয়। কথাটার সত্যতা টের পেলাম যখন দেখলাম রানির ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারে জানে অলিভার, যা শুধু তাঁর মুখ থেকেই শোনা সম্ভব ওর পক্ষে।

এমনিতে কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে দখল দেয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু অলিভার আমার খুব ভালো বন্ধু, এবং ভালো একটা মানুষ। আমি চাই না ওর কোনো ক্ষতি হোক। তাই একদিন সাহস করে বলেই ফেললাম, আবাটিদের মতো অনন্য

এক গোত্রের বংশানুক্রমিক শাসকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না ওর মতো ভিনদেশী এক যুবকের পক্ষে। হেসে উড়িয়ে দিল সে আমার কথা, বলল এটা কোনো ব্যাপারই না, কারণ রানিকে নাকি কোনোদিনই বিয়ে করতে পারবে না সে। আবাটিদের প্রাচীন নিয়মে আছে, বিয়ে করতে হলে নিজের পরিবারের কাউকেই বেছে নিতে হবে রানির, এর বাইরে তিনি যেতে পারবেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রানি মাকেডার অনেক চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুফাতো ভাই আছে শুনেছি। জানতে পারি, কে সেই সৌভাগ্যবান যাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তিনি?'

হাসল অলিভার। 'কেউই না। শুনলে চমকে উঠবেন হয়তো, আমার মনে হয় ওই মোটকু যশুয়ার সঙ্গে বাগদান হয়ে গেছে তাঁর; কিন্তু এসব আসলে লোক-দেখানো—ভাইদেরকে দূরে রাখার জন্যই কাজটা করেছেন তিনি।'

'বলো কী!' সত্যিই চমকে উঠলাম। 'যশুয়ার সঙ্গে? কিন্তু সে না...'

'হ্যাঁ, সে রানির চাচা, কিন্তু আবাটিদের মধ্যে চাচা-ভাতিজির বিয়ে হওয়াটা দোষের কিছু না।'

'কিন্তু...যশুয়া কি জানে অন্যদের দূরে রাখার জন্য ওর সঙ্গে বাগদানের নাটক করেছেন রানি?'

'সে কী জানে আর কী জানে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না দয়া করে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল অলিভার। 'আমি জানি আমার ধারণা ভুল না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, চীনের সম্রাজ্ঞীকে বিয়ে করার যতখানি সম্ভাবনা আছে আপনার, রানি শেবাকে বিয়ে করার ঠিক ততখানিই সম্ভাবনা আছে যশুয়ার। ...বাদ দিন এসব কথা। কপালে যা আছে হবে। কাজের কথায় আসুন। প্রফেসর হিগস বা আপনার ছেলের ব্যাপারে আর কিছু শুনেছেন?'

'এসব রাষ্ট্রীয় গোপন খবর তো আমার চেয়ে ভালো তোমার

জানা থাকার কথা। কী জানতে পেরেছ?'

'রানি কীভাবে খবরটা যোগাড় করলেন জানি না, তবে আমাকে বললেন দু'জনই নাকি ভালো আছে এবং ওদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করছে না ফাংরা। প্রফেসর হিগসকে বলি দেয়ার চিন্তা থেকে একচুলও সরেননি রাজা বারুং, আর পনেরো দিন পরে নাকি উৎসর্গ করা হবে তাঁকে। যেভাবেই হোক তাঁকে বাঁচাতে হবে আমাদের, যদি প্রয়োজন হয় নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। ...দয়া করে ভাববেন না সবসময় শুধু সুখস্বপ্নে বিভোর থাকি আমি, ওই দু'জনের কথা আমার মাথায় আছে। কিন্তু মুশকিল হলো, কীভাবে উদ্ধার করবো ওদেরকে সে-ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা করতে পারছি না।'

'কিন্তু পরিকল্পনা করতে হবে আমাদেরকে, সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সময় থেমে থাকবে না আমাদের জন্য।'

'আবাটিরা আমাদেরকে সাহায্য না-করলে কোনো আশা নেই বুঝতে পারছি। কিন্তু ওরা সাহায্য করবে বলে মনেও হয় না। এক কাজ করা যায়। প্রফেসর হিগসকে বলি দেবেনই রাজা বারুং, যদি ওর মৃত্যু ঠেকাতে না-পারি আমরা তা হলে আমাদের তিন জনের মধ্যে অন্তত একজন শামিল হতে পারি তাঁর সঙ্গে।'

তিন জনের একজন বলতে কাকে বোঝাচ্ছে অলিভার বুঝতে সময় লাগল না আমার।

'আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন নিজের কথাই বলছি আমি। হ্যাঁ, আমি গিয়ে আত্মসমর্পণ করবো রাজা বারুং-এর কাছে, নিজেকে তুলে দেবো তাঁর হাতে। যদি রক্ষা করতে না-পারি প্রফেসর হিগসকে, তা হলে তাঁর সঙ্গে অন্তত মৃত্যুযন্ত্রণাটা ভোগ করবো। ...শুনুন, আগামী পরশুদিন একটা মন্ত্রণাসভা ডেকেছেন রানি মাকেডা, ওই সভায় অংশগ্রহণ করতে হবে আমাদেরকেও। আরও আগেই হতো সভাটা, কিন্তু আমি সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন রানি। মূলত শ্যাডর্যাকের বিচার

করবেন তিনি সবার সামনে, এবং আমার বিশ্বাস মৃত্যুদণ্ড দেবেন শয়তানটাকে। ওই দিন আরেকটা কাজ করতে হবে আপনাকে–ফিরিয়ে দিতে হবে রানির আংটিটা, আপনার কাহিনি যাতে সহজেই বিশ্বাস করাতে পারেন সেজন্য প্রমাণ হিসেবে যেটা দিয়েছিলেন তিনি আপনাকে। যা-হোক, হয়তো ততদিনে কোনো একটা উপায় বের করে ফেলতে পারবো। ...এবার যদি অনুমতি দেন আমাকে, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই আমি। ...ফারাও,' নিজের কুকুরটাকে ডাকল সে, এই ক'দিন আদর্শ প্রভুভক্তের মতো সময় কাটিয়েছে জন্তুটা ওর বিছানার পাশে বসে থেকে, 'চল্। গায়ে বাতাস লাগিয়ে আসি।'

নয়

অলিভারের সঙ্গে আমার এই কথোপকথনের দুই কি তিন দিন পর, রাজপ্রাসাদের বিশাল দরবারকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রানি মাকেডার ওই সভা। অনেকদিন আগের ঘটনা, তাই সময়ের হিসেবটা ঠিকমতো মনে নেই আমার। যা-হোক, রক্ষী-পরিবেষ্টিত হয়ে দরবারে ঢুকি আমরা। নিজেদেরকে কয়েদি বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে। দেখলাম, কয়েকশ' আবাটি জড়ো হয়েছে দরবারকক্ষে; সারি করে সুশৃঙ্খলভাবে বসানো আছে বেঞ্চ, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ওরা নিজেদের জন্য। দরবারের একপ্রান্তে গম্বুজাকৃতির ছাদবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার একটা জায়গা আছে, সেখানে সোনার একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন রানি মাকেডা। চেয়ারটার দুই হাতলের প্রান্তভাগে দুটো সিংহের মাথা

খোদাই করা। রূপার কাজ করা চকচকে একটা গাউন পরে আছেন তিনি, রূপার তারা খচিত সুন্দর একটা নেকাবে ঢেকে রেখেছেন চেহারার অর্ধেকটা। তাঁর কপালে, একগুচ্ছ কালো চুলের উপরে দেখা যাচ্ছে সোনার একটা বলয়, যার মাঝখানে চমকাচ্ছে একটামাত্র রত্ন, দূর থেকে দেখে চুনি বলে মনে হলো আমার। বেঁটে হলেও রানি অনিন্দ্যসুন্দরী; এত দামি আর সুন্দর পোশাকে তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও বেশি করে প্রকাশিত হচ্ছে, একনজর দেখেই যে-কেউ বলে দিতে পারবে তিনি সম্ভ্রান্ত কেউ। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হলো তাঁর নেকাব–নরম আর মিহি ওই নেকাবের কারণে অদ্ভুত এক রহস্যময়তায় ঢেকে গেছে তাঁর চেহারা।

রানির সিংহাসনের পিছনে বর্শা আর তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সৈন্য–তাঁর দেহরক্ষী। আসনের দু'পাশে, বেশ কিছুটা দূরে, যাঁর যাঁর চেয়ারে বসে আছেন রানির সভাসদরা। এঁদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়–একশ'র মতো হবে। রানির দু'পাশে তাঁর সহচরীরা, এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, দেখতে পুতুলের মতো লাগছে সবাইকে। একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, যার যার পেশা আর পদ অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর অভিজাত পোশাক পরে আছে প্রত্যেকে।

রাজা নরম্যানের আমলের শিকলের বর্ম পরে এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে যশুয়া, সঙ্গে কয়েকজন সেনাপতি আর ক্যাপ্টেন। কালো রোব পরা কয়েকজন জজকেও দেখতে পেলাম, দেখা গেল কয়েকজন যাজককেও। কয়েকজন লোককে আবার দেখলাম উঁচু সোলের বুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। পরে জানতে পারি এরা নাকি মুরের বড় বড় জমিদার।

যথেষ্ট সম্মান করে রানির সামনে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদেরকে। গম্বুজাকৃতির ছাদবিশিষ্ট এবং সিডার-কাঠের কলামযুক্ত যে-অর্ধবৃত্তাকার জায়গায় তিনি বসে আছেন, হাঁটতে

হাঁটতে যখন সেদিকে এগোচ্ছিলাম আমরা, তখন গুরুগম্ভীর বাজনা বাজাচ্ছিল বাদকদল। সিংহাসনের সামনে অনেকখানি জায়গা উন্মুক্ত, সেখানে গিয়ে থামলাম আমরা। যারা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদেরকে, রানির সামনে দাঁড়ানোমাত্র প্রাচ্যদেশীয় কায়দায় একযোগে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করল তাদের সবাই। আর আমরা আমাদের দেশীয় কায়দায় স্যালুট করলাম রানিকে। বসার জন্য চেয়ার দেয়া হলো আমাদেরকে। কিছুক্ষণ পর আবারও বেজে উঠল ট্রাম্পেট, পাশের কোনো একটা কক্ষ থেকে হাজির করা হলো আমাদের ভূতপূর্ব পথপ্রদর্শক শ্যাডর‍্যাককে। মোটা শিকলে হাত-পা বাঁধা ওর, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে।

বিচার শুরু হলো ওর। একঘেয়ে ওই বিচারকাজের বর্ণনা দিতে চাই না, দেয়ার দরকারও নেই, শুধু এটুকু বলি, অনেকক্ষণ সময় লাগল, আমাদের তিন জনকেও ডাকা হলো সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। ফারাওকে নিয়ে প্রফেসর হিগসের সঙ্গে যে-ঘটনাটা ঘটিয়েছিল শ্যাডর‍্যাক, বললাম সেটা বিস্তারিতভাবে। এরপর একে একে হাজির করা হলো শ্যাডর‍্যাকের চামচাগুলোকে, মুরে আসার পথে আমাদের সঙ্গে ছিল যারা। ওরা প্রথমে কিছু বলতে চাইল না, কিন্তু যখন বলা হলো কথা গোপন করলে চাবুকের বাড়ি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না কপালে, তখন খই ফুটল একেকজনের মুখে।

কসম খেয়ে বলল এদের সবাই, ফাংদের হাতে হিগসের ধরা পড়ার ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত। কেউ কেউ বলল, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শ্যাডর‍্যাক—ফাংদের সঙ্গে নাকি আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল ওর। ঝোপঝাড়ে আগুন লাগিয়ে আমাদের পৌঁছানোর খবর আবাটিদেরকে নয়, বরং ফাংদেরকে জানিয়েছিল সে। আর শুধু হিগসকেই নয়, ফাংদের হাতে আমাদের চারজনকেই ধরিয়ে দেয়ার মতলব ছিল ওর এবং

আমাদের রাইফেল আর ডিনামাইটবহনকারী উটগুলো চুরি করে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার ফন্দিও নাকি করেছিল সে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে জোর গলায় বলল শ্যাডর‍্যাক, ওর বিরুদ্ধে করা প্রতিটি অভিযোগই নাকি বানোয়াট। তবে স্বীকার করল, হিগসকে ওর উটের পিঠ থেকে জোর করে নামিয়েছে সে, কারণ ফাংদের ভয়ে তখন নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর, আর যে-উটের পিঠে চেপে সে নিজে যাচ্ছিল যে-কোনো কারণেই হোক গুরুতরভাবে আহত হয়ে গিয়েছিল জন্তুটা, আর চলতে পারছিল না।

কোনো কাজে লাগল না ওর এই সাফাই গাওয়া। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে রানি মাকেডার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন কালো-রোব-পরা একজন বিচারক, তারপর শ্যাডর‍্যাককে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে ঘোষণা করলেন, খুবই নিষ্ঠুর উপায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ওকে। শুধু তা-ই নয়, সহায়-সম্পত্তি বলতে যা কিছু আছে ওর, তার সবই দখল করে নেবে মুরের সরকার; ক্রীতদাসের মতো বাকি জীবন কাটাবে ওর স্ত্রী আর সন্তানরা। নিচুমানের যত কাজ আছে সেনাবাহিনীতে, সেসব কাজ করবে ওর ছেলেরা, আর সৈন্যদের মনোরঞ্জন করতে হবে ওর স্ত্রীকে।

আমাদেরকে ফাংদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে শ্যাডর‍্যাকের সঙ্গে আর যারা জড়িত ছিল, তাদের সহায়-সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং বাকি জীবন নিম্নপদস্থ-চাকর হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করে যাওয়ার দণ্ড দেয়া হলো তাদেরকে। যাদের শাস্তি ঘোষণা করা হলো তাদের পরিবারের লোকজন আর বন্ধুবান্ধবরাও উপস্থিত ছিল দরবারকক্ষে; রায় শোনামাত্র একযোগে বিলাপ করতে শুরু করে দিল তারা।

মূল কাহিনি থেকে সরে গিয়ে কিছু কথা বলবো এখানে। ওই

লোকগুলোর বুকফাটা আর্তনাদ স্পর্শ করেছিল আমাকে, সভ্য জগৎ থেকে সামাজিকভাবে কতখানি পিছিয়ে আছে আবাটিরা বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন। পথ দেখিয়ে ঘুরে নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের উপর হামলা চালানো হলে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল শ্যাডর‍্যাক আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে ফাংদের সঙ্গে হাত মেলায় ওরা, তাই উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে ওদের সবাই; কিন্তু শ্যাডর‍্যাকের স্ত্রী বা সন্তানরা কী দোষ করেছে? স্বামী বা বাবার অপরাধে কেন শাস্তি পেতে হলো ওদেরকে? ওদের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে ওদেরকে নিঃস্ব বানিয়ে দিয়ে কেন ওদেরকে ঘৃণ্য কাজের দিকে ঠেলে দিল সরকার?

বিচার শেষ; নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্যাডর‍্যাককে, আর কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে চিৎকার করে আমাদের করুণা ভিক্ষা করছে সে। ওর সেই কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাত করল না কেউ। কমে গেছে জনতার ভিড়, যার যার কাজে চলে যাচ্ছে সবাই। এখন একে একে নাম ধরে ডাকা হচ্ছে রানির মন্ত্রণাপরিষদের সদস্যদেরকে। সবাই আসার পর আমাদের তিন জনকেও থাকতে অনুরোধ করা হলো, বসার জন্য জায়গা করে দেয়া হলো আগের মতো।

চুপ করে আমাদের তিন জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সবাই। তারপর একজনকে কিছু একটা ইশারা করলেন রানি। তখন একটা কুশন নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। আগেই বলা হয়েছিল আমাকে, তাই লোকটা কাছে আসার পর রানি মাকেডার আংটিটা পকেট থেকে বের করে রাখলাম কুশনের উপর। রানির কাছে আংটিটা নিয়ে গেল লোকটা।

'রানি,' বললাম আমি, 'প্রমাণ হিসেবে প্রাচীন ওই আংটিটা ধার দিয়েছিলেন আপনি আমাকে, এবার ফিরিয়ে নিন সেটা। আমাদের যে-ভাই আজ বন্দি হয়ে আছেন ফাংদের হাতে, ওই

আংটিটা দেখিয়েই এখানে আসতে রাজি করিয়েছিলাম তাঁকে। আর তিনি রাজি হয়েছিলেন বলেই পুরো অভিযানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন অলিভার ওর্ম, মানে আমাদের নেতা। আর অলিভার এসেছে বলে সার্জেন্ট কুইকও এসেছে আমাদের সঙ্গে।'

আংটিটা নিলেন রানি, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর উপস্থিত কয়েকজন যাজককে দেখালেন। চিনতে পেরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন সবাই।

'সত্যি বলতে কী,' মুখ খুললেন রানি, 'আংটিটা আপনাকে দেয়ার সময় কিছুটা ভয়ই পেয়ে যাই আমি, মনে সন্দেহ জাগে আর কোনোদিন ফিরে পাবো কি না। এখানে আসার সময় অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে আপনাদের উপর দিয়ে, তারপরও আগলে রেখেছেন আপনি আংটিটা এবং নিরাপদে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

নিজের হাতের যে-আঙুল থেকে খুলে নিয়ে আংটিটা দিয়েছিলেন তিনি আমাকে বেশ কয়েক মাস আগে, এখন সে-আঙুলে পরলেন আবার।

তারপর রাজকীয় ঢং-এ চিৎকার করে ঘোষণা করল একজন অফিসার, 'ওয়ালদা নাগাসটা এখন কথা বলবেন!'

ওর সঙ্গে গলা মেলাল উপস্থিত সবাই, 'ওয়ালদা নাগাসটা এখন কথা বলবেন!'

কোমল আর মোহনীয় কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন রানি, 'বিদেশি অতিথিরা, ফাংদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ব্যাপারে সবই জানেন আপনারা। আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে ওরা এবং আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়। বছরখানেক আগে আপনাদের একজন এসেছিলেন এখানে, তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ধ্বংসের আগুন আর যে বা যারা সে-আগুন জানে-বোঝে তাদেরকে নিয়ে এখানে ফিরে আসতে যাতে

ফাংদের সেই বিশাল আর প্রাচীন মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। কারণ লোকে বলে, ওদের ধর্মের নিয়ম হলো, মূর্তি যদি কোনো কারণে ভেঙে যায় বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ওই এলাকায় আর থাকে না ওরা, অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যায়।'

'মাফ করবেন, রানি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল অলিভার, 'আপনার কথার মাঝখানে কথা বলছি। রাজা বারুং কিন্তু অন্য কথা শুনিয়ে গেছেন আমাদেরকে। ওদের দেবতা হারম্যাকের মূর্তিটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলেও নাকি এখানে থাকবে ওরা, যতদিন না সব আবাটিকে মেরে প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ হয় ওদের।'

অলিভারের কথাগুলো শুনে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রানির সভাসদদের, ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন তাঁরা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন রানি, কম্পনের কারণে টুংটাং আওয়াজ শোনা গেল তাঁর রূপার-ঝালর-বসানো পোশাক থেকে।

'ওদের ধর্মের যে-নিয়ম আমার জানা আছে সেটাই বলেছি আপনাদেরকে,' বললেন তিনি, 'কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্মের সব নিয়ম সবসময় মানা হয় না। আমার মনে হয়, হারম্যাকের জঘন্য ওই মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে ফাংদের মনোবলও, এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে ওরা। ভূমিকম্প ভয় পায় ওরা, বলে এটা নাকি খুব খারাপ একটা দেবতা; আজ থেকে পাঁচশ' বছর আগে এই পর্বতঘেরা মুর ছিল ওদেরই দখলে, একদিন ভূমিকম্প হয় আর বাড়িঘর সব ফেলে রাতারাতি সমতলভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয় ওরা, যুক্তি দেখায় দেবতা হারম্যাককে বাঁচাতে নাকি ওর কাছাকাছি গেছে।'

'ইতিহাস সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা নেই আমার,' স্বীকার করল অলিভার। 'তবে আমাদের যে-ভাই আজ ফাংদের হাতে বন্দি, তিনি যদি থাকতেন এখানে তা হলে অনেক কিছু বলতে

পারতেন। বর্বর...মানে, সভ্যতার স্পর্শবঞ্চিত লোক আর তাদের দেবতা-পূজা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা আছে তাঁর।'

'কিছু মনে করবেন না,' বললেন রানি, 'আজ কারও পাণ্ডিত্য আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। আজ আমাদের সামনে একটাই প্রশ্ন—হারম্যাকের মূর্তি আমরা ধ্বংস করবো কি করবো না। যদি প্রশ্নটার উত্তর হ্যাঁ হয় তা হলে আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন কি না?'

যে-কোনো কারণেই হোক, উত্তর দিতে দ্বিধা করছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে ব্যঙ্গ করে মোটা গলায় বলে উঠল যশুয়া, 'আপনার অতিথিরা মনে হয় পুরস্কারের ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে আরেকবার আশ্বাস না-পাওয়া পর্যন্ত কাজে হাত দিতে চাচ্ছে না। শুনেছি পশ্চিমের লোকরা নাকি খুব লোভী হয়; যে-সোনার বলতে গেলে কোনো দামই নেই আমাদের কাছে, ওরা নাকি সে-সোনার জন্য পাগল। ...ভালো হয় যদি ওদেরকে পুরস্কারের ব্যাপারটা আবার বলে দেন, রানি।'

বিরক্তি নিয়ে যশুয়ার দিকে তাকালেন রানি। 'সোনার দাম নেই আমাদের কাছে—কথাটা কে বলল আপনাকে? নাকি নিজে নিজেই বানিয়েছেন? স্বর্ণালঙ্কারের ব্যাপারে ঘৃণ্য ইতিহাস আছে আমাদের, ভুলে গেছেন? নিরীহ মিশরীয়দের কাছ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে সোনার গহনা লুট করে নিয়েছিল মনে নেই? দক্ষিণ-পূর্ব আরবের "ওফির" নামের দেশটার সঙ্গে আমাদের বাপ-দাদারা কি সোনার ব্যবসা করত না? ...আপনার অনেক আত্মীয় তো দেবতাদের মূর্তি বানিয়ে পেট চালায়; ওরা কি মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়, না সোনা দিয়ে?'

রানির একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না যশুয়া, চুপ করে তাকিয়ে থাকল মাটির দিকে।

'সত্যি বলতে কি,' বলে চললেন রানি, 'আমাদের এখানে সোনার মজুদ তেমন একটা নেই। কারণ ফাংদের দ্বারা আমরা

অবরুদ্ধ, তাই কারও সঙ্গে ব্যবসা করার উপায় নেই। গহনা বানিয়ে পরা ছাড়া বলতে গেলে আর কোনো কাজে লাগে না আমাদের সোনা। তা না হলে পৃথিবীর অন্য সব দেশে যেমন দাম দেয়া হয় সোনাকে, আমরাও তেমন দাম দিতাম। এবং ফাংদের কবল থেকে যদি মুক্তি পেতে পারি তা হলে আবারও সোনার ব্যবসা শুরু করবো আমরা।'

'আপনার কথার মানে কী?' খেঁকিয়ে উঠল যেন যগুয়া। 'আপনার অতিথিদের কি তা হলে সোনার কোনো লোভই নেই? পুরস্কারের কোনো দরকার নেই তাদের?'

'কে বলেছে দরকার নেই?' রেগে গেছে অলিভার। 'আমরা এখন বলতে গেলে ভাড়াটে সৈনিক। পুরস্কারের দরকার আছে বলেই তো নিজেদের দেশ আর কাজ-কারবার ফেলে আপনাদের দেশে আপনাদের হয়ে লড়তে এসেছি। আমাদের এক ভাই আজ আপনাদের শত্রুদের হাতে বন্দি, খরচের খাতায় ধরে নেয়া যায় তাঁকে, দেশে গরিব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁর, কাজেই এখান থেকে যদি কিছু পুরস্কার পেয়ে দেশে ফিরে যেতে পারি এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তুলে দিতে পারি ওই লোকগুলোর হাতে, তা হলে অসুবিধাটা কোথায়? আর আমাদের মধ্যে কেউই কিন্তু তেমন ধনী না, সুতরাং সোজা কথায় বললে যা করছি পুরস্কারের জন্যই করছি আমরা।'

'শুনুন,' ঝগড়া বেধে যাচ্ছে টের পেয়ে হাত তুলে থামানোর চেষ্টা করলেন রানি, 'আমি আমার নামে আর আবাটি জনগণের নামে শপথ করে বলছি, আপনাদের অভিযান যদি সফলভাবে শেষ হয়, তা হলে আপনারা যত সোনা চাইবেন তত সোনা দেবো আমি। হয়তো ভাবছেন কিছুক্ষণ আগে বলেছি আমাদের এখানে তেমন একটা সোনা নেই, তা হলে ওই পরিমাণ সোনা দেবো কোত্থেকে? কী পরিমাণ সোনা আছে, কোথায় আছে জানা আছে আমার। যদি দেখতে চান, যদি আমার সঙ্গে যাওয়ার সাহস থাকে

আপনাদের, তা হলে আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আগে কাজ তারপর পুরস্কার,' বলল অলিভার। 'কী করতে হবে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন, কীভাবে করতে হবে পরামর্শ দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে চাই আমরা।'

'সবার প্রথমে, যদি আপনাদের ধর্ম আর বিবেকের বিরোধী না হয়, তা হলে একটা শপথ করতে হবে আমার কাছে। আজ থেকে শুরু করে আগামী একটা বছর, আমার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে আমার দেশের হয়ে কাজ করতে হবে আপনাদেরকে। আমার দেশের হয়ে লড়তে হবে, আমার দেশের আইন মেনে চলতে হবে। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, আপনাদের পাশ্চাত্য দক্ষতা আর অস্ত্র কাজে লাগিয়ে ধ্বংস করে দিতে হবে দেবতা হারম্যাকের মূর্তিটা। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের এই চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনাদের পুরস্কার নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারবেন আপনারা।'

'ধরুন যা যা বললেন আপনি তার সবই করার প্রতিশ্রুতি দিলাম আমরা,' কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুখ খুলল অলিভার, 'কিন্তু আমাদের পদমর্যাদা কী হবে? কী হিসেবে আপনার অধীনে চাকরি করবো আমরা?'

'এই অভিযান শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আপনি আমার প্রধান সেনাপতি হিসেবে কাজ করে যাবেন,' জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন রানি। 'আর আপনার অধীনস্থ যাঁরা আছেন তাঁদেরকে আপনার ইচ্ছামতো পদমর্যাদা দেয়ার ক্ষমতা দিলাম আমি আপনাকে।'

রানির এই ঘোষণা শুনে সভায় উপস্থিত অন্য সেনাপতিদের মধ্যে অসন্তুষ্টির মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

'তার মানে,' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল যশুয়া, 'এই ভিনদেশীকে সবসময় মান্য করে চলতে হবে আমাদের?'

'হ্যাঁ, চাচা, যতদিন না এই অভিযান শেষ হয় ততদিন ওঁর

boiRboi.net

আদেশ মেনে চলবেন আপনারা। কেন মানতে হবে জানেন? আগুনের অস্ত্র আছে ওঁদের কাছে, ওঁরা চালাতে জানেন, আপনারা কেউ জানেন? কত সহজে কত বেশি মানুষ মেরে ফেলতে পারেন তাঁরা, ওই গোপন ক্ষমতার ব্যাপারে কিছু জানা আছে কি আপনাদের কারও? হারম্যাক শহরের বাইরে একটা তোরণে আশ্রয় নিয়ে ফাংদের পুরো বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন এঁরা তিন জন, আপনাদের মধ্যে যে-কোনো তিন জন কি পারবেন কাজটা করতে? শুধু তা-ই না, ফাংদের পরাভূত করে চলে আসতে পেরেছেন তাঁরা মুরে, আপনাদের কারও সাহস হবে কাজটা করার?' থামলেন রানি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলেন তাঁর প্রশ্নের জবাব শোনার জন্য। কিন্তু একজন সেনাপতিও মুখ খুললেন না, চেহারা কালো করে তাকিয়ে থাকলেন সবাই রানির দিকে।

'আপনারা নিরুত্তর কারণ আপনারা তো পারবেনই না ওরকম কোনো কাজ করতে, করার কথাও ভাববেন না—অত সাহস নেই আপনাদের, কোনোদিন হবে বলে মনেও হয় না। কাজেই যাঁরা আপনাদের চেয়ে বেশি যোগ্য তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে আপনাদের—আমার আদেশে এবং দেশের স্বার্থে।'

এরপরও কোনো কথা বলল না রানির সভাসদদের কেউ।

'রানি,' নীরবতা ভাঙল অলিভার, 'আমাকে আপনার প্রধান সেনাপতি বানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার অন্য সেনাপতিরা কি আমার আদেশ মানবে? তা ছাড়া আপনার সৈন্যরাই বা কারা? আসার পথে যাদেরকেই চোখে পড়েছে তাদেরকেই দেখেছি অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মানে কি এদেশের সব পুরুষই অস্ত্র সঙ্গে রাখে? যুদ্ধ করতে জানে?'

শ্লেষের হাসি হাসলেন রানি। 'যদি সব পুরুষ অস্ত্র সঙ্গে রাখত, যদি সবাই লড়তে পারত তা হলে কতই না ভালো হতো! ...এমন একটা সময় ছিল যখন ফাংদেরকে বলতে গেলে পাত্তাই

দিত না আমাদের পূর্বপুরুষরা। কারণ তখন সবাই ছিল জানবাজ যোদ্ধা। ওদেরকেই বরং সমীহ করে চলত ফাংরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে আমাদের দেশপ্রেম, কমেছে আমাদের লড়াকু মনোভাব। আজ এদেশের বেশিরভাগ লোক ব্যবসা-বাণিজ্য আর খেলাধূলা করতে যত ভালোবাসে, দেশকে তত ভালোবাসে না, যার কারণে আমাদের এই পরিণতি। আজকাল অনেকেই আমার কাছে এসে বলে যুদ্ধ নাকি জংলীদের কাজ, এসব বন্ধ করে দেয়া উচিত। আমার ভয় হয়, সামনে এমন একটা দিন আসবে যেদিন সেনাবাহিনী বলে কিছু থাকবে না আবাটিদের; আর সেদিন ফাংরা অবলীলায় ঢুকে পড়বে আমাদের দেশে, দখল করে নেবে সবকিছু, শিশুদেরকে বানাবে চাকর আর মেয়েদেরকে রক্ষিতা। ...যারা খুব গরিব, পেট চালানোর জন্য অস্ত্র ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যাদের, এবং বড় কোনো অপরাধ করার কারণে শাস্তি হিসেবে যাদেরকে সেনাবাহিনীতে পাঠানো হয়েছে তারা ছাড়া আজ আর অস্ত্র হাতে নিতে চায় না কেউ। ...আপনারা এদেশে আসার সময় অতি উৎসাহে অস্ত্র নিয়েছিল কেউ কেউ, তাদেরকেই দেখেছেন আপনি।' শেষের কথাটা অলিভারকে উদ্দেশ্য করে বলে ক্লান্তিতে বা হতাশায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন রানি, তাঁর রূপার-ঝালর-দেয়া ভারী নেকাব খসে পড়ল, কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল তাঁর গাল দিয়ে। তারপর আমাদেরকে হতভম্ব করে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এত করুণ কোনো দৃশ্য এর আগে আমি দেখেছি বলে মনে হয় না। নিজের দেশের লোকদের কাপুরুষত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের সভাসদদের সামনে কাঁদছেন অনিন্দ্যসুন্দরী আর সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক নারী, যাঁকে হয়তো বাধ্য হয়ে, বলা ভালো নিয়ম রক্ষার খাতিরে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নিতে হয়েছে কাঁধে। বুড়ো হয়েছি আমি, তা ছাড়া প্রাচ্যদেশীয় এসব জায়গায়

দীর্ঘদিন থাকার কারণে এখানকার লোকদের আবেগ সম্বন্ধেও জানা আছে আমার, তাই চুপ করে থাকলাম। কিন্তু রানি মাকেডাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে সহ্য করতে পারল না অলিভার। প্রথমে লাল, পরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা; সান্ত্বনা দেয়ার জন্য চেয়ার থেকে উঠে সোজা রানির দিকে রওয়ানা হয়ে গেল সে। ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম আমি, টেনে বসালাম ওকে চেয়ারে। মুখ তুলে কক্ষের ছাদের দিকে তাকাল কুইক, শুনলাম নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে একটানা, মনে হয় প্রার্থনা করছে।

আতঙ্ক আর ক্ষোভের মিশ্র একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল দরবারকক্ষে। হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে সবাই, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বরাবরের মতো, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল যশুয়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল কয়েক কদম, তারপর রানির সিংহাসনের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট কষ্ট করে হাঁটু গেড়ে বসল। ভারী কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'ওয়ালদা নাগাসটা, রাজকন্যা, এসব কথা বলে কেন শুধু শুধু নিজে কষ্ট পাচ্ছেন, আর আমাদেরকেও কষ্ট দিচ্ছেন? শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ কি যথেষ্ট নয় আমাদের জন্য?'

'ঈশ্বর তাদেরকেই রক্ষা করেন, যারা নিজেদেরকে রক্ষা করে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন রানি।

কথাটা শুনে থমকে গেল যশুয়া। অবশ্য সামলে নিয়ে আবার বলল, 'আপাতদৃষ্টিতে আপনার সেনাপতিদের কাপুরুষ বলে মনে হচ্ছে আপনার। কিন্তু যুদ্ধ যদি সত্যিই লাগে, তখন দেশের কথা ভেবে তাঁরা কি জানবাজি রেখে লড়বেন না?'

'তাঁরা না-হয় লড়লেন, কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যরা যদি পালিয়ে যায়?'

'আমি তো আছি, নাকি?' দেখেই বোঝা গেল মিথ্যা সান্ত্বনা

boiRboi.net

দিচ্ছে যশুয়া, কিন্তু কাজটা করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা হচ্ছে না ওর। 'আপনার চাচা, আপনার বাগদত্তা, আপনার প্রেমিক।' বুকের বাঁদিকে, হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখল সে, গোল গোল চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রানির দিকে। 'এই বিদেশিরা, যাদের উপর আপনার এত ভক্তি আর আস্থা, যদি সেদিন বাধা না দিত আমাকে, রাজা বারুংকে কি পাকড়াও করতে পারতাম না আমরা? নেতৃত্বশূন্য করতে পারতাম না ফাংদের?'

'হ্যাঁ, এমনিতেই তো গৌরব বলতে কিছু নেই আবাটিদের, ওই ন্যাক্কারজনক কাজটা করতে গিয়ে ফাংদের কাছে আরও ছোট হই আমরা, নাকি?'

সুর পাল্টাল যশুয়া। 'মুরের গোলাপ, চলুন বিয়েটা সেরে ফেলি আমরা। তারপর, কথা দিচ্ছি, ফাংদের কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করবোই আমি। আজ আপনি অসহায় বোধ করছেন কারণ আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হয় আপনাকে। আসুন, একসঙ্গে থাকতে শুরু করি, দেখবেন জয়ী আমরা হবোই। ...বলুন, কবে বিয়ে করছি আমরা?'

'যেদিন ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে হারম্যাকের মূর্তিটা এবং এই দেশ ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবে ফাংরা, সেদিন। ...কিন্তু, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন বিয়ে নিয়ে কথা বলার মতো উপযুক্ত কোনো জায়গায় বসে নেই আমরা, সেই সময়ও নেই আমাদের হাতে,' প্রসঙ্গ পাল্টালেন রানি মাকেডা, 'যাজকদের সামনে পশ্চিমের এই অতিথিরা শপথ নেবেন এখন।'

জমকালো পোশাক পরা এক লোক তখন সিংহাসনের পিছন থেকে হাজির হলো আমাদের সামনে। কোনো কোনো অনুষ্ঠানে গির্জার যাজকরা যে-রকম উঁচু টুপি পরেন, সে-রকম একটা টুপি পরে আছে লোকটা। গায়ের রোবের উপরে দেখা যাচ্ছে যেন-তেনভাবে পলিশ-করা দামি রত্নপাথরের একটা ব্রেস্টপ্লেট। লোকটার লম্বা সাদা দাড়ির কারণে অর্ধেকের মতো ঢাকা পড়ে

গেছে বর্মটা।

দেখে মনে হলো লোকটা মুরের প্রধান পুরোহিত। ওর হাতে পার্চমেন্টের দুটো রোল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু লেখা আছে সেখানে। লোকটা কাছে আসার পর পার্চমেন্টের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, কারণ ভাষাটা জানি না। পরে অবশ্য জানতে পারি ভাষাটা নাকি অতি প্রাচীন হিব্রু, যা একেবারেই অপ্রচলিত এবং ওই ভাষায় লেখা কোনো কিছু পড়ে মানে বুঝতে পারে এরকম লোক নাকি বেশি হলে তিন কি চার জন আছে সারা মুরে। আমাদেরকে বলা হলো জিনিসটা নাকি মুরের "সংবিধান"। অনেক অনেক বছর আগে যখন সবে গোড়াপত্তন হয়েছিল দেশটার, তখনকার শাসক আর তাঁর সভাসদরা মিলে রচনা করেছিলেন এই দলিল। কেউ কেউ আবার বলেন দলিলটা নাকি নিয়ে আসা হয়েছিল সুদূর আবিসিনিয়া থেকে, সঙ্গে ছিল রানি মাকেডার ওই বিশেষ আংটিটা এবং আরও কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। যা-হোক, আমাদের হাতে দেয়া হলো ওই দলিল, চুমু খেতে বলা হলো। কথামতো কাজ করলাম। তারপর ঈশ্বর আর নবী সোলায়মানের নামে শপথ করলাম, যতদিন না অভিযান শেষ হয় আমাদের, ততদিন অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবো রানি শেবা এবং আবাটিদের প্রতি।

জানি না কেন কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের এই শপথ-নেয়ার অনুষ্ঠান দেখছিলেন রানি মাকেডা। তাঁর দিকে তাকাল অলিভার, আরবিতে বলতে শুরু করল, 'রাজকন্যা, আপনার কথামতো আমরা শপথ নিলাম। আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি, এই শপথের মধ্যে যদি কোনো ফাঁকফোকর থেকে থাকে যা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা হলে সেসব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন আপনি। আমাদের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, দয়া করে মনে রাখবেন, আপনার দেশে আমরা আগন্তুক মাত্র—এখানকার আইন আর সামাজিক

boiRboi.net

রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই আমাদের। তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখা দরকার, আমাদের অনেক দূরের দেশেও একজন রানি আছেন, তাঁর প্রতি অনুগত আর বিশ্বস্ত আমরা এবং সারাজীবন থাকবো। আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি, ফাং্দের হাতে আমাদের যে-সঙ্গী আর বন্ধু বন্দি হয়ে আছেন এবং আমাদের এই ডাক্তার ভদ্রলোকের যে-ছেলে ক্রীতদাস হয়ে দিন কাটাচ্ছে সেখানে, তাঁদেরকে উদ্ধার করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই আমরা। আশা করছি এই ব্যাপারটায় আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন আপনি। সবশেষে বলবো, যদি কখনও এমন কিছু ঘটে যাতে মনে হয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি আমরা, তা হলে হয়তো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের; সেদিন আপনি একা বিচার করবেন আমাদের, অন্য কেউ বিচারক হতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন রানি মাকেডা, তারপর দূরে সরে যেতে বললেন আমাদেরকে। নিজের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। বোঝাই যাচ্ছে রানি ছাড়া অন্য কেউ এতটা স্বাধীনতা দিতে চাচ্ছে না আমাদেরকে, কিন্তু রানিকেও দেখলাম নাছোড়বান্দার মতো যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত পাল্লা ভারী হলো তাঁর, যারা ওজর-আপত্তি করছিল তাদের সংখ্যা কমে গেল। আমাদেরকে কাছে ডাকলেন রানি, বললেন আমাদের শর্ত মেনে নিয়েছেন তিনি এবং তাঁর সভাসদরা।

আনুষ্ঠানিকভাবে একটা চুক্তিপত্র তৈরি করা হলো, তাতে স্বাক্ষর করলাম আমরা তিন জন। করার মতো আর কিছু নেই আপাতত, একঘেয়ে এসব কাজ দেখতে দেখতে ক্লান্তও হয়ে পড়েছি; অতিথি-ভবনে ফিরে যেতে বলা হলো আমাদেরকে, লাঞ্চটা সেরে নিতে হবে সেখানেই। লাঞ্চ না-বলে বোধহয় ডিনার বলাই ভালো, কারণ দিনের সবচেয়ে ভারী খাবারটা দুপুরেই খায়

আবাটিরা। তারপর প্রাচ্যদেশীয় রীতি অনুযায়ী একটা ঘুম দিয়ে ওঠে সন্ধ্যার দিকে।

খাওয়া সেরে নিজের কামরায় ঘুমাচ্ছিলাম আমিও, ফারাও-এর ঘেউ ঘেউ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘড়িতে দেখি চারটার মতো বাজে। দরজার দিকে চোখ গেল। গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে আছে অথবা পালানোর চেষ্টা করছে একটা লোক, বাঁচতে চাচ্ছে কুকুরটার কবল থেকে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই আছে দরজার কাছে। আশ্চর্য হলাম, নামলাম বিছানা ছেড়ে।

লোকটার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, সে আসলে রানি মাকেডার একজন দূত। আগে দেখিনি এরকম একটা জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে যেতে চান রানি, তাই লোকটাকে পাঠিয়েছেন জানার জন্য আমরা যেতে পারবো কি না।

আমি যখন কথা বলছিলাম লোকটার সঙ্গে তখন অলিভার আর কুইকও এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে, তাই রানির প্রশ্নটা শোনামাত্র একসঙ্গে হ্যাঁ বলে উঠলাম তিন জন। দেরি করল না লোকটা, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমাদেরকে। প্রাসাদের পিছনদিকে, ধুলোয় ভরা আর বহুদিনের অব্যবহৃত একটা মিলনায়তনে হাজির হলাম।

তিন সহচরীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে চলে এলেন রানি মাকেডা, সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক, যাদের প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন। খেয়াল করলাম, লাউ-এর শুকনো খোলস দিয়ে বানানো পাত্রে তেল নিয়েছে কেউ কেউ, প্রয়োজনের সময় যাতে ব্যবহার করতে পারে। কারও কারও সঙ্গে মশালও দেখা গেল।

'সন্দেহ নেই,' নেকাব পরেননি রানি, সকালের সেই দুশ্চিন্তা আর বেদনা মুছে গেছে তাঁর চেহারা থেকে, তাই আরও সুন্দর লাগছে তাঁকে, 'আফ্রিকার অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখেছেন

boighoi.net

আপনারা। কিন্তু এখন এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো আপনাদেরকে, যা, আমার মনে হয়, অন্য সব জায়গার চেয়ে সুন্দর, অন্য সব জায়গার চেয়ে অদ্ভুত।'

এবার আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন তিনি। মিলনায়তনের শেষপ্রান্তে, বন্ধ একটা দরজার সামনে হাজির হলাম আমরা। হুড়কো সরিয়ে নিয়ে দরজাটা খোলা হলো। ভিতরে ঢুকলাম আমরা, তারপর আবার বন্ধ করে দেয়া হলো দরজাটা, যাতে অন্য কেউ আসতে না-পারে।

সামনে লম্বা একটা প্যাসেজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পাহাড়ের পাদদেশে সুড়ঙ্গ কেটে বানানো হয়েছে প্যাসেজটা। আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে গেছে এই সুড়ঙ্গ। এগিয়ে চললাম আমরা। শেষমাথায় গিয়ে হাজির হলাম আরেকটা দরজার কাছে। দরজাটা পার হয়ে পা রাখলাম বিশাল এক গুহায়।

এত বড় গুহার কথা আগে কখনও শুনিওনি, দেখা তো দূরে থাক। অনেকগুলো লণ্ঠন জ্বলছে, কিন্তু ছাদ এত উঁচু যে, অপর্যাপ্ত আলো পৌঁছাতে পারছে না সে-পর্যন্ত। ডানে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় ছোট-বড় পাথরের টুকরো, দেখলে মনে হয় কোনো এক কালে পাথরের বাড়িঘর ছিল এখানে, পরে যে-কোনো কারণেই হোক ধ্বংস হয়ে গেছে সব।

'এই হচ্ছে মুরের সুড়ঙ্গ-শহর,' হাতে-ধরা লণ্ঠনটা নাড়ালেন রানি মাকেডা। 'অথবা বলতে পারেন ভূগর্ভস্থ শহর। ফাংদের পূর্বপুরুষরা একসময় থাকত এখানে, জায়গাটা ছিল ওদের গোপন দুর্গ। দু'দিকের এই ভেঙে-পড়া পাথরের স্তূপগুলোই একদিন ছিল ওদের ফসলের গোলা, মন্দির অথবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান পালনের কেন্দ্র। আগেও বলেছি আপনাদের, কয়েকশ' বছর আগে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায় এসব, তখন এই শহর ছেড়ে চলে যায় ফাংরা, যেটা যেভাবে ছিল সেটা সেভাবেই পড়ে থাকে। ওই ভূমিকম্পে এমনকী এই গুহাটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়,

বিভিন্ন জায়গার ছাদ ধসে পড়ে। সে-কারণে এই সুড়ঙ্গে এমনও জায়গা আছে যেখানে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। ...চলুন, সামনে কী আছে দেখা যাক।'

তাঁকে অনুসরণ করে ওই সুড়ঙ্গের আরও গভীরে নেমে এলাম আমরা। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার; কালো আকাশের পটভূমিতে অল্প কয়েকটা তারা যেমন দেখায়, আমাদের জ্বলন্ত লণ্ঠন আর মশালগুলো দেখতে সেরকমই লাগছে যেন। কাছেই পড়ে আছে পাথর-নির্মিত একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ভিতরে সম্ভবত শস্যের গুঁড়ো। বাড়িটা এককালে গোলাঘর ছিল হয়তো।

হাঁটতে হাঁটতে শেষপর্যন্ত হাজির হলাম বেশ বড়, ছাদহীন, বিধ্বস্ত একটা বাড়ির ভিতরে। ভেঙে পড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বাড়ির স্তম্ভগুলো। সেগুলোর মাঝখানে, কখনওবা কোনো কোনোটার উপরে দেখা যাচ্ছে পুরু ধুলোর আবরণে আবৃত কিছু মূর্তি; আকৃতিতে বেশিরভাগই স্ফিংক্সের মতো।

কিছু একটা দেখানোর জন্য অলিভারকে ডাকছিলেন রানি, তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'যদি প্রফেসর হিগস থাকতেন এখন!'

সিংহ-মাথার দেবতার মূর্তি দিয়ে ভরা জায়গাটা, তার মানে এটা একটা মন্দির। কিন্তু ভিতরের যা অবস্থা, এখানে বেশিক্ষণ থাকা বা হেঁটে বেড়ানো নিরাপদ হবে বলে মনে হয় না। রানির পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়ালাম বড় একটা ঝরনার সামনে। বিশাল এক গর্তের মধ্যে জমা হচ্ছে পানি, একাধিক নালা বানানো আছে যাতে পানি বের হয়ে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যেতে পারে। এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু পানি আসলে কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

'ঝরনাটা কত পুরনো খেয়াল করেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রানি, ইঙ্গিতে দেখালেন গর্তটার চারপাশ। খেয়াল করে দেখলাম, ছোট ছোট, কয়েক ইঞ্চি গভীর কিছু গর্ত তৈরি হয়েছে—আসলে

বছরের পর বছর ধরে যারা পানি নিতে আসত তাদের পায়ের ছাপ গভীরভাবে বসে গেছে মাটিতে।

'এত বিশাল একটা গুহা ওরা আলোকিত করত কীভাবে?' চারদিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'জানি না,' বললেন রানি। 'তখনকার দিনে তো আজকের মতো এত লণ্ঠনও ছিল না। ব্যাপারটা গোপন এক রহস্য হয়েই রয়ে গেছে আমাদের কাছে। আমরা আবাটিরা কোনোদিন মাথাও ঘামাইনি ওসব নিয়ে। ...আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছেন? মাটির এত নীচে চলে এসেছি আমরা, তারপরও শ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, গরমও লাগছে না। বাতাস বলতে গেলে উপরের মতোই বিশুদ্ধ। এমনকী, এই জায়গা প্রাকৃতিক না কৃত্রিম তা-ও কিন্তু নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই।'

'আমার মনে হয় কিছুটা প্রাকৃতিক, কিছুটা কৃত্রিম,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললাম। 'কিন্তু রানি, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? এই গুহা কি কোনো কাজে লাগে আবাটিদের?'

'ফাংরা যখন হামলা চালায় আমাদের উপর, তখন তো চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয় পড়ি আমরা; ওই অবস্থায় কিছু ফসল মজুদ করে রাখা হয় এখানে। কিন্তু...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রানি, 'সারা দেশের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য ওই ফসল যথেষ্ট না। আমার নিজের জমিদারি আছে, এখানে মজুদ করে রাখা ফসলের বেশিরভাগই আসে সেখান থেকে। এ-কাজে অংশ নেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার আহ্বান করেছি আমি দেশের জনগণকে, কিন্তু তেমন একটা সাড়া পাইনি। হিসেব করে দেখেছি, চাষীরা যদি তাদের ফসলের একশ' ভাগের একভাগও সঞ্চিত রাখত এখানে তা হলেও আপদকালীন সময়ে অভাব মিটে যেত আমাদের। কিন্তু কাজটা করেনি ওরা। সবাই বলেছে, যদি তাদের প্রতিবেশীরা ফসল দেয় রাজভাণ্ডারে তা হলে তারাও দেবে। এই "প্রতিবেশী" "প্রতিবেশী" করতে করতেই দিন পার হয়েছে, ফসল আর পাওয়া

যায়নি। এরা এত অবুঝ কেন জানি না!' লণ্ঠন হাতে এগিয়ে গেলেন তিনি, দেখালেন প্রাচীন কিছু আস্তাবল, যেখানে অনেক অনেক আগে ঘোড়া আর ঘোড়ার-গাড়ি রাখা হতো। খেয়াল করলাম, পাথরের মেঝেতে আজও লেগে আছে চাকার দাগ।

'আবাটিরা তো দেখছি চমৎকার মানুষ,' কুইকের কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ। 'এই দেশে যদি নারী আর শিশুরা না থাকত, আর আমাদের সামনের ওই উদার মনের ছোট্ট ভদ্রমহিলাটা না-থাকতেন, যাঁকে আমি মন থেকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি, তা হলে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে এখানকার লোকদের কী অবস্থা হয়, সেটা একবারের জন্য হলেও দেখতে চাইতাম।'

কোনো মন্তব্য করলাম না। আস্তাবলগুলো দেখছি, আর নিজেরা নিজেরাই কথা বলছি—ঠিক কোন্ কারণে মাটির এত নীচে ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি রাখতে পারে আগের দিনের মানুষ বুঝতে পারছি না। এমন সময় নিচু কণ্ঠে ডেকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রানি মাকেডা, 'আরেকটা জায়গা দেখানো বাকি আছে। যে-জায়গায় গেলে আমার মনে হয় আপনারা স্বীকার করবেন, আজ বিকেলের আমাদের এই অভিযান একেবারে সাদামাটা হয়নি। আপনাদেরকে যে-গুপ্তধন দেয়ার কথা দিয়েছি, ওই গুপ্তধন আছে সেখানেই। ...চলুন।'

আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের। একটার পর একটা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলেছি এবার, পুরো ব্যাপারটা গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমার মনে হয় রানি মাকেডার সঙ্গে না-এলে জীবনেও আসতে পারতাম না এখানে। যা-হোক, শেষ প্যাসেজটা পার হওয়ার পর পথ বেঁকে গেল হঠাৎ করেই, চওড়া আর খাড়া হয়ে উঠে গেল উপরের দিকে। পঞ্চাশ কদমের মতো এগোলাম। সামনে এখন পাহাড়ি একটা দেয়াল, আর এগোনোর রাস্তা নেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম রানির দিকে।

তিন সহচরী আর ভৃত্যদেরকে এখানেই দাঁড়াতে বললেন

তিনি। খেয়াল করলাম, আদেশ শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেল ওরা। হঠাৎ করে ওদের এত ভয় পাওয়ার কারণ কী, বুঝলাম না। দেয়ালের এককিনারার দিকে এগিয়ে গেলেন রানি, তাঁর পিছু পিছু গেলাম আমরা তিন জন। ইশারায় আলগা একটা পাথর দেখিয়ে আমাকে টেনে তুলতে বললেন। যথেষ্ট ভারী পাথরটা, তুলতে বেশ কষ্ট হলো আমার। ঘড়ঘড় শব্দ হলো সঙ্গে সঙ্গে, যেন ভারী কিছু সরে যাচ্ছে মাথার উপর থেকে; চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, নিরেট দেয়ালটার কিছুটা জায়গা উধাও হয়ে গেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালো একটা গহ্বর, যেখান দিয়ে হয়তো গুড়ি মেরে এগোনো সম্ভব আমাদের পক্ষে।

নিজের লোকদের দিকে তাকালেন রানি। 'তোমরা জানো এই জায়গাটা অভিশপ্ত, আগের দিনের মানুষ যারা মরেও শান্তি পায়নি তাদের আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায় এখানে। হয়তো আমি বললে ভিতরে ঢোকার সাহস হবে তোমাদের, কিন্তু এমনিতে ঢুকবে বা ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না। ভয় পেয়ো না, ঢুকতে বলবো না কাউকে। তবে ওই সাহস আছে আমার এবং আমার এই বিদেশি অতিথিদের। কাজেই, একপাত্র তেল আর কয়েকটা মশাল দাও আমাদেরকে। আর আমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত এখানেই থাকো সবাই। আমরা নীচে নেমে যাওয়ার পর একটা লণ্ঠন বসিয়ে রাখবে দেয়ালের এই গর্তের মুখে, যাতে আমাদের মশালগুলো কোনো কারণে নিভে গেলে পথ চিনে ফিরে আসতে পারি আমরা।' সহচরীরা কিছু বলতে যাচ্ছে টের পেয়ে ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, 'না, কোনো ওজর-আপত্তি কোরো না কেউ, কারণ এখানে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তোমাদের। ফিরে যেতে পারবে না, কারণ কোন্ প্যাসেজ দিয়ে কোন্ প্যাসেজে ঢুকতে হবে জানা নেই তোমাদের কারোরই। আমাদের সঙ্গেও আসতে পারবে না, সে-সাহস হবে না তোমাদের। এখানে থাকলে কোনো বিপদ হবে না কারও;

এখানকার বাতাস গরম হলেও দূষিত না, এর আগে এই জায়গায় অনেকবার এসেছি আমি।'

কথা শেষ করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অলিভারের হাত ধরলেন তিনি, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন আলকাতরার-মতো-কালো ওই গহ্বরে। তাঁদের দু'জনের পিছু নিলাম আমি আর কুইক।

অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছি। বেশ কিছুক্ষণ পর হাজির হলাম আরেকটা গুহায়। এখানকার বাতাস বাইরের চেয়ে যথেষ্ট গরম, আর আবহাওয়াও কেমন গুমোট।

পরিবেশটা সত্যিই অস্বস্তিকর। ভূত-প্রেত বলে কোনো কিছু বিশ্বাস করিনি আমি কোনোকালে, কিন্তু এখন জানি না কেন মনে হচ্ছে কী যেন, বলা ভালো বর্ণনার অতীত কিছু ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। কথা বলার সাহস হচ্ছে না, নিজের হৃৎকম্পন যেন টের পাচ্ছি অস্পষ্টভাবে।

'এটা কোন্ জায়গা?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অলিভার, প্রশ্নটা শুনে বোঝা গেল এই জায়গা ওর মনেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

'মুরের প্রাচীন রাজাদের কবরস্থান,' জবাব দিলেন রানি। 'আরও কিছুদূর চলুন, নিজেরাই দেখতে পারবেন,' ঢালটা প্রায়-খাড়া হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে, তা ছাড়া অজানা কোনো কারণে পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি, তাই আবারও অলিভারের হাত ধরলেন তিনি।

এগিয়ে চললাম আমরা। ক্রমেই নামছি নীচের দিকে। আন্দাজ করলাম, গহ্বরের মুখ থেকে চারশ' গজের মতো নীচে চলে এসেছি। অখণ্ড নিস্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে বড় বেশি কানে বাজছে আমাদের জুতোর আওয়াজ। কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে শত শত বাদুড়, বছরের পর বছর ধরে এই জায়গাটা ওদের আস্তানা বোধহয়, পাক খেয়ে খেয়ে আমাদের চারপাশে

উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা অস্থিরভাবে, ডানা ঝাপটানোর সম্মিলিত আওয়াজ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে যেন ঝড়ের গর্জন তুলেছে এই গুহায়। আমাদের চারজনের হাতেই লণ্ঠন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারটা তারার মতো দেখাচ্ছে ওগুলো। খেয়াল করলাম, যত এগোচ্ছি সামনের দিকে তত চওড়া হচ্ছে প্যাসেজটা। শেষপর্যন্ত বড় একটা গোলাকৃতির অ্যারিনাতে হাজির হলাম আমরা। মাথার উপরে উঁচু, গম্বুজের মতো, পাথর-নির্মিত ছাদ। ডান দিকে মোড় নিলেন রানি, কিছুদূর এগোনোর পর থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ করেই। সামনে, লণ্ঠনের আলোয়, অত্যন্ত ক্ষীণভাবে চকচক করছে কিছু একটা। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলেন রানি, বললেন, 'দেখুন!'

আমাদের সামনে বিশাল এক পাথরের-চেয়ার। চেয়ারের আসনে এবং পায়ার কাছে পড়ে আছে মানুষের হাড়গোড়। খুলিটা দৃষ্টি কেড়ে নিল, কারণ ওটার মাথায় কোনোরকমে আটকে আছে সোনার একটা মুকুট। রাজদণ্ড, আংটি, নেকলেস, অস্ত্র, বর্ম—যেটা যে-জায়গায় থাকার কথা সে-অলঙ্কার কঙ্কালটার ঠিক সেখানেই লেপ্টে আছে যেন। শুধু এই একটা কঙ্কালই নয়, চেয়ারটার আশপাশে বৃত্তাকারে পড়ে আছে পঞ্চাশ বা তারও বেশি কঙ্কাল; সবগুলোর "গায়ে" সোনার অলঙ্কার।

প্রত্যেকটা কঙ্কালের সামনে রূপা বা তামা দিয়ে বানানো একটা করে বড় ট্রে। তাতে স্তূপাকারে সাজানো আছে সব রকমের মূল্যবান সামগ্রী—সোনার কাপ আর ফুলদানি, প্রসাধন আর শৌচাগারের যাবতীয় সরঞ্জাম, নেকলেস, পেক্টোরাল, ব্রেসলেট, লেগলেট, কানের রিং, অতি মূল্যবান রত্নপাথর থেকে সুন্দর করে কাটা পুঁতি এবং আরও অনেক অনেক কিছু।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হাঁ করে দেখছি সামনের এই গুপ্তধন, আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন রানি, 'বুঝতেই পারছেন, চেয়ারে বসে থাকা কঙ্কালটা কোনো এক রাজার। আশপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা

কেউ তাঁর রক্ষী, কেউ সেনাপতি, আবার কেউ স্ত্রী বা রক্ষিতা। তাঁকে কবর দেয়ার পর কী মনে হয়েছিল ফাংদের জানি না—কবর থেকে তোলা হয় তাঁর কঙ্কাল, এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয়া হয় ওই চেয়ারে, সঙ্গে আনা হয় সম্পদের ওই পাহাড়। রাজার ঘনিষ্ঠ যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকেও জড়ো করা হয় রাজার চেয়ারের পাশে, তারপর নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়। আমার কথা বিশ্বাস না-হলে চেয়ারের আশপাশের ধুলো সরিয়ে দেখুন, মাটিতে আজও দেখতে পাবেন রক্তের দাগ। শুধু তা-ই না, প্রত্যেকটা কঙ্কালের খুলিতে কিংবা ঘাড়ের হাড়ে আছে তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন।'

রানির কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তারপরও কুইক এগিয়ে গেল সামনের দিকে, আমাদের মধ্যে সে-ই আবার সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধিৎসু, সময় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল রাশি রাশি সোনা এবং ওই সোনার কোনো এক কালের মালিকদের।

'ঈশ্বর!' জায়গায় জায়গায় তরবারির চিহ্নযুক্ত একটা খুলি দেখাল সে আমাদেরকে, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কপাল ভালো যে, মুরের আগের দিনের রাজাদের চাকরি করতে হয়নি আমাকে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের এই নিষ্ঠুর প্রথা বিলুপ্ত হয়নি আজও—খুঁজলে আফ্রিকার প্রত্যেক গোত্রে পাওয়া যাবে এরকম কোনো-না-কোনো রক্তাক্ত ইতিহাস। আপনাদের সঙ্গে রওনা হওয়ার দিন পনেরো আগেও ছিলাম পশ্চিম আফ্রিকায়; সেখানে দেখি হতদরিদ্র একদল ভিক্ষুককে জীবন্ত কবর দিচ্ছে এক গোত্রের লোকরা!'

কুইকের কথাগুলো অনুবাদ করে শোনালাম রানিকে। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, ওই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না-করে শুধু বললেন, 'বন্ধুরা, আগে বাড়তে হবে আমাদের। এরকম রাজা আরও আছেন, চলুন দেখে আসি তাঁদেরকেও। তেলও বেশি বাকি নেই, তাই তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

এগিয়ে চললাম আমরা। বিশ কদম দূরে দেখতে পেলাম আরেকটা পাথরের চেয়ার, সেই চেয়ারের উপর "বসে আছে" আরেকজন রাজার কঙ্কাল এবং তাঁর পায়ের কাছে, মাটিতে পড়ে আছে হতভাগ্য একদল লোকের কঙ্কাল—রাজার মৃত্যুর পর, শেষ যাত্রায় রাজাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে এবং রাজার লাশের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে যাদের লাশ। সবগুলো কঙ্কালের সামনে আগের মতোই একটা করে ট্রে, তাতে সোনার জিনিসপত্র। পার্থক্য একটাই—এই রাজার চেয়ারের পাশে পাওয়া গেল একটা কুকুরের কঙ্কাল, সেটার গলায় পরানো আছে রত্নখচিত একটা কলার।

বেশিক্ষণ থাকলাম না এখানে, হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলাম তৃতীয় "শবকক্ষে"। এবার বিশেষ একটা কঙ্কালের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রানি মাকেডা। কঙ্কালটার সামনে একটা ট্রে, তাতে স্তূপ করা আছে ওষুধের বোতল আর পুরনো আমলের অস্ত্রোপচারের কিছু যন্ত্রপাতি।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন রানি। 'রাজার ব্যক্তিগত কোনো চিকিৎসক থাকলে তাঁকেও বাদ দেয়া হয়নি, রাজার সঙ্গে পাঠানো হয়েছে পরপারে।'

কিছু না-বলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে, ওই ট্রে থেকে কিছু যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে ভরলাম পকেটে। পরে নিজের কামরায় ফিরে এসে সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম ওগুলো, কিন্তু জিনিসগুলো কত হাজার বছর আগের বুঝতে পারিনি, তবে এটা বুঝতে পারি, এই যন্ত্রপাতিগুলোই একটু এদিক-সেদিক করে নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন এখনকার নামকরা সার্জনরা।

যা-হোক, অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর ওই কবরস্থানের ব্যাপারে বলার মতো আর তেমন কিছুই নেই। একটার পর একটা রাজার "সমাধির" সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমরা, দেখি রাজা আর তাঁর খুব কাছের লোকদের সারি সারি কঙ্কাল এবং রাশি রাশি সোনা।

একসময় একঘেয়ে লাগতে শুরু করে পুরো ব্যাপারটা, ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

তবে, আমার গণনা অনুযায়ী, পঁচিশ নম্বর সমাধির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই, বিস্ময়ে আরেকবার অভিভূত হয়ে যেতে হয় আমাদেরকে। এর আগে প্রত্যেক রাজার সামনে যত কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছি, এই রাজার সামনে তার দুই কি তিনগুণ কঙ্কাল পড়ে আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই, বিপুল পরিমাণ সোনা আর সোনার অলঙ্কার এখন আমাদের সামনে। কিছু কিছু সোনার মূর্তিও চোখে পড়ল প্রথমবারের মতো, দেখে মনে হলো দেব-দেবীর হবে হয়তো।

অদ্ভুত হলেও সত্য, এই রাজার লোকজন যেমন বেশি, সোনাদানা যেমন বেশি, তেমনই রাজার কঙ্কালটাও অন্যদের চেয়ে অনেক বড়। বাঁকানো মেরুদণ্ড দেখে বুঝলাম রাজা ছিলেন কুঁজোপিঠের। কোনো এক সময়ে হয়তো দুর্দান্ত প্রতাপে মুর শাসন করতেন এই কুঁজোপিঠের রাজাঃ খুব ইচ্ছে হলো ওই ইতিহাস জানার, কিন্তু আফসোস, হাজার খুঁজলেও সে-রকম কিছু পাওয়া যাবে না কোথাও!

দশ

'এবার ফিরে যেতে হবে আমাদের,' ঘাড় ঘুরিয়ে অলিভারের দিকে তাকিয়ে বললেন রানি।

কিন্তু যাকে বলা হয়েছে কথাটা, রানিকে ছাড়িয়ে সে এগিয়ে গেছে কিছুদূর; দাঁড়িয়ে আছে কুঁজোপিঠের রাজার চেয়ারের পাশে,

boiboi.net

পকেট থেকে কিছু একটা বের করে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে চেয়ারটার উপর, কী যেন করছে।

কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলেন রানি। অলিভারের হাতে-ধরা যন্ত্রটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'কী এটা? এটা দিয়ে কী করেন আপনারা?'

'এটার নাম কম্পাস,' জবাব দিল অলিভার। 'এটা দিয়ে দিক চিনে নিতে পারি আমরা। যেমন, আমি যেদিকে পিঠ দিয়ে আছি সেদিকটা হচ্ছে পুব, মানে যেখানে সূর্য ওঠে। আরও একটা জিনিস জানা যায় আমার হাতের এই যন্ত্র দিয়ে—সমুদ্রপৃষ্ঠের কত উপরে আছি। ...আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, রানি, আমরা যদি সোজা সামনের দিকে এগোতে থাকি তা হলে কোথায় গিয়ে হাজির হবো?'

'ফাংদের সেই সিংহ-মাথার দেবতা হারম্যাকের পাদদেশে। আমি কখনও যাইনি, তবে ওরকমই বলা হয়েছে আমাকে। মূর্তিটা আগেও দেখেছেন আপনারা। কিন্তু এখান থেকে কত দূরে আছে সেটা ঠিক জানি না। ...ডাক্তার অ্যাডামস, একটু আসবেন এদিকে? আমার লণ্ঠনটা নিভু নিভু করছে, তেল ভরতে সাহায্য করবেন আমাকে? অন্ধকারে এই শত শত কঙ্কালের সঙ্গে থাকতে বোধহয় ভালো লাগবে না আমাদের কারোরই।'

এগিয়ে গেলাম রানির দিকে। লণ্ঠনে তেল ভরছি, এমন সময় একটা প্রশ্ন জাগল মনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রানি, আপনার পূর্বপুরুষরা কি অনেক আগে থেকেই জানতেন এখানে প্রাচীন রাজাদের সমাধি আছে?'

মৃদু হাসলেন রানি। 'না। মাত্র কয়েক বছর আগে এই সমাধি আবিষ্কার করি আমি নিজে। দলবল নিয়ে এসেছিলাম, অনেকটা কপালগুণেই খুঁজে পাই জায়গাটা। কিন্তু এত কঙ্কাল দেখার পর ভীতু লোকগুলোর একজনও থাকেনি আমার সঙ্গে, পড়িমরি করে পালায়। তারপর থেকে মাঝেমধ্যে একাই চলে আসতাম এই

জায়গায়, দেখতাম এককালে অহঙ্কারে মাটিতে যাদের পা পড়ত না তাদের কী দশা হয়েছে। ...কয়েক জায়গায় ধুলোর উপর আমার জুতোর চিহ্নও আছে,' মাটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়।'

কথা শেষ করে ফেরার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন তিনি অলিভারকে। তাড়াহুড়ো করে নিজের কাজ শেষ করল অলিভার, তারপর পকেট থেকে ছোট নোটবুক বের করে কী যেন লিখে রাখল। রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা, নিতান্ত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে দৌড়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল সে।

'কী জানতে পারলেন?' ওকে জিজ্ঞেস করলেন রানি।

'আমাকে যদি আরেকটু সময় দিতেন তা হলে যা জানতে পারতাম তার চেয়ে কম,' হেসে বলল অলিভার। 'আমি পেশায় ছিলাম একজন প্রকৌশলী, পরে যোগ দিই সেনাবাহিনীতে। কোনো কিছু করার আগে কীভাবে করবো ভাবতে হয় আমাকে, মাপজোখ করতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব কষতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে আপনার। পর্বত কেটে এই সুড়ঙ্গ যারা বানিয়েছে, এই গুহা যারা...কী বলবো...সাজিয়েছে, তারাও ছিল প্রকৌশলী। আমার কাজ অনেকটা ওদের মতোই।'

'তা-ই?' বিশেষ দৃষ্টিতে অলিভারের দিকে তাকালেন রানি। 'ওরকম প্রকৌশলী আমাদের দেশেও আছে। বাঁধ তৈরি করে ওরা, সুন্দর করে নালা খনন করে পানির প্রবাহ ঠিক রাখে, কেউ কেউ আবার ঘরবাড়ি বানায়। যদিও, সত্যি কথা বললে, আগের দিনের মতো ভালো হয় না সেসব বাড়ি। ...কিন্তু মাপজোখ করে আপনি কী জানতে পারলেন বলুন তো?'

'খুব বেশি কিছু না। তবে যা জেনেছি তা কম গুরুত্বপূর্ণ না। বললে বিশ্বাস করবেন, হারম্যাক শহর থেকে খুব বেশি দূরে নেই আমরা এখন? আরেকটা কথা, কুঁজোপিঠের রাজা যে-চেয়ারে বসে

boighar.net

আছেন, আমার মনে হয় ওই চেয়ারের পিছন দিয়ে অনেক অনেক বছর আগে গোপন একটা প্যাসেজ ছিল। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল প্যাসেজটা। ...এ-ব্যাপারে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারবো না আপাতত।'

'আগে ভাবতাম আপনি বোধহয় শুধু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একজন সেনাপতি,' শুনেই বোঝা গেল অলিভারের মন্তব্যে দুঃখ পেয়েছেন রানি, 'কিন্তু' এখন দেখছি যথেষ্ট বিচক্ষণ একজন লোক। আসলে আমাকে সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছেন না আপনি, তাই আপনার গোপন কথাগুলো বলতে চাইছেন না। ঠিক আছে, আপনার গোপন কথাগুলো গোপন থাকলে যদি ভালো হয় তা হলে না-হয় জানলামই না কোনোদিন।'

রানিকে বোঝানোর চেষ্টা করল না অলিভার, বরং বাউ করে সম্মান প্রদর্শন করল এবং আর কোনো কথা বলল না এ-ব্যাপারে।

ফিরে আসছি আমরা। যে-পথে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন রানি সে-পথে নয়, আরেকটা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলেছেন তিনি এবার। এখানেও কিছুদূর পর পর ত্রিশ-চল্লিশটা করে কঙ্কাল আর সোনার স্তূপ। দেখতে দেখতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, আর তাকাতেও ইচ্ছা করছে না। আরেকটা ব্যাপার, এ-জায়গার বাতাস ভারী হয়ে আছে ধুলোয়, দম কেমন আটকে আটকে আসছে আমাদের। পরে আমাকে বলেছিল কুইক, যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা তত নাকি কঙ্কালের সংখ্যা কমছিল; পাল্লা দিয়ে কমছিল দামি দামি সব অলঙ্কারের পরিমাণ। আরও পাঁচ-ছ'টা সমাধি পার হওয়ার পর, কুইকের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রত্যেক রাজার কঙ্কালের সঙ্গে অল্প কয়েকটা নারীদেহের-কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নাকি ছিল না। তার মানে রাজার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদেরকেও হত্যা করে তাঁর সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল

পরপারে!

একেবারে শেষের দিকে চোখে পড়ল আরেক ব্যাপার। বলতে গেলে পাশাপাশি বসানো আছে কয়েকটা চেয়ার, তাতে কয়েকজন রাজার কঙ্কাল। এঁদের সঙ্গে বাড়তি একটা কঙ্কালও নেই। তার মানে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়েছে একেকজনকে। অল্প কিছু সোনার অলঙ্কার আর রাজমুকুট না-থাকলে রাজা বলে চেনাই যেত না কাউকে। এরপরের কঙ্কালগুলোর অবস্থা দেখলাম আরও করুণ। অলঙ্কার বলতে কিছুই নেই; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় না-রাখলেই নয়, সোনার পাত দিয়ে বানানো এরকম কিছু তৈজসপত্র আছে কেবল। এঁদের ট্রেগুলোতে বসানো আছে মাটির পাত্র, তাতে সম্ভবত খাবার আর মদ। কোনো কোনো কঙ্কালের সঙ্গে বর্শা আর অন্য দু'-একরকম অস্ত্র।

এরপরের কয়েকটা চেয়ার দেখলাম খালি পড়ে আছে। ভাবছি, আর কোনো কঙ্কাল দেখতে হবে না; এমন সময় চোখে পড়ল আরেকটা চেয়ার, তাতে ছোট্ট একটা কঙ্কাল। দেখেই বুঝলাম কঙ্কালটা নারীদেহের। তার মানে কোনো এককালে মুরের রানি ছিলেন ওই মহিলা, মৃত্যুর পর সহায়-সঙ্গীহীন অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁকে।

'সন্দেহ নেই,' কঙ্কালটার সামনে কিছুক্ষণের জন্য থামলেন রানি, 'ফাংরা খুব গরিব হয়ে পড়েছিল তখন। ওদের ইতিহাসে রানির শাসন খুব কমই আছে, যেসব নারী শাসন করেছে ওদেরকে তাঁরা তেমন একটা মর্যাদা পায়নি কোনোকালেই। আমার মনে হয় এই রানির শাসনকাল ছিল ভূমিকম্পের পর। তখন অল্প কয়েকজন ফাং থাকত এই জায়গায়। তারপর সুযোগ বুঝে আবাটিরা দখল করে নেয় মুর।'

'তা হলে,' রানির দিকে তাকাল অলিভার, 'আপনাদের রাজা-রানিদের সমাধি কোথায়? আরও সামনে?'

'না। আগেও বলেছি, এই জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। আমাদের রাজা-রানিদেরকে কবর দেয়া হয় বাইরে, এরকম গুহার মধ্যে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয় না। আর আমার ব্যাপারে বলে রেখেছি আমার লোকদের, মরার পর আমার কোনো সমাধি যেন না-বানায় ওরা, খুব সাধারণভাবে কবর দেয়া হবে আমাকে, আর দশজন লোক যেভাবে মাটির নীচে যায় আমারও সেভাবে যাওয়ার ইচ্ছা। মরার পরে ঘাস আর ফুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই আমি। ...অল্প কয়েকটা দিন, কে জানে আর ক'দিন, তারপর আমার, আমাদের সবারই এই অবস্থা হবে। আরেকজন হয়তো এসে খুঁজে পাবে আমাদের কঙ্কাল, মন্তব্য করবে আমাদের ব্যাপারে। ...যা-হোক, আপাতত বেঁচে আছি আমরা, এবং যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ ভালো কিছু করার চেষ্টা করে যাবো। ...আপনাদের পুরস্কার দেখলেন আপনারা; বলুন, পছন্দ হয়েছে? এই পরিমাণ সোনা পেলে চলবে আপনাদের নাকি আরও লাগবে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অলিভার, কিন্তু থেমে যেতে হলো ওকে, কারণ হঠাৎ করেই নিভে গেছে কুইকের লণ্ঠন, আরও গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। বার দু'-এক থাবা দিল সে, কিন্তু কাজ হলো না। 'প্রথম থেকেই দেখছিলাম সমস্যা ছিল জিনিসটায়,' বিরক্ত হয়ে বলল সে। 'বলবো বলবো করেও বলা হয়নি। ...হায়, হায়, ডাক্তার অ্যাডামস, আপনার লণ্ঠনও তো নিভে যাচ্ছে!'

কথাটা শেষ হলো কি হলো না, একবার মাত্র লাফিয়ে উঠেই নিভে গেল আমার লণ্ঠনের শিখা। অন্ধকারে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলাম আমি হাতে-ধরা জিনিসটার দিকে।

'সলতে!' স্বভাববিরুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন রানি, 'সঙ্গে করে নতুন সলতে আনতে ভুলে গেছি আমরা! তেল নিয়ে এসেছি ঠিকই কিন্তু সলতে আনার কথা খেয়াল নেই আমাদের কারোরই। ওটা ছাড়া তেল দিয়ে কী হবে? ...চলুন, তাড়াতাড়ি করতে হবে

আমাদের; গহ্বরের মুখ, যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম আমরা এই গুহায়, এখনও অনেক দূরে আছে। আমরা যদি এখানে হারিয়ে যাই তা হলে বিশ্বাস করুন কেউ কোনোদিন আসবে না খুঁজতে। প্রধান পুরোহিত হয়তো আসতে পারেন, কিন্তু এই বয়সে কী করতে পারবেন তিনি জানি না।' কথা শেষ করে অলিভারের হাত ধরলেন তিনি, তারপর দৌড়াতে শুরু করলেন। তাঁদের পিছন পিছন দৌড়াতে লাগলাম আমি আর কুইক।

'আস্তে, ডাক্তার অ্যাডামস, আস্তে!' যত তাড়াতাড়ি পারি দৌড়াচ্ছিলাম, আমাকে পরামর্শ দিল কুইক। 'একসঙ্গে বিপদ মোকাবেলা করার সময় তাড়াহুড়ো করার চেয়ে পাশাপাশি থাকাটা বেশি জরুরি আর কাজের। ...আমার হাত ধরুন, গতি কমান। অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদেরকে, তাই দম ঠিক রাখতে হবে। মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ...সামনের ওই আলোটার দিকে চোখ রাখুন,' রানির হাতের লণ্ঠনটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'কিছুতেই আড়াল হতে দেবেন না ওটাকে, তা হলেই কাজ হবে।'

আমাদেরকে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন রানি আর অলিভার, আমরা পিছিয়ে পড়েছি টের পেয়ে থেমে দাঁড়ালেন রানি, লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন আমাদের দু'জনকে। দূর থেকে দেখলাম, অনুজ্জ্বল আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাঁর অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা, থেকে থেকে চকচক করছে পোশাকের রূপার ঝালরগুলো। একটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই নেচে উঠল তাঁর লণ্ঠনের শিখা, নিভে গেল আগুন। অলিভারের লণ্ঠন নিভে গেছে আগেই, তাই গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল আমাদের চারজনকে।

'যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, ডাক্তার অ্যাডামস, আর সামনে আসার দরকার নেই। আমরাই আসছি আপনাদের কাছে। আর কিছুক্ষণ পর পর চিৎকার করে জানান দিন কোথায় আছেন।

তা হলে সহজেই খুঁজে বের করতে পারবো আপনাদেরকে।'

'জী সার,' বলে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল কুইক যে, বদ্ধ গুহায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই আওয়াজ বলতে গেলে আমার কানে তালা লাগিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি।

'ঠিক আছে, আসছি আমরা,' চেঁচিয়ে বলল অলিভার। কিন্তু শুনে মনে হলো এখনও যথেষ্ট দূরে আছে ওরা, তাই গলা ফাটিয়ে আবারও চেঁচিয়ে উঠল কুইক।

এবারও সাড়া দিল অলিভার। একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম—ঠিক যেদিক দিয়ে এলে আমাদের সামনে হাজির হতে পারবে ওরা সেদিক দিয়ে আসছে না ওর কণ্ঠ, বরং বার বার কিছুটা সরে যাচ্ছে মনে হয়। বুঝলাম, প্রতিধ্বনির কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা, ভুল পথে চলে যাচ্ছে।

সন্দেহ নেই, এভাবে এগোলে আমাদেরকে কোনোদিনই খুঁজে পাবে না অলিভার। কাজেই ওদেরকে থামতে বলল কুইক, বলল আমরা দু'জন এগোচ্ছি এবার, যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে পারবো ওদেরকে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছি রানিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে অলিভার, অন্ধকারে চলতে গিয়ে যেটা হয়তো টের পায়নি সে।

কিন্তু কিছুদূর এগোতে-না-এগোতেই ঘটল বিপত্তি। কিছু একটার সঙ্গে পা আটকে গেল আমার, হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়লাম। ঝনঝন শব্দ শুনে বুঝলাম, গুপ্তধন-ভর্তি কোনো একটা ট্রে'র উপর পড়েছি হাত-পা ছড়িয়ে। সামনে হাত বাড়ানোমাত্র ধরতে পারলাম কিছু একটা, কুইকের বুট মনে করে আরও ভালোমতো আঁকড়ে ধরতে গিয়ে টের পেলাম, হাতের জিনিসটা মড়ার খুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্ধকারে আমাকে খুঁজে বের করল কুইক, টেনে তুলল। কী করবো বুঝতে পারছি না কেউই। কঙ্কালগুলোর মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লাম, কান পাতলাম। চিৎকার করে

boiRboi.net

আমাদেরকে ডাকছে অলিভার, কিন্তু কেন জানি না ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হচ্ছে ওর কণ্ঠ; রহস্যময় একজাতের ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি যেন, সুরটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারছি না।

'একদম বোকার মতো কাজ করেছি আমরা,' নিজের উপরই বিরক্ত হচ্ছি আমি। 'এত তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়েছি যে, ম্যাচবাক্স পর্যন্ত আনার কথা মনে নেই। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। ...কুইক, স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করো যাতে বাইরে অপেক্ষমাণ আবাটিদের মন থেকে ভূতের ভয় উধাও করে দেন তিনি, আর আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজতে আসে ওরা।'

'ভূতের ভয়ের কথা বলছেন?' খেয়াল করলাম অল্প অল্প কাঁপছে কুইকের কণ্ঠ, 'তা হলে তো আবাটিদের আগে নিজের জন্য প্রার্থনা করতে হবে আমাকে। লণ্ঠনের আলোয় এতগুলো কঙ্কাল দেখা এক কথা আর এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে কঙ্কালগুলোর মাঝখানে বসে থাকাটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। ...কিছু শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আমার তো মনে হয় উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে কিছু কঙ্কাল। নিজেদের মধ্যে কথাও বলছে বোধহয়, শুনছেন, কারা যেন ফিসফিস করছে?'

'কিছু একটা যে শুনতে পাচ্ছি সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় আমাদের কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ...তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ, কুইক।'

'তা হলে মুখ বন্ধ রাখলেই মনে হয় ভালো হয়, সার। কারণ আমাদেরকে কথা বলতে দেখে ওদেরও কথা বলার ইচ্ছা জেগেছে বোধহয়, তাই ফিসফিস করছে। এরকম একটা জায়গায় অদ্ভুত ওই ফিসফিসানি শুনলে গা ছমছম করবে না—এত বড় দুঃসাহসী বোধহয় নেই কোথাও।'

কথা থামালাম আমরা। কিন্তু অদ্ভুত ওই ফিসফিসানি থামল না। একটু খেয়াল করাতে মনে হলো, আমাদের পিছনের গুহার

boiRboi.net

দেয়াল ভেদ করে যেন আসছে শব্দটা। আরও আশ্চর্যের কথা, আমার মনে হলো আগেও কোথাও শুনেছি আমি এই ফিসফিসানি। ভাবলাম কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় শুনেছি, কিংবা আদৌ শুনেছি কি না। পরে মনে পড়েছিল, যখন খুব ছোট ছিলাম, লণ্ডনের সেইন্ট পল'স ক্যাথেড্রালের "হুইসপারিং গ্যালারি"তে একবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে, আর সেখানেই এরকম অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই।

আধ ঘণ্টার মতো কেটে গেল। আবাটিদের কোনো চিহ্ন নেই, অলিভার বা রানি মাকেডার পক্ষ থেকেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ শুনি পকেট হাতড়াচ্ছে কুইক। জানতে চাইলাম কী করছে সে।

'আমার কোটের লাইনিং-এ মনে হয় একটা ম্যাচকাঠি আছে,' বলল কুইক। 'লণ্ডন থেকে যেদিন রওনা হই আমরা, সেদিন কী মনে হওয়াতে রেখে দিয়েছিলাম জিনিসটা কোটের পকেটে, এখন মনে পড়ল। খুঁজে পেলে ধরে নিন কাজ হয়ে গেছে, কারণ আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মশাল আছে। হয়তো খেয়াল করেননি, লণ্ঠন নিভে গেলে কাজে লাগতে পারে ভেবে সারাটা সময় ওগুলো বহন করেছি আমি।'

ওর মশাল বহন করার ব্যাপারটা সত্যিই খেয়াল করিনি আমি। তবে ম্যাচকাঠির ব্যাপারে ভরসা করতে পারলাম না ওর উপর, তাই চুপ করে থাকলাম। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে একটু পরই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পেয়েছি! বলেছিলাম না আছে জিনিসটা!'

আর দেরি করলাম না আমরা, দুটো মশাল জ্বালিয়ে নিলাম ঝটপট।

অন্ধকার দূর হলো কিছুটা। অভাবনীয় একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয় বলতে ভুলে গেছি, এখন যে-গুহায়

boiRboi.net

আছি আমরা, সেটার মাঝখানে বেদির মতো উঁচু একটা জায়গা আছে। আসলে মশাল জ্বালানোর পরই বেদিটা চোখে পড়েছে আমার, এর আগে খেয়াল করিনি। যা-হোক, সন্দেহ নেই, ব্যাসাল্ট পাথরের বেশ বড় একটা ব্লক দিয়ে বানানো এই বেদি, প্রাচীন রাজাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কাজে লাগানো হতো। সেটার মাঝখানে খোদাই করা আছে মানুষের চোখের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত একটা প্রতীকচিহ্ন। বেদির পাদদেশে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নকশাখচিত স্ফিংক্স।

সিঁড়ির সবচেয়ে নীচের ধাপে, রানি মাকেডাকে নিয়ে খুবই অন্তরঙ্গভাবে বসে আছে অলিভার। একহাতে রানির কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে। আবেশে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেছে রানির, অলিভারের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছেন তিনি সংজ্ঞাহীনের মতো। তাঁর ঠোঁটে যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে অলিভারের ঠোঁট, একের পর এক চুমু দিয়ে যাচ্ছে সে। দু'জনের কেউই টের পাচ্ছে না আমাদের উপস্থিতি!

বদ্ধ জায়গায় মশালের ধোঁয়ার কারণেই হোক, অথবা সামনের ওই অচিন্তনীয় দৃশ্যের কারণেই হোক, দম আটকে গেল আমার, খক খক করে কাশতে লাগলাম আমি। হাত ধরে আমাকে টেনে সামনে নিয়ে গেল কুইক, অলিভারের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা।

'আপনাকে দেখে কী যে খুশি লাগছে, ক্যাপ্টেন, বুঝিয়ে বলতে পারবো না,' তিক্ত গলায় বলল কুইক। 'আপনার জন্য...আসলে আপনাদের জন্য যার-পর-নাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। এতক্ষণ হয়ে গেল, অথচ কোনো সাড়াশব্দ নেই...। আসলে মানুষ যখন খুব জরুরি কোনো কাজ করে তখন নিঃশব্দেই করার চেষ্টা করে। যা-হোক, কপাল ভালো আমাদের, আমার কোটের লাইনিং-এর ভিতরে একটা ম্যাচকাঠি খুঁজে পেয়েছি। তবে প্রফেসর হিগস যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন তা

হলে এত কষ্ট হতো না—সবসময় ধূমপান করেন বলে তাঁর কাছে আবার ম্যাচকাঠির অভাব হয় না। ...এ কী! আমাদের মহামান্য রানির এ কী অবস্থা? ও বুঝেছি, জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিক, জীবনে প্রথমবারের মতো...মানে, এত গরম কোনো জায়গায় জীবনে প্রথমবারের মতো অনেকক্ষণ ধরে আছেন তো বেচারা, তাই ওরকম হয়েছে। তবে ভাগ্য খুবই ভালো তাঁর—আর যা-ই করুন তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাননি আপনি। ...সার, তাঁকে তো ধরেই আছেন, এবার কি একটু উঠবেন? যাবেন আমাদের সঙ্গে? দেরি হয়ে যাচ্ছে কি না, রসিক মশালগুলো যে-কোনো কারণেই হোক নিভে যেতে চাইছে বার বার। আপনাকে কষ্ট করতে হতো না, আমিই ধরতাম রানিকে, কিন্তু মুশকিলের কথা হচ্ছে, জনৈক মৃত রাজার দাঁতের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে আমার একটা পা বলতে গেলে খোঁড়া হয়ে গেছে। ...আপনি কি পারবেন রানিকে তুলতে নাকি ডাক্তার অ্যাডামসকে বলবো? তিনি আবার বয়স্ক মানুষ, রানির গায়ে হাত দিলে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। ...আসলে হয়েছে কি, এখানে তো আর সারারাত থাকতে পারি না আমরা; আবাটিদের স্বভাব তো জানাই আছে আপনার, বলবে গুপ্তধন দেখানোর নাম করে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদেরকে, মানে আপনাকে নিয়ে এখানে এসেছেন রানি। ভালো মানুষটাকে কলঙ্কিত করে ছাড়বে। ...ডাক্তার অ্যাডামস, রানি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছেন; তাঁর একটা হাত ধরুন আপনি, চলুন রওনা হই আমরা। মশাল নিয়ে সামনে থাকছি আমি।'

আমাদেরকে দেখে বিস্ময়ে বা লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল অলিভার, তাই কুইকের এত তিরস্কার শুনেও কিছু বলতে পারল না। এগিয়ে গিয়ে রানির অবস্থা দেখলাম আমি, প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা দিলাম, জ্ঞান ফিরে পেতে সময় লাগল না তাঁর। সাহায্য করতে চাইলাম, কিন্তু মাথা নেড়ে তিনি বললেন একাই যেতে

পারবেন, কারও সাহায্য লাগবে না। কিন্তু আমাদের পিছন পিছন যখন আসছিলেন তিনি, দেখলাম দু'হাতে অলিভারের একটা হাত জড়িয়ে ধরে আছেন, আর একটু পর পর মুখ তুলে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছেন ভালোবাসার মানুষটাকে।

উল্লেখ করার মতো কিছুই ঘটেনি এরপর, যে-গহ্বর দিয়ে "প্রাচীন রাজাদের কবরস্থান"-এ ঢুকেছিলাম আমরা সেখান দিয়ে বের হয়ে আসতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। অতিথি-ভবনে, আমাদের কামরায় আমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেন রানি মাকেডা।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমার মুখোমুখি হলো অলিভার, বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'রাজাদের কবরস্থানে আজ বিকেলে এটা কী হলো?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। 'কী হলো মানে?'

'হঠাৎ করে মশাল জ্বালাল কেন কুইক?'

কী বোঝাতে চাইছে অলিভার বুঝতে পেরে মেজাজ বিগড়ে গেল আমার। তারপরও নিজেকে সংযত রেখে বললাম, 'হঠাৎ করে জ্বালায়নি। ওর নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা না যে, অন্ধকারে রানিকে এত কাছে পেয়ে ওরকম কিছু করে ফেলবে তুমি। ...মশাল জ্বালানোর আগে অদ্ভুত একটা ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি সেটা কীসের শব্দ ছিল।'

'হ্যাঁ,' উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল অলিভার, রেগে গেছে সে-ও, 'রানি মাকেডাকে ভালোবাসি আমি। আমাকেও ভালোবাসেন তিনি। মুখ ফুটে কেউ কাউকে বলতে পারিনি কথাটা এতদিন, গুহার ভিতরে লণ্ঠন নিভে যাওয়ার পর যা ঘটল আমাদের মধ্যে তাতে আর কারোরই কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। ...হয়তো কাজটা করা উচিত হয়নি আমার, কিন্তু ওরকম একটা পরিবেশে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।'

'শুনে ভালো লাগল, একজন আরেকজনকে ভালোবাসো তোমরা,' ভোঁতা কণ্ঠে বললাম। 'তবে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো? আমাকে আগেই বলেছিল কুইক, এরকম কিছু শুনতে হতে পারে একদিন। আফসোস, ওর কথা পাত্তা দিইনি সেদিন।'

'কুইকের কথা বাদ দিন,' সার্জেন্টের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অলিভার। 'ভালোবাসার কী বোঝে সে? আর, রানির সঙ্গে প্রেম করতে আমার অসুবিধাটা কোথায়? এমন তো না যে জোর করে কিছু করছি আমি। রানির পক্ষ থেকেও পূর্ণ সম্মতি আছে, আমি তাঁকে যতটা চাই তিনিও আমাকে ঠিক ততটাই চান। হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন, তিনি ইহুদি এবং সভ্য জগৎ থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন একটা উপজাতির রানি। আর আমি খ্রিস্টান এবং ইংরেজ। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে এসব কোনো ব্যাপারই না। ইচ্ছা করলেই মানিয়ে নেয়া যায়। এখানে সামাজিক দিক দিয়ে বলুন কিংবা টাকাপয়সার দিক দিয়ে বলুন, আমার চেয়ে অনেক অনেক উপরে তিনি; কিন্তু ইউরোপে আমরা দু'জনই সমান। তাঁর চালচলন প্রাচ্যদেশীয়দের মতো, এটাও কোনো ব্যাপার না। তা হলে সমস্যাটা কোথায় বলুন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'ভালোবাসা নামের আবেগটার সবচেয়ে বড় দোষ কী জানো? এটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, চোখ থাকতেও সে দেখে না। ...আফ্রিকা বলতে গেলে চষে বেড়িয়েছি আমি, যত সুন্দরী নারী দেখেছি রানি মাকেডা তাদের সবার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দরী। যদি তাঁর সৌন্দর্যই তোমাকে আকর্ষণ করে থাকে তা হলে আরেকবার ভেবে দেখো তোমার আবেগটার নাম প্রেম নাকি অন্য কিছু। মস্তিষ্কটাকে একটু কাজে লাগাও, অলিভার, কারণ ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেলে ওই কাজ আর করা যাবে না।'

'ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে মানে?'

'মনে করে দেখো, এখানে আসার অনেক আগেই তোমাকে

boiRboi.net

বলেছিলাম, আর যা-ই করো, আবাটিদের রানির সঙ্গে প্রেম—ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক গড়তে যেয়ো না। ...মনে পড়ে?'

'বলেছিলেন নাকি?' অলিভারের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'সত্যিই, একটুও খেয়াল নেই আমার। আসলে এত কথা বলেছেন আপনি আমাকে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা মনে রাখবো বুঝতে পারিনি।'

বলতে বলতে লাল হয়ে গেল অলিভারের গাল, দৃষ্টি সরিয়ে নিল, সে যে মিথ্যা বলছে বুঝতে বাকি থাকল না আমার বা কুইকের।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার মুখ খুলল কুইক, 'আসলে আমাদের ক্যাপ্টেনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ডাক্তার অ্যাডামস। তিনি যে মনে রাখতে পারেন না সে-কথাটা বরং আমাদেরই মনে রাখা উচিত। হাজার হোক বিস্ফোরণের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, আর ওরকম ধাক্কায় মস্তিষ্ক এত জোরে ঝাঁকুনি খায় যে, অনেকেরই স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ...একটা সত্যি ঘটনা বলি। বোয়াদের সঙ্গে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হলো না, তখন কোত্থেকে বিরাট এক বোমা এসে পড়ল ইংরেজ বাহিনীর উপর। যারা মারা গেল তারা তো মরে বাঁচল, কিন্তু বিস্ফোরণের ধাক্কা খাওয়ার পরও যারা বেঁচে ছিল তারা স্রেফ ভুলে গেল কী করা উচিত। যার যার কর্তব্য ভুলে খরগোসের মতো পালাতে লাগল সবাই।'

হেসে ফেললাম আমি। বিড়বিড় করে কিছু বলল অলিভার, স্পষ্ট শোনা গেল না।

কুইক বলে চলল, 'ক্যাপ্টেন অলিভার যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তা হলে আমাদের উচিত তাঁকে মনে করিয়ে দেয়া। লণ্ডনে, প্রফেসর হিগসের বাসায়, যে-রাতে এই অভিযানের ব্যাপারে আলোচনা হয়, সে-রাতেই রানির ব্যাপারে ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করে দেন ডাক্তার অ্যাডামস। তখন ক্যাপ্টেন বলেন, একটা নিগ্রো

মহিলার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই...'

'নিগ্রো মহিলা!' চেঁচিয়ে উঠল অলিভার। 'ওরকম কিছু বলা তো দূরের কথা, রানির ব্যাপারে ওরকম কিছু চিন্তাও করিনি আমি। আমার ব্যাপারে এত বাজে একটা কথা বলতে পারলেন? ...নিগ্রো মহিলা! আমার এত বড় বদনাম?'

'আমি খুবই দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। এতক্ষণে আসল কথাটা মনে পড়েছে আমার। খুব তাড়াহুড়ো করে বলেছিলেন, কালো মহিলা। শুনে, তখন সম্ভবত বড় বড় কথা বলতে নিষেধ করি আমরা আপনাকে।'

আলোচনা আর এগোল না। যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমরা। কিন্তু এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম আমি, ঘুম এল না সহজে।

বিষাদে ভরে গেছে মন। মস্ত বড় বোকামি করে ফেলেছি। যত কুশলীই হোক না কেন, অলিভারের মতো অবিবাহিত কারও বদলে এই অভিযান পরিচালনার কাজটা দেয়া উচিত ছিল বিবাহিত কোনো লোকের হাতে। কিন্তু...বিবাহিত কেউ যদি থাকত ওর জায়গায় তা হলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? জোর দিয়ে কি বলা যায় নৈতিক স্খলন হতো না ওই লোকটার? বিয়ে করলেই কি মানুষের মন থেকে অবৈধ কামনা-বাসনা দূর হয়ে যায়?

আসলে, নির্জলা সত্যি কথা হচ্ছে, রানি মাকেডা খুবই আকর্ষণীয় একজন মানুষ। যেমন তাঁর সৌন্দর্য, তেমনই তাঁর ব্যবহার আর ব্যক্তিত্ব। তার উপর, যে-পুরুষের মনে সামান্যতম করুণা আছে, রানির অসহায়ত্ব নিজের চোখে দেখলে সে-ও রানির প্রতি দয়াপরবশ না-হয়ে পারবে না। সব কিছু আছে রানির, তবুও যেন কিছুই নেই তাঁর, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছেন তিনি কাপুরুষে ভরা একটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, ভাগ্যের নির্মম

পরিহাস মেনে নিয়ে শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরে যিনি এমন এক হোঁতকার সঙ্গে বাগ্দান করেছেন যার মধ্যে সাহস বলতে কিছুই নেই এবং যে কি না তাঁরই আপন চাচা!

এরকম একটা মানুষের মন যে অলিভারকে দেখামাত্র নেচে উঠবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার আর কী আছে? প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বোমা ফাটানোর জন্য হারম্যাকের ওই তোরণে একা রয়ে গেল অলিভার, বিস্ফোরণের ধাক্কা সহ্য করে মরতে মরতে ফিরে এল আমাদের কাছে, আরও বড় কথা—যে-কোনো আবাটির চেয়ে অনেক সুদর্শন সে। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে যে ছুটে এসেছে শুধু রানিকে সাহায্য করার জন্য, আবাটিদের দৃষ্টিতে "অতিমানবীয়" ক্ষমতা আছে যার। সুতরাং রানি মাকেডার জন্য ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম হচ্ছে রূপকথার রাজপুত্র। তাই সে অসুস্থ হলে ওর সেবা করার জন্য ছুটে যান রানি নিজেই, ওর অবস্থা খারাপ শুনে কেঁদে ফেলেন, তিনি যে কতটা নির্ভর করেন ওর উপর তা বোঝানোর জন্য সময়ে-অসময়ে প্রকাশ্যে-গোপনে জড়িয়ে ধরেন ওর হাত।

কিন্তু এই প্রেমের পরিণতি কী? আজ হোক বা কাল, গোপন এই সম্পর্কের কথা জানাজানি হবেই; তখন কী হবে? আবাটিদের অনেকেই, বিশেষ করে যশুয়া দু'চোখে দেখতে পারে না আমাদেরকে, আর অলিভারকে তো পারলে খুন করে। কারণ আর কিছুই নয়—বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টিতে আমাদেরকে দেখেন রানি। অনুগ্রহ করাতেই এই অবস্থা, ভালোবাসার কথা জানতে পারলে না জানি কী করে বসে সে! তা ছাড়া আবাটিদের আইনেই আছে, তাদের রানির সঙ্গে কেউ "অন্যায়" কোনো সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে লোকটাকে। ওদের ধর্মের সঙ্গে রানির এই শাসনের নিবিড় সম্পর্ক আছে; যদি রানির দিকে ভিনদেশী কেউ হাত বাড়ায় তা হলে তা হবে ওদের ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, আর পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষই তাদের ধর্মের

অবমাননা মেনে নেয়নি কোনোদিন, নেবেও না।

দরবার কক্ষে, রানির সভাসদদের সামনে, আনুগত্যের শপথ নিয়েছে অলিভার; এই দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলতে রাজি হয়েছে। এখন সে নিজেই যদি অবিবেচকের মতো কিছু করে বসে তা হলে শাস্তি পেতে হবে কাকে বা কাদেরকে?

উত্তরটা খুব সহজ। অলিভারকে তো খুন করবেই আবাটিরা, আমাকে আর কুইককেও ছাড়বে না। আর, আমার মনে হয়, রানি মাকেডাও তাঁর সিংহাসন হারাবেন, বড় কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে তাঁকেও।

সব বোঝে অলিভার, তারপরও কী করে ওরকম উদ্ধত হতে পারে সে? কোত্থেকে এত সাহস আসে ওর মধ্যে? রানি মাকেডাই বা ওকে বাধা দেন না কেন? তিনি কি জানেন, প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, নিজের আর অলিভারের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছেন তিনি?

তিনি কি জানেন, ফাংদের কবল থেকে নিজের দেশ উদ্ধার করার সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দিতে যাচ্ছেন নিজেই?

তিনি কি জানেন, আমার ছেলেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যে-আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই আশ্বাস এখন আমার কাছে কতটা হাস্যকর এক বুলিতে পরিণত হয়েছে?

আমাদের অভিযান তা হলে এখানেই শেষ? এতগুলো বছর ধরে আমার ছেলেকে খুঁজছি আমি, সেই খোঁজের তা হলে এখানেই সমাপ্তি?

প্রেম মানুষকে এত স্বার্থপর করে দেয়?

boiRboi.net

এগারো

পরদিন সকালে নাস্তার সময় বলতে গেলে বোবা বনে থাকলাম তিন জনই। গতকাল বিকেলের ঘটনা নিয়ে একটা কথাও বললাম না, এমনকী রাতে ঘুমানোর আগে আমাদের মধ্যে যা যা কথা হয়েছিল তার একটা শব্দও উচ্চারণ করলাম না কেউ।

বলার মতো কিছু নেইও আসলে। কী হচ্ছে আর কী হবে ভাবতে গিয়ে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না, তাই চুপ করে আছি আমি; আর কুইককে দেখে মনে হচ্ছে দার্শনিক চিন্তাভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে। ওদিকে কিছু একটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছে অলিভার, আলুথালু অবস্থা ওর। যতবার ওর দিকে তাকাচ্ছি ততবার কেন যেন কবিদের কথা মাথায় চলে আসছে আমার, মনে হচ্ছে এখনই খাতা-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসে যাবে সে।

যা-হোক, আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষের দিকে, এমন সময় একজন দূত এসে জানাল, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দেখা পেলে খুশি হবেন ওয়ালদা নাগাসটা।

শুধু এই কথাটা শুনেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খুশি হয়ে গেল অলিভার; সে আবার উল্টোপাল্টা কিছু না বলে বসে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'রানির আদেশ শিরোধার্য।'

আমার চিন্তা আরও বাড়ল। নিশ্চয়ই এরকম কিছু একটা হয়েছে যার কারণে আমাদের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে দেখা করতে চাচ্ছেন রানি মাকেডা। কারণটা কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে প্রস্তুত হলাম তিন জনই, তারপর গিয়ে হাজির হলাম রানির

boiRboi.net

সাক্ষাৎকার-কক্ষে।

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় অলিভারের উদ্দেশ্যে নিচু কণ্ঠে বললাম, 'তোমার নিজের, রানি মাকেডার এবং আমরা যারা জড়িত আছি এই অভিযানের সঙ্গে তাদের সবার ভালোর জন্য মিনতি করি তোমার কাছে, সাবধান হয়ে যাও। তুমি যা বলবে অথবা যা করবে তার সবই খেয়াল করবে কেউ-না-কেউ।'

'ঠিক আছে,' কিছুটা হলেও লজ্জা পেল অলিভার, 'আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম, 'আস্থা রাখতে পারলে ভালোই হতো।'

নিজের আসনে বসে আছেন রানি মাকেডা। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। রানির আশপাশে বসে আছেন মুরের কয়েকজন বিচারক আর সেনাবাহিনীর অফিসার। এঁদের মধ্যে যশুয়াও আছে। সাধারণ বাদামি রোব পরা রুক্ষ চেহারার দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন রানি, আমাদের দেখে আন্তরিক সম্ভাষণ জানালেন, কুশল বিনিময়ের পর বললেন, 'বন্ধুরা, বিশেষ একটা ঘটনা ঘটেছে, তাই ডেকে পাঠাতে হলো আপনাদেরকে। আজ সকালে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিশ্বাসঘাতক শ্যাডর্যাককে, এখন যাঁদেরকে আমার পাশে বসে থাকতে দেখছেন তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন তখন। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে শ্যাডর্যাক, বলে কিছুটা হলেও যেন সময় দেয়া হয় ওকে। এঁরা তখন জিজ্ঞেস করেন কেন, কারণ ওর রায় পুনর্বিবেচনা করার প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয়েছে। শ্যাডর্যাক তখন বলে, ওকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়া না-হয় তা হলে নাকি আপনাদের সঙ্গী, কালো জানালা বলে যাঁকে ডাকি আমরা, ফাংদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন যিনি, তাঁকে উদ্ধার করার উপায় জানিয়ে দেবে সে।'

'কীভাবে?' একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আমি আর অলিভার।

'জানি না,' বললেন রানি। 'কিন্তু তখন আর ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেননি এঁরা, ওকে নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। ওকে বরং হাজির করি আপনাদের সামনে, আপনারাই না-হয় কথা বলে দেখুন কী বলতে চায় সে। ...শ্যাডর‍্যাককে নিয়ে এসো আমার সামনে।'

এক দিকের দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল শ্যাডর‍্যাক। ওর দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, পায়ে ভারী শিকল। স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ ওর চেহারায়, দেখেই বোঝা যায় যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওর এই ক'দিনে। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে ওর দু'চোখ, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে একটু পর পর। রানির সামনে দাঁড়ানোমাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল সে, তারপর শরীরটা কোনোরকমে মুচড়ে চুমু দেয়ার চেষ্টা করল অলিভারের বুটে। একটানে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল প্রহরীরা।

রানি মাকেডা বললেন, 'শুনলাম আমাদেরকে নাকি কী বলতে চাও তুমি?'

'জী। কিন্তু কথাটা গোপনীয়। সবার সামনে বলাটা কি উচিত হবে?'

'না, উচিত হবে না,' বলে আশপাশে থাকা বেশিরভাগ লোককে বাইরে যেতে বললেন রানি, এমনকী জল্লাদ আর প্রহরীদেরকেও।

'লোকটা এখন মরিয়া,' বিচলিত কণ্ঠে বলল যশুয়া। 'ওকে পাহারা দেয়ার কেউ নেই। যা খুশি তা-ই করে বসতে পারে সে।'

'আমি পাহারা দেবো,' ভাঙা ভাঙা আরবিতে বলে শ্যাডর‍্যাকের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কুইক। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'সাবধান, কুত্তা, উল্টোপাল্টা কিছু করিস না। এমনিতেই তোকে খুন করার জন্য হাত নিশপিশ করছে আমার।'

সবাই বাইরে চলে যাওয়ার পর শ্যাডর‍্যাককে বললেন রানি

শেবা, 'এবার বলো কী বলবে।'

'বলবো, ফাংদের ওই বিশাল মূর্তিটার সঙ্গে, নির্দিষ্ট একটা জায়গাতে কয়েদ করে রাখা হয়েছে কালো জানালাকে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমি জানি। এবং ফাংদের রাজাও কথাটা বলেছেন, তা-ই না? এখন কথা হচ্ছে, ওই মূর্তির কাছে পৌঁছানোর খুবই গোপন একটা রাস্তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি আমি। ওই রাস্তা দিয়ে গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করতে পারবেন আপনারা। ...ছেলেবেলায় আমার নাম ছিল বিড়াল। কেন জানেন? কারণ গাছে, দেয়ালে অথবা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় চড়তে কোনো জুড়ি ছিল না আমার। একবার পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ওই রাস্তাটা খুঁজে পাই আমি। ...আমার চেহারায় এই যে কাটা দাগগুলো দেখছেন, এগুলো কীভাবে হয়েছে জানেন? একবার ফাংদের হাতে ধরা পড়ি আমি, একপাল সিংহ আছে ওদের, জন্তুগুলোর মুখে আমাকে ছুঁড়ে দেয় ওরা তখন। কিন্তু পাহাড়ি দেয়াল বেয়ে পালিয়ে যাই আমি, গোপন ওই পথ ধরে ফিরে আসি ঘুরে। এখন আমার কথা হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিন আমাকে, আপনাদেরকে ওই পথ চিনিয়ে দেবো আমি।'

'শুধু রাস্তা চেনালেই হবে না,' বললেন রানি, 'বিদেশি ওই লোকটাকে উদ্ধারও করতে হবে তোমার। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই আজ ফাংদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন তিনি। ওঁকে যদি উদ্ধার না-করো তা হলে মরবে তুমি। বুঝতে পেরেছ?'

'এটা কেমন কথা বললেন, রানি? আমি তো ঈশ্বর না যে, মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো? তা ছাড়া ওই লোকটা এতদিনে বেঁচে আছে কি না তা-ও জানি না আমরা কেউই। তবে এটুকু বলতে পারি, চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না—উদ্ধার করে আনবো ওই মানুষটাকে। তবে শর্ত

হচ্ছে, যদি তাঁকে বাঁচাতে পারি তা হলে আমার প্রাণ ভিক্ষা দেবেন আপনি, না-পারলে আপনি যা শাস্তি দেবেন তা-ই মাথা পেতে নেবো। ...একটা কথা আগেই বলে রাখি, রাস্তাটা কিন্তু খুবই খারাপ, আমি যতটা সহজে যাওয়া-আসা করতে পারবো আপনাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না ব্যাপারটা।'

'তুমি যদি যেতে পারো তা হলে আমরাও পারবো,' বললেন রানি মাকেডা। 'এখন বলো কী করতে হবে আমাদেরকে।'

বলতে শুরু করল সে। কিন্তু ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল যশুয়া, 'যত্তোসব বাজে কথা। এরকম একটা বিপজ্জনক অভিযানে যাবেন আমাদের রানি? অসম্ভব!'

যশুয়ার কথা শুনে রানি বললেন, 'আমার জন্য এত দরদ আপনার? দেখে ভালো লাগল। ধন্যবাদ। কিন্তু আমিও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, কালো জানালাকে উদ্ধার করতে যাবো। আমার শত্রুদের হাতে আমার এক অতিথি বন্দি হয়ে আছেন—শুধু এ-কারণেই না, শ্যাডর‍্যাক বলছে হারম্যাকে যাওয়ার গোপন একটা পথ নাকি আছে, ওই পথটা চিনে রাখা দরকার। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। তবে আপনার কথাটা ফেলে দেয়ার মতো না—এরকম বিপজ্জনক একটা অভিযানে যথাসম্ভব সতর্কতা নিয়েই যাওয়া উচিত আমার। সেজন্যই বলছি, আজ দুপুরে রওনা হবো আমরা, আর আমাদের সঙ্গে আপনিও যাবেন, তা হলেই বোধহয় আর কোনো সমস্যা হবে না।'

কথাটা শোনামাত্র একের পর এক বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে লাগল যশুয়া। কিন্তু ওর একটা কথাতেও কান না—দিয়ে রানি বললেন, 'না, না, আপনি যে সৎ আর নির্ভীক সে-কথা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই অভিযানটা এখন আবাটিদের জন্য মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন জানেন? একজন আবাটির কারণেই কিন্তু আজ ফাংদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন কালো জানালা। কাজেই, এখন আবাটিদেরই দায়িত্ব তাঁকে উদ্ধার

করা। ...চাচা, আপনি আগে অনেকবার বলেছেন আমাকে, পাহাড়ে চড়তে নাকি দারুণ পারদর্শী আপনি, আপনার কথা সত্যি হয়ে থাকলে আমি বলবো চমৎকার একটা সুযোগ এসেছে আপনার সামনে। এই বিদেশিদের সামনে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার ওরকম একটা সুযোগ আপনি হারাবেন কেন? ...দয়া করে আর আপত্তি করবেন না, মুরের রানি হিসেবে আপনাকে আদেশ করছি আমি, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বোঝা গেল অনাড়ম্বর এই সভা এখানেই শেষ।

সেদিন বিকেলে, শ্যাডর‍্যাকের নেতৃত্বে, মুরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটা পর্বতের চূড়ায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা। গোপন এই রাস্তাটা একমাত্র সে-ই চেনে বলে নেতৃত্বের দায়িত্ব ওকেই দেয়া হয়েছে।

আমাদের থেকে পাঁচশ' ফুট বা তারও বেশি নীচে বিস্তৃত সমতলভূমি। এত উঁচু থেকে দেখলে মনে হয়, সবুজের উপর জায়গায় জায়গায় খয়েরির ছোপ দেয়া বিশাল একটা গালিচা বিছিয়ে রেখেছে যেন কেউ। বিস্তৃত এই প্রান্তর থেকে কয়েক মাইল দূরে হারম্যাক শহরটা, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখা যায়, কিন্তু ওদের সেই বিশাল মূর্তিটা চোখে পড়ে না। পাহাড়ের চূড়াটা সামনের দিকে বেঁকে গিয়ে ওটাকে আড়াল করে ফেলেছে।

'এবার?' জিজ্ঞেস করলেন রানি। তাঁর পরনে কৃষাণীদের মতো ভেড়ার-চামড়ার পোশাক, কিন্তু অতি-সাধারণ ওই পোশাকেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। 'পর্বতের চূড়ায় হাজির হয়েছি আমরা। নীচে সমতলভূমি। এদের মাঝখানে-তো কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। চাচা যশুয়াকে যতই উপহাস করি না কেন, এই এলাকা খুব ভালোমতো চেনা আছে তাঁর; তিনিও বলছেন ওরকম কোনো রাস্তার কথা কোনোকালেই নাকি শোনেননি তিনি।'

'শুধু আমি চিনি বলেই তো বলেছি গোপন রাস্তা,' ম্লান হাসল শ্যাডর‍্যাক। 'সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো আমাদের?'

চোখ বুলিয়ে নিলাম শেষবারের মতো। রানি মাকেডা, যশুয়া আর আমরা তিন ইংরেজ মিলে মোট ষোলো জন। সঙ্গে আছে রিপিটিং রাইফেল আর রিভলভার। পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করছে শ্যাডর‍্যাক। দক্ষতা আর সাহসের জন্য পরিচিত—এরকম কয়েকজন পাহাড়ি-লোকও আছে আমাদের দলে। এদেরকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি, কারণ একদল কাপুরুষের মধ্য থেকে এক জন সাহসীকে বের করাটা মোটেও কঠিন কিছু নয়। মুরের দূর-দূরাঞ্চলের গ্রামগুলোতে আজও দেখা পাওয়া যায় এরকম কিছু মেষপালক আর শিকারীর, যাদের বীরত্ব নিয়ে রীতিমতো উপাখ্যান লেখা যায়। পাহাড়েই বসবাস এদের, পাহাড় ঘিরেই এদের জীবন। যা-হোক, দড়ি, লণ্ঠন এবং একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া দেয়া যায় এরকম লম্বা আর হালকা মই বহন করছে আমাদের সঙ্গের বলিষ্ঠ এই লোকগুলো।

মই আর দড়ি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা হলো। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার একপ্রান্ত ক্ষয়ে গেছে বাতাসের আঘাতে, আর সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে আছে কিছু ঝোপঝাড়—দেখলে মনে হয় চূড়াটা সেখানেই শেষ, তারপর খাড়াভাবে নীচের দিকে পাঁচশ' ফুট নেমে গেছে পর্বতটা; ওই ঝোপগুলোর দিকে এগিয়ে গেল শ্যাডর‍্যাক। উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে, হাতড়ে হাতড়ে কী যেন খুঁজল কিছুক্ষণ, তারপর বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর সরিয়ে নিল। আশ্চর্য হয়ে দেখি, একধাপ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে পাথরের নীচ দিয়ে ঢোকা বর্ষার বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গেছে নীচের-দিকে-নেমে-যাওয়া ধাপগুলো। কোনো কোনো ধাপের অবস্থা আরও খারাপ—ভেঙেই গেছে একেবারে।

'নিজেদের প্রয়োজনেই এই সিঁড়ি বানিয়েছিল আমাদের

পূর্বপুরুষরা,' বলল শ্যাডর‍্যাক। 'ছেলেবেলায়, নিতান্তই কপালগুণে, এই রাস্তাটা খুঁজে পাই আমি। ...রওনা হওয়ার আগেই বলে রাখি, সিঁড়ির ধাপগুলো কিন্তু খুবই খাড়া আর জায়গায় জায়গায় ভাঙা; যাদের সাহসের অভাব আছে তারা যদি আমাদের সঙ্গে না-আসে তা হলেই ভালো হবে।'

ঘোড়ায় চড়ে লম্বা একটা পথ পাড়ি দিয়ে এই পর্বতের পাদদেশে হাজির হয়েছিলাম আমরা, তারপর ঢাল বেয়ে উঠে আসি চূড়ায়। তাতেই যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যশুয়া, শ্যাডর‍্যাকের শেষের কথাটা শোনার পর ওর ক্লান্তি আরও বেড়ে গেল যেন। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল সে, ভয়ঙ্কর ওই গর্তে না-ঢোকার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল রানি শেবাকে। আসলে নিজে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে, রানি না-গেলে ওকেও যেতে হবে না, তাই যেতে মানা করছে। ওদিকে রানি মাকেডার না আবার কোনো ক্ষতি হয় সে-চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে অলিভারের, আমার জন্য কিছু বলতে পারছে না কিন্তু মিনতিভরা দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে রানির দিকে।

কিন্তু যশুয়ার কথা শুনেও শুনলেন না রানি, আবার অলিভারের মনের কথা সম্ভবত বুঝেও না-বোঝার ভান করলেন। বললেন, 'চাচা, আপনার মতো অভিজ্ঞ একজন পর্বতারোহী যখন আছে আমার সঙ্গে তখন আর ভয় কীসের? দেখুন, আমাদের দু'জনেরই বাবার সমান বয়সী এই বিদেশি ডাক্তার যখন যাচ্ছেন, (মন্তব্যটা ঠিক নয়—আমি বয়সে রানি মাকেডার বাবার সমান হতে পারি, কিন্তু যশুয়ার বাবার সমান নই) তখন আমাদের অসুবিধাটা কোথায়? আরও বড় কথা হলো, আমি যদি না-যাই তা হলে আমাকে পাহারা দিতে আপনিও থেকে যাবেন আমার সঙ্গে, নিজের নিরাপত্তার জন্য এত চমৎকার একটা অভিযান থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছি ভাবলে খুব খারাপ লাগবে আমার পরে। ...আপনার মতো আমারও পাহাড়ে চড়তে অথবা দড়ি বেয়ে

নামতে খুব ভালো লাগে। চলুন, আর সময় নষ্ট করা যাবে না।'

যার যার কোমরে দড়ি বেঁধে ওই সিঁড়িতে নেমে পড়লাম আমরা। সবার আগে শ্যাডর‍্যাক, তারপর কুইক। ইচ্ছে করেই শ্যাডর‍্যাকের ঠিক পরেই ঢুকল সে। বলল, বিশ্বাসঘাতকটাকে নাকি চোখে চোখে রাখা দরকার। মই, লণ্ঠন, তেল, খাবার আর অন্যান্য জিনিস নিয়ে তারপর ঢুকল কয়েকজন পাহাড়ি লোক। গেল আমাদের প্রথম দল।

দ্বিতীয় দলের শুরুতেই আরও দু'জন পাহাড়ি লোক, তারপর অলিভার, রানি মাকেডা, আমি এবং যশুয়া। তৃতীয় দলে অন্য পাহাড়ি লোকরা, সঙ্গে বাকি রসদ, মই আর টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস। লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম আমরা, শুরু হলো আমাদের অদ্ভুত অভিযান।

প্রথম দু'শ' ফুট সম্ভবত, খেয়াল করলাম, অনেকটা খনিমুখের মতো। উপর থেকে যে-রকম দেখেছিলাম—ধাপগুলো জায়গায় জায়গায় ভাঙা এবং বলতে গেলে উল্লম্ব। যদি বলি নামতে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে আমাদের তা হলে ভুল বলা হবে আসলে। তবে যশুয়ার কথা আলাদা। আমার পিছনেই আছে সে; একটু পর পর শুনছি হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে, গোঙানির মতো অদ্ভুত একটা শব্দ বের হয়ে আসছে ওর মুখ দিয়ে তখন।

দু'শ' ফুটের সিঁড়ি শেষ হয়ে এল একসময়। সামনে এখন একটা সুড়ঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পঞ্চাশ কদমের মতো এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে খাড়া একটা ঢালের সঙ্গে মিশেছে সুড়ঙ্গটা। সেটা পার হয়ে হাজির হলাম আরেকটা "খনিমুখে"। এটার গভীরতাও দু'শ' ফুটের মতো, কিন্তু সিঁড়ির ধাপগুলো আরও বেশি ক্ষয়া। আরেকটা সমস্যা—মাথার উপর থেকে সোজা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে জোরালো বাতাস, লণ্ঠনগুলো নিভু নিভু করছে।

এই সিঁড়িগুলো পার হয়ে যে-জায়গায় হাজির হলাম, সেখান

boiboi.net

থেকে বলতে গেলে আর কোনো সিঁড়ি নেই। নীচে নামাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এখন। খুব ধীরে নামছি, তারপরও একজায়গায় পা পিছলে গেল যশুয়ার, ভয়াবহ আর্তনাদে পুরো সুড়ঙ্গ মুখরিত করে সোজা আমার পিঠের উপর এসে পড়ল সে। কপাল ভালো—সুবিধাজনক একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন, না হলে যশুয়াকে পিঠে নিয়ে দু'জনে মিলে গিয়ে পড়তাম রানি মাকেডার উপর, তারপর তিনজনে মিলে কোথায় জানি না, তবে এটুকু জানি নির্ঘাত মরণ হতো আমাদের।

মোটা লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে এসে পড়ল আমার ঘাড়ের উপর, মরণভয়ে ভীত হয়ে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে থাকল আমার গলা। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো আমার, হাজার চেষ্টা করেও খসাতে পারলাম না ওকে। হোঁতকাটার ওজন আর চাপের কারণে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবো এখনই। ভাগ্য সহায় হলো—আমাদের তৃতীয় দলটা হাজির হলো এমন সময়, টেনে তুলল যশুয়াকে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললাম, যশুয়া আমার পিছনে থাকলে আর এক পা-ও আগে বাড়বো না আমি। কোমর থেকে দড়ি খুলে আমার থেকে আলাদা হয়ে গেল যশুয়া।

শ্যাডর‍্যাক আর কুইকের সঙ্গে যে-পাহাড়ি লোকরা আছে, আমাদের সুবিধার জন্য মই বসিয়ে দিয়েছে ওরা। ওই মই বেয়ে নামলাম বেশ কিছুটা পথ, তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। খেয়াল করলাম, ঢালু একটা সুড়ঙ্গ ধরে ধীরে ধীরে পুবদিকে এগোচ্ছি; সামনে আরেকটা সুড়ঙ্গ।

আমাদের জন্য বড় একটা ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে যশুয়া। বার বার বলছে ওর পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আমরা সেখানে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি করছে একটু পর পর। অথচ শ্যাডর‍্যাক বার বার আশ্বাস দিয়ে বলছে, সামনে রাস্তা এতটা খারাপ নয়। শেষপর্যন্ত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন রানি মাকেডা।

'চাচা,' বললেন তিনি, 'আপনি বলছেন যে, আমাদের সঙ্গে যাওয়াটা আর সম্ভব না আপনার পক্ষে। আবার সময় নষ্ট করে, এতগুলো লোককে সঙ্গে দিয়ে আপনাকে ফেরত পাঠানোটাও সম্ভব না আমাদের পক্ষে। কাজেই সবচেয়ে ভালো হয়, যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসি ততক্ষণ আপনি এখন যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আর আমরা যদি না-ফিরি, নিজের বুদ্ধি আর শক্তি খরচ করে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আশা করি। বিদায়, চাচা; এই জায়গাটা যথেষ্ট নিরাপদ আর আরামদায়ক, এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়াটাই আপনার জন্য ভালো।'

'পাষাণী!' ভয় আর রাগের মিশ্র আবেগে কাঁপছে যশুয়া। 'আপনি আমার বাগদত্তা, আর আমি আপনার প্রেমিক; আমাকে এই ভয়ঙ্কর গর্তে একা ফেলে রেখে যেতে একটুও খারাপ লাগছে না আপনার? বিদেশি আগন্তুকদের সঙ্গে বিড়ালের মতো পাহাড় বেয়ে নামতে বোধহয় খুব মজা লাগবে, তা-ই না? ...আমি যদি এখানে থাকি, আপনি থাকবেন আমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই না,' সরাসরি মানা করে দিলেন রানি।

আমাদের সঙ্গে আসার সাহস বা সামর্থ্য কোনোটাই নেই যশুয়ার, আবার ফিরে যাওয়ার উপায়ও নেই ওর, এদিকে আমরা যতক্ষণ ফিরে না-আসি ততক্ষণ অন্ধকার সুড়ঙ্গে একাও থাকতে পারবে না সে। কাজেই খাটুনি বাড়ল পাহাড়ি-লোকদের তৃতীয় দলটার—সবাই মিলে বহন করতে লাগল যশুয়াকে। আবার শুরু হলো আমাদের "অবরোহণ"।

ঠিকই বলেছিল শ্যাডর‍্যাক। যে-কোনো কারণেই হোক, তৃতীয় সুড়ঙ্গ দিয়ে যে-সিঁড়িগুলো নেমে গেছে সেগুলো বলতে গেলে অক্ষতই আছে। কিন্তু এখানে সিঁড়ির সংখ্যা এত বেশি যে, নামতে নামতে একসময় মনে হলো আর শেষ হবে না বুঝি। পরে হিসেব করে দেখেছিলাম, পর্বতের চূড়া থেকে শুরু করে নীচে, ভিতরের দিকে, বারোশ' ফুটের মতো নেমেছিলাম আমরা।

যা-হোক অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছি আমি। ওদিক রানি শেবা এত হাঁপাচ্ছেন যে, ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছেন না, অলিভারের গায়ে ভর দিয়ে আছেন তিনি। তবে আশার কথা, এই সুড়ঙ্গটার শেষমাথায় ছোট একটা গর্তের মতো দেখা যাচ্ছে, আর সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে শেষবিকেলের অনুজ্জ্বল আলো। আরও কিছুদূর নামার পর দেখি, একজায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে শ্যাডর‍্যাক আর বাকিরা। আমাদের দেখামাত্র বলল সে, 'দড়ি খুলে ফেলতে হবে। লণ্ঠন নিভিয়ে রেখে যেতে হবে এখানেই।'

অলিভার জিজ্ঞেস করল, 'এই সুড়ঙ্গটা ঠিক কোন্‌দিকে গেছে বলো তো?'

'আরও নীচের দিকে। কিন্তু আমি অন্য পথে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে, অত নীচে নামবো না। কেন জানেন? এই সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে অনেক বড় একটা গর্তে, আর ওই গর্তেই নিজেদের "পবিত্র" সিংহগুলোকে রাখে ফাংরা। ওরা ওই সিংহগুলোর পূজা করে। প্রাণের মায়া আছে এরকম কারও ওই গর্তে নামা তো পরের কথা, ধারেকাছে যাওয়াও উচিত না।'

কথা আর না-বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল শ্যাডর‍্যাক, নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলাম আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলাম ব্যাডমিন্টন কোর্টের সমান বড় একটা মালভূমিতে। কুলঙ্গির মতো ওই মালভূমিটা প্রাকৃতিক নাকি কৃত্রিম বুঝতে পারলাম না। ফার্নের মতো কিছু গাছ আর সবুজ ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গাটা। ভালোই হলো—নীচে যদি কোনো পাহারাদার থেকেও থাকে, দেখতে পাবে না আমাদেরকে।

মালভূমিটা যদি বাদ দিয়ে বলি, এই ঢালটা প্রায় উল্লম্বভাবে নেমে গেছে কয়েকশ' ফুট। নীচের দিকে তাকালাম, কিন্তু এত উপর থেকে তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। পুরো জায়গায় কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার, তা ছাড়া আরও একটা কারণ

boiRboi.net

আছে—আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, নীচের গভীর ওই খাদ থেকে কালো পাথরের একটা পাহাড় উঠে এসেছে যেন; দেখতে অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো। পাহাড়ের একটা প্রান্ত ধসে গিয়ে অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, তৈরি করেছে বিশাল এক কূপ। জায়গাটা ভরে আছে ঝোপঝাড়ে, এত উপর থেকে আধো-অন্ধকারে কুঁড়েঘরের সমান মনে হচ্ছে। ঝোপঝাড়ে ভরা ওই কালো পাথরের পাহাড়টার চূড়া, এই মালভূমি, মানে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, সেখান থেকে ত্রিশ কি বেশি হলে চল্লিশ ফুটের মতো দূরে।

একটা পেয়ালায় পানি ঢেলে খাচ্ছিলেন রানি মাকেডা, পেয়ালাটা একজন পাহাড়ি লোকের হাতে দিয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে শ্যাডর‍্যাককে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কী?'

'ফাংদের সেই সিংহ-মাথার দেবতা হারম্যাকের বিশাল মূর্তিটার পিছনের দিক,' জবাব দিল শ্যাডর‍্যাক। 'ঝোপঝাড়ে ভরা পাথরের একটা কূপ দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে? ওটা আসলে মূর্তির লেজ, নিরেট পাথর দিয়ে বানানো। এখন আমরা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাটা এভাবে কেন বানানো হয়েছে জানেন? আমার মনে হয় অনেক আগে, এই দেশটা যখন ফাংদের দখলে ছিল, তখন ওদের পুরোহিতরা এখানে এসে দাঁড়াত, আসলে দাঁড়াত না-বলে লুকাত বললেই বোধহয় মানায় বেশি, আর এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় দেখত কী হচ্ছে না হচ্ছে।' পাহাড়ের গায়ের বিশেষ কয়েকটা খাঁজ আমাদেরকে দেখাল সে। 'একসময় মনে হয় এখানে একটা টানাসেতু ছিল। ইচ্ছে করলে সেতুটা নামানো যেত সিংহ-দেবতার লেজের উপর। অনেক আগেই, কী কারণে জানি না, ধ্বংস হয়ে গেছে সেতুটা। কিন্তু মাঝখানের এই রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য সেতুর দরকার হয়নি আমার আগে, আশা করি এখনও হবে না।'

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালাম আমরা। এই খাদ সে পার

হলো কী করে ভাবতে গিয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। নিরেট নিস্তব্ধতায় অলিভারের কানে রানি মাকেডার ফিসফিসানি তাই কান এড়াল না আমার, 'এ-কারণেই বোধহয় লোকে ওকে বিড়াল বলে ডাকে। আর একই কারণে আমাদের সবার চোখ এড়িয়ে ফাংদের গুপ্তচরগিরি করতে পেরেছে সে।'

'অথবা এমনও হতে পারে,' রানির কথা কান এড়ায়নি কুইকেরও, চুপ থাকতে না-পেরে বলে ফেলল সে, 'লোকটা ডাহা মিথ্যা কথা বলছে।'

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন রানি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন শ্যাডর‍্যাককে, 'আমাদেরকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ তুমি?'

'কালো জানালাকে উদ্ধার করতে!' আশ্চর্য হলো অথবা হওয়ার ভান করল শ্যাডর‍্যাক। 'দয়া করে অবিশ্বাস করবেন না আমাকে, বরং যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ফাংদের একটা রীতি হলো, হারম্যাকের মূর্তির সঙ্গে যাদেরকে আটকে রাখে তাদেরকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় হাঁটাচলা করতে দেয়। অন্তত কালো জানালার ক্ষেত্রে যে এই নিয়মটা পালন করবে ওরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার। দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না কীভাবে জানলাম, শুধু জেনে রাখুন কথাটা সত্যি। আমার জীবনটা এখন ঝুঁকির মধ্যে, এই অবস্থায় মিথ্যা বলবো না। ...এখন আমার পরিকল্পনাটা শুনুন। জোড়া দেয়া যায় এরকম মই আছে আমাদের সঙ্গে। আমার মনে হয় এখান থেকে ওই মই সিংহ-দেবতার লেজ পর্যন্ত যাবে। কালো জানালা যদি এখনও বেঁচে থাকেন, আমার বিশ্বাস তিনি বেঁচে আছেন, এবং যদি হাঁটতে হাঁটতে লেজের কাছে খোলা জায়গাটায় চলে আসেন...'

'তিনি যে ওই জায়গায় আসবেন বুঝলে কী করে?' প্রায় ধমকে উঠল কুইক। 'তোমাকে বলেছে? নাকি এটাও তোমার

জানা আছে?'

'যে মানুষটা সারাদিন বন্দি হয়ে থাকে অন্ধকারে, সূর্যাস্তের সময় যদি সুযোগ পায়, তা হলে কি আলো-বাতাসে বের হতে চাইবে না?'

শ্যাডর‍্যাকের প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ। ভুল বলেনি সে।

'যা-হোক,' বলে চলল সে, 'তিনি ওই জায়গায় আসার পরে মই ফেলে তাঁর কাছে যাবে আমাদের কেউ, গিয়ে নিয়ে আসবে তাঁকে। সবচেয়ে ভালো হয় প্রভু অলিভার যদি যান। কারণ আমি যদি একা যাই, অথবা মুরের এই পাহাড়ি লোকগুলোও যদি যায় আমার সঙ্গে, আপনাদের মনে সন্দেহ লেগেই থাকবে। কারণ কালো জনালার সঙ্গে আমার যা হয়েছে তার পর থেকে আমার উপর আর বিশ্বাস নেই আপনাদের, আমি জানি।'

নীচের গভীর খাদটার দিকে আরেকবার তাকালেন রানি শেবা। 'এই জায়গাটা পার হওয়া...আসলেই কি সম্ভব?'

'দেখতে যতটা কঠিন মনে হয় কাজটা আসলে কিন্তু ততটা কঠিন না। প্রথমে মই-এর উপর দিয়ে মাত্র কয়েক কদম যেতে হবে। তারপর সিংহ-দেবতার লেজের ভিতরে ঢুকে এগোতে হবে একশ' ফুটের মতো। নিরেট পাথর দিয়ে বানানো হলেও লেজের ভিতরটা কিন্তু ফাঁপা, জমি সমতল আর দু'পাশ যথেষ্ট চওড়া। বেশ কয়েকটা বাঁক আছে, সেগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারলে ইচ্ছে করলে দৌড়ে যাওয়া যাবে। ...কিন্তু প্রভু অলিভার যদি সাহস না-পান কাজটা করার...অবশ্য...তাঁর সাহসের ব্যাপারে কিছু বলাটাও ঠিক না, কারণ সবাই জানে যে...' এ-পর্যন্ত বলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে থেমে গেল বদমাশটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'সাহস?' তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গিতে হাসল অলিভার। 'এ-রকম অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে কোনোকালেই কোনোরকম ভয় ছিল না আমার, থাকবেও না। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওখানে যাওয়ার

boighoi.net

আসলেই কোনো দরকার আছে কি না। প্রফেসর হিগস, মানে তোমাদের কালো জানালাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখা যায় ওই সিংহ-দেবতার লেজের কাছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাওয়াটা উচিত হবে বলে মনে হয় না। কারণ পুরো ব্যাপারটা তোমার চালাকি হতে পারে। হয়তো আমাকে ফাংদের হাতে ধরিয়ে দিতে চাও, তাই ছক কষে আমাদেরকে হাজির করেছ এখানে। আর কে না জানে যে, ফাংদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে, তুমি ওদের গুপ্তচর?'

'এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না,' শুনে মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবেন রানি মাকেডা। 'আপনি যাবেন না। মই থেকেই পড়ে যাবেন আপনি, মাটিতে আছড়ে পড়ে ভর্তা হয়ে যাবেন। দয়া করে আমার কথা শুনুন, যাবেন না আপনি।'

'কেন যাবে না?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল যশুয়া। 'ঠিকই বলেছে শ্যাডর‍্যাক। এই বিদেশিটার সাহসের ব্যাপারে অনেক কথাই শুনেছি আমরা। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে সবই গালগল্প। এতই যদি সাহস ওর তা হলে যাচ্ছে না কেন? অসুবিধাটা কোথায়? ওর বুকের পাটা কত বড় দেখানোর এটাই তো সুযোগ!'

ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঘুরে যশুয়ার মুখোমুখি হলেন রানি। 'খুব ভালো কথা, চাচা, তা হলে ওঁর সঙ্গে আপনিও যাবেন। একজন বিদেশি যে-কাজ করতে ভয় পায় না, একজন আবাটিরও সেই কাজ করতে ভয় পাওয়া উচিত না।'

কথাটা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেল যশুয়া। এরপর সে কী করেছিল বা বলেছিল তা আর ঠিক মনে নেই আমার।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কেউ কিছু বলছে না বা করছে না। সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না ভেবে বসে পড়ল অলিভার, বুট খুলতে শুরু করল।

'আপনি জুতো খুলছেন কেন?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রানি।

boiRboi.net

'কারণ মই-এর উপর দিয়ে জুতো পরে হাঁটা যাবে না, বরং মোজা পরে হাঁটাটাই নিরাপদ। ঘাবড়াবেন না, ছেলেবেলা থেকেই এসব কাজের অভ্যাস আছে আমার। নিজের দেশের সেনাবাহিনীতে যখন ছিলাম, এরকম কাজ নিয়মিত করতে হতো আমাকে। তবে একটা কথা ঠিক, আজ যা করতে যাচ্ছি তা ওই সব কাজকেও হার মানিয়েছে।'

'কিন্তু...আমার খুব ভয় লাগছে।'

এদিকে কুইকও বসে পড়েছে, বুট খুলতে শুরু করেছে।

'তুমি আবার কী করছ, কুইক?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্যাপ্টেন অলিভারকে সঙ্গ দিতে যাচ্ছি,' জবাব দিল সে।

'বাজে কথা রাখো! অলিভারের সঙ্গে যদি কারও যেতে হয়ে তা হলে আমি যাবো। আর আমার যাওয়ার কারণও আছে। আমার বিশ্বাস আমার ছেলে এখনও আছে হারম্যাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বয়স হয়েছে আমার, উঁচু জায়গায় উঠলে মাথা ঘোরায়, মই-এর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় না আবার...'

'আপনাদের দলনেতা কে?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অলিভার। 'আমি। কার আদেশ মানতে হবে আপনাদেরকে? আমার। আমি আদেশ করছি, আপনারা কেউই আমার সঙ্গে যাবেন না। সার্জেন্ট কুইক, মনে রেখো, যদি আমার কিছু হয় তা হলে আমাদের রসদের দায়িত্ব বুঝে নেয়া আর প্রয়োজনের সময় সেগুলো কাজে লাগানো তোমার দায়িত্ব। তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না কাজটা, বুঝতে পারছ না কেন? এখন যাও, পাহাড়ি লোকগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মই জোড়া দাও। যদিও পুরো ব্যাপারটা একটা ধোঁকাবাজি বলে মনে হচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে ওই লেজের মাথায় প্রফেসর হিগসের দেখা পাওয়া যাবে না কোনোদিন, কিন্তু তারপরও প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সুতরাং আমি আর কুইক রওয়ানা হলাম মই জোড়া লাগানোর কাজ তদারকি করতে। মই-এর ধাপে ঘষে ঘষে লাগানোর জন্য

কিছু কাঠের-গুঁড়া নিয়ে এসেছি আমরা। এই গুঁড়া ঘষে দিলে মই-এর উপর দিয়ে চলাটা আরও সহজ হয়। শ্যাডর‍্যাক বা অলিভার ছাড়া আর কেউ যেতে চায় কি না জিজ্ঞেস করলাম প্রত্যেককে, কিন্তু এককথায় মানা করে দিল সবাই। শেষপর্যন্ত রানি ঘোষণা করলেন, যে যাবে অলিভারের সঙ্গে তাকে একখণ্ড জমি দান করবেন তিনি। শুনে জ্যাফেট নামের এক পাহাড়ি লোক রাজি হলো। রানি বললেন, যদি কোনো কারণে জ্যাফেটের মৃত্যু হয় তা হলে ওই জমি ওর আত্মীয়দেরকে দিয়ে দেয়া হবে।

অলিভারের কাজে লাগতে পারে এরকম সবকিছু প্রস্তুত করে ফেললাম আমরা। তারপর চুপ করে বসে থাকলাম মালভূমির মাটিতে। আসলে এত ক্লান্ত হয়ে গেছি যে, কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না কারও। কিন্তু ওই নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কারণ নীচের গভীর খাদ থেকে হঠাৎ ভেসে এল ভয়ানক এক গর্জন।

'পবিত্র সিংহগুলোকে খাওয়াচ্ছে ফাংরা,' ব্যাখ্যা করল শ্যাডর‍্যাক। 'খাওয়ানোর সময় হয়েছে জন্তুগুলোকে। আমরা যদি উদ্ধার করতে না-পারি তা হলে আমার মনে হয় আজ রাতে কালো জানালাকে ছুঁড়ে দেয়া হবে ওই সিংহগুলোর মুখে। আজ পূর্ণিমা, হারম্যাকবাসীদের জন্য উৎসবের রাত। আবার এমনও হতে পারে, সামনের পূর্ণিমায় যেহেতু সব ফাংরা আসবে পূজা করতে, সবার মনোরঞ্জনের জন্য তখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হবে কালো জানালাকে।'

কথাটা শুনে কারও কোনো ভাবান্তর হলো বলে মনে হলো না, শুধু শুনলাম বিড়বিড় করে বলছে কুইক, 'বাজে কথা!'

চোখ ফিরিয়ে হারম্যাকের সুবিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি, ছায়া ঘনাচ্ছে—পর্বতের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পুবাকাশে এখনও কিছুটা আলো আছে, তা না হলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যেতাম আমরা। চাতক পাখির মতো

তাকিয়ে আছি সবাই ফাংদের ওই বিশাল মূর্তিটার দিকে। দূর থেকে মূর্তির মাথা বলে মনে হয় যে-অংশটাকে, আকাশের পটভূমিতে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল সেখানে। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তিটা, তারপর হঠাৎ করেই গান গাইতে শুরু করল। রাতের বাতাস বহন করে নিয়ে এল সেই সুর; কণ্ঠটা এতই যাদুকরী লাগল আমার কাছে যে, মনে হলো অপার্থিব কোনো গান শুনছি যেন। পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারানোর মতো দশা হলো আমার, কুইক ধরে না-ফেললে পড়েই যেতাম।

'কী হয়েছে, ডাক্তার অ্যাডামস?' জিজ্ঞেস করল অলিভার, রানি মাকেডাকে নিয়ে এককোনায় বসে আছে সে, অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কথা বলছে দু'জনে। 'প্রফেসর হিগসকে দেখতে পেয়েছেন?'

'না,' খেয়াল করলাম, গলা কাঁপছে আমার। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ছেলে এখনও বেঁচে আছে। ওই যে গান শুনতে পাচ্ছ না? ওটা সে-ই গাইছে। ...অলিভার, যদি সম্ভব হয়, হিগসের সঙ্গে ওকেও উদ্ধার কোরো।'

এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, ঠিকমতো খেয়াল করতে পারিনি—কে যেন আমার হাতে একটা ফিল্ডগ্লাস ধরিয়ে দিল এমন সময়। কিন্তু হয় কোনো ত্রুটি ছিল যন্ত্রটায়, অথবা আমার হাত এত কাঁপছিল যে, ঠিকমতো দেখতেই পারলাম না দূরের ওই ছায়ামূর্তিটাকে। তখন আমার হাত থেকে ফিল্ডগ্লাসটা নিয়ে নিল কুইক, তারপর ভালোমতো দেখে বলল, 'লম্বা, পাতলা একটা মানুষ। সাদা পোশাক পরে আছে। কিন্তু এত দূর থেকে এত কম আলোয় চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না ভালোমতো। ...গান মনে হয় শেষ ওর...হ্যাঁ, এই তো...নেমে যাচ্ছে...আহ্, চলে গেল!'

চলে গেল শব্দ দুটো কেন যেন ঘুরপাক খেতে লাগল আমার মনের মধ্যে। এতগুলো বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আজ এক পলকের জন্য দেখতে পেলাম আমার ছেলেটাকে। বেচারা জানেও

না ওর এত কাছে আছি আমি, জানেও না ওকে উদ্ধার করার জন্য নাওয়া-খাওয়া সব বাদ দিয়ে একদল অশিক্ষিত কাপুরুষ লোকের রানির চাকর হিসেবে দিন কাটাচ্ছি।

গান থেমে গেল আমার ছেলের, মূর্তির ভিতরে কোথাও উধাও হয়ে গেল সে, এবং কিছুক্ষণ পরই মূর্তির পিছনদিকে দেখা গেল তিন ফাং যোদ্ধাকে। লম্বা রোব পরে আছে তিনজনই, প্রত্যেকের হাতে ঝকঝকে বর্শা। ওদের পিছনে একজন তূর্যবাদক, সঙ্গে একটা শিঙা অথবা হাতির ফাঁপা দাঁত। খেয়াল করলাম, মূর্তির ঘাড় থেকে শুরু করে লেজের নিম্নভাগ পর্যন্ত একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ওটা ধরে ওঠা-নামা করছে ওরা—সবকিছু ঠিক আছে কি না দেখছে আসলে। আগেই বলেছি, যে-মালভূমিতে এখন আছি আমরা সেটার চারপাশে বড় বড় ঝোপ, তাই আমাদেরকে দেখতে পেল না লোকগুলো। এমনকী এখানে যে এরকম একটা মালভূমি আছে, আমার মনে হয় তা-ও জানে না ওরা।

যা-হোক, সন্দেহজনক কিছু দেখতে না-পেয়ে হাতের শিঙায় জোরে ফুঁ দিল তূর্যবাদক। এত জোরে আওয়াজ হলো যে, মনে হলো কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। পুরো উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল শব্দটা, কিন্তু তার আগেই সঙ্গের তিন প্রহরীকে নিয়ে উধাও হলো লোকটা।

আর ঠিক তখনই, যেন অনেকটা ভোজবাজির মতো, সিংহ-দেবতার মূর্তির গায়ে দেখা গেল আরেক ছায়ামূর্তিকে।

হিগস। কোনো সন্দেহ নেই। মাথায় সেই ভাঙাচোরা সান-হেলমেট, চোখে সেই চিরচেনা কালো চশমা। ঠোঁটে সাদামাটির পাইপ, নাকমুখ দিয়ে অনর্গল বের হচ্ছে ধোঁয়া। হাতের নোটবুকে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখছে সে; দেখে মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ যাদুঘরে, প্রাগৈতিহাসিক কোনো কিছু দেখে গুরুত্বপূর্ণ নোট লিখে রাখছে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে কয়েকবার ঢোক গিললাম আমি। সত্যি

কথা বলতে কি, যে-কোনো কারণেই হোক, ধরেই নিয়েছিলাম আর কোনোদিন দেখা পাবো না হিগসের।

রানি মাকেডার পিছন থেকে একেবারে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল অলিভার, তারপর স্থির কণ্ঠে বলল, 'শ্যাডর্যাক, চলো আমার সঙ্গে। মই ফেলো। আমার আগে তুমি গিয়ে হাজির হবে ওই মূর্তির কাছে যাতে বুঝতে পারি আগেরবারের মতো কোনো চালাকি করোনি।'

'না,' বাধা দিয়ে বললেন রানি মাকেডা। 'শ্যাডর্যাকের যাওয়া উচিত হবে না। কারণ গেলে আর ফিরে আসবে না সে ওর বন্ধুদের কাছ থেকে। ...জ্যাফেট, এই বিদেশি প্রভুর সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। তুমি আগে যাবে। ওই প্রান্তে গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে মইটা যাতে এই বিদেশির কোনো অসুবিধা না-হয়। আর ইনি যদি নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন, তা হলে যে-পরিমাণ জমি তোমাকে দেবো বলেছিলাম, কথা দিচ্ছি, তার দ্বিগুণ তুমি পাবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে রানিকে অভিবাদন জানাল জ্যাফেট। বাকি পাহাড়ি লোকদের সঙ্গে নিয়ে ঝটপট জোড়া লাগিয়ে ফেলল মইটা। তারপর আমরা যে-মালভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রান্ত থেকে ফেলল, জিনিসটা গিয়ে পড়ল মূর্তির লেজের উপর, বলা ভালো লেজের চারপাশে গজিয়ে থাকা ঝোপঝাড়ের উপর। আকাশের দিকে মুখ আর হাত তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, একমনে প্রার্থনা করল। তারপর সঙ্গীদেরকে বলল মই-এর এই প্রান্তটা শক্ত করে ধরতে। পা রাখল প্রথম ধাপে, জোরে চাপ দিয়ে দেখল ওর ভার সহ্য করতে পারে কি না সেটা। তারপর, অভূতপূর্ব দক্ষতায়, পার হলো প্রতিটা ধাপ, অনায়াসে গিয়ে হাজির হলো ফাংদের সিংহ-দেবতার লেজে।

এবার অলিভারের পালা। যাওয়ার আগে রানি মাকেডার দিকে তাকাল সে, মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রানির চেহারার দিকে

তাকিয়ে আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। ভয়ে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছেন মানুষটা, দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক, ক্রমাগত কাঁপছে ঠোঁট দুটো। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে কিছু বলল অলিভার, স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। তারপর ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো সে, হাত মেলাল আমার সঙ্গে।

'যদি পারো, আমার ছেলেটাকেও নিয়ে এসো,' ফিসফিস করে বললাম।

'ওকে যদি পাই, কথা দিচ্ছি, সর্বাত্মক চেষ্টা করবো সঙ্গে করে নিয়ে আসার। ...সার্জেন্ট কুইক, আমার যদি কিছু হয় তা হলে...'

'কিছু হবে না আপনার,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল কুইক।

কথা আর না-বাড়িয়ে মই-এর প্রথম ধাপে পা রাখল অলিভার। বারো, কি বেশি হলে চোদ্দটা ধাপ পার হতে হবে ওকে। অর্ধেকটা দূরত্ব বেশ সহজেই পার হলো সে। কিন্তু মই-এর মাঝখানে যখন দাঁড়িয়ে আছে সে, সিংহ-দেবতার লেজের ঝোপে আটকে থাকা একটা প্রান্ত নড়ে উঠল হঠাৎ। প্রাণপণে চেষ্টা করল জ্যাফেট যাতে পিছলে না-যায়, কিন্তু পারল না। টলে উঠল অলিভার, সহজাত প্রবৃত্তির বশে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার তাড়নায় বাতাসে থাবা চালাল কিছুক্ষণ, বাতাসে নলখাগড়া যেভাবে নড়ে সেভাবে টলমল করল হাতের কাছে কিছুই না-পেয়ে, তারপর হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পড়ে গেল মই-এর উপর।

'আ-আ-হ্!' শুনে মনে হলো কেউ বোধহয় ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে রানি মাকেডার পাঁজরে।

অপর প্রান্ত থেকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল জ্যাফেট, 'ভয় পাবেন না, মই ঠিকই আছে। আস্তে আস্তে আসুন।'

সময় নিল অলিভার। ধাতস্থ হলো কিছুটা, তারপর উঠে দাঁড়াল। মই-এর ধাপগুলো দেখে নিল ভালোমতো। তারপর

boighar.net

জ্যাফেটের মতো দক্ষতায় হেঁটে গিয়ে হাজির হলো অপর প্রান্তে। ঝোপঝাড়ে আবৃত জায়গাটুকু পার হলো দু'জন, সিংহ-দেবতার লেজের খোলা মুখে গিয়ে উঠল। তারপর ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে, হাত নাড়ল। এরপর দু'জনেই ঢুকে গেল লেজের ভিতরে, ওদেরকে দেখতে পেলাম না আর।

ভিতরটা কেমন, জানি না, তবে আমার মনে হয় যথেষ্ট ফাঁকফোকর আছে, কারণ কিছুক্ষণ পর আবার দেখতে পেলাম দু'জনকে—হাঁটতে হাঁটতে উপরের দিকে, মানে মূর্তিটার কাঁধের দিকে যাচ্ছে। অনুমান করলাম ভিতরটা, দু'দিকে পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ফাঁকা চাতালের মতো এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বোধহয় ঘর বা বড় দরজা আছে। যা-হোক, সিংহ-দেবতার কাঁধে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা হিগসের পিছনে গিয়ে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না ওদের। এখনও নোটবুক নিয়েই ব্যস্ত আছে হিগস, কী হচ্ছে না হচ্ছে সে-ব্যাপারে কোনো খেয়ালই নেই ওর।

জ্যাফেটকে ছাড়িয়ে হিগসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অলিভার, আস্তে করে হাত রাখল ওর কাঁধে। ঘুরল হিগস, অলিভার আর জ্যাফেটের দিকে তাকিয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। তারপর এতই আশ্চর্য হয়ে গেল যে, ধপ করে বসে পড়ল বড় একটা পাথরের উপর। ওকে টেনে দাঁড় করাল অলিভার, খেয়াল করলাম এই মালভূমির দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন বলছে সে। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলছে মনে হয়, কী করতে হবে জানিয়ে দিচ্ছে। দু'জনে কথা বলল কিছুক্ষণ, ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখলাম কোনো একটা বিষয়ে একমত হতে পারছে না ওরা—ক্রমাগত মাথা নাড়ছে হিগস। কিছুক্ষণ পর হাঁটতে শুরু করল সে, কয়েক কদম এগিয়েই উধাও হয়ে গেল কোথায় যেন। (পরে জানতে পারি আমার ছেলেকে আনতে গিয়েছিল সে।)

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, আমার মনে হলো এক বছর হয়ে

গেছে, তেমন কিছু ঘটল না আর। তারপর হঠাৎ করেই শুনি, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কারা যেন। হিগসের সাদা সান-হেলমেটটা দেখতে পেলাম আবার, তারপর উদয় হলো ওর শরীরটা, সঙ্গে দুই ফাং প্রহরী—জাপটে ধরে আছে ওকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে সে ইংরেজিতে, আর ওর প্রতিটা শব্দ আমাদের কানে নিয়ে আসছে রাতের বাতাস, 'পালাও, অলিভার, নইলে মরবে! এই দুই শয়তানকে ধরে রাখছি আমি। পালাও, দৌড় দাও!'

তার মানে হিগসই ধরে রেখেছে দুই প্রহরীকে!

দ্বিধায় পড়ে গেছে অলিভার, কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বিপদ টের পেয়ে গেছে জ্যাফেট, অলিভারের জামা ধরে টানছে যাতে এখনই ছুট লাগায় সে। আরও দু'-একটা ফাংকে দেখা গেল, কী ঘটছে এখনও বুঝতে পারেনি ওরা। বুঝে গেল অলিভার বাঁচাতে পারবে না সে হিগসকে, বরং সময় নষ্ট করলে ধরা পড়ে নিশ্চিত মরবে, তাই নিতান্ত হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরল, তারপর ছুট লাগাল। দেখা গেল দৌড়ে জ্যাফেটকে পিছনে ফেলে দিয়েছে সে, দু'জনের মাঝখানে বড় একটা ব্যবধান। ওদিকে জ্যাফেটের পিছন পিছন হাতে ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে বেশ কয়েকজন ফাং পুরোহিত বা প্রহরী। আরও পিছনে, সিংহ-দেবতার ঘাড়ের কাছে, দুই প্রহরীর সঙ্গে চত্বরের মেঝেতে তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে হিগস।

পরের ঘটনাগুলো অনেক দ্রুত ঘটে গেল। কেউ বাধা দেয়ার আগেই একদৌড়ে সিংহ-দেবতার লেজের কাছে হাজির হয়ে গেল অলিভার আর জ্যাফেট। ওদের পিছু পিছু একসারিতে ছুটে এল তিন ফাং যোদ্ধা। কিন্তু ভারী পোশাকের কারণে সুবিধা করতে পারল না এরা, তাই ওদের আগেই মই-এর কাছে পৌঁছে গেল অলিভার আর জ্যাফেট। অর্ধেকটা দূরত্ব পার হওয়ার পর একটা আর্তচিৎকার শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অলিভার, মই-এ সবে পা রেখেছিল জ্যাফেট, এমন সময় মাটিতে শুয়ে পড়ে ওর

একটা পা খামচে ধরেছে এক ফাং, টানের কারণে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে বেচারা জ্যাফেট, আরেকটু এদিক-ওদিক হলেই মই থেকে নীচের খাদে খসে পড়বে ওর দেহটা।

চিৎকার শুনে থামল অলিভার, ঘুরে পিছন ফিরে তাকাল, রিভলভার বের করল। তারপর নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে। ফাং প্রহরীর মুঠো আলগা হয়ে গেল, আপনাথেকেই ছুটে গেল জ্যাফেটের পা, মাথা নীচের দিকে দিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল প্রহরী লোকটা। এরপর কী হয়েছিল ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কয়েক মুহূর্ত পরই দেখি, আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে অলিভার আর জ্যাফেট এবং কেউ একজন বলছে, 'মইটা তুলে ফেলো। ওদের একজনও যাতে আসতে না-পারে।'

রিপিটিং রাইফেল নিয়ে মালভূমির প্রান্তে গিয়ে বসে পড়ল কুইক, নিশানা করে একের পর এক টান দিয়ে চলল ট্রিগারে। এই আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ফাং প্রহরীরা, তাই ওদের বেশিরভাগই মারা পড়ল নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যাওয়ার আগে। কয়েকজনের লাশ গিয়ে পড়ল খাদে, কয়েকজন মরে পড়ে থাকল সিংহ-দেবতার লেজের কাছে, আর গুরুতরভাবে আহত কয়েকজন কোনোরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে লুকাল কোনো ঝোপ বা বোল্ডারের আড়ালে।

রাইফেলের আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা নেমে এল চারদিকে। কেউ কোনো কথা বলছি না, কী করবো বোধহয় বুঝতেও পারছি না। অলিভারের দিকে তাকিয়ে দেখি, মাথা নিচু করে বসে আছে সে।

'কী হয়েছে?' উদ্বেগ আর কৃতজ্ঞতায় ভরা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রানি মাকেডা।

'সব তালগোল পাকিয়ে গেছে,' মাথা না-তুলেই বলল অলিভার, 'যে-কাজে গিয়েছিলাম সে-কাজ করতে পারিনি, ব্যর্থ হয়েছি। এবং আজ রাতেই প্রফেসর হিগসকে সিংহের গুহায় নিয়ে

boiRboi.net

ফেলবে ওরা। কথাটা তিনিই আমাকে বলেছেন।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন রানি মাকেডা, তারপর অনেকটা হঠাৎ করেই জ্যাফেটকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার, জ্যাফেট। অনেকদিন পর এরকম একজন আবাটি দেখলাম যার মধ্যে সাহস বলে কিছু আছে। আমি খুশি হয়েছি তোমার উপর; তোমাকে যা দেবো বলে কথা দিয়েছিলাম, তার চারগুণ দেবো দেশে ফেরার পর।'

মাথা নুইয়ে রানিকে আবারও সম্মান জানাল জ্যাফেট।

অলিভারের দিকে তাকালাম আমি। 'কী হয়েছিল বলো তো?'

'সবকিছু ঠিকই ছিল,' বলতে শুরু করল অলিভার, 'চলে আসার আগে প্রফেসর বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাঁর, ওকে রেখে পালাবেন না। ছেলেটাকে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করলাম। প্রফেসর বললেন, নীচেই নাকি আছে, তিনি গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন। চলে গেলেন তিনি, এবং আমার মনে হয় আপনার ছেলের বদলে কোনো ফাং পাহারাদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। এই লোকটা সম্ভবত আড়াল থেকে আমাদের কথা শুনছিল, কিন্তু আমরা ইংরেজিতে কথা বলছিলাম বলে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তারপর কী হলো তা তো দেখলেনই আপনারা। আজ পূর্ণিমার রাত, চাঁদ ওঠার দু'ঘণ্টা পর বলিদানের উৎসব শুরু হবে হারম্যাকে, পবিত্র সিংহগুলোর গুহায় তখন ছুঁড়ে ফেলা হবে প্রফেসর হিগসকে। ...আমরা যখন এই মালভূমি থেকে প্রথমবারের মতো তাঁকে দেখি, তখন তিনি তাঁর নোটবুকে নিজের উইল লিখছিলেন। রাজা বারুং নাকি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সব জিনিসপত্র নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হবে আমাদের কাছে।'

'ডাক্তার অ্যাডামস,' অলিভারের দেয়া খবরটা হজম করার পর ভয়ঙ্কর গলায় আমাকে বলল কুইক, 'শয়তান শ্যাডর্যাকের

সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। আমি তো ভালো আরবি জানি না, আর ওই ব্যাটা আমার ইংরেজি বুঝবেও না, বলতেও পারবে না। আপনি কি দয়া করে দোভাষীর ভূমিকাটা পালন করবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কুইককে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম মালভূমির একটা প্রান্তের দিকে। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েই সব দেখেছে আর শুনেছে শ্যাডর‍্যাক।

'হারামজাদা, কান খুলে আমার কথা শোনো,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কুইক। 'যদি আর একটা মিথ্যা কথাও বলো অথবা কোনো চালাকি করার চেষ্টা করো আমাদের সঙ্গে, কসম খেয়ে বলছি হয় তুমি না-হয় আমি ফিরবো মুরে, একজনে মরতে হবেই। বোঝা যাচ্ছে আমার কথা?'

আমি বুঝিয়ে বলার পর শ্যাডর‍্যাক জানাল যে, সব কথা বুঝতে পারছে সে।

'খুব ভালো,' বলে চলল কুইক। 'তুমি বলেছ তোমাকে নাকি একবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল ফাংরা, ছুঁড়ে দিয়েছিল ওদের এই "পবিত্র সিংহগুলোর" মুখে। কিন্তু বেঁচে গেছ তুমি। এখন ঠিক করে বলো আসলে কী হয়েছিল।'

'একটা উৎসবের আয়োজন করেছিল ফাংরা,' জবাব দিল শ্যাডর‍্যাক। 'কী উৎসব সেটা বলার দরকার নেই, কারণ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ না। যা-হোক, আনুষ্ঠানিকতা সারার পর বড় একটা খাবারের-ঝুড়িতে ভরে আমাকে নামিয়ে দেয়া হয় সিংহগুলোর গুহায়। ওই ঝুড়িতে তাজা মাংসের বড় বড় টুকরোও ছিল। তারপর শিকল টেনে ওই গুহার একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ছুটে আসে ক্ষুধার্ত জন্তুগুলো।'

'তারপর?'

'আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কী ঘটতে চলেছে, তাই মাটিতে পড়ামাত্র মাংসের টুকরোগুলোর কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। গিয়ে আশ্রয় নিই গুহার ঘন ছায়ার মধ্যে। পারলে মিশে

boiboi.net

যেতাম পাহাড়ের দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি, আমার ঘ্রাণ পেয়ে যায় একটা সিংহী। ছুটে আসে আমার দিকে, থাবা চালায় আমার মুখে। দেখুন,' চেহারার বিশ্রী কতগুলো দাগ দেখাল সে আমাদেরকে। 'সিংহীটার নখের আঘাতে বিছার হুলের মতো যন্ত্রণা শুরু হয় আমার চেহারায়। বলতে গেলে পাগল হয়ে যাই আমি, লাফালাফি শুরু করি। তখন সবগুলো সিংহ ঘুরে তাকায় আমার দিকে। বড় বড় হলুদ হলুদ চোখগুলো দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যাই, একলাফে গিয়ে চড়ি পাহাড়ের দেয়ালে—কুকুরের তাড়া খেলে বিড়াল যেভাবে গিয়ে চড়ে উঁচু কোনো জায়গায় ঠিক সেভাবে। বাঁচার তাগিদে নখ, দাঁত আর পায়ের পাতা কাজে লাগিয়ে দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করি। বেশিদূর যেতে পারিনি, তার আগেই লাফিয়ে ওঠে একটা সিংহ, একথাবায় চিরে ফালা ফালা করে ফেলে আমার পায়ের মাংস। এই যে...দেখুন,' পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে, কিন্তু অনুজ্জ্বল আলোয় বলতে গেলে কিছুই দেখতে পেলাম না। 'তবে থাবা দিয়ে আমাকে ধরে রাখতে পারল না সিংহটা, নিজের ওজনের কারণেই মাটিতে নামতে হলো তাকে। দৌড়ে কিছুদূর পিছিয়ে গেল সে, আবার লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেয়ালের গায়ে একটা তাকের মতো আছে, চিলের সমান বড় কোনো পাখি বসতে পারবে সেখানে। আমাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সিংহটা, তখন আমিও লাফ দিলাম তাকটা লক্ষ্য করে এবং ধরতে পারলাম, গুটিয়ে নিলাম পা দুটো, ফলে বেঁচে গেলাম সিংহের থাবা থেকে। ...বাঁচার জন্য এরকম কাজ, লোকে বোধহয় একবারই করে জীবনে। যা-হোক, শরীরটা টেনেহিঁচড়ে কোনোরকমে গিয়ে উঠে বসলাম ওই তাকে। আমার একটা উরু সেঁটে থাকল পাহাড়ের দেয়ালের সঙ্গে, আরেকটা ঝুলতে থাকল বাইরে; দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইলাম শরীরটা যাতে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না-থাকে। বেশ

কিছুক্ষণ পর আরেকটু উপরের দিকে উঠি, একটা গর্তের মতো দেখতে পেয়ে বহুকষ্টে ঢুকে যাই সেটার ভিতরে। বুঝতে পারি, একটা সুড়ঙ্গের মুখে হাজির হয়েছি। তারপর অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কপালগুণেই হাজির হয়ে যাই পাহাড়ের চূড়ায়। পুরো দুই দিন দুই রাত সময় লাগে আমার। ওই সময়টা কীভাবে যে পার হয়েছে নিজেও ঠিকমতো জানি না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পথ চিনে নিয়ে জ্যান্ত ফিরে আসতে পেরেছি আমি। এবং এই ঘটনার পর থেকে লোকে আমাকে "বিড়াল" নামে ডাকতে শুরু করে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল কুইক, 'তুমি যত বড় শয়তানই হও না কেন, সাহস আছে তোমার। ...আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো, সিংহের গুহাটা আগে যেখানে ছিল এখনও কি সেখানেই আছে?'

'আমার তা-ই মনে হয়। ...পাল্টানোর কোনো দরকার আছে কি ফাংদের? সিংহ-দেবতার পেটের ভিতর দিয়ে চালান করে দেয়া হয় বলিদের, এই কাজের জন্য ওই দেবতার দুই উরুর মাঝখানে বিশাল বিশাল দরজা বানিয়ে রেখেছে ওরা। পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকা একটা জায়গায় গিয়ে পড়ে বলিরা; আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ফাঁকা জায়গাটা বলতে গেলে তার ঠিক নীচেই। আমাকে কেউ পালাতে দেখেনি, তাই ওই জায়গার উপরে কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ফাংদের কেউ, ওরা ভেবেছে মাংসের সঙ্গে আমাকেও গিলে খেয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহের পাল। পারতপক্ষে ওই জায়গার কাছেও ঘেঁষতে চায় না ওদের কেউ। পাশেই আরেকটা বড় গুহার মতো আছে, ওখানে থাকে আর ঘুমায় জন্তুগুলো; পেট ভরে খাওয়া হয়ে গেলে ওগুলোকে ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাওয়া হয় মানে উপর থেকে দেখতে থাকে প্রহরীরা, সিংহগুলো যখন গিয়ে ঢোকে ওই গুহায় তখন শিকল টেনে লোহার গরাদেঅলা একটা দরজা

নামিয়ে দেয় ওরা।' অনেক দূর থেকে একটা ঝনঝন শব্দ ভেসে এল এমন সময়, কথা থামিয়ে সেটা শুনল শ্যাডর্যাক, তারপর বলল, 'ওই যে, শুনুন। শিকল টেনে নামানো হলো গরাদে, তার মানে খাওয়া শেষ সিংহগুলোর, ঘুমাতে গেছে ওরা। কালো জানালাকে যখন ছুঁড়ে ফেলা হবে ওই গর্তে, তখন আবার টেনে তোলা হবে দরজাটা, ছুটে বের হবে জন্তুগুলো।'

'তাক থেকে উপরে উঠে যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে এসেছিলে তুমি সেই সুড়ঙ্গটা কি এখনও আছে?'

'আছে। কোনো সন্দেহ নেই আমার। যদিও দেখিনি, তারপরও জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'তা হলে, বাছা,' কৌতুক নয়, আদেশের সুরে বলল কুইক, 'এবার সাহসের খেলা দেখানোর সময় হয়েছে তোমার।'

বারো

শ্যাডর্যাকের কাছ থেকে যা জানা গেল, ফিরে এসে রানি মাকেডা আর অন্যদেরকে সব জানালাম।

'আপনার পরিকল্পনাটা কী, সার্জেন্ট?' জিজ্ঞেস করল অলিভার। 'আমার মাথায় কেমন জট পাকিয়ে গেছে, ভেবে বের করতে পারছি না কিছুই।'

'শ্যাডর্যাক যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়, আমি যাবো নীচে, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে হাজির হবো গুহার ঠিক উপরে। এরপর ওরা যখন প্রফেসর হিগসকে নামিয়ে দেবে, যদি দেয় আর কী, এবং যখন শিকল টেনে গরাদে খুলবে, রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে

চেষ্টা করবো সিংহগুলোকে দূরে রাখার। আমার সঙ্গে কয়েকজন পাহাড়ি লোক থাকবে, মই নামিয়ে দেবে ওরা। আশা করি মই বেয়ে উঠে আসতে খুব একটা কষ্ট হবে না প্রফেসরের।'

'চমৎকার! কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি একা যেতে পারবেন না। আমিও যাবো।'

'এবং আমিও,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললাম।

অলিভার আবারও কোনো বিপজ্জনক অভিযানে যেতে চাইছে টের পেয়ে গেলেন রানি মাকেডা, তাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিয়ে কথা বলছেন আপনারা? দয়া করে বুঝিয়ে বলুন, আপনাদের ভাষা আমি বুঝতে পারছি না।'

আমাদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বললাম তাঁকে। শুনে এমনভাবে তাকালেন তিনি অলিভারের দিকে, যেন খুব খারাপ কোনো কাজ করে ফেলেছে সে। বললেন, 'আবারও? আবারও আপনি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছেন নিজেকে?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি,' শুনে মনে হলো রেগে গেছে অলিভার, 'আমার চেয়ে প্রফেসর হিগসের জীবন অনেক মূল্যবান।'

আর একটা কথাও বললেন না রানি, চুপ হয়ে গেলেন একেবারে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে গেলাম আমরা। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, নীচে নামবো আমরা, গিয়ে হাজির হবো গুহার উপরে। তারপর কুইক আর জ্যাফেটকে সঙ্গে নিয়ে গুহায় নামবে অলিভার। আমি থেকে যাবো সুড়ঙ্গের মুখে, সিংহের কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো আমার বন্ধুদেরকে। গুহায় নামতে চাইলাম আমিও, কিন্তু রাজি হলো না কেউ। যুক্তি দেখাল, রাইফেলে আমার নিশানা তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো; কাজেই আমি যদি উপরে থেকে রাইফেল নিয়ে পাহারা দিই তা হলেই নাকি সবচেয়ে ভালো হয়। ওদের কথা একদিক দিয়ে ঠিক, আবার আরেকদিক দিয়ে এই কথাও ঠিক যে, বুড়ো হয়েছি বলে বিপজ্জনক আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ইচ্ছে করেই সরিয়ে দেয়া

হলো আমাকে।

রানি মাকেডার দিকে তাকাল অলিভার, আমাদের মধ্যে যা যা কথা হয়েছে জানাল তাঁকে। তারপর বলল, 'ভালো হয় এবার যদি ফিরে যান আপনি। কয়েকজন পাহাড়ি লোককে সঙ্গে নিয়ে যান, প্রফেসর হিগসকে নিয়ে যতক্ষণে এখানে ফিরে আসবো আমরা ততক্ষণে পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারবেন।'

'চূড়ায় পৌঁছার কোনো দরকার নেই আমার!' বলতে গেলে মুখ ঝামটা মারলেন রানি। 'এখানেই থাকবো আমি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া চূড়ায় পৌঁছানোও যাবে না। আপনাদের এই অভিযানের ফল শেষপর্যন্ত কী হয় তা-ও দেখা দরকার।'

'সবাই যে কালো জানালাকে বাঁচাতে চললেন,' অনেকক্ষণ পর কথা বলল যশুয়া, 'এদিকে আমাদের কী হবে ভেবেছেন একবারও?'

'কী হবে মানে?' জানতে চাইল কুইক।

'সিংহ-দেবতার লেজ থেকে এই মালভূমিতে আসার রাস্তাটা এতদিন জেনেও জানত না ফাংরা। কিন্তু আজ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওদের কাছে। এখন কথা হচ্ছে, মই তো ওদের কাছেও আছে। ওরা যে সেগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে না তার নিশ্চয়তা কী? আমাদেরকে এখানে পেলে কচুকাটা যে করবে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই, এই রাস্তা ধরে গিয়ে হাজির হতে পারে এমনকী মুরেও। তখন আমাদের দেশ আর আমাদের থাকবে না, দখল হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য! কথাটা আমাদের কারও মাথাতেই আসেনি!

'সেজন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম আমাদের কী হবে,' বলল যশুয়া।

'জানি না,' জবাব দিলেন রানি। 'তবে এটুকু বলতে পারি, ছোট্ট এই মালভূমি থেকে বের হওয়ার পথ যদি বন্ধ করে দিতে পারি আমরা তা হলে ওই বাধা টপকে মুরে হাজির হতে যথেষ্ট

কষ্ট করতে হবে ফাংদের।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা খারাপ না,' বলল অলিভার। 'এখান থেকে একবার বের হতে পারলে চাইলে পুরো সুড়ঙ্গটাই উড়িয়ে দিতে পারি আমরা। তা হলে ইহজীবনে ফাংরা হাজির হতে পারবে না মুরে, অন্তত এই পথে।'

'এই রাস্তাটা কিন্তু কাজে লাগতে পারে আমাদের, ক্যাপ্টেন অলিভার,' কুইকের কণ্ঠে দ্বিধা।

'আমার মনে হয় আরও ভালো একটা রাস্তা আছে, সার্জেন্ট। খেয়াল আছে, "প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে" কিছু মাপজোক করছিলাম আমি? আমার হিসাব বলে, ওই পথ দিয়ে এগোলে সোজা হাজির হবো সিংহ-দেবতার মূর্তির নীচে, যদিও সময়ের অভাবে ঠিকমতো হিসাব করতে পারিনি। ...এখন কথা হচ্ছে, আজকের পরে এই সুড়ঙ্গটা কোনো কাজে লাগছে না আমাদের, সুতরাং এটা এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কী করতে হবে বলে দিচ্ছি। ...হাত লাগাতে হবে সবাইকে।'

অলিভারের কথামতো যে যেখানে যে আকার-আকৃতির পাথর পেলাম, নিয়ে আসতে লাগলাম একের পর এক, তারপর ফেলতে লাগলাম মালভূমিতে ঢোকার মুখে। কাজটা যথেষ্ট কষ্টকর, কিন্তু কারও উৎসাহে কোনও কমতি ছিল না, বিশেষ করে পাহাড়ি লোকদের, তাই যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কম সময়েই কাজ শেষ হয়ে গেল আমাদের। গতর খাটিয়ে লাভও হলো একদিক দিয়ে—বেশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য বেঁচে গেল আমাদের।

আমাদের এই কাজ যখন চলছিল তখন শ্যাডর‍্যাক আর জ্যাফেটকে সঙ্গে নিয়ে নীচে, মানে পবিত্র সিংহগুলোর গুহার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কুইক। কাজ শেষ করে এনেছি প্রায়, এমন সময় ফিরে এসে জানাল ওরা, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল এরকম বড় বড় কিছু পাথর সরিয়ে দিয়ে এসেছে

ওরা, এবার দড়ি আর মই নিয়ে গেলেই কাজ হয়ে যাবে আশা করা যায়।

পাথর ফেলে মালভূমিতে ঢোকার, অথবা বলা যায় মালভূমি থেকে বের হওয়ার পথটা বন্ধ করে দিলাম আমরা ভালোমতো। তারপর আগেরবারের মতোই সারি করে এগিয়ে চললাম সবাই মিলে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর, হিসেব করে দেখলাম, তিনশ' ফুটের মতো নীচে নেমে এসেছি, পৌঁছে গেছি সিংহ-দেবতার মূর্তির পাদদেশের কাছাকাছি।

শ' শ' বাদুড় আস্তানা গেড়েছে এখানে; চারদিকে ভালোমতো তাকিয়ে দেখি গুহার দেয়াল কেটে বানানো একটা কামরায় হাজির হয়েছি আসলে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কামরাটা অনেক আগে কোনো-না-কোনো প্রয়োজনে ফাংরাই বানিয়েছে। আগেই বলে রেখেছিল শ্যাডর‍্যাক, তাই খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না—কামরার পুবদিকের দেয়ালে কায়দা করে বসানো আছে আয়তাকার একটা পাথরখণ্ড। কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে জানি না, কিন্তু খেয়াল করলাম, পাথরটার একদিকে ধাক্কা দিলে ভিতরের দিকে ঢুকে যায় ওই প্রান্তটা, তখন বলপ্রয়োগকারীর দিকে এগিয়ে আসে অন্য প্রান্ত। ফলে মোটামুটি বড় একটা ফোকর দেখা দেয়, যেখান দিয়ে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে।

অনেক দিনের পুরনো আর খুব সাধারণ এই দরজাটা (আসলে বোধহয় জানালা বললেই মানায় বেশি) খুললাম আমরা ধাক্কা দিয়ে, তাকালাম সামনের দিকে। থালার মতো বড় চাঁদ আকাশে, পূর্ণিমার আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। আমাদের সামনে, জমিন থেকে শুরু করে মাথার প্রায় তিনশ' ফুট উপর পর্যন্ত, ঘন একটা ছায়া—দানবীয় ওই মূর্তির নিম্নাঙ্গে বাধা পাচ্ছে চাঁদের আলো। পাথর দিয়ে বানানো মধ্যমাকৃতির একটা টিলার উপর বসানো আছে মূর্তিটা, তাই এত বিশাল হয়ে পড়েছে ওটার

ছায়া। শ্যাডর‍্যাকের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে এখানেই কোথাও নামিয়ে দেয়া হবে হিগসকে। তার মানে নীচের ওই ছায়াচ্ছন্ন, কমবেশি দশ হাজার বর্গগজের মতো উন্মুক্ত জায়গাতেই বিশেষ বিশেষ রাতে বলি উৎসর্গ করা হয় পবিত্র সিংহগুলোর উদ্দেশ্যে।

বোটকা আর ভয়ঙ্কর একটা দুর্গন্ধ বাতাসে। বিড়ালজাতীয় অনেকগুলো প্রাণী একসঙ্গে কোনো জায়গায় থাকলে এরকম গন্ধ পাওয়া যায় সাধারণত। শুধু তা-ই নয়, পচা মাংসের বিশ্রী দুর্গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এই গুহার তিনদিকে পাহাড়ি দেয়াল। আরেকদিকে, মানে পুবদিকে, ছোট-বড় পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে একটা দেয়াল। সেখানে ধাতুনির্মিত গরাদে। মোটা মোটা শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরে আসছে অনুজ্জ্বল আলোর রশ্মি, পিছন থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ আর ক্ষুধার্ত সিংহগুলোর ভয়ঙ্কর গর্জন।

আমাদের নীচের জমিনে পড়ে আছে কয়েকটা লাশ। কাপড় আর চুল দেখে মানুষ বলে চিনতে পারলাম ওদেরকে, নইলে এই অন্ধকারে ঠাহর করতে পারতাম না। পিছন থেকে কেউ একজন বলল, আনমনা হয়ে পড়েছিলাম তাই খেয়াল করতে পারিনি লোকটা কে, তবে সম্ভবত শ্যাডর‍্যাকই হবে, 'গুলি খেয়ে মরেছে ওরা, তারপর অত উঁচু থেকে সোজা নীচে এসে পড়েছে এদের লাশ।'

কেউ কিছু বললাম না। নীচের অতি-ভয়ঙ্কর ওই গুহাটা দেখে সবাই যেন কথা হারিয়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পর পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল অলিভার, তারপর বলল, 'প্রফেসর হিগস আমাকে বলেছিলেন চাঁদ ওঠার দু'ঘণ্টা পর তাঁকে ছুঁড়ে দেয়া হবে সিংহের মুখে। তার মানে আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। এবার যাওয়া দরকার আমাদের।'

'শ্যাডর‍্যাক,' কঠোর গলায় বলল কুইক, 'মই ফেলো।' একটা রাইফেল বাড়িয়ে দিল সে অলিভারের দিকে। 'ক্যাপ্টেন, এই নিন আপনার রাইফেল আর ছ'টা রিলোড ক্লিপ। একেকটা ক্লিপে পাঁচটা করে বুলেট আছে। আমার কাছেও ছ'টা ক্লিপ থাকল। ...ডাক্তার অ্যাডামস, আপনি এখানেই থাকুন, পাথরের জানালাটা কাজে লাগবে আপনার। পজিশন নিন ওখানেই, আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি বেশিরভাগ বুলেট। যতটুকু আলো আছে, চাঁদ যদি মেঘে ঢাকা না-পড়ে তা হলে ততটুকু আলোয় আশা করি অসুবিধা হবে না আপনার। ভাগ্যে যদি খারাপ কিছু লেখা না-থাকে, তা হলে এই রেঞ্জে আপনার মতো ঝানু লোকের জন্য জীবনের সেরা মুহূর্তটা অপেক্ষা করছে হয়তো। ...সঙ্গে পিস্তলও নিয়ে নিয়েছি আমি, কাজে লাগতে পারে। এবার ক্যাপ্টেন, আদেশ দিন, রওনা হই আমরা।'

'মই বেয়ে নামবো আমরা,' বলল অলিভার, 'তারপর এগোবো পঞ্চাশ কদমের মতো। খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে, ছায়া থেকে বের হওয়া যাবে না একচুল, কারণ আমি চাই না আমাদেরকে দেখে ফেলুক কেউ। মাংসের ঝুড়িটা ঠিক কোথায় নামানো হবে জানি না, তবে ওই গুহার ভিতরেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানেই নামানো হোক আশপাশেই থাকবো আমরা, অপেক্ষা করবো। প্রফেসর হিগস, মানে কালো জানালা যদি থাকেন ওই ঝুড়ির ভিতরে, তা হলে জ্যাফেট, আড়াল ছেড়ে বের হবে তুমি, এগিয়ে গিয়ে বের করে নেবে তাঁকে এবং দরকার হলে তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে সোজা চলে আসবে মই-এর কাছে। তোমাকে কভার দেবো আমরা, এবং উপর থেকে, মানে এখান থেকে ডাক্তার অ্যাডামস। কাকে কাকে সঙ্গে নেবে ঠিক করো তুমি, কী করতে হবে বুঝিয়ে বলো ওদেরকে; ওরা মই-এর কাছে থাকবে, তুমি সেখানে পৌঁছানোমাত্র সাহায্য করবে তোমাদের দু'জনকে। ...সার্জেন্ট কুইক এবং ডাক্তার অ্যাডামস,

প্রফেসর হিগসকে নিয়ে জ্যাফেট নিরাপদে ফিরে না-আসা পর্যন্ত সিংহ বা ফাং যা-ই পান রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে, গুলি করতে দ্বিধা করবেন না। একটা কথা খেয়াল রাখবেন, সিংহগুলো যদি একইসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের আর প্রফেসর হিগসের উপর, তা হলে প্রফেসরকে বাঁচানোর চেষ্টাটাই করবেন আগে; দু'দলকে একইসঙ্গে বাঁচাতে গেলে সবাই মরবে। পরিস্থিতি যত সহজ মনে হচ্ছে নীচে নামার পর পাল্টে যাবে সবকিছু, কাজেই সার্জেন্ট কুইক আর জ্যাফেট, আমার আদেশের অপেক্ষায় থাকবেন না সবসময়, আপনাদের বিবেচনায় জরুরি মুহূর্তে যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করবেন,' বলতে বলতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ল সে, 'ডাক্তার অ্যাডামস, যদি আমাদের কিছু হয়ে যায়, যদি আমরা কেউই নিরাপদে ফিরতে না-পারি, তা হলে আপনি দয়া করে রানি মাকেডার দায়িত্ব নেবেন, তাঁকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন মুরে।' রানির দিকে তাকাল সে। 'বিদায়, রানি।'

'বিদায়,' রানি মাকেডার কণ্ঠে বেদনা নয় বরং আত্মবিশ্বাসের সুর, শুনে কিছুটা হলেও আশ্চর্য হলাম, 'আমি জানি আপনার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদেই ফিরে আসবেন আপনি।'

'দাঁড়ান,' রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল অলিভাররা, যশুয়ার মোটা গলার প্রচ্ছন্ন হুমকি শুনে থমকে গেল সবাই, 'এই বিদেশিরা তাদের খেলনার মতো অস্ত্র নিয়ে বাহাদুরি ফলাবে আর আমি একজন সেনাপতি হওয়ার পরও চুপ করে বসে থাকবো তা তো হয় না! ...আমিও যাবো। নীচে নামবো, উপযুক্ত অস্ত্র নেই বলে সিংহের গুহায় ঢুকবো না, তবে মই-এর কাছেই থাকবো, পাহারা দেবো জায়গাটা।'

'খুবই ভালো কথা,' আশ্চর্য হয়ে বলল অলিভার। 'আপনার মতো একজন বীরের সঙ্গ পেলে খুশিই হবো আমরা। তবে মনে রাখবেন মই দিয়ে ওঠার সময় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ ক্ষুধার্ত সিংহ কেমন তেজী হয় তা হয়তো জানা নেই

আপনার। আরেকটা কথা, আগেই বলে রাখি, ভালো বা মন্দ যা-ই থাকুক আপনার কপালে, তার জন্য কিন্তু আমরা কেউই দায়ী থাকবো না। কারণ আপনাকে যেতে বলিনি আমরা, আপনিই নিজে থেকে আসছেন আমাদের সঙ্গে।'

'চাচা,' মুখ খুললেন রানি, 'বরং বাদ দিন, যাওয়ার দরকার নেই আপনার। এখানেই থাকুন না-হয়।'

'তারপর সারাজীবন আপনার খোঁটা খাই, নাকি?' রেগে গেছে যশুয়া। 'না, নীচে যাবো আমি, মুখোমুখি হবো ভয়ঙ্কর ওই সিংহগুলোর,' বলে আর দেরি করল না সে, "জানালা" দিয়ে বের হলো অতি ধীর গতিতে, মই বেয়ে নামতে শুরু করল নীচে।

দেরি করল না কুইক, রওয়ানা হয়ে গেল। কিছুদূর নেমেই কী যেন বলে উঠল সে বিরক্ত হয়ে; বুঝলাম, যশুয়ার কারণে নীচে নামতে দেরি হচ্ছে বলে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

দু'-এক মিনিট পর জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি, যশুয়া বাদে সবাই পৌঁছে গেছে জায়গামতো। বেশি হলে ছ'ফুটের মতো নেমেছে সেনাপতি মহাশয়, অথবা আমার মনে হয় পুরোটা নামার পর উপরে উঠে এসেছে আবার। মই-এর ধাপে পিঠ ঠেকিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে দু'দিকের দেয়াল খামচে ধরে আছে—দেখলে মনে হয় ওকেও যেন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে। ওই জায়গায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ওকে দেখে ফেলতে পারে ফাং প্রহরীরা, তাই রানি মাকেডাকে বললাম যশুয়াকে বলতে যেন উপরে উঠে আসে সে, অথবা নেমে গিয়ে কোনো কিছুর আড়ালে দাঁড়ায়। জানালা দিয়ে মাথা বের করে কথাটা বললেন রানি যশুয়াকে, কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষপর্যন্ত আর ঘাঁটালাম না যশুয়াকে, যা হবার হবে।

এদিকে সিংহ-দেবতার মূর্তির ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেছে অলিভার, কুইক আর জ্যাফেট—বার বার এদিক-ওদিক তাকিয়েও

দেখতে পাচ্ছি না ওদের কাউকে। ক্রমেই মাথার আরও উপরে উঠে যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, নীচের মরণ-গুহাটাও একটু একটু করে আরও আলোকিত হচ্ছে। থেকে থেকে হিংস্র গর্জন ছাড়ছে গরাদে-এর আড়ালে থাকা সিংহগুলো, রক্ত পানি-করা এই হুঙ্কার বাদে বলতে গেলে কোথাও কোনো শব্দ নেই। গরাদে-এর ধাতব শিকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এতক্ষণে, ওই শিকগুলোর পিছনের চলমান গাঢ় ছায়াগুলোও নজর এড়াচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম—পাহাড়ের একদিকের দেয়ালে জড়ো হচ্ছে কতগুলো ছায়ামূর্তি। কোথেকে আসছে ওরা জানি না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি যত সময় যাচ্ছে তত বাড়ছে ওদের সংখ্যা, এবং ওই দেয়ালের উপর একসঙ্গে দাঁড়াতে সমস্যা হচ্ছে না ওদের, কারণ নিজেদের সুবিধার জন্যই জায়গাটাকে চওড়া একটা রাস্তার মতো বানিয়ে নিয়েছে ওরা। বলে না-দিলেও বোঝা যায় এরা দর্শক, উৎসর্গের অনুষ্ঠান দেখে নিছক মজা নেয়ার জন্য জড়ো হয়েছে সেখানে।

'রাজকুমার,' গলা খাদে নামিয়ে বললাম যগুয়াকে, 'যদি বাঁচতে চান, যদি চান আমরা কেউ ধরা না-পড়ি ফাংদের হাতে, তা হলে দয়া করে নীচে নেমে যান। এখন আর উপরে উঠে আসার সময় নেই আপনার। চাঁদের আলো সোজা এসে পড়ছে আপনার মাথার উপর, আপনি উপরে উঠতে গেলেই কোনো-না-কোনো ফাং দেখে ফেলবে আপনাকে। নীচে নামুন, তা না হলে ধাক্কা দিয়ে মই ফেলে দেবো আমি, তখন মাটিতে আছড়ে পড়তে হবে আপনাকে।'

অবস্থাটা বুঝতে পারল যগুয়া। কথা না-বাড়িয়ে নীচে নেমে গেল সে, গিয়ে লুকাল কিছু ফার্ন আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে। আর দেখা গেল না ওকে, যেখানেই আছে নিরাপদেই আছে ধরে নিয়ে ওর কথা ভুলেই গেলাম আমি।

অনেক, অনেক দূর থেকে, দানবীয় ওই মূর্তিটার পিছন থেকে

সম্ভবত, ভেসে এল প্রার্থনাসঙ্গীতের ভাবগম্ভীর মৃদু সুর। হঠাৎ করেই থেমে গেল সুরটা, চিৎকার করে উঠল কারা যেন। তারপর আবার হঠাৎ করেই শুরু হয়ে গেল গানটা। আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন রানি মাকেডা, আলতো করে আমার একটা হাত স্পর্শ করলেন তিনি, সামনের দিকে দেখার ইঙ্গিত করলেন।

আরও বেড়েছে চাঁদের আলো, আরও ক্ষয়ে গেছে মূর্তির ছায়া। মাটি থেকে সম্ভবত দু'শ' ফুট উপরে শূন্যে ঝুলছে কিছু একটা। ধীরে ধীরে নামছে জিনিসটা, বলা ভালো নামানো হচ্ছে। ওটাই সেই বিশাল ঝুড়ি, সন্দেহ নেই ভিতরে হিগসও আছে। কীভাবে জানি না, ক্ষুধার্ত সিংহের পাল টের পেয়ে গেছে আসছে ওদের খাবার; মুহুর্মুহু সিংহনাদে কাঁপছে নীচের মাটি, এত উপরে থেকেও সেই কম্পন টের পাচ্ছি যেন। হতে পারে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে ফেলেছে ওরা ঝুড়িটা, তারপর সম্মিলিত গর্জনে প্রকম্পিত করছে চারদিক। এটা ওদের উল্লাস না আক্রোশ কে জানে!

নামছে, আরও নামছে, নামতে নামতে মাটির কয়েক ফুট উপরে এসে থামল ঝুড়িটা, পেণ্ডুলামের মতো দুলতে লাগল সামনে-পিছনে। একবার চাঁদের আলোয়, আরেকবার অন্ধকারে চলে যাচ্ছে সেটা দুলতে দুলতে। ঝুড়ির ভিতরে আবছামতো দেখা যাচ্ছে একজন মানুষের অবয়ব। এত দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না লোকটাকে। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটল এমন সময়—ঝুড়ির এক প্রান্ত থেকে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, খসে পড়ল ওর হ্যাট। সান-হেলমেটটা দেখে লোকটাকে চিনতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না আমার।

উঠে দাঁড়াল হিগস, অতি ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল ওর হেলমেটের দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে সে। ওর পিঠ গরাদে-এর দিকে, হেলমেটটা মাত্র হাতে নিয়েছে সে, তখনই শোনা গেল ঝনঝন শব্দ। শেকল ধরে টান

দিয়েছে কেউ, উঠে যাচ্ছে গরাদে। এখনই বের হয়ে আসবে ক্ষুধার্ত সিংহগুলো!

'দরজা খুলে দিয়েছে ওরা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন মাকেডা।

হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে সিংহের গুহায়, কে কার আগে বের হবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন, হুটোপুটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এত দূর থেকেও। উল্লসিত হয়ে উঠেছে দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকা জনতা, চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ওরা সিংহগুলোকে। পিছনে কী হচ্ছে দেখার জন্য ঘুরল হিগস, এবং দেখল। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো বুঝি দৌড় দেবে সে, কিন্তু তারপরই সিদ্ধান্ত পাল্টাল। ধীরেসুস্থে হেলমেট পরল, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল স্থির হয়ে। ওর সেই খাটো কিন্তু মোটা শান্ত অবয়ব দেখে কেন যেন নেপোলিয়নের কথা মনে পড়ে গেল আমার—কিছুই করার নেই বুঝতে পেরে পাথর হয়ে গেছেন যেন বিশ্বখ্যাত সম্রাট, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন নিজের ধ্বংস।

তারপর কী হলো ঠিকমতো বর্ণনা করা আসলে আমার জন্য কঠিন একটা কাজ। কারণ একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। সিংহগুলোর কথাই বলি প্রথমে। যেরকম আশা করেছিলাম সেরকম ব্যবহার করল না ওরা। ভেবেছিলাম গরাদে খোলামাত্র ছুটে বের হবে সবগুলো, দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে হিগসের উপর। কিন্তু সেরকম কিছু করল না ওরা। তখন মনে পড়ে গেল আজ সন্ধ্যায়ই খাওয়ানো হয়েছে ওগুলোকে, তাই হয়তো রুচি হচ্ছে না খাওয়ার। অথবা হয়তো হিগসকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে জন্তুগুলো, "জিনিসটাকে" আসলেই খাওয়া যায় কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

হুড়োহুড়ি করে নয়, আমাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে সিংহগুলো বের হলো দুই সারিতে, ধীরেসুস্থে। মর্দা, মাদি, সবে

কেশর গজাতে শুরু করেছে এরকম এবং দুধের বাচ্চা—সব মিলিয়ে পঞ্চাশ কি বেশি হলে ষাটটার মতো হবে। এতগুলোর মধ্য থেকে মাত্র দুটো কি তিনটা মুখ তুলে তাকাল হিগসের দিকে, কিন্তু ছুটে এল না একটাও। বেশিরভাগই ছড়িয়ে পড়ল নিজেদের খুশিমতো, ছায়া ছায়া অন্ধকারে গিয়ে লুকাল—যেন চাঁদের আলোয় থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওদের।

ঠিক তখনই, ভয়ঙ্কর এক আর্তচিৎকার ভেসে এল নীচ থেকে। জানালা দিয়ে গলা বের করে নীচে তাকিয়ে দেখি, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে মই বেয়ে উঠে আসছে যশুয়া। কিন্তু ওর চেয়েও অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে এল সিংহটা, মই-এর কাছে পৌঁছেই লাফ দিল। দুই থাবা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে জন্তুটা, ধারালো নখরগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। শেষরক্ষা হলো না যশুয়ার, ওর পিঠে এসে পড়ল সিংহের থাবা, মই-এর সঙ্গে বলতে গেলে গেঁথে গেল বেচারার দেহটা। যশুয়ার গা থেকে ছুটে গেল নখ, মাটিতে পড়ে আবার লাফ দিল সিংহটা, আবার থাবা বসাল। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আবাটিদের সেনাপতি। বার বার চেষ্টা করছি আমি যে-কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে গুলি করার, কিন্তু সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যশুয়া, শেষপর্যন্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জানালাটা দিয়ে শরীরের অনেকখানি বের করে দিলাম বাইরে। পাহাড়ি লোকদের একজন চেপে ধরল আমার পা যাতে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এক মুহূর্তও দেরি না-করে গুলি করলাম, পশুরাজের খুলি ভেদ করে ঢুকে গেল বুলেট। ভারী একটা বস্তার মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা।

কয়েক মুহূর্ত পরই আমাদের মাঝে উপস্থিত হলো যশুয়া। টলতে টলতে এগিয়ে গেল একটা কোনার দিকে, পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকজন পাহাড়ি লোক এগিয়ে গেল ওর দিকে, শুশ্রূষা করতে লাগল। ওর দিকে খেয়াল করলাম না আর, সেই সময়ও নেই আমার হাতে।

boiRboi.net

আমার রাইফেলের ধোঁয়া কেটে গেছে ততক্ষণে। নীচে তাকিয়ে দেখি, হিগসের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে জ্যাফেট, ইঙ্গিতে দৌড় দিতে বলছে ওকে। ওদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিংহ আর একটা সিংহী, বার বার তাকাচ্ছে হিগস আর জ্যাফেটের দিকে। জ্যাফেট কী বলতে চায় বুঝে গেল হিগস, কিছুক্ষণ কথা বলল সে ওর সঙ্গে, তারপর যে-হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে পড়ে গিয়ে সে-হাঁটুটা দেখাল জ্যাফেটকে। বুঝলাম, প্রচণ্ড ব্যথায় বলতে গেলে খোঁড়া হয়ে গেছে সে, দৌড়ানো সম্ভব নয় এখন ওর পক্ষে। ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ইশারায় নিজের পিঠটা কয়েকবার দেখাল জ্যাফেট, তারপর হিগসের দিকে এগিয়ে গিয়ে উল্টো ঘুরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল হাঁটু না-ভেঙে। অনেক কষ্টে, এক পা-এ ভর দিয়ে জ্যাফেটের পিঠে চড়ে বসল হিগস, ওকে ময়দার বস্তার মতো তুলে নিল জ্যাফেট, তারপর এগিয়ে আসতে লাগল মই-এর দিকে।

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা সিংহটা বসে পড়ল মাটিতে, পাহারাদার কুকুরের মতো নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দেখতে লাগল হিগস আর জ্যাফেটের কাজকর্ম। কিন্তু সিংহীটা পিছু নিল ওদের দু'জনের, বার বার বাতাসে কীসের যেন গন্ধ শুঁকছে জন্তুটা। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল হিগস, দেখল সিংহীটাকে। হেলমেটটা খুলল সে মাথা থেকে, ছুঁড়ে মারল জন্তুটার দিকে। সিংহীর মাথায় গিয়ে লাগল জিনিসটা। ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছাড়ল সিংহী, থাবা মেরে ধরল হেলমেটটা, বিড়ালের বাচ্চা যেভাবে উলের বল নিয়ে খেলে সেভাবে খেলতে লাগল সেটা নিয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আগ্রহ শেষ হয়ে গেল জন্তুটার, নিচু কিন্তু হিংস্র গর্জন ছাড়ল একটা, লেজ দিয়ে মাটিতে কয়েকবার বাড়ি দিয়েই দৌড় দিল হিগস আর জ্যাফেটকে ধরতে।

যশুয়ার বেলায় যেরকম হয়েছিল, এবারও সেই একই মুশকিলে পড়েছি আমি। জ্যাফেট-হিগস আর সিংহীটা একই

লাইন-অফ-ফায়ারে আছে, আমি যদি গুলি করি তা হলে সিংহীটার আগে জ্যাকেট বা হিগসের কোনো একজনের শরীর যে ফুটো হবে তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই রাইফেল কাঁধে নিয়ে হতভম্বের মতো বসে থাকতে হলো আমাকে। এদিকে আরও কাছে এসে গেছে সিংহী, লাফিয়ে উঠবে এখনই, জ্যাকেটের পিঠে সওয়ার হিগসই ওর টার্গেট। ঠিক তখনই নীচের কোনো একটা ছায়া থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। লাফ দেয়া আর হলো না সিংহীর, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দু'বার পাক খেল সে, তারপর ঘুরে পড়ে গেল, সমানে পা ছুঁড়ছে, একের পর এক নিষ্ফল কামড় বসাচ্ছে মাটিতে। নিষ্প্রাণ দর্শকের মতো এতক্ষণ সবই দেখছিল সিংহটা, এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে, কী ব্যাপার জানার জন্য ছুটে এল সিংহীর দিকে। আহত সিংহীর রাগ গিয়ে পড়ল সিংহের উপর, উঠে দাঁড়িয়েই চোখের পলকে কয়েকবার থাবা চালিয়ে দিল সে সিংহের মুখে। এবার রাগে ফেটে পড়ল সিংহ, হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সিংহীর উপর। শুরু হলো ভয়ঙ্কর মারামারি, ধুলো আর উড়ন্ত কেশরের কারণে অদৃশ্য হয়ে গেল জন্তু দুটো।

রাইফেলের আওয়াজ শুনে চমকে গেছে দেয়ালের উপরের ফাংরা, চোখের সামনে দুটো সিংহকে গুলি খেতে দেখেছে ওরা। দেখতে পাচ্ছি, প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ওদের মধ্যে। রাইফেল কী জিনিস এতদিনে জেনে গেছে ওরা, এই জিনিস এখানে হাজির হলো কী করে বুঝতে পারছে না কেউই, তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওরা স্বাভাবিকভাবেই। আতঙ্ক ছড়ায় দাবানলের মতো, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফাংরা তাই গলা ফাটিয়ে চেঁচানো ছাড়া আর কিছুই করছে না এই মুহূর্তে। শত শত লোকের সম্মিলিত এই চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গেল নীচের সিংহগুলো, যেগুলো চাঁদের আলোয় ছিল সেগুলো ছোটাছুটি শুরু করে দিল এদিকে-সেদিকে, বেশিরভাগই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে

অন্ধকারে। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না জ্যাফেট, তাকানোর দরকারও নেই, হিগসকে পিঠে নিয়ে ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে মই-এর দিকে।

তারপর হঠাৎ করেই, রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জনে ভারী হয়ে গেল রাতের বাতাস। চাঁদের আলোয় বের হয়ে এসেছে অলিভার আর কুইক, মই-এর দিকে পিছু হটতে হটতে গুলি করছে সমানে। একের পর এক ক্রোধান্ধ সিংহ ছুটে আসছে ওদের দিকে, কিন্তু কাছে আসার আগেই বুলেটের ধাক্কায় ধরাশায়ী হতে হচ্ছে সবগুলোকে। দেখে ভালো লাগল এত উত্তেজনার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে অলিভার আর কুইক, পরিকল্পনা অনুযায়ী হিগস আর জ্যাফেটকে নিরাপদে এগোতে দিয়ে নিজেরা আসছে পরে। খেয়াল করলাম, দু'জনই গুলি করছে না একসঙ্গে। একবার একটানা গুলি করতে করতে রাইফেলের চেম্বার খালি করে দিচ্ছে অলিভার, তখন কিছুটা পিছিয়ে যাচ্ছে কুইক। অলিভারের বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওর দিকে কার্ট্রিজের একটা ক্লিপ ছুঁড়ে দিয়েই সমানে ট্রিগার টানছে কুইক। তখন আবার পিছিয়ে আসছে অলিভার, পজিশন নিচ্ছে কুইকের পিছনে নিরাপদ কোনো জায়গায়, হাতে ক্লিপ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকছে কুইকের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার জন্য।

এভাবে পালা করে গুলি করতে করতে বেশ কয়েকটা সিংহকে শুইয়ে দিল ওরা। বুলেট বলতে গেলে নষ্ট হচ্ছে না একটাও—আসলে এত কম রেঞ্জে সিংহের মতো বিশালবপুর প্রাণী সহজ একটা শিকার। তা ছাড়া মেরে ফেলতে না-পারলেও অসুবিধা নেই—মাথায় না-লাগলেও পায়ে বা ঘাড়ে যেখানেই লাগুক বুলেট, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে জন্তুগুলো।

আমার লাইন-অফ-ফায়ারে এবার আর দাঁড়িয়ে নেই কেউ, তাই দেরি না-করে আমিও টানতে শুরু করলাম ট্রিগার। হত্যা করার নিয়তে নয়, সিংহগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই

নিশানা না-করে গুলি করছি, তাই আমার বেশিরভাগ বুলেটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আর যেগুলো লাগল, সেগুলো শরীর ভেদ করে বের হয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে গেল সিংহ বা সিংহীটার প্রাণ।

হিগসকে পিঠে নিয়ে মই-এর আরও কাছে চলে এসেছে জ্যাফেট, ওদের থেকে বেশি হলে এগারো-বারো গজের মতো দূরে আছে অলিভার আর কুইক। বুলেটের আঘাতে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে পবিত্র সিংহগুলো, তার উপর বলি পালাচ্ছে নিরাপদে–দেখে আর সহ্য করতে পারল না দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ফাংরা, ফেটে পড়ল ক্ষোভে। কিন্তু কিছুই করার নেই ওদের, তীর বা বর্শা যা-ই মারুক না কেন লাগবে না এতদূর থেকে, আবার সিংহের ভয়ে নামতেও পারছে না কেউ গুহায়, পিছু ধাওয়া করতে পারছে না শত্রুদের। আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ি লোকরা খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল অবস্থা অনুকূলে দেখে, আশ্বস্ত হলাম আমিও।

কিন্তু হঠাৎ করেই পাল্টে গেল পরিস্থিতি। কোত্থেকে জানি না, ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে অলিভারদের ঘিরে ধরল নতুন একদল সিংহ। ফাংদের চিৎকার, আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, আর স্বজাতীয়দের মৃত্যু–সব দেখে সতর্ক হয়ে গেছে ওরা, বুঝে গেছে মই-এর দিকে এগিয়ে চলা দু'পেয়ে জীবগুলোই যত সমস্যার কারণ। লেজ দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিচ্ছে সবগুলো, চোখে খুনে দৃষ্টি।

নওজোয়ান একটা সিংহ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিগস আর জ্যাফেটের উপর। ধাক্কা সহ্য করতে না-পেরে মাটিতে পড়ে গেল দু'জনই। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম। সিংহটার পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেল বুলেট, কিন্তু মরল না জন্তুটা, বরং এক পা হিগসের আরেক পা জ্যাফেটের বুকের উপর তুলে দিয়ে দাঁড়াল সগৌরবে। এগিয়ে আসা সিংহগুলোর দিকে মনোযোগ অলিভার আর কুইকের, পিছনের দৃশ্যটার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওদের।

গর্জাতে গর্জাতে কাছিয়ে আসছে বাকি সিংহগুলো, জ্বলছে হলুদ চোখগুলো, বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে ক্রমেই।

এমন সময় কে যেন দৌড় দিল আমার পিছন থেকে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছেন রানি শেবা। সিংহের মুখ থেকে খালিহাতে ছিনিয়ে নেবেন তিনি হিগসকে! তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম আমি, টেনে সরিয়ে নিলাম জানালার কাছ থেকে। তারপর পাহাড়ি লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললাম, 'যদি তোমাদের রানিকে বাঁচাতে চাও, আমার সঙ্গে চলো সবাই।'

জানালা দিয়ে কীভাবে বের হলাম, মই বেয়ে কীভাবে নেমে এলাম মাটিতে সেসব কিছুই আর মনে নেই এখন। শুধু মনে আছে, আমার পিছন পিছন নেমে এল পাহাড়ি লোকগুলো–কেউ কেউ মই বেয়ে, আবার কেউ কেউ অবিশ্বাস্য কায়দায় পাহাড়ি দেয়াল বেয়ে। মাটিতে পা দেয়ামাত্র টের পেলাম আমার পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েকজন, অপদেবতার মতো গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে সবাই, হাতে-ধরা লম্বা লম্বা ছুরিগুলো নাড়াচ্ছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গেল হিগস আর জ্যাফেটের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নওজোয়ান সিংহটা, আর ওই একটা মুহূর্তেই তীরবেগে ছুটে গিয়ে জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ি লোকগুলো। ধারালো ছুরির উপর্যুপরি আঘাতে চিরে ফালা ফালা হয়ে গেল পশুরাজের শরীর, মরার আগে শেষবারের মতো হুঙ্কার ছাড়ারও সুযোগ পেল না জন্তুটা, স্রেফ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সিংহ-দেবতার মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু করে মই পর্যন্ত এখন চাঁদের আলোর বন্যা; আমার কাছ থেকে যে-দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে সিংহগুলো সে-দূরত্বে সিংহ কেন পাখিও মারতে পারবো আমি চোখ বন্ধ করে, লাইন-অফ-ফায়ারেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই কেউ বা কিছু, কাজেই আমার রিলোড-করা রিপিটিং

রাইফেলটা গর্জাতে শুরু করল আবার। পিছনে না-তাকিয়েও বুঝে গেল অলিভার আর কুইক, সাহায্য এসে গেছে। যার যার রাইফেল তুলে নিল ওরা কাঁধে, সিংহ-মারার উৎসবে যোগ দিল আমার সঙ্গে।

আধ ঘণ্টা পর, হিগসসহ আমরা সবাই নিরাপদে এসে দাঁড়ালাম ওই মালভূমিতে।

তেরো

বড় কোনো ক্ষতি হয়নি হিগসের। পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে সে, প্রিয় সান-হেলমেটটা হারিয়েছে এবং শরীরের এখানে-সেখানে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। এগুলো বাদ দিলে সুস্থ-স্বাভাবিকই আছে। ওর কালো চশমাটাও অক্ষত আছে, যে-চশমার কারণে আবাটি-ফাং সবাই ওকে "কালো জানালা" নামে ডাকে।

নিরাপদেই শেষ হয়েছে আমাদের অভিযান, যগুয়ার কথা বাদ দিয়ে বললে যেভাবে গিয়েছি সেভাবেই ফিরে এসেছি আমরা, তাই সবাই খুশি। কিন্তু আমার মনে আনন্দ নেই। বন্ধুকে ফিরে পেয়েছি, ভাবতেও পারিনি কোনোদিন সম্ভব হবে ব্যাপারটা, এবং এই পাওয়া আমার জন্য বড় একটা পাওয়া; কিন্তু আমার অসহায় ছেলেটা এখনও বন্দি হয়ে আছে ফাংদের হাতে। যদিও হিগস বলেছে আমার ছেলের সঙ্গে নাকি খারাপ ব্যবহার করে না ফাংরা, বরং যথেষ্ট আদর-যত্ন করে ওকে, কিন্তু তারপরও মন মানে না আমার, থেকে থেকে উদাস হয়ে যাই ছেলের কথা ভেবে।

যা-হোক, আগের কথা আগে বলি, তা হলে কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। মই বেয়ে উপরে উঠে এল হিগসসহ বাকিরা, পাথরটা জায়গামতো বসিয়ে দিয়ে ভালোমতো আটকে দিলাম আমরা যাতে কেউ সহজে খুলতে না-পারে, তারপর লণ্ঠন জ্বালালাম। তাকিয়ে দেখি মেঝেতে বসে পড়েছে হিগস, মশালের আগুনের মতো দেখাচ্ছে ওর লাল চুলগুলো, ছেঁড়া জামাকাপড়ের জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ, বড় বড় দাড়িতে ঢাকা পড়ে গেছে চেহারার অর্ধেকটা, গায়ে সিংহের মতো গন্ধ। পকেটে হাত দিয়ে বিশাল পাইপটা বের করে আনল সে, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু তামাক দিন তো! আমার কাছে যতটুকু ছিল শেষ হয়ে গেছে। ওই উৎকট গন্ধের ঝুড়িতে আমাকে ভরার আগে ভেবেছিলাম মরতেই যখন যাচ্ছি তখন তামাক যা আছে শেষ করে যাই, তাই আমার কাছে এখন আর কিছুই বাকি নেই।'

কিছু তামাক দিলাম আমি হিগসকে। নিবিষ্টমনে পাইপে অগ্নিসংযোগ করছে সে, জ্বলন্ত ম্যাচকাঠির আলো গিয়ে পড়েছে রানি মাকেডার চেহারায়, খেয়াল করলাম আশ্চর্য হয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'অদ্ভুত! অপূর্ব! অতুলনীয়!' নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মন্তব্য করল হিগস।

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এত সুন্দরী মহিলা জীবনেও দেখিনি আমি। কী করছেন তিনি এখানে? কে তিনি?'

রানির পরিচয় জানালাম আমি হিগসকে। শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, পাশ্চাত্য কায়দায় মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে রানিকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে বোকা বনল কারণ সিংহীর মুখে ছুঁড়ে মেরেছে সে হ্যাটটা, তারপর আবার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিশুদ্ধ আর অনর্গল আরবিতে রানিকে বলতে লাগল এই

boighar.net

অভাবনীয় সম্মান পেয়ে সে যার-পর-নাই খুশি... ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বিনা ক্ষতিতে আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পেরেছেন আপনি, আমি তাতেই সন্তুষ্ট,' বিনয় করে বললেন রানি।

গম্ভীর হয়ে গেল হিগস। 'হ্যাঁ, এ ক'দিনে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, বাপ-দাদার নাম তো পরের কথা নিজের নামটাই ভুলতে বসেছিলাম।' আমাদের দিকে তাকাল সে। 'দেখুন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না, তাই বলে আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবেন না আপনারা। আসলে ধন্যবাদ দেয়ার মতোও অবস্থা নেই আমার। মাথাটা কেমন ঘোলা হয়ে গেছে, এত দ্রুত এত অবিশ্বাস্য আর উত্তেজনাপূর্ণ সব ঘটনা ঘটছে যে কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। ...ডাক্তার অ্যাডামস, কোনো চিন্তা করবেন না আপনি, আপনার ছেলে ভালো আছে, সুস্থ আছে। ওর সঙ্গে খুব খাতির হয়ে গেছে আমার। দেখতে না-পেলেও জানি নিরাপদেই আছে সে। ...আর রাজা বারুং-এর কথা কী বলবো? বয়স হয়েছে বেচারার, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এখনও তরুণ তিনি, এবং উদার, যদিও তাঁরই আদেশে আমাকে সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোহিতদের পরামর্শ ফেলতে না-পেরে কাজটা করতে হয়েছে তাঁকে।'

এমন সময় পাহাড়ি লোকরা জানাল যে, ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে ওরা। যশুয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা দিলাম ওকে। হিগসের মুখ থেকে শুনে ভালো লাগছে নিরাপদে আছে আমার ছেলে।

যশুয়ার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে রওয়ানা হলাম আমরা। ক্লান্তিকর ওই যাত্রার বর্ণনা দেবো না আর। তবে একটা কথা না-বললেই নয়, যে-মালভূমি থেকে মই ফেলে সিংহ-দেবতার মূর্তির লেজে গিয়ে হাজির হয়েছিল অলিভার আর জ্যাফেট, সেখানে পৌঁছানোর পর শুনি আমাদের বানানো

দেয়ালটার ওপাশ থেকে কারা যেন উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। বুঝলাম, মূর্তিপ্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছে মহাক্ষিপ্ত পুরোহিতরা; বলি কোন্ পথে পালিয়েছে দেখেছে ওরা, কোন্ দিক দিয়ে যেতে পারে অনুমান করে নিয়ে আমাদের আগেই হাজির হয়ে গেছে আমাদের উপর হামলা করার জন্য। কোন্ পথে এসেছে ওরা তা-ও বুঝতে অসুবিধা হলো না–সিংহদেবতার লেজ থেকে মালভূমি পর্যন্ত মই ফেলেছে আমাদের মতোই।

সময় নষ্ট করলাম না আমরা, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পর্বতের চূড়ায় পৌছানোমাত্র আর দেরি করতে চাইল না কুইক; রানি মাকেডা, শ্যাডর‍্যাক আর দু'জন পাহাড়ি লোককে সঙ্গে নিয়ে আলাদা আলাদা ঘোড়ায় চড়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আনার জন্য ছুটল প্রাসাদের উদ্দেশে। আহত হওয়া সত্ত্বেও কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রাসাদে যেতে চাইল না হিগস, আর যশুয়াকে পাঠিয়ে দিয়ে মূল্যবান সময় অপচয় করার কোনো মানে হয় না, তাই আমরা বাকিরা রয়ে গেলাম চূড়ায়, পাহারা দিতে লাগলাম সুড়ঙ্গমুখটা। বলা ভালো রাইফেল হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা বিদেশিরা, আর পাহাড়ি আবাটিরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকল সুড়ঙ্গের মুখে। পরদিন দুপুরের কিছু আগে ফিরে এল কুইক, সঙ্গে অনেক লোক; এদের মধ্যে কেউ কেউ একজাতের একাধিক পালকি বহন করছে, আবার কারও কারও সঙ্গে আমাদের কাজে লাগবে এরকম সব সরঞ্জাম।

যা-হোক, ওরা আসার পর ডিনামাইট নিয়ে পাথর সরিয়ে নীচে নেমে গেল অলিভার, জ্যাফেট এবং আরও কয়েকজন, জায়গামতো বসিয়ে দিল বিস্ফোরকগুলো। বেশ কিছুক্ষণ পর সবাইকে নিয়ে আবার উদয় হলো অলিভার, খেয়াল করলাম কেন যেন মলিন আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওর চেহারাটা। চিৎকার করে আমাদের সবাইকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার আদেশ দিল

সে। সবাই সরে আসার পর এক কুণ্ডলী তার হাতে নিল সে, প্যাঁচ খুলতে খুলতে পিছিয়ে আসতে লাগল। নির্দিষ্ট দূরত্বে আসার পর ব্যাটারির সঙ্গে সংযোগ করল তারের প্রান্ত, কিছুক্ষণ পরই বিস্ফোরণের ভয়াবহ ধাক্কায় কেঁপে উঠল আমাদের পায়ের নীচের মাটি। ফুঁ দিলে তুলা যেভাবে উড়ে বাতাসে, সুড়ঙ্গমুখ থেকে ঠিক সেভাবে আকাশে উড়াল দিল ছোট-বড় পাথরখণ্ড, তারপর একেকটা ছড়িয়ে পড়ল একেকদিকে। এরপর ধস নামল হঠাৎ করেই, প্রচুর মাটি আর পাথর নেমে গেল নীচের দিকে, প্রাচীন ওই সুড়ঙ্গপথটা বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

'খারাপ লাগছে,' আমার পাশে দাঁড়ানো অলিভার মন্তব্য করল, 'কিন্তু করার কিছু ছিল না।'

'খারাপ লাগছে!' আশ্চর্য হলাম। 'কেন?'

'অনেকগুলো প্রহরী নিয়ে কয়েকজন ফাং পুরোহিত উঠে আসছিল ওই পথ দিয়ে, বোমা বসানোর সময় আওয়াজ পেয়েছি আমি। ওরা হয়তো আক্রমণ করত আমাদেরকে, কিন্তু করেনি, তার আগেই মেরে ফেলতে হলো ওদেরকে। শত্রু হামলা করার আগে তাকে মেরে ফেলাটা বীরের কাজ না। তবে যা-ই হোক, ওই পথ দিয়ে আর কেউ কোনোদিন চলাচল করতে পারবে না।'

পরে, মুরের অতিথি-ভবনে, আমাদেরকে নিজের কাহিনি শোনাল হিগস, 'হারম্যাক শহরটার কাছে যখন পৌঁছাই আমরা তখন জনৈক ফাং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গোপনে দেখা করে শ্যাডর্যাক, কথা হয় দু'জনের মধ্যে। ওদের সেই কথোপকথনের কিছুটা শুনে ফেলি আমি। শ্যাডর্যাকের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের চার জনকেই ধরিয়ে দেয়া। যা-হোক, আপনারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, ধরা পড়ি আমি; সিংহ-দেবতার মূর্তির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হয় আমাকে। আপাতদৃষ্টিতে নিরেট দেখালেও ওই মূর্তির ভিতরে অনেকগুলো ঘর আর ডানজন আছে। মূর্তিটা যারা বানিয়েছিল তারাই এসব ঘর বানিয়েছে। রাজা বারুং-এর

সঙ্গে ওখানেই দেখা হয় আমার, কথা হয়। তিনি বলেন, আমাকে নাকি পছন্দ হয়েছে তাঁর এবং রানির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি আপনারা–আমার মুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

'জানেন, রাজার মুখ থেকে কথাটা শুনে খুব রাগ হয়েছিল আপনাদের উপর। কিন্তু পরে যখন মাথা ঠাণ্ডা হয় তখন ভেবে দেখি, আসলে ঠিক কাজটাই করেছেন আপনারা। তারপরও চিন্তা করতে খারাপই লাগছিল, একদল সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেয়া হবে আমাকে এবং মুহূর্তের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবো আমি। রাজা বারুংকেও পছন্দ হয়েছে আমার–চমৎকার একটা মানুষ তিনি, কিন্তু তারপরও আমাকে বলি দেয়ার ব্যাপারটা ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। আগেই বলে দিয়েছিলেন, আমাকে বলি না-দিয়ে আর কোনো উপায় নেই তাঁর–ফাং সমাজে পুরোহিতরা নাকি খুবই ক্ষমতাবান, ওদের কথা না-শুনলে দেবতার অভিশাপ নামবে পুরো জাতির উপর।

'আমার সবরকম আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করে দেন তিনি। যেমন, এক ঘরে আটকে না-রেখে হাঁটাচলার সুযোগ দেয়া হয় আমাকে। সুযোগটা কাজে লাগাই আমি। মিশতে শুরু করি পুরোহিতদের সঙ্গে। বুঝতে পারি লোকগুলো খুবই খারাপ আসলে–সন্দেহপ্রবণ আর উন্নাসিক। ওদের ধর্মচর্চা দেখি, প্রাচীন মিশরের ধর্মচর্চার ব্যাপারটা তখন আরেকটু পরিষ্কার হয় আমার কাছে। সত্যি কথা বলতে কী, দারুণ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি; যদি এই জায়গা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারি ইংল্যাণ্ডে, যদি লিখে প্রকাশ করতে পারি আমার কথাগুলো তা হলে অমর হয়ে যাবো সম্ভবত।

'আমার মতে, এই ফাংদের পূর্বপুরুষরা নিঃসন্দেহে প্রাক-রাজবংশীয় মিশরীয়দেরও পূর্বপুরুষ। কারণ ওদের রীতিনীতি আর ধর্মীয় মতবাদে যথেষ্ট মিল আছে। ফাংরা যখন যেখানেই থাকুক না কেন, প্রাচীন সাম্রাজ্যকাল থেকে শুরু করে বিশতম রাজবংশ

পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিশরীয়দের সবসময় যোগাযোগ ছিল। জানেন হয়তো, একসময় এই মুর ছিল ওদের রাজধানী।

'আমাকে যে-ডানজনে আটকে রাখা হয়েছিল সেখানে একটা অভিলিখন আছে। অভিলিখন কী নিশ্চয়ই জানেন আপনারা–বড় এক টুকরো সমতল পাথর যেটাতে খোদাই করে বিভিন্ন কথাবার্তা লেখা থাকে। আসলে অভিলিখন না-বলে দেয়াল-লিখন বললেই মানায় বেশি। আমি বুঝতে পারি, কোনো একসময় অন্য কাউকে আটকে রাখা হয়েছিল ওই ডানজনে। প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, দ্বিতীয় র‍্যামসিসের সময় পালিয়ে গিয়েছিল লোকটা, পলাতক আসামি হিসেবে বিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছিল মিশরে, তারপর যে-কোনো কারণেই হোক সম্রাটের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় ওকে, সিংহ-দেবতার মূর্তির ভিতরে নিঃসঙ্গ কারাবাস হয় ওর। আমারই মতো সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেয়া হয় হতভাগা লোকটাকে। মরার আগের রাতে নিজের কথাগুলো দেয়ালে লিখে রেখে যায় সে। ওই কথাগুলো আমার নোটবুকে টুকে নিয়েছি আমি। শোনাচ্ছি আপনাদের,' বলতে বলতে পকেট হাতড়াতে লাগল সে। 'যত যা-ই করুক, হারামজাদা শ্যাডর‍্যাককে ধন্যবাদ জানাতেই হবে আমার। ওর জন্যই তো আজ এই...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে আমার ছেলের ব্যাপারে কিছু কথা জানতে চাইলাম তখন।

'ওহ্,' বলল হিগস, 'এককথায় যদি বলতে বলেন, আমি বলবো, খুবই চমৎকার এক যুবক এবং দেখতে খুবই সুন্দর। ওকে তো আমি নিজের ধর্মপুত্র বলে মেনে নিয়েছি। এতগুলো বছর ধরে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনি, ওকে উদ্ধার করার জন্য এই বয়সে নাওয়া-খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন–আমার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল সে। এখনও ইংরেজিতে কথা বলতে পারে আপনার ছেলে, তবে ভুল হয় আর ফাংদের মতো টান চলে আসে। সবচেয়ে বড় কথা, হারম্যাকে

থাকতে একটুও ভালো লাগে না ওর, পালাতে চায় সে। তবে বলতে গেলে সুখেই আছে আপনার ছেলে, ফাংদের বেশিরভাগ প্রার্থনাসঙ্গীত গায় সে, গানের গলা আবার খুব মিষ্টি ওর। ...ও, ভালো কথা, রাজা বারুং-এর একমাত্র বৈধ মেয়ের সঙ্গে, মানে রাজার স্ত্রীর ঘরে জন্মেছে যে, উপপত্নীদের ঘরে জন্মায়নি, আগামী পূর্ণিমার রাতে বিয়ে হবে আপনার ছেলের। হারম্যাক শহরে হবে অনুষ্ঠানটা। এমন জাঁকজমকের ব্যবস্থা করছেন রাজা যে, সারাজীবন ফাংরা মনে রাখবে ঘটনাটা। শুনেছি একজন ফাংও নাকি বাদ যাবে না দাওয়াত খাওয়া থেকে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলে যার-পর-নাই খুশি হতাম, কিন্তু কপাল খারাপ—পারছি না; তবে আপনার বুদ্ধিমান ছেলে আমাকে বলেছে ঠিকমতোই নোট লিখে রাখবে, যাতে ফাংদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আরও ধারণা পেতে পারি আমি। আশা করি ওর ওই নোট সঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে আমার কাছে।'

'রাজা বারুং-এর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে!' ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হলো আমার। 'সে কি ওই জংলী মেয়েটাকে পছন্দ করে নাকি?'

'না মনে হয়। মেয়েটাকে নাকি কখনও দেখেইনি আপনার ছেলে। শুধু শুনেছে মেয়েটা নাকি সহজসরল, তবে দেমাগ আছে। দার্শনিক দার্শনিক একটা ভাব আছে আপনার ছেলের আচরণে, এত উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে দিন কাটালে যে-কারও ওই রকম অবস্থা হবে। যা ঘটে তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় সে বেশিরভাগ সময়, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে আরও খারাপ অবস্থা হতে পারত কিন্তু হয়নি। ...একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছেন, ওকে যদি কখনও উদ্ধার করতে না-পারেন, না-পারার সম্ভাবনাটাই বেশি, তা হলে অন্তত রাজার মেয়েজামাই হওয়ার কারণে সিংহের মুখে গিয়ে পড়তে হবে না ওকে কোনোদিন?'

আমরা কেউই কোনো মন্তব্য করলাম না ওই ব্যাপারে।

'আপনাদের সম্বন্ধে, আপনার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বার বার জানতে চাইত সে আমার কাছে,' বলে চলল হিগস, 'আর আমি ওর কাছে জানতে চাইতাম ফাংদের ব্যাপারে। জানতে চাইতাম কীভাবে সিংহ-দেবতা হারম্যাকের পূজা করে ফাংরা, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান আর রীতিনীতি পালন করে। এসব আলাপচারিতায় কেটে যেত আমাদের সময়, তাই খুব একটা খারাপ লাগত না। ...ওর সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভালোই হতো।' হাতের নোটবুকটাতে কয়েকবার টোকা দিল সে। 'ভেবে দেখুন তো, কোনো একটা সিংহ যদি গিলে খেত এই নোটবুকটা তা হলে কত দুঃখজনক একটা ব্যাপারই না হতো! আমার কিছুই হতো না আসলে, আমার চেয়েও ভালো ইজিপ্টোলজিস্ট থাকতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যতটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পেরেছি ফাংদের সঙ্গে তারা কি ততটা ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেত? ...যেসব নোট আমি নিয়েছি তার আসল আসল কথাগুলো, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কালি দিয়ে ভেড়ার-চামড়ার উপর লিখে গচ্ছিত রেখেছি আপনার ছেলের কাছে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালাম, 'তোমার মতো এত চমৎকার একটা সুযোগ আর কেউ কখনও পাবে কি না সন্দেহ আছে। তুমি নিঃসন্দেহে একজন ভাগ্যবান আর্কিয়োলজিস্ট।'

নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমার সঙ্গে একমত হলো হিগস। 'কখনও কল্পনাও করিনি অলিভার ওভাবে গিয়ে হাজির হবে সিংহ-দেবতার মূর্তির লেজে। আমাকে যখন পালানোর কথা বলছিল সে, আপনার ছেলের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ওকে উদ্ধার করার সবরকম চেষ্টা করি আমি। ভেবেছিলাম ওকে ওর ঘরেই পাবো, কিন্তু সেখানে ছিল না সে। বরং গিয়ে দেখি কয়েকজন পুরোহিত বসে আছে; অলিভারের সঙ্গে আমার কথার আওয়াজ কানে গিয়েছিল ওদের। তারপর তো জানেনই কী হলো। ...আপাতত আমার আর কিছু বলার নেই,

এবার আপনারা বলুন এই ক'দিনে কী কী হলো এখানে।'

যা যা ঘটেছে এই ক'দিনে, সংক্ষেপে বলা হলো ওকে। শুনতে শুনতে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর। "প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানের" বর্ণনা যখন শুনল সে, উত্তেজনায় বলতে গেলে অস্থির হয়ে উঠল।

'নিশ্চয়ই আপনারা হাত দেননি কোনো কিছুতে,' প্রায় চেঁচিয়ে কথা বলছে হিগস, 'বলুন, বর্বর অশিক্ষিত মূর্খদের মতো ওই অমূল্য জিনিসগুলোতে হাত দিয়ে ওগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব নষ্ট করে দেননি আপনারা কেউ। আগে যে-কাজটা করতে হবে তা হলো, একটা তালিকা বানাতে হবে সব জিনিসের, আর একটা নকশা আঁকতে হবে। যদি সম্ভব হয়, কিছু কিছু নমুনা এমনভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে পরে যাদুঘরে বসানো হলে এখন যেটা যেভাবে আছে সেটা ঠিক সেভাবেই থাকে।' চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে। 'সামনে আমার অনেক কাজ। ফাংদের সঙ্গে আমাদের কোনো ফয়সালা হোক বা না-হোক, বুঝতে পারছি আমাকে কমপক্ষে আরও ছ'মাস থাকতে হবে এখানে।'

পরদিন ভোরে হিগসের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। চোখ খুলে দেখি, অদ্ভুত এক স্লিপিং-সুট পরে আমার ঘরে হাজির হয়েছে সে। কুইককে সঙ্গে নিয়ে গত রাতে বানিয়েছে সে এই সুটটা।

'অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত,' বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল সে প্রথমেই, 'কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস না-করে পারছি না।'

'কী কথা?' উঠে বসলাম খাটের উপর।

'ওই মেয়েটা, ওই যুবতীটা, ওয়ালদা নাগাসটা যার নাম, তার ব্যাপারে কিছু বলুন আমাকে। কী মিষ্টি চেহারা মেয়েটার! আর কী সাহস ওর! আমি যে-লাইনের লোক, মেয়েছেলে নিয়ে মাতামাতি করাটা আমার মানায় না, কোনো মেয়ে বা মহিলার দিকে গত বিশ

বছরে সেরকমভাবে তাকাইনি পর্যন্ত, এবং মনের মতো কাজ পেলে এই মেয়ের কথা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত খেয়াল থাকবে কি না সন্দেহ, কিন্তু তারপরও...' বুকে কয়েকবার থাবা দিল সে। 'এইখানে, জানেন, ঠিক এইখানে কেমন যেন লাগছে আমার ওই চোখ দুটোর কথা মনে পড়লেই।' অপ্রস্তত হাসি হাসল সে, 'আসলে কী হয়েছে জানেন, সিংহের গুহার বিভীষিকা কাটছে না আমার কিছুতেই, তাই বোধহয় এত সুন্দরী একটা মেয়ে দেখে...'

'হিগস,' শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'ওই গুহার কোনো সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে ওটার মুখে চড় মারার চেয়ে তুমি যে-মেয়ের কথা বলছ তার ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক। এমনিতেই এই ব্যাপারটা অনেক জটিল হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, দয়া করে আর জটিল কোরো না।'

'জটিল হয়ে গেছে মানে?'

'মানে আমাদের অলিভার প্রেমে পড়ে গেছে মেয়েটার।'

'তা তো পড়তেই পারে। এ আর এমন আশ্চর্যের কী! না পড়লেই বরং বিস্ময়কর লাগত আমার কাছে। কিন্তু অলিভার প্রেমে পড়েছে না পড়েনি তাতে কী যায়-আসে? আমার প্রেমে পড়তে অসুবিধাটা কোথায়? যদিও,' নিজের নাদুসনুদুস শরীরটার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল সে, 'অলিভারের মতো তেমন একটা সম্ভাবনা নেই আমার। তা ছাড়া আগে শুরু করে দিয়েছে বলে শেষপর্যন্ত জিত ওরই হবে হয়তো...'

'হয়তো না,' করুণ হাসি হাসলাম আমি, 'সবকিছু ঠিক থাকলে শেষপর্যন্ত অলিভারই জিতবে। কারণ ওই মেয়ে, মুরের রানি ওয়ালদা নাগাসটাও প্রেমে পড়ে গেছেন অলিভারের।'

'কী!'

প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে কী ঘটেছিল অলিভার আর রানি মাকেডার মধ্যে জানালাম হিগসকে। শুনে প্রথমে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে, তার কিছুক্ষণ পরই অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর হয়ে

গেল, দেখে মনে হলো রেগে গেছে। 'কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে অলিভার। স্বার্থপরের মতো যা করেছে সে তাতে সীমাহীন দুর্গতির মধ্যে পড়তে হবে আমাদের সবাইকে। ওর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলতে হবে আমাকে।'

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা শেষ করে গোসল করার জন্য চলে যাচ্ছিল হিগস, পিছু ডেকে থামালাম ওকে। 'অলিভারকে যত খুশি বোঝাও, আপত্তি নেই আমার, শুধু একটা কথা মনে রেখো, রানি মাকেডার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বোলো না। কারণ তোমার কথা শুনে আর চালচলন দেখে তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হতে পারে তাঁর। গতকাল তাঁর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে সে-দৃষ্টি দেখলে যে-কোনো মেয়েরই ওরকম ভুল ধারণা হতে পারে।'

সকালে ডেকে পাঠানো হলো আমাকে—যশুয়ার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতে হবে। শেকলযুক্ত বর্ম পরে থাকার কারণে গুরুতরভাবে আহত হয়নি সে, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে।

ওর খাসকামরায় ঢোকামাত্র টের পেলাম, অন্যরকম দেখাচ্ছে ওর চেহারা। আমার দলের বাকি সদস্যদের মতো, কাপুরুষ আর বাচাল ছাড়া আর কিছুই মনে করিনি আমি ওকে এতদিন; আজ কেন যেন মনে হচ্ছে লোকটাকে চিনতে ভুল করে ফেলেছি আমরা সবাই। মনে হচ্ছে কোনো একটা ব্যাপারে, সেটা যে-ব্যাপারেই হোক না কেন, স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে সে। কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মানুষটাকে। যত ঝুঁকিই থাকুক না কেন, কিছু একটা করার বা ঘটানোর ব্যাপারে ওর মনে আর কোনো দ্বিধা নেই যেন।

সীমিত সামর্থ্যে যা যা করা সম্ভব ছিল ওর জন্য, করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার ক্ষত তেমন গুরুতর নয়, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অত উঁচুতে লাফিয়ে উঠে ঠিকমতো থাবা দিতে পারেনি সিংহটা, আর আপনিও তখন পরে ছিলেন শিকলওয়ালা বর্ম, তাই বেঁচে গেছেন। মাংসে পচন ধরেনি, তার মানে বিষক্রিয়া

দেখা দেয়নি।'

যশুয়া বলল, 'ভিনদেশী ডাক্তার, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা আছে আমার।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তারপরও মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালাম।

বলতে শুরু করল যশুয়া, 'ওয়ালদা নাগাসটা, বংশপরম্পরায় এই দেশের রানি। মন্ত্রণাসভার পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—আপনাদের দক্ষতা আর চাতুরী কাজে লাগিয়ে আমাদের চিরশত্রু ফাংদের ধ্বংস করে দেয়া। কাজে সফল হলে আপনাদেরকে আপনাদের পরিশ্রমের চেয়ে বহুগুণে বেশি পুরস্কার দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ...আপনারা আপনাদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করেন। মনে করাটা স্বাভাবিক। অনেক দিক দিয়ে দুর্বলতা আছে আমাদের, আপনাদের সেসব নেই। অথচ আমরা কিন্তু জানি না, আপনাদের দেশে আপনারা আসলেই কতটা বড়। যা-ই হন না কেন, এই দেশে কিন্তু আপনারা আমাদের চাকর, ভদ্র ভাষায় বললে ভাড়াটে সৈনিক। ঠিক না?'

এতটা আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলছিল যশুয়া যে, যদিও চুপ করে থাকাটাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু প্রতিবাদ না-করে পারলাম না আমি। বললাম, 'রাজকুমার, রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করছেন আপনি। তা হলে বরং সত্যি কথাটা বলেই ফেলি আপনাকে, যার জন্য আপনার ভাষায় ভাড়া খাটছি আমরা, তার জন্য আমার ভাষায় জীবন বাজি রাখতে হয়েছে আমাদেরকে। আমার কথা যদি বলি, একটাই পুরস্কার আমার—ছেলের মুক্তি। জানেন কি না জানি না, আপনার শত্রুদের হাতে দাস হিসেবে বন্দি হয়ে আছে সে। আর ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম এখানে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে, যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে। এমনিতেই অনেক সহায়-সম্পত্তি টাকা-পয়সা আছে ওর, এখান থেকে কিছু না-

পেলেও অসুবিধা নেই। আর যাকে আপনারা কালো জানালা বলে ডাকেন, আসলে যার নাম হিগস, সে এসেছে জ্ঞান অর্জনের জন্য। ইংল্যাণ্ডে এবং আশপাশের অন্য পাশ্চাত্য দেশগুলোতে...কীভাবে বোঝাবো আপনাকে...মরা মানুষ, মানে আগের দিনের মানুষ, তাদের ভাষা, রীতিনীতি এসব নিয়ে গবেষণা করার কারণে একনামে পরিচিত সে। ভয়ঙ্কর এই অভিযানে আমাদের সঙ্গী হয়েছে শুধু একটা কারণে—আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। আর কুইকের কথা যদি বলি, অলিভারকে ছেলেবেলা থেকেই চিনত সে, সেনাবাহিনীতে ছিল, একসঙ্গে যুদ্ধও করেছে কয়েক জায়গায়, মায়া করে বলে একা আসতে দিতে রাজি হয়নি তাই চলে এসেছে অলিভারের সঙ্গে।'

'তা-ই নাকি?' যশুয়ার কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

'জী, তা-ই।'

'আসল কথায় আসি। ওয়ালদা নাগাসটা—খুবই সুন্দরী একটা মেয়েমানুষ, যুবতী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ভিনদেশী কোনো কিছু দেখলে, সেটা ভালো হোক বা মন্দ, যেমন পছন্দ হয়ে যায়, আপনাদেরকে, বলা ভালো আপনাদের কোনো একজনকে তেমন পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু আমি আশা করবো আপনারা তাঁকে মনে রাখতে দেবেন তিনি কে এবং যে-মানুষটা এসবের জন্য দায়ী তিনিও মনে রাখবেন তিনি কে। যদি মনে না-রাখেন তা হলে দয়া করে তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন, মুরের প্রাচীন রক্তের বাইরের কেউ যদি রানির দিকে চোখ তুলেও তাকায় তা হলে একটাই পরিণতি তার জন্য—মৃত্যু। এই মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর, কত নিষ্ঠুর আর কত ধীরগতির হতে পারে তা শুধু জানা আছে আমার। আরেকটা কথা, এত বড় ধৃষ্টতার শাস্তি শুধু একজনেরই হবে না, বরং যে বা যারা তাকে এই কাজে সাহায্য করবে তাদেরকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে।...ছেলেবেলা থেকে রানির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আমার, কাজেই আমার হবু স্ত্রীর সঙ্গে

কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে তাঁর দিকে তাকাতে হবে সেসব যেন আর শিখিয়ে দিতে না-হয়। আমাদের রানির বয়স কম তাই তাঁর মনটাও অন্যরকম, ভিনদেশীদের সঙ্গে চালচলনে তিনি দোষ দেখেন না, কিন্তু তাঁর অসম্মান মানে আমাদের পুরো জাতির সব নারীর অসম্মান। বুঝতে পেরেছেন?'

'জী,' রাগে জ্বলছে আমার পুরো শরীর, তাই আর কথা বাড়ালাম না, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলি ভেবে সংযত করলাম নিজেকে। তারপর আর কিছু না-বলে, এমনকী বিদায় সম্ভাষণটুকু না-জানিয়ে চলে এলাম বাইরে।

পরে, এই ঘটনা যখন বললাম আমার সঙ্গীদের কাছে, আমার মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। তবে আমার মনে হয়, অন্ধের মতো কাজ করছিল যে বা যারা এতদিন, বিশেষ করে অলিভার, তাদের চোখ খুলে গেল কথাগুলো শুনে। পরে আমাদেরকে বলল সে, ব্যাপারটা নিয়ে নাকি কথা বলেছে রানি মাকেডার সঙ্গে। শুনে আমাদেরকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রানি, নিজের ব্যাপারেও দুশ্চিন্তা জেগেছে তাঁর মনে। তিনি বলেছেন যশুয়া নাকি চাইলে যা খুশি করতে পারে, কারণ বেশিরভাগ আবাটি সমর্থন করে ওকে।

কিন্তু কীসের কী! প্রেম বড় সর্বনাশা আবেগ—দু'দিন যেতে-না-যেতেই আবার আগের মতো খাতির হয়ে গেল রানি আর অলিভারের মধ্যে। না আলাদা করা গেল তাদেরকে, না কমল তাদের ভালোবাসা। নিয়তির লিখন, কী আর করা, ট্রাজেডি ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে, অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া করার আর কিছু থাকল না আমাদের।

যা-হোক, মূল ঘটনায় ফিরে যাই। যশুয়াকে যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন বিকেলে রানির মন্ত্রণাসভায় যোগ দেয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হলো আমদেরকে। ঝামেলা হতে পারে অনুমান করে নিয়ে গেলাম আমরা। সবার মধ্যে সচকিত ভাব। ঝামেলা হলো ঠিকই, কিন্তু যে-রকম ভেবেছিলাম সে-রকম নয়।

বিশাল হলরুমে ঢুকে দেখি, সিংহাসনে বসে আছেন রানি। আমরা ঢুকতে-না-ঢুকতেই খুলে গেল একপ্রান্তের বড় বড় কয়েকটা দরজা, বের হয়ে এল সাদা রোব পরা আর ধূসর দাড়িওয়ালা তিন জন লোক। বুঝলাম, দূত পাঠিয়েছে ফাংরা।

নেকাবে মুখ ঢেকে রেখেছেন রানি, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল লোকগুলো। তারপর ঘুরল আমাদের দিকে, কুর্নিশ করল আমাদেরকেও। কিন্তু যশুয়া বা অন্য কাউকে সম্মান দেখাল না।

মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলার ইশারা করলেন রানি দূতদেরকে।

'ফাং জাতির রাজা বারুং পাঠিয়েছেন আমাদেরকে। আপনাকে বলার জন্য ঠিক যা যা বলেছেন তিনি তা-ই শোনাচ্ছি: "ওয়ালদা নাগাসটা, আপনাকে সাহায্য করার জন্য যেসব বিদেশি লোক নিয়ে এসেছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরই বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেবতা হারম্যাক এবং আমার মতো তাঁর একজন ভৃত্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন আপনি। আমার শহরের একটা তোরণ ধ্বংস করেছেন আপনারা, সেই সঙ্গে মেরে ফেলেছেন আমার অনেক লোককে। আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন আমার এক বন্দিকে, দেবতা হারম্যাকের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছেন তাঁর বলি। ফলে আমাদের উপর খুব রেগে গেছেন তিনি। অনেকগুলো পবিত্র পশুকে নির্বিচারে খুন করেছেন, পাহাড়ের সুড়ঙ্গে জ্যান্ত কবর দিয়েছেন বেশ কয়েকজন পুরোহিত আর অনেক প্রহরীকে। আরও বড় কথা, আমার গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, দেবতা হারম্যাক আর আমার বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র করছেন আপনারা—কীভাবে আরও ক্ষতি করা যায় আমাদের। পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি আমি, আর ছাড় দেয়া হবে না আপনাদেরকে; আমি বেঁচে থাকলে একজন আবাটিও বেঁচে থাকবে না মুরে। আর কিছুদিন পরই আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে যাচ্ছি আমার ক্রীতদাস সাদা মানুষটার সঙ্গে, যে নাকি আপনার কাছে যে-বিদেশি ডাক্তারটা

আছে তার ছেলে, যাকে আমরা আদর করে ডাকি "মিশরের গায়ক"। কিন্তু এই উৎসব উদযাপনের পর এবং আমাদের ক্ষেত থেকে ফসল ঘরে আনার পর তলোয়ার হাতে নেবো আমি এবং একজন আবাটিও বেঁচে থাকা পর্যন্ত সেই তলোয়ার ছাড়বো না।

'"জেনে রাখুন, গত রাতে যখন হত্যা করলেন পবিত্র পশুগুলোকে এবং পণ্ড করে দিলেন আমাদের বলির উৎসব, তখন পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন দেবতা হারম্যাক। নিজের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: আমাদের ফসল তোলার আগেই নাকি তাঁর মুণ্ডু গড়াগড়ি খাবে মুরের সমতলভূমিতে। কথাটার মানে কী বুঝতে পারিনি আমরা, কিন্তু এটা জানি যে, ফসল ঘরে তোলার পর আমি অথবা আমার পরে যে বা যারা শাসন করবে ফাংদের তারা ঘুমাবে মুরের প্রাসাদে, কারণ ততদিনে দখল হয়ে যাবে আপনাদের দেশ।

'"আমি মনে করি আপনার এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। আত্মসমর্পণ করুন—কেউ আপনাদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত দেবে না। কিন্তু যশুয়া, যে কিনা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল এবং ওর সঙ্গে আরও দশজনকে কোনোদিনও ক্ষমা করবো না আমি; যেদিনই হাতের নাগালে পাবো এদেরকে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবো। কারণ আমি মনে করি না, আমার তলোয়ারের আঘাতে মরার যোগ্যতাটুকুও আছে এদের কারও। আরেকটা কাজ করতে পারেন আপনি—প্রতিরোধ করতে পারেন আমাকে, সোজা কথায় বললে যুদ্ধ করতে পারেন আমার বিরুদ্ধে। যদি তা-ই হয় তা হলে দেবতা হারম্যাকের নামে শপথ করে বলছি, একজন আবাটিকেও জীবিত রাখবো না আমি। তবে বিদেশি লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবো, কারণ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি আমি। আরও একজনের কোনো ক্ষতি হবে না—আপনার যে-চাকর গত রাতে নেমেছিল পবিত্র পশুদের গুহায়, বীরপুরুষের মতো পালন করেছে নিজের দায়িত্ব। বেঁচে থাকবে আপনার

দেশের সব মেয়েছেলে, কিন্তু দাস হিসেবে কাজ করে যেতে হবে ওদেরকে আজীবন। তবে আপনার কথা আলাদা, যদি জীবিত ধরা পড়েন তা হলে সসম্মানে রাখা হবে আপনাকে, কারণ আপনি মহৎ হৃদয়ের একজন মানুষ।'"

কথা শেষ হলো দূতের, মুখ তুললেন রানি, তাকালেন তাঁর সভাসদদের দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে সবাই। এমনকী কাঁপছেও কেউ কেউ।

'আপনাদেরকে তেমন কিছু বলার নেই আমার,' দূতদেরকে বললেন রানি, 'আমি সামান্য একটা মেয়েমানুষ। ...যশুয়া চাচা, কী বলেন আপনি? আপনাকে পাওয়ামাত্র ফাঁসি দেবেন রাজা বারুং; দেশ ও জনগণের স্বার্থে আপনি কি স্বেচ্ছায় গিয়ে ধরা দেবেন তাঁর কাছে? আপনার আত্মত্যাগের কারণে কিছুটা হলেও হয়তো কমতে পারে তাঁর রাগ।'

'কী?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল যশুয়া। 'আপনি যদি রানি হন তা হলে যে কিনা বলতে গেলে মুরের রাজা, যে আপনার চাচা এবং হবু স্বামী, তার ব্যাপারে ওরকম কথা কীভাবে বলতে পারলেন আপনি? আমি গিয়ে আত্মসমর্পণ করবো বারুং-এর কাছে? স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি পরবো যাতে আমাকে ঝুলিয়ে মারতে পারে সে? জীবনেও না। আমরা যুদ্ধ করবো ফাংদের বিরুদ্ধে, ধ্বংস করে দেবো ওদেরকে এবং ওদের সেই সিংহ-মাথার দেবতা হারম্যাককে। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মূর্তিটা, সেসব টুকরো দিয়ে মন্দির বানাবো আমরা, রাস্তাঘাট বানাবো। ...শুনেছিস, ফাং কুত্তারা?' শেষের কথাটা দূতদের উদ্দেশ্য করে বলল সে, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা।

ওর দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল দূতরা, তারপর একজন বলল, 'শুনেছি এবং শুনে খুব খুশি হয়েছি। কারণ আমরা ফাংরা আপোষের মাধ্যমে না, তলোয়ারের মাধ্যমে যে-কোনো বিরোধ মীমাংসা করাটা পছন্দ করি। যশুয়া, আপনাকে উদ্দেশ্য করে

একটাই কথা বলার আছে আমাদের: আমরা আপনাদের দেশ দখল করে নেয়ার আগেই পারলে মরে যান। কারণ ফাঁসির দড়ি ছাড়াও আরও অনেক কায়দায় মানুষকে মারতে জানি আমরা।'

কথা শেষ করে ধীরস্থিরভাবে প্রথমে রানি শেবাকে, তারপর আমাদেরকে কুর্নিশ করল ওরা, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল।

'মার্ সবগুলোকে!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল যশুয়া আবারও, 'মেরে ফেল্! কত বড় সাহস! আমাকে হুমকি দেয়! মুরের ভবিষ্যৎ রাজাকে মৃত্যুর ভয় দেখায়?'

কিন্তু কেউই কিছু করল না। নিরাপদেই প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে গেল দূতরা; বাইরে ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল, যার যার ঘোড়ায় গিয়ে চড়ল ওরা।

চোদ্দ

দূতরা চলে যাওয়ার পর প্রথমে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল দরবারে। তারপর হঠাৎ করেই, একদল বানর যেভাবে কিচিরমিচির করে ঠিক সেভাবে, একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল মন্ত্রণাসভার সব সদস্য। পাশেরজনের কথা শুনছে না কেউই, মাথায় যা আসছে তা-ই বের করে দিচ্ছে মুখ দিয়ে। এই হট্টগোল থামল শেষপর্যন্ত, কারণ দরবারকক্ষে প্রবেশ করল জমকালো পোশাক পরা এক বুড়ো, দেখে মনে হলো কোনো পুরোহিত; কয়েক কদম আগে বাড়ল সে, তারপর চিৎকার করে থামতে বলল সবাইকে।

কিচিরমিচির থেমে যাওয়ার পর উত্তেজিত আর বিষমাখা কণ্ঠে

আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুরু করল বুড়ো, 'আজ আমাদের সব সমস্যার কারণ এই বিদেশিরা। এরা এখানে আসার আগেও আমাদেরকে অনেকবার হুমকি-ধমকি দিয়েছে ফাংরা, তারপরও যথেষ্ট সুখে-শান্তিতে ছিলাম আমরা, গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল আমাদের। এই বিদেশিগুলো রাগিয়ে দিয়েছে ওদেরকে, সোজা কথায় বললে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছে—পাগল হয়ে গেছে ফাংরা, আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। এখন সবার প্রথমে যে-কাজটা করতে হবে আমাদেরকে তা হলো, ঘাড় ধরে মুর থেকে বের করে দিতে হবে এই বিদেশিদেরগুলোকে।'

কথাটা শোনামাত্র পাশে-বসে-থাকা লোকটার কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল যশুয়া, শুনে গলা ফাটিয়ে বলে উঠল লোকটা, 'না, না, বের করে দেয়া যাবে না ওদেরকে। তা হলে ওরা সোজা গিয়ে হাজির হবে রাজা বারুং-এর কাছে, পয়সার লোভে ওর হয়ে কাজ করবে। আমাদের সব গোপন খবর জানা আছে এদের, ওগুলো আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে ওরা তখন। আমি বলি কী, চার শয়তানই এখন আছে আমাদের হাতে, কোনো ঝুঁকি না-নিয়ে ওদেরকে সোজা খুন করে ফেললেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়!' কথা শেষ করে একটানে তরবারি বের করল সে, সাঁই সাঁই করে বাতাসে কোপ মারল কয়েকবার।

পিস্তল বের করল কুইক। ধীরেসুস্থে নিশানা করল তলোয়ারধারীর দিকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা আরবিতে বলল, 'খেলনাটা ফেলে দাও। তোমার তলোয়ারটাকে কেন খেলনা বলছি বুঝতে পারছ আশা করি? কাছেও যেতে হবে না আমাকে, যা করার এখান থেকেই করবো, চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগেই লাশ হয়ে যাবে তুমি। ফাংরা কী করল তোমার প্রাণপ্রিয় দেশটার জানার সুযোগ আর কখনও পাবে না।'

হাত থেকে তরবারি ছেড়ে দিল লোকটা।

এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন রানি মাকেডা, এবার

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করলেন, 'এই বিদেশি লোকগুলো আমাদের অতিথি। আমাদের উপকার করার জন্যই এখানে এসেছেন তাঁরা। আপনারা কি আমাদের অতিথিদের মেরে ফেলতে চান? মেরে ফেললে আসলেই কি কোনো লাভ হবে? আপনাদের কি একবারও মনে হয় না, মেয়ের বিয়ে অথবা জনগণের ফসল তোলা—এগুলো রাজা বারুং-এর অজুহাত মাত্র? আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে সময় নষ্ট করছেন তিনি। সিদ্ধান্ত কেন নিতে পারছেন না জানেন? এই বিদেশিদের জন্য। তিনি জানেন যে, এই লোকগুলো যতক্ষণ আছে আমাদের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর। একটু আগেই তো শুনলেন কী বলেছেন এই চার বিদেশির একজন, "কাছেও যেতে হবে না..."। হ্যাঁ, আমার মনে হয় কথাটা বুঝতে পেরেছেন রাজা বারুং-ও। শত্রুর কাছেও যেতে হয় না এঁদের, তার আগেই ধ্বংস হয়ে যায় শত্রুরা। আর এটাই এঁদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা।

'ফাংদের বিরুদ্ধে জেতার ক্ষীণ একটা আশা আছে আমাদের, এই বিদেশিদের হত্যা করলে সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা কেন বার বার ভুলে যান, মুখোমুখি লড়াই-এ কোনোদিনও পারবো না আমরা ফাংদের বিরুদ্ধে? ওরা সংখ্যায় বেশি, ওদের অস্ত্র বেশি, যুদ্ধের কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো জানে ওরা এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রচণ্ড সাহস আছে ওদের বুকে। আমাদের যদি জিততে হয় অথবা টিকে থাকতে হয় তা হলে কৌশল খাটানো ছাড়া উপায় নেই। ধ্বংস করে দিতে হবে ওদের সিংহ-মাথার দেবতা হারম্যাকের মূর্তিটা। সবাই জানেন বোধহয়, মূর্তিটা কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে এখানে আর থাকবে না ওরা, চলে যাবে অন্য কোনো জায়গায়, সেখানে গিয়ে আবার মূর্তি বানাবে, বসত গড়বে। কথাটা আমার না, ওদের ধর্মের। আর যেহেতু ধর্মীয় গোঁড়ামি আছে ওদের মধ্যে সেহেতু সেই

সুযোগটাই নিতে চাচ্ছি আমি।

'বলুন, আপনাদের কারও কি ক্ষমতা আছে বিশাল ওই মূর্তিটা রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেয়ার? নাকি আপনাদের সাহস আছে তলোয়ার হাতে যুদ্ধের ময়দানে ফাংদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর? আমি যেমন জানি, আপনারাও তেমন ভালো করেই জানেন, কোনোটাই পারবেন না আপনারা। আর সেজন্যই এই বিদেশিদেরকে বলতে গেলে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। আরেকটা কথা, ওঁদেরকে খুন করলেই কি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে রাজা বারুং-এর রাগ? না, বরং আরও দশ গুণ বাড়বে। সেই সঙ্গে বাড়বে তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা, কেটে যাবে তাঁর দ্বিধা। এত কিছু জানার পরও যদি খুন করেন আপনারা আমার অতিথিদের, তা হলে আমি, মাকেডা, এই মুহূর্তে ঘোষণা করছি, আরেকজন ওয়ালদা নাগাসটা খুঁজে নিতে হবে আপনাদের, কারণ তখন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবো আমি এই সিংহাসন।'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে বলল কেউ। 'এই দেশে এখন আপনিই একমাত্র মানুষ, রাজবংশের খাঁটি রক্ত আছে যাঁর শরীরে।'

'আপনাদের মতো মানুষদের শাসন করার জন্য রাজবংশের খাঁটি রক্ত থাকতে হয় না কারও শরীরে। ...আরও একটা কাজ করতে পারেন আপনারা,' যশুয়ার দিকে তাকালেন রানি কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, 'অন্য কাউকে, যে কিনা আপনাদের জন্য যথোপযুক্ত, রাজা নির্বাচিত করতে পারেন।'

'হঠাৎ রাজা নির্বাচনের দরকার পড়ল কেন আমাদের?' জানতে চাইল আরেকজন।

'কারণ আমার চোখের সামনে আমার অতিথিদের যদি খুন করেন আপনারা তা হলে সম্ভবত লজ্জায়ই মারা যাবো আমি।'

রানির কথা শুনে কথা বন্ধ হয়ে গেল সবার। বোঝা গেল, মুখে যা-ই বলুক, আসলে রানিকে শ্রদ্ধা করে সবাই, ভয় পায়।

'কী করতে বলেন আপনি আমাদেরকে?' বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর জানতে চাইল কেউ।

একটানে চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে ফেললেন রানি। 'কী করতে বলি? পুরুষের মতো আচরণ করতে বলি। ...তলোয়ার চালাতে পারে এরকম যত জনকে পাওয়া যায় তাদের সবাইকে নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করুন। ক্ষতি না-করে সাহায্য করুন এই বিদেশিদেরকে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের সাহায্য পেলে আপনাদেরকে বিজয় এনে দিতে পারবেন তাঁরা। এখন সিদ্ধান্ত নিন আপনারা, শেষ হয়ে যেতে চান নাকি বেঁচে থাকতে চান? যদি চান আপনাদের নাম-নিশানা মুছে যাক এই অঞ্চল থেকে, যদি চান আপনাদের ঘরের মেয়েছেলেরা দাসী হয়ে আমরণ থাকুক ফাংদের ঘরে তা হলে খুন করুন এই বিদেশিদের।'

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন, 'না, না, বেঁচে থাকতে চাই আমরা!'

'যদি তা-ই চান তা হলে আবারও বলি, সাহায্য করুন এই বিদেশিদেরকে। আপনাদের সংখ্যা নেহাৎ কম না, আর যুদ্ধের আধুনিক কৌশল জানা আছে এই বিদেশিদের; আপনারা যদি অনুসরণ করতে চান তা হলে আপনাদেরকে অবশ্যই সঠিক দিকনির্দেশনা দেবেন তাঁরা। অন্তত আগামী কয়েকদিনের জন্য হলেও একটু সাহসী হোন সবাই; আমার বিশ্বাস আগামী নবান্নের সময় ফাংরা মুরে না, আবাটিরা হারম্যাকে ঘুমাবে। ...আমার আর কিছু বলার নেই, এবার আপনাদের যা খুশি করুন।' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন, ইশারায় আমাদেরকেও চলে যেতে বললেন দরবারকক্ষ ছেড়ে।

সভাসদদের উপস্থিতিতে রানির চমৎকার এই ভাষণের ফলাফল ভালোই হলো সবার জন্য। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো আমাদের আর সভাসদদের মধ্যে। মুরের "সংবিধানের পাণ্ডুলিপি" হাতে নিয়ে বরাবরের মতো দাম্ভিক আর পণ্ডিতিমার্কা মনোভাবে

শপথ করে বলল সবাই, ফাংদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগলে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে আমাদেরকে সাহায্য করবে ওরা। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধের সময় যা যা আদেশ করবো আমরা, সব মেনে নেবে। সংক্ষেপে বললে, নিজেদের অস্তিত্ব আর পরিবার নিয়ে এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল মুরের এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লোকগুলো যে, কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদের প্রতি নিজেদের ঘৃণা ভুলে গিয়েছিল ওরা।

এই সভাসদরা ছাড়া জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক আর কোনো প্রতিষ্ঠান নেই মুরে, তাই ওই "অধিবেশনেই" সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সহজ করে বললে "আইন" পাস করা হলো–সক্ষম সব আবাটি পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হবে সেনাবাহিনীতে।

কিন্তু আইনটা যখন জানতে পারল সাধারণ আবাটিরা, তখন সহজভাবে নিল না ব্যাপারটাকে। কারণও আছে অবশ্য। বেশিরভাগ আবাটিই সহজ-সরল চাষী; সেনাবাহিনী, যুদ্ধ ইত্যাদি বলতে গেলে ঘৃণা করে ওরা। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে ওরা হামলা করবে ফাংরা, কিন্তু আসলে সেরকম গুরুতর কোনো লড়াই আজ পর্যন্ত হয়নি দুই গোত্রের মধ্যে। মুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে মুরের বাইরেই রয়ে গেছে ফাংরা, আর মুর দখল করার পর থেকে মুরের ভিতরেই আছে আবাটিরা। ব্যাপারটা যেন অনেকটা সমুদ্র-দূরবর্তী কোনো দ্বীপের মতো। যুগ যুগ ধরে দুর্ভেদ্য পাহাড়ি-দেয়াল রক্ষা করে চলেছে আবাটিদের, তুলনামূলকভাবে অনেক শক্তিশালী হওয়ার পরও সে-দেয়াল পার হয়ে আসতে পারছে না ফাংরা।

ধ্বংসযজ্ঞ আর লুটপাটের কোনো অভিজ্ঞতাই বলতে গেলে নেই এই আবাটিদের। এমনকী, আমার মনে হয় না, এসব নিয়ে কখনও কিছু ভাবে ওরা। দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি ঘটনা এবং পাশের বাড়ির লোকরা কী করল না-করল সেসব নিয়েই যত মাথাব্যথা ওদের। কাজেই যখন ওরা শুনল দখল করতে পারলে

ওদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে ফাংরা, নির্বিচারে খুন করবে ওদেরকে, ধরে নিয়ে গিয়ে দাস-দাসী বানাবে ওদের ছেলেমেয়ে আর বউদের, তারপরও যে বা যারা বেঁচে থাকবে তারা না-খেতে পেয়ে মরবে অথবা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে পাহাড়ে-জঙ্গলে, আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল—যেন বুঝতেই পারছে না অথবা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না যা বলা হচ্ছে ওদেরকে।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনদের উপদেষ্টা হিসেবে ওদের সঙ্গে টানা কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালাম আমি আবাটিদের গ্রামগুলোতে। কিন্তু ঘুম ভাঙাতে পারলাম না ওদের, দেশ বাঁচানোর ডাকে সাড়া দিল না বেশিরভাগ লোকই। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো জায়গায়, নির্দিষ্ট করে বললে বিখ্যাত সেই হ্রদটার তীরবর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে তো মহাবিপদে পড়ে গেলাম। পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আমাদের উপর, সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া তো পরের কথা আমাদেরকে দেখামাত্র তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা!

এত কিছুর পরও, যে-কোনো ভাবেই হোক, পাঁচ কি ছ'হাজারের মতো লোক যোগাড় হয়ে গেল। ওদেরকে নিয়ে ক্যাম্প করলাম আমরা, প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম। কিন্তু যে-দেশের মানুষদের প্রধান প্রতিনিধি যশুয়ার মতো একটা লোক, সে-দেশের অবাধ্য, অবোধ আর ভীতু লোকদের বেলায় যা হওয়াটা স্বাভাবিক তা-ই হলো—ক্যাম্প থেকে নিয়মিত বিরতিতে পালাতে লাগল একজন দু'জন করে এবং ওদেরকে কড়া শাসন করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে লাশ হয়ে যেতে হলো সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে।

'কোনো লাভ নেই, ডাক্তার অ্যাডামস,' হতাশ হয়ে একদিন বলল আমাকে কুইক, 'বাদ দিন এসব। আবাটিদের মতো একদল শুয়োরকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে

boighar.net

গিয়ে যার যার খোঁয়াড়ে ঢোকার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে এদের সবাই। কপালে যা লেখা আছে, তা-ই হবে এদের, হলেই ভালো; আমি বলি কী, এদের সঙ্গে থেকে-মরার চেয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হওয়া উচিত আমাদের। জানটাও বাঁচবে, আবার ফেরার পথে বড় কোনো শিকার পেলে মেরে সঙ্গে করে নিতেও পারবো ট্রফি হিসেবে।'

'ভুলে যাচ্ছ, কুইক, এত লম্বা একটা সময় ধরে এই অসভ্যদের সঙ্গে থাকার বিশেষ একটা কারণ আছে আমার। একই কথা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন হিগস। প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে, কঙ্কালগুলো নিয়ে গবেষণা করতে পারলে আর কিছু দরকার নেই ওর।'

'এবং ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম,' কুইকের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, 'কঙ্কালের চেয়েও ভালো আর বিপজ্জনক কিছু একটার খোঁজ তিনি পেয়ে গেছেন, তাই পড়ে আছেন এখানে জানের পরোয়া না-করে।'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না সে, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল র‍্যামরডের মতো, তারপর ফুলবাবুর মতো দেখতে কয়েকজন আবাটি অফিসারের দিকে এগোল। অতিরিক্ত সাজসজ্জার জন্য এই লোকগুলোকে ঘৃণা করে সে, আবার সবসময় কড়া নিয়ম মেনে চলে এবং চলার আদেশ দেয় বলে কুইককেও ঘৃণা করে ওরা।

কিন্তু আবাটিদেরকে শুধু আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া অথবা যুদ্ধের কৌশল শেখানোতেই থেমে নেই আমাদের কাজ। হিসেব কষে নিশ্চিত হয়েছে অলিভার, প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানের নীচ থেকে একটা টানেল বানালে সোজা হাজির হওয়া যাবে সিংহ-দেবতার মূর্তির পাদদেশে। সেই টানেল বানানোর কাজও চলছে গত ক'দিন ধরে। শুনে যে-রকম মনে হয়, কাজটা কিন্তু তারচেয়ে

অনেক জটিল আর বড়। এই যে আমি বললাম বানানো, আসলে বানানো না-বলে পরিষ্কার করা অথবা চলাচলের উপযোগী করা বললে বোধহয় ভালো হতো। কারণ কুঁজোপিঠের ওই রাজার বিশাল কঙ্কালটা যে-চেয়ারে বসানো ছিল, অলিভার অনুমান করেছিল ওই চেয়ারের নীচ দিয়ে একটা টানেল এগিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে সিংহ-দেবতার মূর্তির পাদদেশে। পরে সঠিক প্রমাণিত হয় ওর অনুমান–সত্যিই সেরকম একটা প্যাসেজ খুঁজে পাই আমরা। কয়েকশ' গজ পর্যন্ত খুব খাড়াভাবে নীচের দিকে নেমে গেছে প্যাসেজটা, কিন্তু তারপর সম্ভবত একশ' গজ পর্যন্ত এত বেশি ভেঙেচুরে গেছে আর নড়বড়ে হয়ে গেছে ওটার দেয়াল আর ছাদ যে, আরও আগে বাড়ার আগে নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই মেরামত করাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য।

এরকম একদিন, প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে হাজির হলাম অদ্ভুত এক জায়গায়। পুরো প্যাসেজটাই যেন ধসে পড়েছে আমাদের সামনে। বুঝলাম, ভয়ঙ্কর ওই ভূমিকম্পের ফলে হয়েছে এরকম। অলিভারের যন্ত্রপাতি আর হিসেব ঠিক থাকলে, ফাংদের সেই সিংহের-গুহা থেকে দু'শ' ফুট দূরে আছি আমরা এখন। পাহাড়ি দেয়াল আর ছাদ ভেঙে পড়ে পথ আটকে দিয়ে না-থাকলে, বোঝাই যাচ্ছে, সোজা গিয়ে সিংহের মুখে পড়তাম আমরা। কী করা যায় সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

ব্যাপারটা নিয়ে দরবারকক্ষে দেখা করলাম আমরা রানি মাকেডার সঙ্গে। মন্ত্রণাসভার কয়েকজন সদস্যকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সবার সামনে অলিভার বলল, কয়েকশ' টন মাটি আর পাথর পরিষ্কার করাটা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তাতে প্রকৃতপক্ষে কোনো লাভ হবে না। কারণ আবারও গিয়ে হাজির হতে হবে আমাদেরকে ওই সিংহের-গুহায়।

'তা হলে আপনার পরিকল্পনাটা কী?' অলিভারের কাছে

জানতে চাইলেন রানি।

'বলছি। তবে তার আগে আমাকে জানতে হবে আপনি কি এখনও চান গুঁড়িয়ে দেয়া হোক হারম্যাকের মূর্তিটা?'

'চাইবো না কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেলেন রানি। 'মনেপ্রাণে চাই।'

'কিন্তু কতগুলো অসুবিধা আছে ওই কাজে। আপনাকে বোঝাতে পারবো কি না জানি না, তারপরও যথাসম্ভব সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। একাধিকবার বলেছেন আপনি, মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে গেলে নাকি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে ফাংরা। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যাবে না ওরা। বরং প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে আপনাদের উপর। দ্বিতীয়ত, মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দেয়া কিন্তু মুখের কথা না। আমাদের সঙ্গে যেসব বিস্ফোরক দ্রব্য আছে সেগুলোর ক্ষমতা তো দেখেছেনই ইতোমধ্যে, ঠিক জায়গায় ঠিকমতো বসাতে পারলে ওই মূর্তি উড়িয়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই না, কিন্তু মুশকিলের কথা হচ্ছে, কতটুকু বিস্ফোরক দ্রব্য লাগতে পারে সে-সম্বন্ধে সঠিক কোনো হিসেব নেই আমার কাছে। কারণ কয়েকবার চেষ্টা করেও মূর্তিটার সঠিক ওজন বের করতে পারিনি আমি। দূর থেকে দেখে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজটা করা সম্ভব না। কাছে যেতে হবে, মাপজোক করতে হবে। ঠিক একইভাবে, মূর্তিটার ভিতরে ফাঁপা জায়গা কতটুকু আছে তা-ও জানা নেই আমার। তৃতীয়ত, মূর্তিটা উড়িয়ে দিতে হলে একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে আমাদেরকে—মূর্তিটার ভিত্তিতে, মানে যেখানে বসানো আছে সেটা তার ঠিক নীচে কমপক্ষে তিনশ' ফুট দৈর্ঘ্যের সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হবে, তা-ও আবার এমনভাবে যাতে কিছুই টের না-পায় ফাংরা। আর কাজটা করার জন্য মাত্র ছ'সপ্তাহ সময় আছে আমাদের হাতে, কারণ এরপরই আমাদের ডাক্তার অ্যাডামসের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে রাজা বারুং-এর মেয়ের, একইসঙ্গে শুরু হচ্ছে

ফাংদের নবান্ন উৎসব। এরকম পাথুরে জায়গায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ার কাজটা খুবই কঠিন আর সময়সাপেক্ষ। কয়েকশ' লোক লাগবে আমার, চোখ-মুখ বুজে দিন-রাত কাজ করতে হবে ওদেরকে।'

চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন রানি মাকেডা। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'বন্ধু, আপনি সাহসী আর এসব কাজে দক্ষ। বলুন, আমার জায়গায় যদি আপনি থাকতেন তা হলে কী করতেন?'

'কী করতাম?' হাসল অলিভার। 'যা করার কথা কোনোদিন আপনাদের মাথাতেও আসত না তা-ই করতাম। দু'পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে আর দুটো হাত আছে এরকম সব আবাটিকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে হামলা করতাম ফাংদের শহরে, ধরুন নবান্ন-উৎসবের রাতে, যখন ওদের পাহারা কিছুটা হলেও শিথিল হয়ে যেত। উড়িয়ে দিতাম হারম্যাক শহরের সবগুলো রক্ষাতোরণ, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়তাম ভিতরে, কচুকাটা করে তাড়িয়ে দিতাম ফাংদের, দখল করে নিতাম মূর্তিটা। তারপর যদি প্রয়োজন মনে করতাম টুকরো টুকরো করে ফেলতাম ওটাকে।'

উপস্থিত সভাসদদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা বললেন রানি। দেখেই বোঝা গেল অপ্রস্তুত বোধ করছে সবাই; ঠিকই বলেছে অলিভার–ওর মতো এত বীরত্ব দেখানো তো দূরের কথা, ওরকম কিছু যে করা যেতে পারে তা-ও কখনও ভাবেনি কেউ। তাই এখন এরকম প্রস্তাব শুনে চেহারা শুকিয়ে গেছে সবার। যা-হোক, মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ শেষে আমাদেরকে ডাকলেন রানি। বললেন, 'ওঁরা কী বললেন জানেন? বললেন আপনার পরিকল্পনাটা নাকি পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। আপনার প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিলেন না কেউই, ওঁদের পক্ষে নাকি এই "আত্মহত্যার চিন্তার" অনুমোদন দেয়া সম্ভব না। অবশ্য যুক্তিও আছে ওঁদের কথায়—হাজার বলেকয়েও হারম্যাক শহর আক্রমণে রাজি করাতে পারবেন না আপনি আবাটিদেরকে।

ধরলাম আপনারা চার জন বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু আমার লোকদের অবস্থা তো ভালো করেই জানি আমি; হাজার হাজার ফাং সৈন্যের বিরুদ্ধে কী করতে পারবেন ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে? আরও একটা কথা বলেছেন তাঁরা, যার প্রত্যুত্তর দিতে পারিনি আমি কারণ কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে—আমার চাকর হিসেবে এক বছর কাজ করার শপথ করেছেন আপনারা, তাই আপনাদের উচিত আমার মন্ত্রীদের আদেশ পালন করা, তাঁদেরকে আদেশ করাটা নাকি ঠিক না। তা ছাড়া মূর্তিটা ধ্বংস করে দিতে পারলে যেহেতু অনেক বড় পুরস্কার আছে আপনাদের জন্য সেহেতু ওই কাজেই নাকি মনোনিবেশ করা দরকার আপনাদের। মন্ত্রণাসভার সব সদস্যের পক্ষ থেকে আমার চাচা যশুয়া বলেছেন কথাগুলো, এবং কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি তাঁর সিদ্ধান্তের।'

রাগে বা লজ্জায়, যে-কোনো কারণেই হোক, লাল হয়ে গেল অলিভারের চেহারা। জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনারও কি একই সিদ্ধান্ত, রানি?'

'দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। ফাংদের শহর আক্রমণে কোনোদিনও রাজি করাতে পারবেন না আপনি আবাটিদের, তাই আমিও চাই ওদের মূর্তিটা ধ্বংস করে দিন আপনারা সবাই মিলে। কিন্তু যশুয়া যেভাবে বলেছেন কথাটা সেভাবে কাজটা করতে কোনোদিনও বলবো না আমি আপনাকে।'

'খুব ভালো কথা। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না আমি। শুধু একটা কথা বলবো—আপনার পণ্ডিত মন্ত্রীরা যে-রকম ভাবছেন, শেষপর্যন্ত যদি সে-রকম না-হয় তা হলে দয়া করে দোষ দেবেন না আমাদেরকে। ...ধর্মীয় গোঁড়ামি এমন একটা সংস্কার, যার উপর ভরসা করা যায় না সবসময়। আমি বিশ্বাস করি না সিংহ-দেবতার মূর্তি ধ্বংস হয়ে গেলে পরাজয় মেনে নিয়ে সব ছেড়েছুঁড়ে চলে যাবে ফাংদের মতো যোদ্ধা একটা জাতির

লোকরা। প্রফেসর হিগসকে যখন উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম তখন কী করেছিল ওরা মনে করতে পারেন? রাইফেলের ভয় ভুলে গিয়ে, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ঠিকই হাজির হয়েছিল ওই মালভূমিতে, পবিত্র পশুর শোকে কাতর হয়নি, আমার তো মনে হয় পাথরের দেয়াল না-থাকলে লড়াই শুরু হয়ে যেত ওদের সঙ্গে আমাদের। যা-হোক, কাজ করতে এসেছি, কাজ করবো। ...ছ'সপ্তাহের মধ্যে অত বড় সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আড়াইশ' লোক লাগবে আমার। প্রফেসর হিগসকে উদ্ধার করতে যারা গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, সেরকম সাহসী পাহাড়ি লোক হলে ভালো হয় আমার জন্য। দয়া করে জ্যাফেটের নেতৃত্বে ওরকম একটা দল গঠন করুন আপনি, আর গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে কাউকে নেবেন না ওই কাজের জন্য। কাজ করতে গিয়ে কাজ বাড়াবে ওরা, সামলাতে গিয়ে সময় নষ্ট হবে আমার। কাকে কাকে দলে নেবে সে-দায়িত্ব না-হয় ছেড়ে দিন জ্যাফেটের উপরই।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালেন রানি।

তাঁকে সম্মান জানিয়ে দরবারকক্ষ ছেড়ে বের হয়ে এলাম আমরা।

পরিশ্রম শুরু হলো আমাদের। কাজটা যেমন কঠিন তেমন বিপজ্জনক। সুড়ঙ্গের মুখে বড় করে গর্ত করি আমরা, তারপর ডিনামাইট ঢুকিয়ে দিই সেখান দিয়ে। নিরাপদ দূরত্বে ফিরে আসি সবাই, একজন রয়ে যায় আগুন জ্বালানোর জন্য। আগুন দিয়েই প্রাণপণে ছুটে আসে সে। বিস্ফোরিত হয় ডিনামাইট, অনেকক্ষণ পর কেটে যায় ধোঁয়া আর ধুলা, তারপর লোহার দণ্ড আর ঝুড়ি নিয়ে আবার আমরা গিয়ে ঢুকি গর্তে, আলগা মাটি আর পাথরের টুকরো পরিষ্কার করি। তারপর যখন দেখি এগোনোর পথ নেই, তখন আবার ফাটাই ডিনামাইট।

মাটির এত নীচে, কাব্যিক ভাষায় বললে পাহাড়ের গর্ভে, যে এত গরম জানতাম না আগে। বাতাসও একেবারে বদ্ধ; কোনো

boiRboi.net

কোনো জায়গায় এত দূষিত যে, লণ্ঠন বা মশাল জ্বালিয়ে রাখতে খুব কষ্ট হয়। একশ' ফুটের মতো কাজ হওয়ার পরে ধরেই নিলাম আর সম্ভব নয়, কারণ দম বন্ধ হয়ে ইতোমধ্যেই মারা গেছে দু'জন। আমাদের সঙ্গে পাহাড়ি লোকরা, সাধারণ আবাটিদের মতো নিচুমনা নয়, তারপরও বার বার বলতে লাগল আর পারছে না ওরা, ফিরে যেতে চায় সবাই। তখন পাহাড়ের দেয়ালে জায়গা বুঝে ছোট ছোট কিছু ফাটল তৈরি করাল অলিভার, বাতাস চলাচল শুরু হলো, অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো আমাদের।

কিন্তু বিপদ কাটল না পুরোপুরি। ভয়ঙ্কর ওই ভূমিকম্পে একেবারেই নাজুক হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা, ছাদ আর দু'দিকের দেয়াল পড়ি পড়ি করছে জায়গায় জায়গায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে হলো আমাদেরকে, এক ইঞ্চি আগে বাড়ার আগে ভাবতে হয় মরবো নাকি বেঁচে থাকবো। আরেকটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল পানি। অনেকদিন ধরে জমতে জমতে মাটির নীচে ছোট ছোট ঝরনার মতো হয়ে গিয়েছিল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় সেসব গুঁড়িয়ে গিয়ে আমাদের চলার পথে, কখনও কখনও আমাদের গায়ে এসে পড়তে লাগল জলস্রোত। মাত্রাতিরিক্ত উত্তাপে আগুনের মতো গরম এবং বিশেষত তামা আর অন্যান্য খনিজ পদার্থে ভরা এই পানির ছ্যাঁকায় ফোস্কা পড়ে গেল আমাদের পায়ের তালুতে, চেহারায় আর হাতের চামড়ায়। জমে থাকা পানি সরিয়ে দেয়ার জন্য এবার মাটিতে গর্ত করতে হলো আমাদেরকে, চুইয়ে চুইয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল পানি, পরিষ্কার হলো আমাদের সামনের রাস্তা।

এখন একটাই কাজ আমাদের, বলা ভালো অলিভার আর কুইকের, পাহাড়ি লোকদের দলটাকে সঙ্গে নিয়ে সুড়ঙ্গ পরিষ্কার করা। সাধারণ আবাটিদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া বাদ দিয়ে দিয়েছে ওরা, জোড়াতালি দিয়ে কাজটা করতে হয় আমাকেই,

ওদিকে একঅর্থে বাদ পড়ে গেছে হিগসও। ভূগর্ভের প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে পারেনি সে, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল একদিন। তারপর থেকে ওকে আর সঙ্গে আনা হয়নি। আজকাল দিনের বেশিরভাগ সময় "প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানেই" পড়ে থাকে সে। কঙ্কালগুলো নিয়ে গবেষণা করে সে, নকশা আঁকে পুরো জায়গাটার, কী কী আছে সেখানে তার তালিকা বানায় এবং ভূগর্ভস্থ শহরটার যেখানেই কোনো ধ্বংসস্তূপ পায় সেটা নিয়েই ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে ওর এই কাজ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু বিজ্ঞান আর ইতিহাস নিয়ে কারবার যাঁদের তাঁদের জন্য হিগসের এই প্রবন্ধগুলো এককথায় বললে সোনার-টুকরো।

কাজে ডুবে আছে সে একদিন, দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। আমাদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজের অগ্রগতি কতদূর জানালাম ওকে নিজে থেকেই। মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমার উপরে বিরক্ত হলো সে, অন্যমনস্কভাবে বলে বসল, 'একটা কথা বলি ডাক্তার, কিছু মনে কোরো না। আমার কী মনে হয় জানো? তোমাদের এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ না-হলেই ভালো। ফাংদের ওই মূর্তিটা তোমরা গুঁড়িয়ে দিতে পারলে কি পারলে না তাতে ইতিহাসের কী লাভ? কারুপুষ আবাটিরা বাঁচল না মরল তাতে আমার মতো একজন গবেষকের কী? আমি চাই সময়, কিছু খাবার আর পানি এবং একাকিত্ব যাতে মরার আগে আরও কিছু জেনে যেতে পারি, পৃথিবীর মানুষকে আরও কিছু জানিয়ে যেতে পারি।'

ওকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসে যোগ দিলাম অলিভার আর কুইকের সঙ্গে।

কাজ এগিয়ে চলল আমাদের, থামে না এক মুহূর্তের জন্যও। সুবিধার জন্য আমাদেরকে দুই শিফটে ভাগ করে দিয়েছে অলিভার। দিনের বেলায় দায়িত্বে থাকে সে, রাতে কুইক।

রোববার দায়িত্ব বদল করে ওরা—দিনের শিফটের কাজ বুঝে নেয় কুইক, রাতে এসে যোগ দেয় অলিভার। কখনও কখনও আমাদের কাজ দেখার জন্য বিনা-নোটিশে হাজির হয়ে যান রানি মাকেডা। খেয়াল করেছি, তখন কাজ থাকে না অলিভারের। সুড়ঙ্গের ভিতরে ঘুরে বেড়ায় দু'জনে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় কোথায় যেন। প্রেমিক-প্রেমিকার পিছন পিছন যাওয়াটা অশোভনীয়, তাই গিয়ে দেখি না রানিকে নিয়ে কেন কোথায় যায় অলিভার। কিন্তু যখনই ফিরে আসে সে, সতর্ক করে দিয়ে বলি, সে টের না-পেলেও ওর প্রতিটা পদক্ষেপের খবর রাখছে কেউ না কেউ, জানতে পারছে কোথায় গিয়ে কী করছে ওরা দু'জন। আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয় অলিভার।

কিন্তু একদিন, রানিকে সঙ্গে নিয়ে অলিভার উধাও হয়ে যাওয়ার পর, কাজ ফেলে আমিও চললাম এবং কিছুদূর যেতে-না-যেতেই অচেনা এক লোককে দেখি বড় একটা পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কী যেন দেখছে সামনের দিকে। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি, রানি মাকেডা আর অলিভারকে দেখা যাচ্ছে সামনে। বুঝতে দেরি হলো না আমার, পাথরের আড়ালের ওই লোকটা আসলে গুপ্তচর—রানির গোপন অভিসারের খবর যোগাড় করার জন্য এসেছে। সেদিন অলিভার ফিরে আসার পর এই কথাটাও বললাম ওকে, কিন্তু এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিল সে খবরটা, সুখচিন্তায় ভাসতে লাগল আগের মতোই।

প্রেমের বেলায় যতটা বেপরোয়া সে, কাজের বেলায় কিন্তু তারচেয়েও বেশি মনোযোগী আর অধ্যবসায়ী। সপ্তাহে দু'বার কি বেশি হলে তিন বার বের হয় সুড়ঙ্গ ছেড়ে, উপরে গিয়ে তাজা বাতাস সেবন করে। অন্যরা হাঁপিয়ে গেলেও সে হাঁপায় না, অন্যরা বিশ্রাম নিলেও সে বিশ্রাম নেয় না। প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে যাওয়ার আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা শহর দেখেছিলাম,

সেখানে অতি পুরনো এক মন্দিরের ভিতরে, আপাতদৃষ্টিতে কোনো পুরোহিতের কামরা বলে মনে হয় এ-রকম এক হতশ্রী জায়গায় একটা বিছানা পেতে নিয়েছে সে, শুধু ঘুমানোর সময়েই গিয়ে হাজির হয় সেখানে। পাহারাদার বা সঙ্গী, যা-ই বলি না কেন, তখন ওর সঙ্গে থাকে শুধু ওর বিশাল কুকুর ফারাও। আগে বলিনি বোধহয়, মাটির এত নীচে, দম বন্ধ করা এই অস্বস্তিকর পরিবেশেও ওর সঙ্গে এসেছে কুকুরটা, ওকে ছেড়ে পারতপক্ষে যায় না কোথাও।

ফারাও-এর কথা ভাবলে মাঝেমধ্যে আশ্চর্যই লাগে আমার কাছে। আলকাতরার চেয়েও কালো এই অন্ধকারে কীভাবে দেখতে পায় সে কে জানে! আর বলতে গেলে বদ্ধ বাতাসে ঘ্রাণই বা পায় কী করে! আরও একটা কথা—আমরা যা করছি তা বুঝে গেছে সে, ডিনামাইট ফাটানোর সময় হলে নিজে থেকেই সরে আসে নিরাপদ জায়গায়।

এক রাতে, এই ফারাও-এর কারণেই প্রাণে বেঁচে গেল অলিভার। অনেক আগে থেকেই আমার মন বলছিল এ-রকম কিছু একটা ঘটবে।

সেদিন সন্ধ্যা ছ'টার দিকে, টানা আট ঘণ্টা কাজ করার পর, হিগসকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসার কথা অলিভারের। কুইকের যাওয়ার সময় হয়নি এখনও, তাই কিছুক্ষণের জন্য দায়িত্ব পালন করবে হিগস। ওদিকে সারাদিন বাইরে ছিলাম আমি, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ না-নিয়ে ফিরে গিয়ে ফসল ফলানোর কাজ শুরু করতে চাইছিল বেশ কয়েকজন আবাটি, ছোটখাটো একটা বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল আমার দলের মধ্যে। বাধ্য হয়ে রানি মাকেডার কাছে খবর পাঠাই আমি, অবস্থা দেখার জন্য হাজির হয়ে যান তিনি কালবিলম্ব না-করে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করান বেশিরভাগ আবাটিদের, আর যারা নেতৃত্ব দিয়েছে বিদ্রোহে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন।

boighar.net

সেদিনের মতো শেষ হলো আমার প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ। রাগে রানির মাথা বলতে গেলে খারাপ হয়ে গেছে, নিজের লোকদেরকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি; বলেছেন একাই ফিরতে পারবেন প্রাসাদে, কারও সাহায্যের দরকার হবে না। সুড়ঙ্গের মুখে, যেখানে কাজ করছে অলিভার, সেখানে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেন তিনি আমাকে।

সুড়ঙ্গমুখের কাছে গিয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে অলিভার, সম্ভবত অপেক্ষা করছে কারও জন্য। কার জন্য তা আর বুঝতে বাকি থাকল না আমার, এটাও বুঝতে পারলাম ওদের এই সাক্ষাৎ পূর্বনির্ধারিত। কাজ কতদূর, জানাল অলিভার রানি মাকেডাকে; তারপর দু'জনে দুটো লণ্ঠন হাতে নিয়ে হাঁটা ধরল। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি সুড়ঙ্গের মুখে, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম অলিভার আর রানির গমনপথের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই শহরটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর হাঁটতে শুরু করলাম আমিও, অলিভাররা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাচ্ছি। কী করে ওরা দু'জন তা দেখার জন্য নয়, বরং আজও ওদের পিছনে গুপ্তচর লাগে কি না জানতে চাই।

হাঁটতে হাঁটতে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটার একটা কানাগলির মুখে হাজির হলো দু'জনে। আমার আর এগিয়ে লাভ নেই, কারণ কিছুই নেই ওর গলির ভিতরে, অনুমান করলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা। সঙ্গে করে আনা লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলাম, কাছেই পড়ে-থাকা একটা স্তম্ভের উপর গিয়ে বসলাম। গলির অনেক ভিতরে চলে গেছে ওরা, আলোও দেখা যাচ্ছে না আর, অন্ধকারে ডুবে গেছে আমার চারদিক। সিদ্ধান্ত নিলাম, ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত বসে থাকবো। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে লম্বা একটা সময় ধরে অপেক্ষা করতে করতে শেষপর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল আমার, উসখুস করতে লাগলাম, বার বার মনে হতে লাগল ফিরে গেলেই ভালো হয়। এমনিতেই মনমরা হয়ে আছি কয়েকদিন থেকে, তার

উপর আশার কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না সামনে—কেমন একটা অস্থিরতা পেয়ে বসল আমাকে, ভেঙে পড়লাম মানসিকভাবে। ঠিক তখনই, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও যেন কারও ছায়া দেখতে পেলাম চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে জ্বালালাম একটা কাঠি।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ! ওর চেহারার উপর সরাসরি পড়ছে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠির আলো। দেখামাত্র চিনতে পারলাম লোকটাকে—যশুয়ার খাস চাকর। আমাকে পাশ কাটিয়ে কানাগলির দিকে যাচ্ছে সে, নাকি কানাগলি থেকে ফিরে এল, বুঝতে পারলাম না।

'কী চাই এখানে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তাতে আপনার কী?' মুখ ঝামটা মেরে পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে লোকটা।

ওর এই আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জ্বলতে জ্বলতে একসময় হঠাৎ করেই নিভে গেল ম্যাচকাঠিটা। তাড়াহুড়ো করে জ্বালালাম আরেকটা। কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে লোকটা, বার বার এদিকে-সেদিকে তাকিয়েও ওর কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

প্রথমেই মনে হলো, একছুটে গিয়ে ঢুকি ওই গলিতে, অলিভার আর রানি মাকেডাকে সতর্ক করে দিয়ে বলি নজর রাখা হচ্ছে ওদের উপর। কিন্তু রানির সামনে অলিভারকে কথাটা বললে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে আমাকে। রানি যদি জিজ্ঞেস করেন আমি কেন এলাম তাঁদের পিছু পিছু তা হলে কী বলবো? তার চেয়ে, সিদ্ধান্ত নিলাম, অলিভারকে একা পেলে জানাবো খবরটা। আরেকটা কথা, গুপ্তচরটাকে যে-ই পাঠিয়ে থাকুক না কেন, আজকের দিনের মতো কাজ শেষ লোকটার, কারণ সে যে চলে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।

মাথা এমনিতেই ভার হয়ে আছে হাজার রকমের চিন্তায়, তাই

এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছা করল না। ফিরে চললাম প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে—কুইক যদি ইতোমধ্যে গিয়ে থাকে সুড়ঙ্গে তা হলে নিজের গবেষণাস্থলে ফিরেছে হিগস, ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। দেখি কী বলে সে।

জায়গামতোই পাওয়া গেল আমার বন্ধুকে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে গিয়ে সুড়ঙ্গে হাজির হয় কুইক, কারণ হিগসের উপর দায়িত্ব দিয়ে গেছে অলিভার শোনার পর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ওর, ভরসা রাখতে পারছিল না হিগসের উপর।

ফিরেই আর দেরি করেনি, নিজের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে হিগস। আমাকে দেখে বরাবরের মতো বিরক্ত হলো না এবার, বরং হাসিমুখে বলল, 'এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি চলে যেতে পারতাম মুর থেকে! যদি দেখাতে পারতাম ইউরোপের লোকদের! কম করে হলেও টানা তিন দিনের জন্য আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যেত পত্রপত্রিকায়, তা-ই না? রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতাম আমরা।'

'এই জিনিসগুলো নিয়ে না, প্রার্থনা করো যাতে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারি আমরা। তুমি তো ডুবে থাকো নিজের কাজে, আশপাশে কী হচ্ছে কোনো খবরই রাখো না; রাখলে এসব কঙ্কাল আর সোনা বাদ দিয়ে পালাতে চাইতে আমার মতোই।'

ওর নাদুসনুদুস চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। 'কেন, কী হয়েছে?'

কী হয়েছে জানালাম ওকে।

'আসলে অলিভারকে দোষ দিয়েও লাভ নেই,' সব শোনার পর বলল হিগস। 'ওর জায়গায় আমি থাকলে একই কাজ করতাম সম্ভবত। আপনিও করতেন হয়তো, যদি আপনার বয়স আরও বিশ বছর কম হতো।' মাথা নাড়ল সে। 'না, অলিভারকে দোষ দিই না আমি। রানির ব্যাপারেও কিছু বলার নেই আমার। তাঁর জন্য অলিভারের মতো সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, সাহসী একজন যোদ্ধা

বলতে গেলে স্বপ্নপুরুষ। হতে পারে তিনি একজন রানি, হতে পারে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী, কিন্তু আসল কথা হলো তিনি একজন মানুষ—প্রেম-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা তাঁর ভিতরে থাকতেই পারে। ...এখন আর আলাদা করা যাবে না দু'জনকে, কিছুতেই না। চুম্বকের সঙ্গে আটকে গেছে লোহা, এখন টানলে কি আর আলগা হবে?'

'কিন্তু আলগা করতে না-পারলে কী হবে বুঝতে পারছ না? স্রেফ খুন হয়ে যাবে আমাদের অলিভার। তারপর একই পরিণতি হতে পারে আমাদেরও। ভাগ্য ভালো হলে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হবে আমাদেরকে, কিন্তু ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে মুর থেকে। সেটা কি খুব ভালো হবে আমাদের জন্য?'

চুপ হয়ে গেল হিগস। আসলে বলার মতো কিছু নেই আমাদের কারোরই। দলনেতা হওয়ার পরও অবিবেচকের মতো যা করছে অলিভার, তাতে আমরা এখন নিষ্ক্রিয় দর্শক ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারি না। দেখতে না-পেলেও টের পাচ্ছি ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে ভাগ্য, মর্মান্তিক কোনো পরিণতির দিকে এগোচ্ছি যেন আমরা সবাই।

'চলো ডিনার সেরে আসি,' পরামর্শ দিলাম হিগসকে। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে হবে অলিভারের সঙ্গে। আমাদের সবার ভালোর জন্যই আবারও বোঝাতে হবে ওকে।'

পরে, রাত আরেকটু গভীর হয়েছে ততক্ষণে, পুরনো সেই মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম আমি আর হিগস। রসদ বলতে যা যা লাগে আমাদের তার সবই রাখি আমরা এখানে, আর আগেও বলেছি বোধহয়, জায়গাটা অলিভারের বাসস্থান।

গিয়ে দেখি, ডিনার প্রস্তুত, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অলিভার। প্রাসাদ থেকে প্রতিদিন খাবার পাঠানো হয় আমাদের জন্য—রানির খাস-চাকররা এসে দিয়ে যায় খাবার, আমাদের খাওয়া শেষ হলে পরে একসময় এসে নিয়ে যায় এঁটো

boiRboi.net

থালাবাসন। আর শুধু আমাদের জন্যই নয়, অলিভারের কুকুর ফারাও-এর জন্যও আলাদা করে খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়।

যা-হোক, খেয়ে নিলাম আমরা, ফারাওকে খাওয়ালাম, এঁটো থালাবাসন নিয়ে গেল রানির চাকররা, তারপর সুবিধাজনক জায়গায় বসে পাইপ ধরালাম তিন জনে। গুপ্তচরটার ব্যাপারে বললাম তখন অলিভারকে।

শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। বলল, 'এমন কিছুই তো করিনি আমরা যার কারণে আমাদের পিছনে গুপ্তচর লাগাতে হবে! রানি বললেন তিনি নাকি একটা স্তম্ভের গায়ে কীসব খোদাই-করা লেখা দেখতে পেয়েছেন, আমাকে দেখানোর জন্য নিয়ে গেলেন সেখানে। এতে দোষের কী আছে?'

'খোদাই-করা লেখা!' আকাশ থেকে পড়ল হিগস। 'আমার মতো একজন বিশেষজ্ঞ থাকতে তোমাকে ডাকলেন তিনি খোদাই-করা লেখা দেখাতে?' অলিভার মিথ্যা কথা বলছে বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল হিগস। 'তা, কী বুঝলে ওই লেখা পড়ে?'

'লেখাটা পড়তে পারিনি,' দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে অলিভার. অপরাধীর মতো কণ্ঠ ওর। 'কারণ ওই স্তম্ভটা আর খুঁজে পাননি রানি।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। একটা অপরাধ লুকাতে গিয়ে আরেকটা অপরাধ করে বসবে অলিভার—কখনও ভাবতেই পারিনি আমরা।

'অলিভার,' শেষপর্যন্ত মুখ খুললাম আমি, 'আমার মনে হয় এখানে আর একা ঘুমানোটা ঠিক না তোমার।'

'বাজে কথা!' রেগে গেছে অলিভার। 'গতরাতে কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে ছিল ফারাও, একবার আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তখন চত্বরে কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। কোনো মানুষের তো আসার কথা না আমার এখানে, তাই ধরে নিই ভূত, ঘুমিয়ে পড়ি আবার। এই জায়গাটা কীরকম ভূতুড়ে

দেখতেই তো পাচ্ছেন...'

'ভূত!' এবার চেঁচিয়ে উঠল হিগস। 'সারাদিন শত শত কঙ্কাল নিয়ে কাজ করি, রাতে ঘুমাই ওগুলোর সঙ্গে; ভূত বলে যদি কিছু থেকে থাকে এই জায়গায় তা হলে তো আমার ওখানে যাওয়ার কথা সবার আগে। কই, আজ পর্যন্ত তো দেখা পেলাম না একটারও? তোমার এখানে যদি ভূত এসে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে সেই ভূতের জন্ম দিয়েছে হোঁতকা যশুয়া। ...ফালতু কথা বাদ দাও, অলিভার। আজ রাতে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও আমাকে। সুড়ঙ্গের ভিতরে কাজ করবে কুইক, রাতের শিফট পরিচালনার দায়িত্ব ওর উপর, আর ডাক্তার অ্যাডামসকেও থাকতে হবে বাইরে, কারণ প্রশিক্ষণের কাজ করতে হচ্ছে তাঁকে।'

'আপনাকে এখানে থাকতে দিলে আমার বিপদ কমবে হয়তো, কিন্তু আপদ বাড়বে। এমনিতেই হাঁপানি আছে আপনার, রাতে তা আরও বাড়ে; মন্দিরের এই বদ্ধ বাতাসে দম বন্ধ হয়ে পড়ে থাকতে হবে আপনাকে শেষে।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে চলো প্রাসাদে, অতিথি-ভবনে থাকবে। কারোরই কোনো অসুবিধা হবে না।'

'হবে। রাত একটার দিকে জটিল একটা কাজ করতে হবে সার্জেন্ট কুইককে। ওকে বলে রেখেছি যদি সাহায্যের দরকার হয় ওর, তা হলে খবর দেয়ামাত্র ছুটে যাবো আমি।' ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় ভাগ্যক্রমে সঙ্গে-আনা ফিল্ড-টেলিফোনটা দেখাল অলিভার ইঙ্গিতে, বিছানার পাশেই জায়গা করে নিয়ে বসিয়েছে সে যন্ত্রটা। 'সঙ্গে আরও কয়েকশ' গজ তার থাকলে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে বসাতাম টেলিফোনটা, তা হলে আর সমস্যা হতো না আমাদের কারোরই। কিন্তু অত তার নেই আমাদের সঙ্গে, আবার এদিকে কাজের খাতিরেই সার্জেন্ট কুইকের কাছাকাছি থাকা দরকার আমার।'

boiRboi.net

বলতে না বলতেই, অনেকটা কাকতালীয়ভাবে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনটা। একলাফে উঠে দাঁড়াল অলিভার, গিয়ে হাতে নিল রিসিভার। টানা পাঁচ মিনিট কথা বলল অপর প্রান্তের লোকটার সঙ্গে, ঝড়ের গতিতে একের পর এক নির্দেশনা দিল তাকে, তারপর তাকাল আমাদের দিকে। 'দেখলেন তো,' মাউথপিসটা হুকে আটকে রাখতে রাখতে বলল সে, 'এখন আমি এখানে না-থাকলে কী হতো? আরেকটু হলেই ধসে পড়ত সুড়ঙ্গের ছাদ, আর সত্যিই যদি পড়ত তা হলে দশ-পনেরোজন পাহাড়ি লোক মারা যেত নিঃসন্দেহে। হাজার বলেকয়েও আর রাজি করাতে পারতেন না কাউকে কাজ করাতে। ...এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি আমরা, আমি এখান থেকে চলে গেলে সেসব বাড়বে বই কমবে না। পারলে এখনই আমি চলে যেতাম সুড়ঙ্গে, কিন্তু এত কাহিল লাগছে যে, যেতে মন চাইছে না। ...চিন্তা করবেন না, কিছু হবে না আমার। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে, টেলিফোন আছে, সবচেয়ে বড় কথা ফারাও আছে। যান এবার, একটু ঘুমাতে দিন আমাকে। ...কাল খুব ভোরে উঠতে হবে আমাকে।'

পরদিন ভোর পাঁচটার দিকে, প্রাসাদের অতিথি-ভবনে আমাদের ঘরের দরজায় কারও টোকা দেয়ার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার আর হিগসের। বিছানা ছেড়ে উঠলাম আমি, খুললাম দরজাটা। বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকল কুইক। ওর পুরো শরীর ভিজে আছে ঘামে, চেহারা আর জামার জায়গায় জায়গায় মাটির দাগ। বুঝলাম, কাজ শেষ না-করেই তাড়াহুড়ো করে এখানে আসতে হয়েছে ওকে।

'ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম পাঠিয়েছেন আমাকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'এখনই দেখা করতে বলেছেন আপনাদেরকে।'

'ব্যাপার কী, কুইক?' ত্রস্ত হাতে কাপড় পরতে পরতে জিজ্ঞেস

boiRboi.net

করল হিগস।

'গেলেই দেখতে পাবেন,' ছোট করে জবাব দিল কুইক।

পাঁচ মিনিট পর, ভূগর্ভস্থ শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম আমরা তিন জন, প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত লণ্ঠন। মোটা শরীর নিয়ে আমাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি হিগস, তার উপর হাঁপানি আছে ওর, তাই পিছনে পরে গেছে সে; আর কুইক এত ক্লান্ত যে, ঠিকমতো দৌড়াতেই পারছে না, আমার সঙ্গে তাল রাখা তো পরের কথা। সুতরাং সবার আগে আমিই গিয়ে হাজির হলাম মন্দিরে।

ভেঙে পড়া দরজার কাছেই অলিভারের বিছানা, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা মানুষটা, হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। দেখেই বোঝা যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সে। পাশেই বসে আছে ওর সেই বিশাল কুকুর ফারাও।

'এখানে আসুন,' নিচু আর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল অলিভার। 'একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে।' ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল সে। কিছুদূর গিয়েই থামল, নিচু করল হাতের লণ্ঠনটা।

ওর বিছানাটা একেবারেই সাধারণ, স্থানীয়ভাবে নির্মিত। সেটার ডানদিকে, মেঝেতে পড়ে আছে কিছু একটা; অনুজ্জ্বল আলোয় কালো দেখাচ্ছে, ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

নিচু করে ধরলাম আমার লণ্ঠনটাও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। মরা একটা মানুষ! লোকটার পাশেই পড়ে আছে বিশাল এক ছুরি। দেখেই বোঝা যায় ছুরিটা ওই মৃত লোকটার হাত থেকেই পড়েছে মাটিতে। কোনো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা নেই চেহারাটায়, পৃথিবীর সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ছেয়ে আছে, যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। কিন্তু একটু নীচের দিকে তাকানোমাত্র শিউরে উঠলাম—দু'ফাঁক হয়ে আছে লোকটার গলা, কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে কণ্ঠনালী।

ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হিগস। একসঙ্গে বলে

উঠলাম দু'জনে, 'শ্যাডর‍্যাক!'

হ্যাঁ, শ্যাডর‍্যাক। আমাদের প্রাক্তন পথপ্রদর্শক। বিশ্বাসঘাতক। সেই শ্যাডর‍্যাক যে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে সিংহ-দেবতার কাছে, ফলে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমরা হিগসকে। সেই শ্যাডর‍্যাক যাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন রানি, হিগস ফিরে আসার পর। সেই শ্যাডর‍্যাক যাকে দু'চোখে দেখতে পারত না ফারাও!

'দেখে তো মনে হয় গোপন অভিসন্ধি নিয়ে এখানে ঢুকেছিল শ্যাডর‍্যাক ওরফে বিড়াল,' মন্তব্য করল হিগস, 'কিন্তু পাহারাদার কুকুরের কবলে পড়ে গেছে বেচারা।'

'রাতে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে সে,' মুখ খুলল অলিভার। 'কখন, কীভাবে বলতে পারবো না, বেহুঁশের মতো ঘুমাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু ফারাও-এর কথা ভুলেই গিয়েছিল সে, আর এই ভুলে যাওয়াটাই কাল হলো ওর জন্য। ফারাও-এর কবলে পড়েই মরতে হলো ওকে। ...ওর গলাটা দেখেছেন? দু'ফাঁক করে ফেলেছে ফারাও, আর কুকুরটা যখন কামড়ায় তখন কোনো আওয়াজ করে না। টুঁ শব্দও করতে পারেনি শ্যাডর‍্যাক, এমনকী হাতে ছুরি থাকার পরও কিছু করার সুযোগ পায়নি। ...ঘণ্টাখানেক আগে সুড়ঙ্গ থেকে আমাকে ফোন করে কুইক, আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় আমার। উঠে দেখি তখনও ঘুমিয়ে আছে ফারাও—টেলিফোনের শব্দে এখন আর অসুবিধা হয় না ওর। যা-হোক, বিছানা ছেড়ে নামতে যাবো, চোখ পড়ল নীচের দিকে, শ্যাডর‍্যাকের লাশের উপর। ওর বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল ফারাও। এখন কথা হচ্ছে, এত রাতে আমার ঘরে এত বড় একটা ছুরি নিয়ে কেন ঢুকতে গেল শ্যাডর‍্যাক?'

'একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারবে উত্তরটা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল হিগস। 'তোমাকে খুন করতে এসেছিল সে। কিন্তু ফারাও-এর কথা মনেই ছিল না ওর, কিংবা মনে থাকলেও পাত্তাই পায়নি

সে হাউণ্ডের মতো বিশাল কুকুরটার সামনে।'

'কিন্তু আমাকে খুন করানোর জন্য ওকে পাঠাল কে?'

'সারাজীবন ভাবলেও উত্তরটা পাওয়া যাবে না,' সহজ গলায় বলল কুইক। 'আবার শুনতে চাইলে এখনই বলে দিতে পারি আমি নামটা, যদিও আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

ভোরে যা ঘটেছে ভূগর্ভস্থ এই শহরে, মানে অলিভারের ঘরে, একজন পাহাড়ি লোককে দিয়ে সেই খবর পাঠিয়ে দেয়া হলো প্রাসাদে, রানি মাকেডার কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন তিনি, সঙ্গে যশুয়া এবং তাঁর মন্ত্রণাসভার আরও কয়েকজন সদস্য। সব কিছু দেখার পর খুব ঘাবড়ে গেলেন রানি, কড়া গলায় বললেন যশুয়াকে, 'এই ব্যাপারে কিছু বলার আছে আপনার?'

চেহারায় নিষ্পাপ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে যশুয়া বলল, 'বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। এই খুনিটাকে কে পাঠাল, কেন পাঠাল কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আমার মনে হয় প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজে থেকেই কাজটা করেছে শ্যাডর‍্যাক। পাপের শাস্তি পেয়েছে সে, শেষপর্যন্ত মরেছে একটা কুকুরের হাতে,' বলতে বলতে তাকাল সে ফারাও-এর দিকে। কিন্তু ওর সেই দৃষ্টি দেখে আরেকবার চমকে উঠতে হলো আমাকে–বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কুকুরটার দিকে।

সবাই চলে যাওয়ার পর, হঠাৎ করেই ছটফট করতে শুরু করল ফারাও, কাঁইকুঁই করে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল বার বার। মাটিতে শুয়ে পড়ে চার পা ছুঁড়তে লাগল একটু পর পর। তারপর একসময় থেমে গেল ওর সব ছটফটানি, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল বেচারা।

বুঝলাম, গত রাতে ওর খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কী খেলা! কেন যেন পুরো খাবার খায়নি কুকুরটা, কিছুটা খেয়েই আর মুখ দেয়নি ওর পাত্রে।

boiRboi.net

তার মানে, হঠাৎ করেই হাজির হয়নি শ্যাডর‍্যাক। জানত বিষ মেশানো খাবার খেয়েছে ফারাও, ধরেই নিয়েছিল ভোরের আগে মরে গেছে কুকুরটা। কিন্তু নিয়তি যে ওর অথবা ওদের বিপক্ষে ছিল তা কি কল্পনাও করতে পেরেছিল ওরা?

পনেরো

এই ঘটনার পর কড়া পাহারা নিযুক্ত হলো আমাদের, বিশেষ করে অলিভারের জন্য। এমন সব লোকদের বাছাই করা হলো এই কাজের জন্য, আপাতদৃষ্টিতে সৎ বলে মনে হয় যাদের; আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না যারা। গোপনীয়তা বলে কিছু বাকি থাকল না আর আমাদের–জায়গায় জায়গায় প্রহরী আর গোয়েন্দা। এমনকী আমাদের খাবারের পাত্র আর পানীয়ের পেয়ালা থেকে, আমাদের আগে খেয়ে বিষ আছে কি না সে-ব্যাপারটা নিশ্চিত করে দেয়ার জন্য লোক ঠিক করা হলো, যাতে আমাদেরকেও ফারাও-এর পরিণতি বরণ করতে না-হয়। কুকুরটার কথা মনে হলেই খারাপ লাগে, মনে হয় যেন কুকুর নয় আমাদেরই একজন সঙ্গী ছিল সে, খুব কাছের কেউ ছিল।

এই অতি-পাহারার ব্যাপারটা যতটা না আমাদের জন্য, তার চেয়ে বেশি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল অলিভার আর রানি মাকেডার জন্য। চাইলেই দেখা করতে পারে না ওরা আগের মতো, কারণ কখন কোথায় ফাঁদ পেতে বসে আছে গুপ্তঘাতক জানা নেই কারোরই। মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কথা বলতে পারে না একজন আরেকজনকে, কারণ পাঁচ হাত দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে

আপাদমস্তক-রণপোশাকে-সজ্জিত সৈন্যরা। তারপরও, ভালোবাসার টান খুব বড় টান—ঝুঁকি নিয়ে দেখা করতে লাগল ওরা যতটা গোপনে সম্ভব। এতদিন আমরা কয়েকজন ছাড়া বলতে গেলে আর কেউ জানত না ব্যাপারটা, এবার ওদের এই গোপন প্রেমের কথা রাষ্ট্র হলো।

নিরাপত্তার এই কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো আমার কাছে। কিন্তু লাভও হলো—বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটল না আর, রাতের বেলায় আমাদের কারও গলাও দু'ফাঁক হয়ে গেল না। কিন্তু আমাদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা থেমে থাকল না। রহস্যময় দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল নিয়মিত বিরতিতে। যেমন, একদিন সন্ধ্যায় এক পাহাড়ের ঢালে বসে আছি আমরা, হঠাৎ উপর থেকে খসে পড়ল বিশাল এক পাথর, সোজা ধেয়ে এল আমাদের দিকে, সময়মতো সরতে না-পারলে ভর্তা হয়ে যেতে হতো আমাদেরকে। আরেকদিন, মনোরঞ্জনের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি জঙ্গলে, কারা যেন সমানে তীর মারতে লাগল আমাদের দিকে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। খুব তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল বলে আমাদের কারও কোনো ক্ষতি করতে পারল না হামলাকারীরা, তবে তীর খেয়ে মারা পড়ল হিগসের ঘোড়াটা। দু'বারই তন্নতন্ন করে খুঁজলাম আমরা—পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা জঙ্গলের ভিতরে, কিন্তু কাউকেই ধরতে পারলাম না। আরেকবার, মুরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত জমিদার আর পুরোহিতের গোপন এক সভার কথা ফাঁস হয়ে গেল—আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল সবাই। কিন্তু সর্বসমক্ষে সতর্ক করে দেয়া ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আর কিছু করতে পারলেন না রানি মাকেডা।

সহসাই অন্যদিকে মোড় নিল ঘটনা। একদিন হন্তদন্ত হয়ে প্রাসাদে এসে হাজির হলো দু'জন মেষপালক, সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। হলফ করে বলল দুই মেষপালক, মুর থেকে অনেক অনেক দূরে, পর্বতের ঢালে যখন মেষ চড়াচ্ছিল ওরা,

তখন কোত্থেকে যেন হাজির হয় পনেরোজন ফাং সৈন্য। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলে ওরা, এমনকী চোখেও কালো কাপড় বেঁধে দেয়। তারপর ওদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে করতে বলে, 'তোদের রানি আর সাদা চামড়ার চার শয়তানকে গিয়ে বলবি, যত তাড়াতাড়ি পারে আমাদের দেবতার মূর্তিটা ধ্বংস করতে। তা না হলে কোন্‌দিন আবার তোদের দেশে এসে হাজির হবেন তিনি, তাঁর পিছু পিছু আসতে হবে আমাদেরকেও। আর আমাদের আসার মানে কী বুঝিস তোরা?'

কথা শেষ করে নাকি ওই অবস্থাতেই ওদেরকে ফেলে চলে যায় ফাং সৈন্যরা। পরদিন ওদেরকে খুঁজতে কয়েকজন লোক যায় গ্রাম থেকে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওভাবে ওদেরকে পড়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে যায় সবাই, তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসে প্রাসাদে।

যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন রানি ব্যাপারটা. আসলে কী ঘটেছিল জানার জন্য তদন্ত দল গঠন করা হলো। ওই দলে আমিও ছিলাম। কিন্তু যেখানে ঘটেছে ঘটনাটা সেখানে গিয়ে দেখি, ফাংদের কোনো চিহ্নই নেই, শুধু একটা বল্লম গেঁথে রাখা হয়েছে মাটিতে, ফলাটা মুরের দিকে এমনভঙ্গিতে তাক করা যে, দেখলেই বোঝা যায় যে বা যারা করেছে কাজটা তারা হুমকি দিচ্ছে আসলে। আগের দিন রাতে ভারী বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ফাংদের অন্য কোনো চিহ্ন বা পায়ের-ছাপ খুঁজে পেলাম না; আর নীচের পাথুরে উপত্যকায় নেমে খোঁজাখুঁজি করা যে বৃথা তা কেউ বলে না-দিলেও বোঝা যায়।

ওই উপত্যকায় কীভাবে হাজির হলো ফাংরা তা এক রহস্য হয়েই রয়ে গেল আমাদের সবার কাছে এবং আজও রহস্য হয়েই আছে। কেউ কেউ বলল, পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে অজানা কোনো পথের সন্ধান পেয়ে গেছে ফাংরা। আবার কেউ কেউ বলল, ওই পথ ধরে যদি পনেরো জন সৈন্য আসতে পারে, তা

হলে আজ বাদে কাল পনেরো হাজার সৈন্য আসতে অসুবিধা কোথায়?

প্রশ্ন হলো, কোথায় সেই পথ? যে বা যারা সেই পথের সন্ধান দিতে পারবে, তাদেরকে রানির পক্ষ থেকে ছোটখাটো জমিদারিত্ব দিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হলো। ব্যস, আর যায় কোথায়? হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল সারা মুরে। একের পর এক খবর আসতে লাগল আমাদের কাছে—গোপন পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। সরেজমিনে তদন্তে যেতে হয় আমাকে সব জায়গায়, কিন্তু গিয়ে দেখি, সব ফালতু; গিরগিটি বা পাখির পক্ষেই কেবল সম্ভব ওই রাস্তা বেয়ে উপরে ওঠা অথবা উড়ে এসে হাজির হওয়া, মানুষের পক্ষে নয়।

ফাংদের ওই "উড়ে এসে হাজির হওয়ার খবর" ছড়িয়ে পড়ল সারা মুরে, মুখে মুখে; ফলে খুব ঘাবড়ে গেল আবাটিরা। যার সঙ্গেই দেখা হয় একটাই কথা—কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছিল ফাংরা। পাহাড়ি দেয়ালের প্রাকৃতিক সুরক্ষা নিয়ে এতদিন গর্বে মাটিতে পা পড়ত না ওদের, আত্মবিশ্বাস এত বেশি হয়ে গিয়েছিল ওদের যে, ধরেই নিয়েছিল ফাংদের বিরুদ্ধে কোনোদিন অস্ত্র নিতে হবে না হাতে, কিন্তু এই গুজব ছড়িয়ে যাওয়ায় কর্পূরের মতো উবে গেল সব। ভীতু লোকরা যখন অসহায় হয়ে যায়, সমস্যা সমাধানের কোনো উপায়ই যখন জানা থাকে না তাদের, তখন সবচেয়ে আগে যে-কাজটা করে ওরা—পুরো দোষ চাপিয়ে দেয় অন্যের কাঁধে। সাধারণ আবাটিরাও ওই কাজটাই করল। একযোগে বলতে লাগল সবাই, ধোঁকা দেয়া হয়েছে তাদেরকে, এতদিন ইচ্ছা করে বোকা বানিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্ধর্ষ লড়াকু ফাংরা, যাদের প্রত্যেকটা সৈন্য যুদ্ধে পারদর্শী, যদি অকস্মাৎ হাজির হয়ে যায় মুরে তা হলে কী ভয়াবহ অবস্থা হবে! সুতরাং কাপুরুষ আবাটিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, মন্ত্রণাসভার কোনো কোনো সদস্যের রক্ত নেয়ার কথাও ঘোষণা করল। জনপ্রিয়তা হারাল

যশুয়া, আর এতদিন যিনি "লড়াই করো, লড়াই করো" বলতে বলতে অরণ্যে রোদন করছিলেন সেই রানি মাকেডা সহসাই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন সবার কাছে।

গ্রামের বসতবাড়ি ছেড়ে শহরে, অথবা শহরের কাছে জড়ো হতে লাগল প্রায় সবাই; ছাউনির মতো ছোট ছোট প্রতিরক্ষামূলক শিবির গড়ে তুলল। ধর্মের ব্যাপারে এতদিন বলতে গেলে উদাসীন ছিল সাধারণ এই গ্রামবাসীরা, তেমন কিছু জানতও না ওরা ধর্মের ব্যাপারে, নিয়মিত চর্চাও করত না, কিন্তু এখন, ভাগ্যের দুর্যোগ যখন নেমে এসেছে ওদের উপর, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল। দাম বেড়ে গেল পুরোহিতদের, গরু-ছাগল আর ভেড়া-বকরির বলি চলতে লাগল নিয়মিত। সর্বশক্তিমানকে ডাকতে লাগল সবাই যাতে দয়া করেন তিনি, মুখ ফেরান অসহায় আবাটিদের দিকে, ধ্বংস করে দেন চিরশত্রু ফাংদের।

জানি না কীভাবে, আরেকটা চিন্তা পেয়ে বসল ওদেরকে, আমরা যত তাড়াতাড়ি গুঁড়িয়ে দেবো হারম্যাকের ওই মূর্তিটা তত তাড়াতাড়ি সমাধান হবে সব সমস্যার। কারণ মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে গেলে সেটা আর চলাচল করতে পারবে না (!), চলাচল করতে না-পারলে এসে হাজির হতে পারবে না মুরে, আর মুরে আসতে না-পারলে ওটার পিছন পিছন আসতেও পারবে না ফাংরা। আমরা চার ইংরেজ রাতারাতি নায়ক বনে গেলাম যেন—যেখানেই যাই অতি-সম্মান পাই আবাটিদের কাছ থেকে। এমনকী এতদিন যে যশুয়া বিষদৃষ্টিতে দেখত আমাদেরকে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কথা বলত সে-ও আজকাল আমাদেরকে দেখলে কুর্নিশ করে, হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে আমাদের কাজের অগ্রগতি কতদূর, কোনো সাহায্য-সহযোগিতা লাগবে কি না জানতে চায়।

যেসব চোরাগোপ্তা হামলার কথা বলেছিলাম আগে, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি। নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে কয়েকটা

banglaboi.net

পোষা কুকুর নিয়ে এসেছিলাম আমরা স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে, একটাও মরল না বিষমেশানো খাবার খেয়ে। আমাদের উপর খসে পড়ল না পাথর, আড়াল থেকে উড়ে এল না ঘাতক তীর। এমনকী পাহারাও কিছুটা শিথিল হয়ে গেল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রহরী ছাড়াই চলাফেরা করতে লাগলাম আমরা। সবাই এখন চায় বেঁচে থাকি আমরা, যে-কোনো মূল্যে, অন্তত ফাংদের ওই মূর্তিটা ধ্বংস না-হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু আমাদের প্রতি আবাটিদের এই বেশি বেশি খাতির দেখে কেন যেন সন্দিহান হয়ে উঠলাম আমি। পুরো ব্যাপারটাই মেকি বলে মনে হতে লাগল আমার কাছে। মনে হলো, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করছে ওরা, কাজ শেষ হলেই কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনো ক্ষতি করবে আমাদের। কোনো প্রমাণ নেই আমার কাছে, তারপরও সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়ে বললাম, সমুদ্রে যত জাহাজ চলে সেগুলোর কোনোটাই একটানা বাতাস পায় না পালে, বরং কখনও কখনও বিপরীত দিক থেকে বইতে শুরু করে বাতাস, তখন খুব মুশকিলে পড়ে যায় নাবিকরা।

কাজ, কাজ আর কাজ; দিন নেই রাত নেই শুধু কাজ করে গেলাম আমরা। এক ঈশ্বরই বলতে পারবেন কীভাবে কাজ করেছি আমরা ওই দিনগুলোয়। একটা সুড়ঙ্গ বানাতে হবে, বানাতেই হবে—লম্বা-চওড়ায় কতখানি তা এখন আর মনে নেই আমার। যন্ত্রপাতি সঙ্গে যা আছে তা সোজা-কথায় বললে যৎসামান্য, আমাদের সঙ্গে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এ-রকম কোনো কাজের, তারপরও নির্দিষ্ট একটা দিনের আগেই শেষ করতে হবে আমাদের কাজ। হাজারটা ঝামেলা দেখা দেয় প্রতিদিন, একটা একটা করে সবগুলোর সমাধান করি আমরা। চরম ঝুঁকি নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে হয় আমাদেরকে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে, একবার এগোলে

আর ফিরে আসতে পারবো কি না জানি না। অলিভার নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার, তার উপর সেনাবাহিনীতে ছিল. কিন্তু এরকম কোনো কাজ কখনও করেনি সে, তারপরও পুরো কাজের দায়িত্ব নিয়েছে নিজের কাঁধে, এবং এমনভাবে করছে কাজটা যেন পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ওর বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।

সত্যিই, শুধু রানি মাকেডার সঙ্গে দেখা করা ছাড়া নিজের সব সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে বীরের মতো কাজ করে গেল সে। যখন সুড়ঙ্গে থাকে না তখন দেখা যায় না-ঘুমিয়ে নিজের বিছানায় বসে হিসেব কষছে খাতা-কলমে, আর না-হয় সেকেলে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাপজোক করছে। জিজ্ঞেস করায় বলল একদিন, 'কাজ আমার, আমাকেই তো খাটতে হবে, তা-ই না? তা ছাড়া ভেবে দেখুন, হিসেবে যদি সামান্য ভুল হয় আমার, তা হলে কত বড় বিপদ হবে। নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের এত দিনের পরিশ্রম, ধুলোয় মিশে যাবে ইংরেজদের মান-সম্মান।'

বললাম, 'যে-পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহার করছ, যদি ঠিক জায়গায় ঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা না-যায় তা হলে...'

জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল সে, কিছু বলল না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল হাতে-ধরা হিসেবে-ভরা খাতাটার দিকে।

শেষপর্যন্ত, আমি বলবো আমাদের সবার ঐকান্তিক ইচ্ছা আর অতিমানবীয় প্রচেষ্টার ফলে শেষ হলো সুড়ঙ্গ বানানোর কাজ। চার উট বোঝাই করে আনা বিস্ফোরকগুলো হিসেব করে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি আমরা। বিস্ফোরক বসানোর জন্য সুড়ঙ্গের মধ্যে আলাদা আলাদা চেম্বার বানানো হয়েছে। একটা চেম্বার আরেকটা চেম্বারের থেকে কম-বেশি বিশ ফুট দূরে দূরে। আমাদের হাতে যদি আরও সময় থাকত তা হলে বিশ ফুট না-হয়ে দূরত্বটা হতো চল্লিশ ফুটের মতো, তা হলে হিসেব অনুযায়ী আরও ভালো কাজ হতো বিস্ফোরণের পর। মূর্তিটার ভিত্তির আনুমানিক ত্রিশ ফুট নীচে, অলিভারের গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী

কাল্পনিক ভারকেন্দ্র যেখানে থাকার কথা মূলত সে-জায়গা ঘিরেই বানানো হয়েছে চেম্বারগুলো। একটা কথা বলে রাখি, মূর্তিটা মাত্র একবার দেখার সুযোগ পেয়েছিল অলিভার, তা-ও আবার পিছন থেকে এবং তাড়াহুড়ো করে, তাই ওর এই হিসেব পুরোপুরি নিখুঁত হয়নি। খুঁতযুক্ত হিসেবের ফলে কী হয়েছিল সে-ঘটনায় আসছি পরে।

ঢালাই লোহা দিয়ে বানানো বিস্ফোরক পদার্থের ফ্ল্যাস্ক, ডিনামাইট কার্ট্রিজ, প্রয়োজনীয় ডেটোনেটর, ইলেকট্রিক তার এবং অন্যান্য জিনিস জায়গামতো বসিয়ে দিল অলিভার আর কুইক। এরপর শুরু হলো আরেকদফা খাটুনি—সুড়ঙ্গটা যথাসম্ভব বুজে দেয়া। কারণ যতদূর বুঝলাম, বিস্ফোরণের ধাক্কা আর ধোঁয়া চারদিকে ছড়াবে, তার মানে সুড়ঙ্গের খোলা জায়গা দিয়ে হাজির হবে আমাদের এখানেও। আলগা মাটি আর পাথর ফেলে নিজেদেরকে নিরাপদ করার সময় খেয়াল রাখতে হলো যাতে ছিঁড়ে না-যায় অথবা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় ইলেকট্রিক তার, তা হলে ব্যাটারি যত ভালো অবস্থাতেই থাকুক না কেন কোনো কাজ হবে না।

গুপ্তচরদের মারফত খবর পেলাম, ফাংদের সব প্রস্তুতি বলতে গেলে শেষ—আগামী পূর্ণিমায় বড় একটা উৎসব হতে যাচ্ছে ওদের শহরে। তার মানে হিগস যা শুনেছে অথবা রাজা বারুং-এর দূতরা যা বলে গেছে তা ঠিকই আছে। আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে রাজার মেয়ের, ঘটনাক্রমে একইসঙ্গে শেষ হবে ফাংদের নবান্ন উৎসব; তারপর নাকি আর একটা দিনও দেরি করবেন না রাজা, হামলা করবেন মুরে।

আরেকটা কথা ভেবে কিছুটা হলেও খারাপ লাগল আমাদের কাছে। আবাটিরা দুই চোখে দেখতে পারে না ফাংদের, যে-কোনো উপায়ে ওদের অনিষ্ট চায় ওরা, কিন্তু হাজার হোক আমরা ভিনদেশী, আমাদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অমানবিক মনে হলো।

উৎসবের রাতে, মানে যে-রাতে ফাটানো হবে ডিনামাইট, বেশ কয়েকজন পুরোহিত আর প্রহরী থাকবে সিংহ-দেবতার মূর্তির ভিতরে, এমনকী আমার ছেলেও থাকতে পারে, যদিও সে-সম্ভাবনা কম। আবার মূর্তির আশপাশে বলি দেয়ার জন্য জড়ো হতে পারে সাধারণ ফাংরা। এই অবস্থায় ডিনামাইট ফাটালে নিরীহ কতগুলো লোক মারা যাবে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, আমরা নিরুপায়।

শেষপর্যন্ত উপস্থিত হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সুড়ঙ্গে মাটি ফেলার কাজ তখনও চলছে আমাদের। ইলেকট্রিক তারগুলোর শেষপ্রান্ত এনে হাজির করা হয়েছে প্রাচীন ওই মন্দিরে, অলিভারের ঘরে, যেখানে শ্যাডর‍্যাকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেছিল ফারাও। এই ক'দিন প্রতি ইঞ্চি তার নিজে "পাহারা" দিয়েছে অলিভার, যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে না-পারে।

আমাদের কাছে ইলেকট্রিক ব্যাটারি আছে দুটো। যদি কোনো কারণে একটা কাজ না-করে তা হলে আরেকটা ব্যবহার করবো। দুটো ব্যাটারিই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, ঠিকই আছে, তারপরও তারের সঙ্গে জোড়া দেয়া হয়নি এখনও। অলিভারের ঘরে, মেঝের উপর রাখা আছে ওগুলো। দেখলে কতই না নিরীহ মনে হয়!

আমরা চারজন এখন বসে আছি অলিভারের ঘরে, ব্যাটারি দুটো ঘিরে। একে একে তাকালাম সবার চেহারার দিকে। উৎকণ্ঠায় ভরে আছে সবগুলো মুখ। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে অলিভারকে। ময়লা হয়ে গেছে ওর গায়ের রঙ, টানা খাটুনির কারণে শুকিয়ে গেছে বেচারা। গত ক'দিন বলতে গেলে কিছুই খায়নি সে, এমনকী একবারও ধূমপান করেনি। পীড়াপীড়ি করে ওকে কয়েক ঢোক স্থানীয়-মদ গেলাতে সক্ষম হলাম আমি। কী যেন হয়েছে ওর, সেই সকাল থেকে নিজের ঘরে বসে আছে মূর্তির মতো; মাটি ফেলার কাজ শেষ হলো কি না অথবা

ইলেকট্রিক তারের জয়েন্ট ঠিক আছে কি না দেখার জন্য বাইরে যাচ্ছে না আর।

'আমার যা করার ছিল,' মুখ খুলল সে, 'তার সবই করেছি। বাকিটা ভাগ্যের উপর।'

দুপুরে খাওয়ার পর, নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল সে লম্বা হয়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। বেহুঁশের মতো ঘুমাল টানা কয়েক ঘন্টা। বিকেল চারটার দিকে একজন শ্রমিক এসে খবর দিল, মাটি ফেলার কাজ শেষ হয়েছে ওদের। কাজ কীরকম হয়েছে দেখল কুইক, তারপর সব শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল ভূগর্ভস্থ শহরটার বাইরে, মানে মাটির উপরে।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে এবার বের হলাম আমি আর হিগস। তারগুলো যে-পথ দিয়ে নেমে গেছে, আমরাও নামছি সে-পথ দিয়ে, আলগা মাটি আর পাথরে বার বার হড়কে যাচ্ছে আমাদের পা। তারপরও এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। চলতে চলতে বার বার লণ্ঠন উঁচু করে দেখছি কোথাও কোনো জয়েন্টে কোনোরকম সমস্যা আছে কি না। যতদূর পারলাম, দেখলাম এভাবে; তারপর ফিরে এলাম প্রাচীন ওই মন্দিরে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যাফেট আর কুইক। আমাদের কত বড় উপকার যে করেছে এই জ্যাফেট তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। ওর পরামর্শ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারতাম না আমরা, আবার যেহেতু পাহাড়ি-লোকদের সবাই ওকে ভালো জানে সেহেতু সে-ই বার বার বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে লোকগুলোকে দিয়ে, তা না-হলে অনেক আগেই এই হতচ্ছাড়া কাজ ফেলে পালাত আমাদের শ্রমিকরা।

লণ্ঠনের আলোয় দেখি, খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে জ্যাফেটকে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্যাপ্টেন অলিভারকে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি। খুবই জরুরি কথা।'

boiboi.net

'কিন্তু সে তো ঘুমিয়ে আছে। এখন জাগানো যাবে না ওকে।'

শুনে আরও মনমরা হয়ে গেল জ্যাফেট। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে, তারপর বলল, 'কথাগুলো খুবই জরুরি। আপনারাও না-হয় চলুন আমার সঙ্গে, আপনাদেরও শোনা দরকার।'

বুঝলাম, ব্যাপারটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, তা না-হলে এত চাপাচাপি করত না জ্যাফেট। চারজনে গিয়ে ঢুকলাম অলিভারের ঘরে, ঘুম থেকে জাগালাম ওকে। লাফ দিয়ে উঠে বসল সে, ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। বোধহয় ভেবেছে খারাপ কিছু ঘটে গেছে সুড়ঙ্গের ভিতরে।

'কী হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে জ্যাফেটকে। 'ফাংরা কি তার কেটে দিয়েছে?'

'না,' জবাব দিল জ্যাফেট। 'তার চেয়েও খারাপ। শুনেছি সেনাপতি যশুয়া নাকি ষড়যন্ত্র করছেন আমাদের রানির বিরুদ্ধে। শয়তানটা নাকি তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।'

'কী?!' নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা।

'খুলে বলো,' ঘুম চলে গেছে অলিভারের চোখ থেকে।

'বলার মতো তেমন কিছু নেই আসলে। কয়েকজন বন্ধু আছে আমার। তাদের মধ্যে একজন, আমার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে যার, দয়া করে ওর নাম জিজ্ঞেস করবেন না, সেনাপতি যশুয়ার অধীনে চাকরি করে। আজ দুপুরে একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিলাম আমরা, একটু বেশিই গিলে ফেলে সে, তখন আলগা হয়ে যায় ওর মুখ, যা বলা উচিত না তা-ই বলে ফেলে। ওর কথা বিশ্বাস করেছি আমি, কারণ বাজে কথা বলার মতো লোক না সে। আমাকে বলল সে, মুরের জনগণ আর নিজের স্বার্থে নাকি এতদিন আপনাদেরকে কিছু বলেনি যশুয়া, নইলে অনেক আগেই খুন হয়ে যেতেন আপনারা চারজনই। কিন্তু আপনাদের কাজ প্রায় শেষ, হয়তো আজই ধ্বংস হয়ে যাবে ফাংদের সেই সিংহ-মাথার দেবতার মূর্তিটা, আপনাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে তখন।

তারপর কী হবে আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম আমার বন্ধুকে, কিন্তু বলতে পারল না সে।'

'কী আর হবে আমাদের,' কুইকের কণ্ঠ বরাবরের মতোই ব্যঙ্গাত্মক, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তো পৃথিবীতে আবাটিদের কোনো তুলনা নেই, আমাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে আমাদেরকে কাঁধে নিয়ে নাচবে ওরা।'

'যশুয়ার সবচেয়ে বড় ভয়, আজ যদি সফল হন আপনারা তা হলে আমাদের রানিকে কোনোদিনও পাবে না সে।'

'কোনোদিনও পাবে না মানে?'

'দেখুন, আগেই বলেছি, নিজের স্বার্থের জন্যই যশুয়া চায় মূর্তিটা ধ্বংস হয়ে যাক। তা হলে ফাংরা মুরে হামলা করুক বা না-করুক ওদের অহঙ্কার যে অনেক কমে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা বারুং-এর উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে সাধারণ ফাংদের, সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন কিন্তু হারম্যাকের আটপৌরে বাসিন্দারা তখন তাঁকে সঙ্গ দেবে বলে মনে হয় না। তার মানে একঅর্থে জিতে যাবে আবাটিরা, এবং আবাটিদের বিজয় মানে সেনাপতি যশুয়ার বিজয়। কিন্তু এই বিজয়ে বেশি খুশি হয়ে হয়তো আপনাদের মধ্যে কোনো একজনকে,' বলতে বলতে অলিভারের দিকে তাকাল জ্যাফেট, 'যা দেয়ার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে ফেলতে পারেন আমাদের রানি। যেহেতু যশুয়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে রানির, তাই সে চায় না...' আর কিছু না-বলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে।

এতদিন আমাদের প্রতি যশুয়ার এত নরম আচরণের রহস্যটা আজ পরিষ্কার হলো।

'আরও একটা ব্যাপার,' বলে চলল জ্যাফেট, 'পুরস্কার হিসেবে আপনাদেরকে বিপুল পরিমাণ সোনা দেয়ার কথা দিয়েছেন রানি। কিন্তু নিজের দেশ থেকে ওই পরিমাণ সোনা

boiboi.net

কিছুতেই বাইরের দেশে যেতে দেবে না যশুয়া, যেভাবেই হোক সব নিজের কাছে রেখে দেবে সে। এই কারণেও আপনাদেরকে ঠেকানো দরকার ওর।'

কিছুই বললাম না আমরা কেউ, এতদিন পর এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের কথা শুনে যেন বোবা হয়ে গেছি সবাই।

'রানিকে বিয়ে করতে পারলে মুরের অঘোষিত রাজা, সোজা কথায় বললে কর্তব্যক্তি হতে পারত যশুয়া,' আমরা নির্বাক দেখে বলল জ্যাফেট, 'অন্য কারও সঙ্গে আমাদের রানির বিয়ে হয়ে গেলে তা আর হতে পারবে না সে। আবার, ওকে ছেড়ে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করেন আমাদের রানি তা হলে মুরের জনগণ আর রাজকীয় ব্যক্তিদের কাছে ভীষণ অপমানিত হবে সে। কারণ এতদিন নিজের ঢোল নিজেই পিটিয়েছে-ওকে নাকি খুব ভালোবাসেন আমাদের রানি, আজ বাদে কাল দু'জনের বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই, আমার বন্ধু বলল, নিশ্ছিদ্র এক ফাঁদ নাকি পেতেছে সে।'

'কীসের ফাঁদ?'

'জানি না। আমার বন্ধুও জানে বলে মনে হলো না। আর জানলেও আমাকে বলেনি। কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, আমাদের রানিকে তুলে নিয়ে যাবে যশুয়া, অথবা ওর অনুগত সেনারা।'

'তুলে নিয়ে কোথায় যাবে?'

'হ্রদের আরেক প্রান্তে যশুয়ার নিজের একটা দুর্গ আছে, সেখানে। প্রাসাদ থেকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে ছ'ঘণ্টা সময় লাগে। ...ওখানে নিয়ে যেতে পারলে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে সে রানিকে।'

'রানিকে তুলে নিতে কখন আসছে সে?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'জানি না। আমার বন্ধু আমাকে যা বলেছে তা ছাড়া আসলে আর কিছু জানা নেই আমার। শুনে আমি ভাবলাম, দেরি না-করে

boiboi.net

সব জানানো উচিত আপনাদেরকে।'

'কবে কখন ঘটবে ঘটনাটা জিজ্ঞেস করোনি তোমার বন্ধুকে?'

'করেছিলাম। সে বলল, সামনের শনিবারের পরের কোনো এক রাতে।'

'তা হলে মিলল কী করে? আজ রাতে উড়ে যাচ্ছে ফাংদের সিংহ-দেবতার মূর্তিটা, আর সামনের শনিবার আসতে আরও পাঁচ দিন বাকি। ...মাতাল অবস্থায় তোমার বন্ধুর হিসেবের ঠিক ছিল না।'

'হতে পারে। ঘটনাটা আজকেও ঘটতে পারে, আবার পাঁচদিন পরও ঘটতে পারে, এমনকী না-ও ঘটতে পারে। আরও একটা কথা, আমার বন্ধু "সদা সত্য কথা বলিব" ধরনের লোক না, তার উপর ছিল মাতাল অবস্থায়, কাজেই ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাসও করা যায় না। যা শুনেছি, আপনাদেরকে জানানোটা কর্তব্য ছিল আমার, তাই সময় নষ্ট না-করে চলে এসেছি এখানে।'

'খুব ভালো করেছ। তুমি আসলেই খুব কাজের। এখন একটা কাজ করো, নীচে গিয়ে শেষবারের মতো দেখে এসে আমাকে জানাও তারগুলো ঠিক আছে কি না।'

স্থানীয় কায়দায় অলিভারকে স্যালুট করে বিদায় নিল জ্যাফেট, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলে গেল নীচে।

আমাদের দিকে তাকাল অলিভার। 'সবই তো শুনলেন আপনারা। এবার বলুন, কী মনে হয় আপনাদের?'

'গাঁজাখুরি,' এককথায় রায় দিয়ে দিল হিগস, 'মুরে এখন আমাদেরকে নিয়ে গুজবের অভাব নেই। যার মুখে যা আসছে তা-ই বলে বেড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে, বিশেষ করে মদের আড্ডায়। ...স্বীকার করি আমাদেরকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে যশুয়া, এমনকী অলিভারকে খুন করানোর জন্য সে-ই হয়তো পাঠিয়েছিল শ্যাডর‍্যাককে, কিন্তু রানিকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস ওর হবে বলে মনে হয় না।'

'আরেকটা কথা,' বললাম আমি, 'জ্যাফেটের বন্ধু যদি সত্যিই কিছু জানত তা হলে আরও খুলে বলত। যশুয়ার জায়গায় আমি থাকলে যা যা করতে চাইছে সে আমাদের বিরুদ্ধে, বলা ভালো করতে চাইছে বলে শুনছি আমরা, আমিও সেগুলো করতাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকার পরও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই ওর। আমার কথা যদি শোনো, অলিভার, এই ব্যাপারে কিছুই বোলো না রানি মাকেডাকে, অন্তত হাতে প্রমাণ না-আসা পর্যন্ত।'

'তুমি কী বলো, সার্জেন্ট কুইক?' ছোট্ট ঘরটার এককোনায় দাঁড়িয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভাবছিল কুইক, ওকে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

ডাক শুনে বাস্তবে ফিরল কুইক। বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয় না ডাক্তার অ্যাডামস বা মিস্টার হিগস যা বলছেন তা ঠিক। তবে একটা ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত—হাতে প্রমাণ না-আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না রানি মাকেডাকে। তাঁর কাছে মাথা ঘামানোর মতো হাজারটা সমস্যা আছে ইতোমধ্যেই, আপাতদৃষ্টিতে একটা উড়ো কথা শুনিয়ে তাঁর পেরেশানি আরও বাড়িয়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু কথাটা উড়ো কথা ভেবে উড়িয়ে দেয়াটাও ঠিক হবে না আমাদের। যদি বলি নেশার ঘোরে দিন-তারিখ-সময় ঠিকমতো বলতে পারেনি জ্যাফেটের বন্ধু, কিন্তু আসল ঘটনাটা ঠিকই জানিয়ে দিয়েছে আমাদের, তা হলে কি ভুল হবে? সহজ-সরল হলেও জ্যাফেট সৎ, আর লোকে যখন সৎ লোকদের কিছু বলে, গালগল্প বাদ দিয়ে সত্য কথাটাই বলে সাধারণত। এ-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম আমি।'

'এ-ই যদি তোমার মত হয়, তা হলে কী করা যায়, বলো তো, সার্জেন্ট? মানলাম রানিকে কিছুই বলা যাবে না এই ব্যাপারে, এদিকে আমার হিসেব অনুযায়ী আজ রাত দশটার আগে আমিও তো বের হতে পারছি না এই জায়গা ছেড়ে। কেন, তা

বুঝতেই পারছ। ...কী করছ তুমি? কী আঁকছ মেঝেতে?'

ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে মেঝে, হাঁটু গেড়ে বসে আঙুল দিয়ে সেখানে কী যেন আঁকছে কুইক। কাজ করতে করতেই মুখ না-তুলে বলল সে, 'রানির ব্যক্তিগত কামরার একটা নকশা আঁকছি, ক্যাপ্টেন। আগে দেখিনি কখনও, তাই বাইরে থেকে যতটুকু দেখেছি তার উপর ভরসা করে অনুমানেই সারছি কাজটা। ...আপনাকে কী যেন বলেছিলেন তিনি? আজ আর বেশি দেরি করবেন না, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাতে যাবেন। আগামীকাল খুব ভোরে উঠবেন তিনি। যা-হোক, এই যে,' মেঝেতে আঁকা নকশার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, 'এটা হলো আমাদের রানির খাসকামরা। আর সামনের এই কামরাটা হলো তাঁর সহচরীদের। রানির কামরার পিছনে উঁচু দেয়াল, নীচে পরিখা; যা কোনোভাবেই টপকানো সম্ভব না।'

'ভুল অনুমান করোনি তুমি, কুইক,' বলল হিগস। 'প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম একদিন, তাই কাজ ফেলে রেখে হাজির হই মুরে, রানির প্রাসাদের কাছে। প্রাসাদটা আমার মনোযোগ কেড়ে নেয়, তাই রানির অনুমতি নিয়ে ঢুকে পড়ি ভিতরে, তোমাদেরকে আগে বলিনি বোধহয়। তখন আমিও মোটামুটি একটা নকশা তৈরি করি। ...রানির সহচরীদের কামরার আগে বিশ ফুট লম্বা আর ছ'ফুট চওড়া একটা প্যাসেজ আছে; সেটার এই মাথায় প্রহরীদের চেম্বার। এই চেম্বার পার হয়ে পা রাখতে হবে প্যাসেজে, আর যতদূর জানি এই প্যাসেজ ছাড়া রানির কামরায় যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই। কাজেই প্যাসেজের ভিতরে যদি ঠিকমতো পজিশন নেয়া যায়, আর সঙ্গে যদি পিস্তল-রাইফেল থাকে, তা হলে মাত্র দু'জন আটকে দিতে পারবে পঞ্চাশ-ষাটজন লোককে। ...এখন একটা কাজ করতে পারি আমরা—দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে পারি। দু'জন থাকবে এখানে, ডিনামাইট ফাটাবে, আর

দু'জন যাবো প্রাসাদে, পাহারা দেবো রানিকে। ডাক্তার অ্যাডামস না-হয় থাকুক অলিভারের সঙ্গে, কুইক, তুমি চলো আমার সঙ্গে। গিয়ে আগে ছোট্ট একটা ঘুম দেবো দু'জনে প্রহরীদের চেম্বারে; আমার মনে হয় আজ রাতে ফাঁকাই থাকবে চেম্বারটা, কারণ শুনেছি সব প্রহরীকে নাকি নিযুক্ত করা হবে প্রাসাদের সদর-দরজায়। ...কী বলো, অলিভার?'

'কিন্তু...রানি কি রাজি হবেন আপনাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিতে? কিছু না কিছু তো অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন তিনি...'

'আমরা ভিতরে যেতে চাই শুনলে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন না তিনি? আর যে-প্রশ্নই করুন না কেন তিনি, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একটা কিছু বলে দিলেই তো হলো, তা-ই না? আমরা তো আর সত্য কথাটা বলবো না তাঁকে।'

'আপনার দু'জন সেখানে থাকলে আসলে অনেক বড় একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো আমি, মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে।'

'একটা কাজ করলেই তো পারি তা হলে,' বুদ্ধি দিল হিগস, 'পোর্টেবল টেলিফোনটা তো আর এখন কোনো কাজেই লাগছে না, ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমরা? অনেক লম্বা তার আছে, প্রাসাদ পর্যন্ত চলে যাবে অনায়াসে। যন্ত্রটা ঠিকমতো কাজ করলে তোমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে। আর এখানে কোনো অসুবিধা হলো কি না তা-ও জানাতে পারবে তোমরা আমাদেরকে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেল হিগস আর কুইক। বরাবরের মতোই সামরিক কায়দায় অলিভারের দিকে এগিয়ে গেল কুইক, বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সাবধান হওয়ার ভঙ্গিতে, বলল, 'এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, সার। আর কোনো আদেশ?'

মেঝের ব্যাটারি দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অলিভার, চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপাতত না, সার্জেন্ট। কী

করতে হবে জানা আছে তোমার। রাত দশটায়, মানে আরও প্রায় দু'ঘণ্টা পর, ব্যাটারির সুইচে চাপ দেবো আমি। আরও আগেই করা যেত কাজটা, কিন্তু ডাক্তার অ্যাডামসের ছেলের কথা ভেবে ওই সময়টা বেছে নিয়েছি আমি। আশা করা যায় ওই সময় নাগাদ ওকে মূর্তির ভিতর থেকে বের করে মূল অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। রাত দশটায় মূর্তির ভিতরে বা তার কাছাকাছি যে বা যারা থাকবে তাদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই আমার। কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলো ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। যা-হোক, আমাদের গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, চাঁদ উঠবার কমপক্ষে তিন ঘণ্টা পর নাকি শুরু হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।'

'ফাংদের হাতে যখন বন্দি ছিলাম তখন আমিও শুনেছিলাম কথাটা,' বলল হিগস।

'তারপরও হাতে খানিকটা সময় রেখে দিয়েছি আমি, কারণ একটাই—ডাক্তার অ্যাডামসের ছেলের যাতে কোনো ক্ষতি না-হয়। কাজেই রাত দশটা না-বাজা পর্যন্ত অথর্বের মতো বসে থাকতে হবে আমাকে এখানে, মন চাইলেও ছুটে যেতে পারবো না প্রাসাদে। উত্তেজনা সহ্য করতে না-পেরে যদি হাত দিয়ে বসি ব্যাটারির সুইচে, তা হলে ডাক্তার অ্যাডামস, আপনার উপর দায়িত্ব থাকল, আমাকে নিবৃত্ত করবেন আপনি। আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় এই জায়গার অবস্থা কী হবে জানি না, যদি খারাপ কিছু লেখা থাকে আমাদের কপালে, তা হলে প্রফেসর হিগস আর সার্জেন্ট কুইকের উপর দায়িত্ব থাকল আমাদের মরদেহ উদ্ধার করার। আর সবসময় আমার আদেশের অপেক্ষায় থাকবেন না, যদি কখনও এরকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হন যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তা হলে আপনাদের বিবেচনায় যা ভালো মনে হবে তা-ই করবেন।...আমার মনে হয় প্রাসাদ পর্যন্ত যাবে না টেলিফোনের তার, যদি যায় এবং যদি ঠিকমতো কাজ করে তা হলে সবকিছুর আগে যোগাযোগ করবেন

আমার সঙ্গে। আর এখানে যদি কোনো দুর্ঘটনা না-ঘটে তা হলে আশা করা যায় সাড়ে দশটার দিকে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের, প্রাসাদে। ...বিদায়!'

'বিদায়, ক্যাপ্টেন,' জানি না কেন বলতে গিয়ে কেঁপে গেল কুইকের কণ্ঠ, চোখ ছলছল করতে লাগল ওর। হাত মেলাল সে অলিভারের সঙ্গে। তারপর আর একটা কথাও না-বলে তুলে নিল নিজের লণ্ঠন, বাইরে চলে গেল।

হঠাৎ করেই ভাবাবেগে আক্রান্ত হলাম আমি, কুইক বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পিছু নিলাম ওর। ঘরে রয়ে গেল অলিভার আর হিগস, কী নিয়ে যেন কথা বলতে লাগল ওরা।

পাশাপাশি হাঁটছি, কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না কুইককে, সে-ও নিশ্চুপ। অটুট নিস্তব্ধতায় ভূগর্ভস্থ ওই শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা দিয়ে পঞ্চাশ গজের মতো এগোলাম দু'জনে, দু'পাশের ধসে পড়া বাড়িগুলো যেন দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে আমাদেরকে, হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে কুইক বলল, 'পূর্বানুভূতিতে বিশ্বাস করেন আপনি?'

থেমে দাঁড়ালাম আমিও। 'পূর্বানুভূতি মানে?'

'মানে, আপনার কি মনে হচ্ছে না খারাপ কিছু ঘটবে?'

'এটা ঠিক যে, বুকের ভিতরে কেমন কেমন করছে; কিন্তু তার সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটার সম্পর্ক কী? ...তোমার পূর্বানুভূতির মানে যদি হয় খারাপ কিছু ঘটা, তা হলে জোর দিয়েই বলছি, ওরকম কিছুতে বিশ্বাস নেই আমার।'

'শুনে ভালো লাগল। আমি কিন্তু আবার এসব বিশ্বাস করি।'

'তা, কী মনে হচ্ছে তোমার এখন?'

'মনে হচ্ছে...আর কোনোদিন দেখতে পাবো না আপনাকে বা ক্যাপ্টেন অলিভারকে।'

'তা হলে তো খুবই খারাপ কথা,' ঠাট্টা করার চেষ্টা করলাম।

'অন্তত আমার জন্য তো অবশ্যই। ...বুঝিয়ে বলতে পারবো

boiRboi.net

না, কেন যেন মনে হচ্ছে সময় হয়ে গেছে আমার, কারা যেন নাম ধরে ডাকছে আমাকে। আপনারা ঠিকই থাকবেন–আপনি, প্রফেসর হিগস, ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্ম, শুধু আমাকেই চলে যেতে হবে। তবে যা-ই হোক, আমার কাজ আমি করে গেছি, কর্তব্য অপূর্ণ রাখিনি। ...কাজ শুরু করার অনেক আগেই সব কিছু লেখা থাকে আমাদের ভাগ্যে, অন্তত সে-রকমই ভেবেছি আমি সবসময়। তারপরও, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলে খুব কষ্ট পাবো, কারণ ছোটবেলায় তাঁর দেখাশোনা করেছি আমি। যদি জেনে যেতে পারি এই গর্ত থেকে নিরাপদে বের হতে পেরেছেন তিনি, যদি দেখে যেতে পারি মিষ্টি ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর, তা হলে মরেও সুখ হবে আমার। অবশ্য, অবস্থা যা দেখছি তাতে রানির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে বলে মনে হয় না...'

'বাজে কথা বাদ দাও তো, কুইক। কাজ করতে করতে আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সইতে সইতে তোমার স্নায়ুগুলো সব গেছে, তাই মাথা কাজ করছে না ঠিকমতো।'

'হতে পারে। তারপরও, আমার কথা যদি ঠিক হয়, আর আপনারা যদি পুরস্কার নিয়ে ফিরে যেতে পারেন ইংল্যাণ্ডে,' বলতে বলতে আমার হাত ধরল কুইক, 'দয়া করে মনে রাখবেন তিন তিনটা এতিম ভাগ্নি আছে আমার ঘরে। ...আমি যা বললাম, আজকের রাত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তার কিছুই দয়া করে বলবেন না ক্যাপ্টেন অলিভারকে। কারণ কথাগুলো শুনলে আরও ভেঙে পড়বেন তিনি, অথচ যে-কোনো উপায়ে রাত দশটা পর্যন্ত শান্ত রাখতে হবে তাঁকে। আর যদি কখনও দেখা না-হয়, তাঁকে বলবেন, কর্তব্যে কখনও অবহেলা করেনি স্যামুয়েল কুইক। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন, আপনারও এবং আপনার ছেলেরও।' পিছন ফিরে কী যেন দেখল সে। 'ওই যে, প্রফেসর হিগস আসছেন, এবার যেতে হয় আমাকে। বিদায়।'

মিনিটখানেক পর আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল হিগস, তারপর কুইকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েই থাকলাম ওদের দিকে, যতক্ষণ না ওদের লণ্ঠনের আলো কমতে কমতে অনুজ্জ্বল দুটো তারায় পরিণত হলো।

একসময় গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওরা দু'জন।

ষোলো

মন ভেঙে গেছে, হাঁটার মতো শক্তিটুকুও যেন আর বাকি নেই শরীরে। পুরনো সেই মন্দিরে ফিরে যেতে অনেক বেশি সময় লাগল আমার।

অলিভারের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে টেলিফোনের তার। কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, যাওয়ার সময় খুলে নিয়ে গেছে হিগস, একটা প্রান্ত রয়ে গেছে এখানে।

কুইকের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মনের ভিতরে। কেন বলল সে খারাপ কিছু ঘটতে পারে? সে-রকম কিছু ঘটার কোনো সম্ভাবনা কি আছে আদৌ? নাকি ধরে নেবো মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে ভুগতে বিশ্বাসপ্রবণ লোকটা আর সংযত রাখতে পারেনি নিজেকে, ভিত্তিহীন একটা ধারণার কথা বলে ফেলেছে আমাকে? পূর্বানুভূতিতে কোনো বিশ্বাসই নেই আমার, যতদূর মনে হয় পরিবেশ-পরিস্থিতিই মানুষকে বাধ্য করে এসব সিদ্ধান্ত নিতে। হাসিখুশি মানুষও মনমরা হয়ে যায় তখন। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি হিগসকে—ফাংদের হাতে ধরা পড়ার আগে কী ছিল সে, আর এখন কেমন চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মতো।

তবে অস্বীকার করবো না, আমি নিজেও অস্বস্তিতে ভুগছি। আমার ছেলে রডরিককে বাঁচাতে এসেছি দুর্ধর্ষ ফাং্দের কবল থেকে, ওদের সিংহ-মাথার দেবতার মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ছেলেকে পাওয়ার, কিন্তু এটাও জানি যে, ডিনামাইট দিয়ে মূর্তিটা উড়িয়ে দিলে মারা পড়তে পারে রডরিকও। আজ রাতে ওর বিয়ে, আর অনুষ্ঠান হবে মূর্তিটা থেকে কয়েক মাইল দূরে, হারম্যাক শহরে, সুতরাং একঅর্থে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই রডরিকের, কিন্তু তারপরও মন মানতে চায় না। এমনও তো হতে পারে, শেষমুহূর্তে পিছিয়ে গেল বিয়ের দিন-তারিখ-সময়? কিংবা যেহেতু রডরিক একজন বন্দি সেহেতু বন্দিশালায়, মানে মূর্তির ভিতরেই আয়োজন করা হলো বিয়ের অনুষ্ঠানটা? রানির গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, আজ রাতে শহরেই নাকি হবে অনুষ্ঠানটা, কিন্তু ওদের এই তথ্য যদি নির্ভুল না-হয়? অলিভারের হিসেবে যদি ভুল না-হয়, (আগেও বলেছি হিসেবে ভুল হয়েছিল অলিভারের) তা হলে বিস্ফোরণের পর স্রেফ উড়ে যাবে মূর্তিটা; তখন সেটার আশপাশে বা ভিতরে যে বা যারা থাকবে তাদের কী হবে?

এসব ভাবতে ভাবতে গলা শুকিয়ে গেল আমার, কেমন শীত শীত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল আমাকে। কিন্তু করার কিছু নেই—সুযোগ নিতেই হবে, রডরিকের কপালে যা লেখা আছে তা-ই হবে। আরও একটা কথা, রাজা বারুং-এর মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়ে যায় আমার ছেলের তা হলে সেটাই বা কেমন হয়? একটা খ্রিস্টান লোক বিয়ে করছে একটা মূর্তিপূজারিণী বর্বর মেয়েকে যে কি না নিজের গোত্রের আচার-সংস্কৃতির বাইরে আসতে পারবে না কোনোদিনও। তখন কী অবস্থা হবে আমার ছেলের? রাষ্ট্রীয় কয়েদিতে পরিণত হবে সে, চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হবে ওকে, এখন যতটুকু স্বাধীনতা আছে ওর তখন ততটুকুও থাকবে না এবং ওকে উদ্ধার করার সব আশা

তখন তিরোহিত হবে।

আরও জটিলতা আছে। আমাদের পরিকল্পনা যদি সফলও হয়, মানে মূর্তিটা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, আমার বিশ্বাস, তাতে ফাংরা সাময়িকভাবে ভয় পেতে পারে, কিন্তু ওদের জিঘাংসা যাবে না। মুরে হাজির হওয়ার কোনো-না-কোনো গোপন রাস্তা জানা আছে ওদের, মাত্র কয়েকদিন আগে ব্যাপারটা টের পেয়েছি আমরা। ওই রাস্তা কাজে লাগাবে ওরা তখন। রাতের আঁধারে হামলা করবে ওরা, হাজার হাজার সৈন্য হাজির হয়ে যাবে ভোর হওয়ার আগেই, তারপর শুরু হবে গণহত্যা। আর রাজা বারুং যদিও নির্ভয় দিয়েছেন, কিন্তু আমার মন বলছে আমরা চার ইংরেজ হবো ফাংদের রোষানলের প্রথম শিকার।

ঘরে ঢুকে দেখি, একা বসে একমনে কী যেন ভাবছে অলিভার। জ্যাফেট ফেরেনি এখনও, তার মানে "তার পর্যবেক্ষণের" কাজ শেষ হয়নি ওর।

আমার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল অলিভার, 'মাকেডাকে অপহরণ করা হবে শোনার পর থেকে আর কিছু ভালো লাগছে না আমার।'

এই প্রথম মুরের রানিকে নাম ধরে ডাকল সে।

'না-ও তো ঘটতে পারে ঘটনাটা?'

'হুঁ। কিন্তু যদি ঘটে, যদি জ্যাফেটের গল্পটার মধ্যে সত্যতা থাকে তা হলে কী হবে? ...এখানে আসতে চেয়েছিল মাকেডা,' যেন আমাকে নয়, নিজেকেই বলছে অলিভার, 'আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বলতে গেলে কেঁদেই ফেলেছিল। কিন্তু আমিই মানা করে দিয়েছি। আমি জানি বিস্ফোরণের ধাক্কা এসে লাগবে এখানেও, টন টন পাথর আর মাটি ধসে পড়তে পারে আমাদের মাথার উপর, জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে তখন আমাদের। ...আপনিই বা এখানে কী করছেন? চলে যাচ্ছেন না কেন? বাকি কাজটুকু আমি একাই করতে পারবো।'

'না, এই অবস্থায় তোমাকে একা ফেলে কোথাও যাবো না। এরকম কাজের দায়িত্ব কারও একার উপর দিয়ে সবার চলে যাওয়াটা উচিত না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল অলিভার, তারপর দেখি মাথা ঝাঁকাচ্ছে আমার কথায় সম্মত হয়ে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। জ্ঞান হারাতে পারি আমি, উত্তেজনায় মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে আমার, অথবা যে-কোনো কিছু ঘটতে পারে। ...ইস্‌স্‌! খুব বড় ভুল হয়ে গেছে! যদি টেলিফোনের তার কাজে লাগিয়ে এই ব্যাটারিগুলো নিয়ে যেতাম মাকেডার প্রাসাদ পর্যন্ত, কত ভালোই না হতো! কিন্তু এই হতচ্ছাড়া ব্যাটারিগুলো চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। সেলগুলো নতুনই আছে, কিন্তু অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন, কত আগে ওগুলো নিয়ে রওনা হয়েছিলাম আমরা লণ্ডন থেকে। মরুঝড়, টানা বৃষ্টি, তারপর সবশেষে মাটির নীচের এই গুমোট আবহাওয়া। আজ রাতে যদি ঠিকমতো কাজ করে ওগুলো...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলাম আমি।

'এই যে ডাক্তার সাহেব!' আমার কণ্ঠ শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল উৎফুল্ল হিগস, 'নিরাপদেই পৌঁছে গেছি আমরা রানির প্রাসাদে। তাঁর খাস কামরার সামনে, ছোট্ট ওই প্যাসেজটা দখল করে আছি এখন।'

'আর কী অবস্থা?' জানতে চাইলাম আমি।

'প্রাসাদটা দেখে তো শ্মশান বলে মনে হচ্ছে আমার। বিশ্বাস করো বা না করো, মাত্র একজন প্রহরী ছিল সদর-দরজায়। রানি এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরী ছাড়া আর কেউ বোধহয় নেই এখানে। বাকিদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'ভয়ে।'

boiRboi.net

'ভয়ে! কীসের ভয়?'

'সবাই জানে যে, আজ রাতে মহাবিস্ফোরণ ঘটবে, উড়ে যাবে ফাংদের ওই মূর্তিটা, একই সঙ্গে নাকি ধসে পড়বে পাহাড়-পর্বত। তিলকে তাল বানানো হয়েছে আসলে, এমনভাবে গুজব রটানো হয়েছে যে, সবাই ভাবছে কেয়ামত বা ওই জাতীয় কিছু একটা ঘটবে আজ রাতে; তাই যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। প্রাসাদ পাহারা দেয়ার কাজে নিযুক্ত প্রহরীদেরও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, কারণ কাছের পাহাড় থেকে বিস্ফোরণের ধাক্কায় নাকি উড়ে এসে পড়তে পারে বড় বড় পাথর।'

'এসব কথা কে বলল তোমাকে?'

'কেন, প্রহরীটা। আমরা ভিতরে ঢোকামাত্র পালিয়েছে ব্যাটা।'

'পালিয়েছে? কোথায়?'

'জানি না। তবে যাওয়ার আগে বলে গেল কোথায় নাকি রিপোর্ট করতে হবে ওকে।'

'কুইক কেমন আছে?'

'যে-রকম থাকে সবসময়। এখানে এসেই সরে গেছে এককোনায়, সেই যে প্রার্থনা শুরু করেছে এখনও থামছে না। ওকে যদি একবার দেখতে, ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হতো তোমার। শরীরের জায়গায় জায়গায় রিভলভার, ছুরি আর রাইফেল, চেহারা মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর—সব মিলিয়ে ডাকাতের মতো লাগছে বেচারাকে।...এক মিনিট, একটু লাইনে থাকো তো...'

দীর্ঘক্ষণের বিরতি, তারপর আবার শুনতে পেলাম হিগসের কণ্ঠ, 'না, সব ঠিকই আছে। রানি মাকেডার একজন সহচরী বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। আমাদের কণ্ঠ শুনে দেখতে এসেছিল আমরা কারা। বলল, রানি নাকি সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন, ঘুমাতে পারছেন না। ভিতরে গেছে মেয়েটা, বোধহয় রানিকে জানাবে সব, আমরা এসেছি শুনলে বাইরে এসে আমাদের সঙ্গে

boiRboi.net

অবশ্যই দেখা করবেন তিনি।'

ঠিকই বলেছে হিগস। দশ মিনিট পর আবার বেজে উঠল ফোন। এবার রানি মাকেডা। রিসিভারটা অলিভারের হাতে দিয়ে দিলাম, লাজুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রিসিভারটা নিয়ে ঘরের একপ্রান্তে সরে গেল সে।

ভালোই হলো, ভাবলাম, এবার আর সময় কাটাতে সমস্যা হবে না অলিভারের।

ঘণ্টাখানেক পর, হাজির হলো জ্যাফেট। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে কোনো কারণে।

'কী হয়েছে?' বিচলিত হয়ে উঠলাম আমিও। 'তারে কোনো সমস্যা?'

'না,' অস্পষ্ট একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। 'একটা ভূত দেখেছি আমি।'

'গাধা!' বিরক্তিতে নাকমুখ কোঁচকালাম। 'কীসের ভূত?'

'একজন মরা রাজার। হাসবেন না দয়া করে, প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে নিজের চোখে দেখেছি আমি। চেয়ারে বসে আছেন তিনি, হাড়গোড় সব বেঁকে গেছে। কীভাবে যেন কিছু মাংস এসে লেগে গেছে তাঁর শরীরে, অথবা তিনিই হয়তো লাগিয়ে নিয়েছেন। দেখতে কী ভয়ঙ্করই না লাগছে! বীভৎস একটা মানুষ, মানে ভূত!'

'তা, ভূতটা কিছু বলেছে তোমাকে?'

'অনেক, অনেক কথা বলেছে। সেসব শুনতে গিয়েই তো এত দেরি হলো আমার। তবে বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারিনি আমি। কারণ তাঁর ভাষা আমার ভাষার চেয়ে কিছুটা আলাদা। আগুনে গাছের গুঁড়ি ফেললে যে-রকম স্ফুলিঙ্গ বের হয়, ভূতটা যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল আমার মনে হচ্ছিল সেরকম স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল তাঁর মুখ থেকে। আমার মনে হয় আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তিনি।'

'কী প্রশ্ন?'

'আমার দেশের জনগণ তাঁর দেবতা হারম্যাকের মূর্তি ধ্বংস করার সাহস পেল কোত্থেকে?'

হাসি চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী জবাব দিলে?'

'বললাম, আমি একজন চাকর মাত্র, আসলে কী হচ্ছে না-হচ্ছে জানা নেই আমার। আরও বললাম আমাকে জিজ্ঞেস না-করে প্রশ্নটা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়।'

'কবে জিজ্ঞেস করবেন তিনি আমাদেরকে প্রশ্নটা?' অলিভারের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

'আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, তিনি নিজেই আসবেন মুরে, আবাটিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। আরও বলেছেন, বিদেশি লোকগুলো যত তাড়াতাড়ি এই দেশ ছেড়ে যতদূরে চলে যায় তত মঙ্গল। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে দয়া করে, তাঁর আর কোনো কথা আমি বুঝতে পারিনি, বোঝার দরকারও নেই আমার। আমাকে যদি মুরের রাজত্বও দিয়ে দেয়া হয়, কোনোদিনও ওই গুহায় আর যাবো না আমি।'

আমার দিকে তাকাল অলিভার। 'দেখা যাচ্ছে আজব আজব সব জায়গায় বেকুব ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আজব আজব...কী বলবো...জিনিসের। আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বলছে সবাই—মুরে চলে আসবে হারম্যাক, আমরা এখান থেকে চলে গেলেই ভালো। হারম্যাক মুরে আসুক অথবা চাঁদে যাক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে এই হতচ্ছাড়া জায়গা ছেড়ে যে চলে যেতে চাই আমি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

কিন্তু আমার আছে, যদিও কথাটা বললাম না অলিভারকে। বরং জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করবে এখন?'

'কী করবো মানে?'

'জ্যাফেটের এই ভূত দেখার ব্যাপারে কী করবে?'

amarboi.net

'দেখি, ফোন করে জানাই মাকেডাকে।'

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে জানাতাম না রানিকে। কারণ প্রথম কথা, ব্যাপারটা জানানোর মতো কিছু না, আর দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয় রানির নিজেরও ভূতের ভয় আছে। এবং তৃতীয়ত,' ব্যাটারি দুটোর পাশে একটা টেবিল, তার উপর রাখা আছে একটা ঘড়ি, সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে।'

সেই শেষ পাঁচটা মিনিট যে কীভাবে কাটল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। একটা একটা করে মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে, অথচ আমার মনে হচ্ছে একশ' বছর পার হচ্ছে যেন। পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেছি আমরা, যার যার চিন্তায় হারিয়ে গেছি সবাই। আমার নিজের কথা যদি বলি, এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি যে, ঠিকমতো ভাবতে পারছি না কিছু, বার বার তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অতীতের টুকরো টুকরো সব স্মৃতি উঁকি দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে মনের ভিতরে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ঘড়িটার দিকে; লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় বার বার মনে হচ্ছে, আসলে চলছে না ঘড়িটা, বন্ধ হয়ে আছে অনেকক্ষণ আগে থেকে।

তারপর হঠাৎ করেই, আমার কাছে মনে হলো অনেক অনেকক্ষণ পর, জোরে জোরে বলতে শুরু করল অলিভার, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...দশটা!' কথা শেষ করেই ব্যাটারির সুইচে চাপ দিল সে।

পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেভাবে তরঙ্গের মতো ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, টের পেলাম ঠিক সেভাবে পায়ের নীচে একটা কম্পন ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দরজায় আড়াআড়িভাবে বসানো ছিল কয়েক টন ওজনের বিশাল একটা পাথর, স্রেফ খসে পড়ল সেটা, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আমাদের চারপাশে এখন শুধু পাথর পড়ার আওয়াজ। ছোট-বড় সবরকম পাথর খসে পড়ছে বাইরে, পাথরবৃষ্টির অদ্ভুত শব্দ

boiRboi.net

শুনতে পাচ্ছি ঘরের ভিতর থেকে। জানি না কখন উল্টে পড়ে গেছি আমি, কারণ পায়া ভেঙে পাছার নীচ থেকে উধাও হয়ে গেছে ছোট্ট টুলটা যেটার উপর বসে ছিলাম এতক্ষণ। ধাতস্থ হওয়ার আগেই শুনি চাপা কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ—অনেক অনেক দূরে বজ্রপাত হচ্ছে যেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাসে আন্দোলিত হলো আমাদের চারপাশ, যেখানে আগে কখনও একরত্তি বাতাস প্রবাহিত হতো না আজ সেখানে মাত্র কয়েক মুহূর্তের এক ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব শুরু হলো যেন। একটানা বাতাসের হু হু শব্দ শুনতে পেলাম অল্প কিছু সময়ের জন্য, তারপর যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল সব কিছু তেমন আচমকাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল ভূগর্ভস্থ শহরটা। নিভে গেল আমাদের সবগুলো লণ্ঠন। মিনিটখানেক পর, অনেক দূরে, মাটির উপর ধুপ করে পড়ল খুব ভারী কিছু একটা, আরেকদফা কম্পন টের পেলাম। তারপর আগের মতোই নিথর হয়ে গেল সব; আমাদের চারপাশে এখন শুধু অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা।

'সব শেষ,' ক্লান্ত গলায় বলল অলিভার, ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুনে মনে হলো অনেকদূর থেকে নিজেকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছে যেন, 'শুধু শুধু এত চিন্তা করছিলাম আমি। প্রায় দেড় টন অ্যাযো-আইমাইডের ধাক্কায় কী হলো ওই বুড়ো স্ফিংক্সটার সেটাই ভাবছি এখন। আমার হিসেব ভুল না-হলে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মূর্তিটা, আর না-হলেও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে সেটার। তবে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। ভিতরে ফাঁপা জায়গার পরিমাণ যদি বেশি হয়, তা হলে শকওয়েভের অনেকখানি চলে গেছে ওখান দিয়ে, তার মানে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফুটোই হয়েছে শুধু। আসলে কী হয়েছে জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের, আজ না হোক কাল জানতে পারবোই। ...একটা ম্যাচকাঠি জ্বালান তো, ডাক্তার অ্যাডামস. লণ্ঠনগুলো নিভে গেছে। ...কীসের আওয়াজ? শুনতে পাচ্ছেন?'

হ্যাঁ, পাচ্ছি। অস্পষ্ট, অনিয়মিত, কিন্তু শোনা যাচ্ছে। গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! কে বা কারা যেন অনেক দূরে একটানা গুলি করছে রাইফেল দিয়ে!

একলাফে উঠে বসলাম, অন্ধের মতো এগিয়ে গিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তুলে নিলাম ফিল্ড টেলিফোনের রিসিভার। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে অপরপ্রান্তে, গুলি করছে হিগস আর কুইক, ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি প্রতিটা আওয়াজ। চেঁচাচ্ছে হিগস; ক্ষীণভাবে, ভেঙে ভেঙে শোনা যাচ্ছে বলছে সে, 'সাবধান, কুইক, তোমার সামনে আরও কয়েকজন!'

চেঁচিয়ে জবাব দিল কুইকও, 'রাইফেলটা একটু নিচু করে ধরে গুলি করুন দয়া করে...বুলেট শেষ হয়ে গেছে আপনার...রিলোড করুন...রিলোড করুন...এই নিন কার্ট্রিজের আরেকটা ক্লিপ...এত তাড়াতাড়ি গুলি করবেন না...আহ্, শয়তানটা আমাকে মেরেই ফেলল...এই যে আমিও শেষ করে দিলাম ওকে...আর কোনোদিন কাউকে বর্শা মারতে পারবে না হারামজাদা...'

'বাঁচাও!' এবার চেঁচিয়ে উঠলেন রানি মাকেডা। 'অলিভার, বাঁচাও আমাকে। যশুয়ার লোকরা আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হামলা করেছে। কোথায় তুমি, অলিভার?'

চিৎকার-চেঁচামেচি আরও বাড়ল। এখন আর আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না কারও কণ্ঠ। সমানে গুলি করছে হিগস আর কুইক। কে যেন উড়ে এল আমার দিকে, ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নিয়ে নিল রিসিভারটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিকল হয়ে গেল যন্ত্রটা। এমনভাবে হ্যালো হ্যালো বলে কয়েকবার চেঁচাল অলিভার যে, মনে হলো কেঁদেই ফেলবে বেচারা।

'তার কেটে দিয়েছে,' রিসিভারটা ছুঁড়ে মারল সে, উল্টোদিকের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেল জিনিসটা। সবে একটা লণ্ঠন জ্বালাতে পেরেছিল জ্যাফেট, থাবা দিয়ে ওর

হাত থেকে সেটা নিয়ে নিল সে। 'চলুন আমার সঙ্গে। ওদেরকে মেরে ফেলছে যশুয়ার দল,' বলতে বলতে ছুটে গেল সে দরজার দিকে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে, পিছিয়ে এল সে কয়েক কদম, খসে-পড়া পাথরের কারণে বন্ধ হয়ে আছে দরজাটা।

'হায় ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল সে গলা ফাটিয়ে। 'আটকা পড়ে গেছি আমরা। বাইরে বের হব কীভাবে? কীভাবে বের হব বাইরে?' ঘরের ভিতরে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল সে, কিন্তু বের হওয়ার কোনো রাস্তা না-পেয়ে সন্ত্রস্ত বিড়ালের মতো বার বার গিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগল চারদিকের দেয়ালে। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে আবার হাজির হলো দরজার কাছে, যেখান থেকে খসে পড়েছে পাথরটা, মানে মাটি থেকে কমপক্ষে বিশ ফুট উপরের দেয়ালে লাফিয়ে চড়ার চেষ্টা করল পর পর তিন বার এবং তিন বারই ব্যর্থ হলো। এই ঘরে কোনো ছাদ নেই, ডানা থাকলে উড়ে বাইরে চলে যেত অলিভার, কিন্তু সেটাও সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অত্যন্ত হাস্যকর ভঙ্গিতে ঠেলতে শুরু করল সে দরজা আটকে-রাখা কয়েক টন ওজনের পাথরটা। যেখানে ছিল সেখানেই থাকল পাথর, নিষ্ফল পরিশ্রমের কারণে হাত পিছলে গিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল অলিভারের লম্বা শরীর।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' পিছন থেকে ওর শার্ট খামচে ধরতে গেলাম, ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল সে। কিন্তু তারপরও ছাড়লাম না, টেনে সরিয়ে আনলাম ওকে দরজার কাছ থেকে। 'মরতে চাও নাকি? তুমি মরলে বা আহত হলে রানি মাকেডাকে বাঁচাবে কে? সরো, গিয়ে বসো খাটের উপর, মাথা ঠাণ্ডা করো।'

প্রাসাদে কী হয়েছে তা জ্যাফেটও বুঝতে পেরেছে, কিন্তু যেহেতু অলিভারের মতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েনি সে তাই মাথা

ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে। অলিভারকে সরিয়ে নেয়ার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে, দু'হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে কয়েকবার ধাক্কা দিল পাথরের গায়ে। কোনো লাভ হবে না বুঝতে পেরে পিছিয়ে এল কিছুটা। বলল, 'আমরা তিন জন তো পরের কথা, একটা হাতির পক্ষেও সম্ভব না এই পাথর ঠেলে সরানো।' কিছুক্ষণ কী যেন দেখল সে চৌকাঠের দিকে তাকিয়ে, তারপর উল্টো ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উপরে যেহেতু ছাদ নেই, আমার মনে হয় চৌকাঠ টপকে বের হতে পারবো আমরা।' ব্যাটারি দুটো যে-টেবিলের উপর রাখা আছে সে-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'এদিকে আসুন দয়া করে, সাহায্য করুন আমাকে।'

দু'জনে মিলে ধরলাম টেবিলটা, নিয়ে গেলাম দরজার কাছে। জ্যাফেটের উদ্দেশ্য কী বুঝে গেল অলিভার, খাট থেকে একলাফে নেমে এসে আরেকলাফে উঠে দাঁড়াল সে টেবিলের উপর। নীচ থেকে শক্ত করে ধরে রাখলাম আমি টেবিলটা যাতে দু'জনের ভারে ভেঙে না-পড়ে।

কী করতে হবে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল জ্যাফেট অলিভারকে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের সঙ্গে কপাল আর বুক ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অলিভার। ওর কাঁধে দু'হাত রেখে ছোট্ট একটা লাফ দিল পাহাড়-চড়ায়-পটু জ্যাফেট, এবং অভূতপূর্ব দক্ষতায় উঠে দাঁড়াল অলিভারের কাঁধের উপর। উপরের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে ধরে ফেলল দেয়াল, তারপর শরীরটা টেনে তুলে চড়ে বসল চৌকাঠের উপর। জ্বলন্ত লণ্ঠনটা দিলাম আমি অলিভারের হাতে, ওটা জ্যাফেটের কাছে চালান করে দিল সে।

পরনের লিনেনের লম্বা রোবটা খুলে ফেলল জ্যাফেট, কয়েকবার পেঁচিয়ে গিঁট দিল দু'জায়গায়, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর। তারপর দেয়ালের উপর থেকে রোবটা ঝুলিয়ে দিল আমাদের দিকে। এবার টেবিলের উপর চড়ে বসলাম আমি, শক্ত করে

ধরলাম জ্যাফেটের সেই "দড়ি"। সর্বশক্তিতে ঠেলে আমাকে উপরে তুলে দিল অলিভার, আর "দড়ি" ধরে উপর থেকে টানতে লাগল জ্যাফেট। দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেয়ালের উপর চড়ে বসতে সময় লাগল না আমার।

সবশেষে অলিভারের পালা। আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভারী সে, তাই আমি আর জ্যাফেট মিলে শক্ত করে ধরলাম রোবটা, আর সেটা ধরে ঝুলে পড়ল অলিভার। একটু একটু করে ওকে টেনে তুলতে লাগলাম আমরা। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম আর হবে না আমাকে দিয়ে, এই বুড়ো বয়সে এত কষ্ট করতে পারবো না, ঠিক তখনই এক হাত দিয়ে রোব ধরে রেখে আরেকহাত দেয়ালের উপরে তুলে দিল অলিভার। তারপর রোব ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে দেয়াল ধরে টেনে তুলল নিজেকে দেয়ালের উপর। একটা মুহূর্তও নষ্ট না-করে লাফ দিল সে, বিশ ফুট নীচের পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল কিন্তু ব্যথায় উহ্ শব্দটাও করল না একবার। এবার রোবের একপ্রান্তে লণ্ঠনটার হাতল বেঁধে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিল জ্যাফেট, জিনিসটা খুলে নীচের মাটিতে রাখল অলিভার।

রোবটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেটা বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল জ্যাফেট; যথেষ্ট হালকা সে, তাই অলিভারকে টেনে তুলতে যতটা কষ্ট হয়েছিল এবার তেমন কোনো কষ্টই হলো না আমার। কিছুদূর যাওয়ার পর রোব ছেড়ে দিল জ্যাফেট, কিন্তু সে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল অলিভার। রোবটা ছেড়ে দিয়ে আমিও ঝুলে পড়লাম দেয়ালে দু'হাত রেখে, তারপর ছেড়ে দিলাম দেয়াল; কিন্তু জ্যাফেট আর অলিভার দু'জনে ধরল আমাকে এবার, তাই মাটিতে পড়ে কোনো আঘাতই পেলাম না বলতে গেলে।

দ্রুত হাতে রোব পরে নিল জ্যাফেট। আর দেরি করল না অলিভার, লণ্ঠনটা তুলে নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল। রানি

মাকেডা এবং আমাদের দুই সঙ্গীর চিন্তা এখন ওর মাথায়, কাজেই ওর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেয়ার সাধ্য কার! তারপরও পিছন থেকে চেঁচিয়ে সতর্ক করলাম ওকে, 'আস্তে, অলিভার! আলগা পাথর পড়ে আছে জায়গায় জায়গায়। তা ছাড়া আমাদের কাছে লণ্ঠন আছে মাত্র একটা, তুমি এত আগে চলে গেলে কিছুই তো দেখতে পাবো না আমরা!'

বলতে না বলতেই আলগা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অলিভার, আরেকটা চোখা পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ওর ডান হাঁটুর কাছটা কেটে গেল অনেকখানি। কিন্তু এবারও কোনো শব্দ করল না সে, একবার মাত্র তাকাল ক্ষতস্থানের দিকে। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে, সতর্ক হয়ে পথ চলতে লাগল এবার। গতি কমে গেল আমাদের।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভূগর্ভস্থ শহরটার ছাদ। আগে থেকেই নড়বড়ে ছিল, এবার ধসে পড়েছে একেবারে—আমাদের চারপাশে এখন শত শত টন ছোট-বড় পাথর। অনেক আগের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বেশিরভাগ বাড়ি, একটা-দুটো টিকে ছিল কোনোরকমে; এখন দেখি সেগুলোও পাথরের টুকরোয় পরিণত হয়েছে। যা-হোক, শেষপর্যন্ত ভূগর্ভস্থ শহরটার শেষপ্রান্তে হাজির হলাম আমরা। কিন্তু হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো—সুড়ঙ্গের মুখটা বলতে গেলে বন্ধই হয়ে গেছে ধসে পড়া পাথরের কারণে।

'ঈশ্বর!' অলিভারের কণ্ঠে এবার দুঃখ নয়, অভিযোগ, 'অবশেষে জ্যান্ত কবর হয়ে গেল আমাদের?'

ওর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে নিল জ্যাফেট। সামনের চারকোনা, তিনকোনা কিংবা অনিয়তাকার পাথরের-ব্লকগুলো দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আগের মতোই অভূতপূর্ব দক্ষতায় একটা একটা করে ব্লক পার হয়ে হয়ে উঠতে শুরু করল উঁচুতে।

হতাশা আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ওর কাজ দেখতে লাগলাম আমি আর অলিভার।

সুড়ঙ্গমুখের ধ্বংসাবশেষের উপর চড়ে দাঁড়াল জ্যাফেট কিছুক্ষণের মধ্যেই, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আছে, হতাশ হবেন না আপনারা, রাস্তা আছে একটা। তবে রাস্তাটা খুঁবই খারাপ আর বিপজ্জনক। কিন্তু এখান থেকে বের হতে চাইলে ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদেরকে। ...লণ্ঠনটা নিচু করে ধরছি আমি যাতে আলো যায় আপনাদের দিকে, আমার মতো পাথর টপকে টপকে প্রথমে চলে আসুন আপনারা এখানে।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে, আলগা পাথরের ব্লক পার হতে হতে ভাবলাম, এই কি সেই জ্যাফেট যে প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে দেখা কোনো এক "ভূতের" কথা বলতে গিয়ে ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিল?

সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পৌঁছে দেখি, নিরেট আর পুরু পাহাড়ি দেয়ালে কুয়ার মতো একটা গর্ত তৈরি হয়েছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। বাতাস বেরিয়ে গেছে বাইরের দিকে, গর্তটাও একটা খাঁজকাটা পথ তৈরি করে দিয়েছে বাইরের দিকে। আমাদের পায়ের নীচে আলগা পাথরের-ব্লকের ছড়াছড়ি; স্রেফ ভাগ্যের উপর ভর করে ওই গর্তটার কাছে হাজির হলাম আমরা। তারপর ঢুকে গেলাম গর্তের ভিতরে, অনেক কায়দা করে শরীর বাঁকিয়ে-মুচড়িয়ে এগোতে লাগলাম একটু একটু করে, প্রতিটা ইঞ্চি এগোনোর সময় মনে মনে প্রার্থনা করছি অপরপ্রান্তটা যেন খোলা থাকে, পাথর পড়ে অথবা যে-বিশাল দরজা ছিল ওই জায়গায় সেটার কারণে যেন আটকে না-যায়।

দৈর্ঘ্যে তেমন বড় নয় গর্তটা, তাই অপরপ্রান্তে হাজির হতে সময় লাগল না আমাদের। ভাগ্য সহায় হলো এবার-খোলাই আছে মুখটা। গর্তের শেষমাথা থেকে নামলাম সুড়ঙ্গের মুখের কাছে, সামনে তাকিয়ে দেখলাম বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় উড়ে

গেছে ভারী দরজাটা, ছিটকে গিয়ে প্রায় দশ হাত দূরে পড়ে আছে। পাথরের কব্জা, পিতলের হুড়কো–কোনোটাই আর নেই আগের জায়গায়।

রিভলভার হাতে নিয়ে দরবার-কক্ষে হাজির হলাম আমরা। কেউ নেই, অন্ধকারে ডুবে আছে বিশাল ঘরটা। মোড় নিলাম বাঁ দিকে, আরও কয়েকটা বড় বড় ঘর পার হলাম; বেশ কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাটার প্রথম চিহ্ন দেখতে পেলাম শেষের ঘরটায়, যে-ঘর পার হলে হাজির হওয়া যায় প্রাসাদের সদর-দরজায়। মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্ত, এককোনায় পড়ে আছে বিশাল এক তরবারি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা, আবার ছুট লাগাতে যাচ্ছিল অলিভার, কিন্তু আবারও থমকে দাঁড়াতে হলো আমাদেরকে। মাংসাশী প্রাণীর হামলায় আহত হরিণ যেভাবে ছুটে বের হয় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠিক সেভাবে বের হয়ে এসেছে একটা লোক। আমাদেরকে দেখে থামা তো পরের কথা গতি আরও বাড়ল ওর, একটা হাত শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালাল সে। বুঝলাম, মারাত্মক আঘাত পেয়েছে সে হাতে।

রানি মাকেডার খাস-কামরার দিকে এগিয়ে গেছে যে-করিডোর, সেখান গিয়ে হাজির হলাম আমরা। মৃত আর মুমূর্ষু সৈন্যদের স্তূপ চারপাশে, ওদেরকে টপকে আগে বাড়তে হচ্ছে। এরকম সময়ে চোখে পড়ার কথা নয়, তারপরও দেখতে পেলাম একজন মৃত সৈন্য এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে ফিল্ড-টেলিফোনের ছেঁড়া তার।

তলপেটে সুড়সুড়ি টের পাচ্ছি, বুকের ভিতরটা মোচড়াচ্ছে কেন যেন। ছুটতে চাইলেও ছুটতে পারছি না, কেউ বাধা না-দিলেও ধীর গতিতে এগোতে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রানি মাকেডার সহচরীদের কামরার সামনে যে-

ছোট ঘরটা আছে, তিনজনে উপস্থিত হলাম সেখানে। লণ্ঠনের আর দরকার নেই, বেশ উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ভিতরে; সেই আলোতে যা দেখলাম তা বোধহয় এই জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারবো না।

মেঝেতে পড়ে আছে আরও কয়েকজন সৈন্যের লাশ। সেনাপতি যশুয়ার আলাদা একটা দেহরক্ষীবাহিনী আছে, এদের পরনে ওই বাহিনীর উর্দি। পিছনে, একটা চেয়ারে বসে আছে আমাদের সার্জেন্ট কুইক। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ওর শরীর, বড় একটা তীর ঢুকে আটকে আছে ওর ডান কাঁধে। এখনও মরেনি বেচারা, চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, আর একটা ভেজা কাপড় দিয়ে ওর কপালটা বার বার মুছিয়ে দিচ্ছেন রানি মাকেডা। কুইকের শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বোলালাম আরেকবার। ওর সেই ক্ষতগুলোর বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এই বুড়ো বয়সে অতখানি মানসিক জোর আর নেই আমার।

কাছেই, একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহাক্লান্ত হিগস। গুরুতর কোনো আঘাত পায়নি সে, কিন্তু অক্ষত নেই ওর শরীরও—রক্তে ভিজে গেছে জামা, কোনো কোনো ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে এখনও। রানি মাকেডার পিছনে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দু'-তিনজন ঘনিষ্ঠ সহচরী; দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপ করে কাঁদছে সবাই।

থমকে দাঁড়িয়ে গেছি আমরা, দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি আসলে, কারণ ওই পরিস্থিতিতে মাথা কাজ করছিল না আমাদের কারোরই। একদল আরেকদলের দিকে তাকিয়ে আছি অপলক দৃষ্টিতে, যেন অনেক অনেক দিন পর দেখা পেয়েছি প্রিয়জনের।

রানি মাকেডাও স্তব্ধ হয়ে গেছেন, কুইকের কপাল মুছিয়ে দেয়া থামিয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছেন অলিভারের দিকে, কিছু একটা হয়েছে টের পেয়ে অত্যন্ত ধীরে চোখ খুলল মুমূর্ষু কুইক, একটা হাত বহু কষ্টে উঁচু করে সম্ভাষণ জানাল আমাদেরকে।

দেখলাম, তরবারির আঘাতে ওর হাতটা বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর খুব ধীরে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। স্পর্শ করল নিজের গলা, বোঝাতে চাইল কথা বলা আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে। তারপর, যতদূর বুঝলাম, শেষবারের মতো স্যালুট করার চেষ্টা করল অলিভারকে, সে যা করল সেটাকে স্যালুট না-বলে কী বলা যায় তা হয়তো আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে আরও ভালো বলতে পারত, কিন্তু হলো না—প্রায় দ্বিখণ্ডিত হাতটা তুলতে পারল না সে কপালের কাছে। বরং একটা আঙুল উঁচু করতে পারল, ইঙ্গিতে রানি মাকেডাকে দেখিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইল অলিভারকে; তারপর, মরার আগে একজন খাঁটি বীর যেভাবে মরে ঠিক সেভাবে বিজয়ীর মুচকি-হাসি দিয়ে কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল চেয়ারের উপর। নড়ল না আর; বুঝলাম, মারা গেছে আমাদের সার্জেন্ট স্যামুয়েল কুইক।

এরপর কী হয়েছিল ঠিকমতো মনে নেই আমার। হতে পারে অতি উত্তেজনা আর পরিশ্রমে কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি, আবার এমনও হতে পারে কুইককে হারানোর বেদনা সইতে না-পেরে পুরোপুরি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আমার দৃষ্টি। আবার দুটোই হতে পারে। তবে যা-ই হোক, যখন সামনে তাকালাম তখন দেখি আমাদের সবার উপস্থিতিতেই অলিভারকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন রানি মাকেডা; ছোট বাচ্চাদের যেভাবে বোঝাই আমরা, করুণ কণ্ঠে সেভাবে বোঝাচ্ছেন ওকে, 'ওই যে, ওখানে ওই মানুষটা যে মরে পড়ে আছে না? ওই মানুষটা আজ দেখিয়ে দিয়ে গেল কীভাবে মরতে হয়। তোমাদের দেশে যদি কখনও কোনো বীর জন্মে থাকে তা হলে ওই মানুষটাই সেই বীর। এমন একজনের দেখা পেলাম আমি যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কোনো কিছু থেকে।'

boiRboi.net

'কী হয়েছিল?' চোখের পানি মুছতে মুছতে হিগসকে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'যা আশঙ্কা করেছিলাম আমরা তা-ই,' বলল হিগস। 'এখানে এসে হাজির হলাম আমরা। তোমাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম। তারপর তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন রানি। একসময় লাইন কেটে দিলে তুমি, বললে জ্যাফেট নাকি ফিরে এসেছে, ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। তারপর রাত দশটার দিকে, খুব ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ পাই আমরা। ঘটনা কী দেখার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন এখানে একা হাজির হয় যগুয়া। বলে, হারম্যাকের মূর্তিটা নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে। ওকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন রানি, কিন্তু তাঁকে সে-সুযোগ না-দিয়ে বলে সে, "রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে" ওই মুহূর্তে রানিকে যেতে হবে ওর সঙ্গে, যগুয়ার প্রাসাদের। ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন রানি, তখন নাছোড়বান্দার মতো জোরাজুরি করতে থাকে সে। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম, কিন্তু আর সহ্য করতে পারলাম না—লাথি মেরে হারামিটাকে বের করে দেয়ার জন্য এগিয়ে যাই। মোটকুটা পালায় তখন, ওর আর দেখা পাইনি আমরা। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসতে শুরু করে আমাদের দিকে। বুঝতে পারি আক্রান্ত হয়েছি আমরা, প্যাসেজের ওই প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে হামলাকারীরা। তীরে কোনও ক্ষতি হয়নি আমাদের, কারণ নিরাপদ আড়ালে লুকিয়ে পড়ি আমরা। তখন মুখোমুখি লড়াই করার জন্য আমাদের দিকে ছুটে আসে একদল সৈন্য। সবাই বলছিল—"বিদেশিদেরকে মারো, মুরের গোলাপকে বাঁচাও।"

'গুলি করতে বাধ্য হই আমরা তখন। কাছের টার্গেট, তাই সহজেই লাশ হয়ে যায় ওদের অনেকে। কিন্তু তখন একটা তীর এসে ঢোকে কুইকের কাঁধে। তারপরও লড়াই চালিয়ে যায় সে। এরকম তিনদফা হামলা চালায় ওরা আমাদের উপর, তিন বারই

ওদেরকে পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হই আমরা। কিন্তু ততক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে আমাদের বুলেট। রাইফেল ফেলে রিভলভার নিই আমরা। সুযোগ পেয়ে যায় ওরা, আরও কাছে এসে পড়ে। তারপর আবার একযোগে হামলা চালায় আমাদের উপর।

'তখন বলতে গেলে পাগল হয়ে যায় কুইক। কাছেই মরে পড়ে থাকা এক আবাটি সৈন্যের হাত থেকে একটা তলোয়ার নেয় সে, ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এতগুলো লোকের উপর। ওর তেজ দেখে ঘাবড়ে যায় কাপুরুষগুলো, এতজন মিলেও সুবিধা করে উঠতে পারে না ওর বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় কুইক, আর নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়। ওর পিছনে ছিলাম আমি; কত বড় আত্মত্যাগ করে গেছে সে ভেবে দেখুন একবার—তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে অবশিষ্ট সবগুলো বুলেট দিয়ে গেছে আমাকে, যাতে আমার দিকে আসতে না-পারে কোনো সৈন্য। ওর পিছনে থেকে গুলি করতে করতে আগে বাড়ি আমি, তাই আমার তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

'যা-হোক, কুলাঙ্গারের দল এঁটে উঠতে পারল না কুইকের সঙ্গে, ঢাল-তলোয়ার ফেলেই পালাল, আর এদিকে মারাত্মক আহত অবস্থায় নেতিয়ে পড়ল কুইক। রানির সহচরীদের সাহায্যে ওকে বহন করে এখানে নিয়ে এলাম আমি, বসিয়ে দিলাম ওই চেয়ারে। তারপর থেকে আর একটা কথাও বলেনি কুইক। তারপর তো...আপনাদের সবার চোখের সামনে মারা গেল বেচারা...' চশমা সরিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল হিগস। 'আমার সৌভাগ্য, মরার আগে অন্তত একজন বীরকে দেখে যেতে পারলাম স্বচক্ষে।'

আমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে তুললাম কুইকের মরদেহটা, নিয়ে গেলাম রানির খাসকামরায়। রানি বললেন তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে যে-মানুষটা জীবন দিয়েছে তার মরদেহ রানিরই

খাটে রাখতে হবে, তাই সেখানে নামিয়ে রাখলাম আমরা কুইককে।

কথা শুনে আর কাজ দেখে এতদিন নির্দয় মনে হতো এই লোকটাকে, কিন্তু আজ জানলাম কত বড় বীর সে, কত লড়াকু একজন সৈনিক। ওর সারা শরীরে রক্ত, এমনকী চেহারাতেও; কিন্তু তারপরও অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে, মনে হচ্ছে মরে গিয়ে স্বর্গীয় এক শান্তি পেয়েছে যেন সে। মরার আগে খুব অস্থিরতায় ভুগছিল বেচারা, কিন্তু এখন যেন পরম নিশ্চিন্তে রানি মাকেডার খাটে ঘুমাচ্ছে সে জীবনের শেষ ঘুমটা।

মনে পড়ে, রানি মাকেডার ওই খাটটা ছিল এককথায় দারুণ। রাজকীয়, জমকালো। কালো কাঠ দিয়ে বানানো, সোনার কাজ করা জায়গায় জায়গায়। খাটের চারদিকে ধবধবে সাদা মশারি, সেই মশারির এখানে-সেখানে সোনার ছোট ছোট তারা লগানো যে-রকম তারা রানির নেকাবে দেখা যায়। বালিশগুলোয় সুগন্ধী মাখানো, চাদরটা অতি-নরম রেশমের। সেই খাটে নামিয়ে রাখলাম আমরা আমাদের বিশ্বস্ত আর অকপট সঙ্গীকে। বুকের উপর হাত দুটো ভাঁজ হয়ে আছে ওর, যেন মরার পরও প্রার্থনা করছে পরম করুণাময়ের কাছে।

এরপর ঘটনাক্রমে ওর চেহারা দেখার সুযোগ আর হয়নি আমাদের। তবে আজও স্মৃতির আয়নায় দেখি মানুষটাকে—একজন বীর যোদ্ধা; সমরে, নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে, মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে যে।

যা-হোক, কুইকের প্রতি শেষ-শ্রদ্ধা জানিয়ে রানির খাসকামরা থেকে বাইরে বের হলাম আমরা সবাই। ফিরে এলাম একেবারে সামনের ওই ছোট ঘরটায়। হিগসের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করলাম। তরবারির খোঁচায় কিছুটা কেটে গেছে ওর মাথার চামড়া, চেহারার একপাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে একটা তীর, আর

উরুতে বিঁধেছে কিন্তু গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারেনি একটা বর্শা। ভালোমতো দেখলাম ওর ক্ষতগুলো, কিন্তু কোনোটাই গভীর বা গুরুতর বলে মনে হলো না আমার কাছে।

সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা সেরে নিলাম আমরা সেখানে।

'বন্ধুরা,' বললেন রানি মাকেডা, প্রেমিকের বাহুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, 'এখানে থাকাটা আর নিরাপদ না আমাদের জন্য। আমার চাচা যশুয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে আপাতত, কিন্তু যতদূর চিনি তাঁকে তাঁর ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে যাবে না এখানেই। আমাকে মুঠোর মধ্যে না-পাওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা ক্ষতি করে যাবেন তিনি। করতেই হবে তাঁকে কাজগুলো, কারণ মুরের সাধারণ জনগণ যদি জানে তাঁর এই হামলার কথা তা হলে বিপদ হবে তাঁর। তার সবচেয়ে বড় শক্তি কোথায় জানেন? যত বড় কাপুরুষই হোক না কেন, মুরের পুরো সেনাবাহিনী তাঁর হাতে। কাজেই আবার ফিরে আসবেন তিনি, হয়তো রওনা হয়ে গেছেন ইতোমধ্যে, এমনও হতে পারে এবার এক হাজার সৈন্য আছে তাঁর সঙ্গে।'

'তোমার পরিকল্পনাটা কী?' আমাদের সবার সামনেই ভাব-ভালোবাসার বিনিময় হয়ে গেছে, তাই আর ভণিতা করে আপনি বলে সম্বোধন করছে না অলিভার রানি মাকেডাকে, 'উড়ে পালিয়ে যাবে মুর থেকে?'

'কীভাবে উড়াল দেবো? এখান থেকে বের হওয়ার যত রাস্তা আছে সব পাহারা দিচ্ছে যশুয়ার লোকরা। কিছু কিছু গোপন পথ আছে যা হয়তো শুধু আমি একাই চিনি, কিন্তু সেগুলো দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না তোমাদেরকে, কারণ একসঙ্গে এতজন লোক চলতে পারবে না ওই রাস্তা দিয়ে। আর ধরো,' রানি মাকেডাও তুমি বলে সম্বোধন করছেন অলিভারকে, 'কোনো না কোনোভাবে বের হলাম আমরা মুর থেকে, বাইরে হিংস্র হায়েনার মতো অপেক্ষা করছে ফাংরা—তোমাদেরকে পাওয়ামাত্র ছিঁড়ে ফেলবে

ওরা। বিপদের এখানেই শেষ না। সাধারণ আবাটিরা ঘৃণা করে তোমাদেরকে, জানো? তোমাদের নামে আজেবাজে কথা বলে এই ঘৃণা ওদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যশুয়ার গুপ্তচররা। যে-কাজের জন্য এসেছিলে তোমরা এখানে তা শেষ হয়েছে, এখন আর ফুটো-কড়ির সমানও দাম নেই তোমাদের এই দেশের জনগণের কাছে। মওকামতো পেলে হয় ধরিয়ে দেবে তোমাদেরকে যশুয়ার লোকদের হাতে, কিংবা স্রেফ খুন করে ফেলবে। আফসোস! কেন যে তোমাদেরকে এই হতচ্ছাড়া কাজের জন্য নিয়ে এলাম এখানে! না-এলেই ভালো করতে, তোমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ত না। এদেশের বেশিরভাগ মানুষই মিথ্যুক, ষড়যন্ত্র করার মধ্যে ওস্তাদ, আর অকৃতজ্ঞ,' বলে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি, আর অসহায়ের মতো একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলাম আমরা।

এতক্ষণ কুইকের শোকে ঘরের এককোনায় বসে কাঁদছিল জ্যাফেট, এবার কান্না থামিয়ে চোখ মুছে আমাদের দিকে এগিয়ে এল সে, ওদের দেশীয় রীতি অনুযায়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সম্মান জানাল রানি মাকেডাকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহামান্য ওয়ালদা নাগাসটা, আপনার এই অধম চাকরের কথা একটাবার কি শুনবেন?'

কান্না থামিয়ে ওর দিকে তাকালেন রানি।

'এখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে, মুর থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তার মুখে, পাঁচশ' পাহাড়ি-লোকের একটা দল অবস্থান করছে। ওখানে ছাউনি ফেলে আছে ওরা গত কয়েকদিন থেকে। রাজকুমার যশুয়া আর তাঁর আজ্ঞাবহ সবাইকে ঘৃণা করে ওরা। আপনি যদি বলেন, পথ দেখিয়ে ওদের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে পারি আমি। আপনাদের কোনো উপকার করতে পারুক বা না-পারুক, অন্তত আপনাদের কোনো ক্ষতি করবে না ওরা। আর আমাকে ভালো জানে ওরা, আমি বলে দিলে সবসময় আপনার

অনুগত হয়ে থাকবে লোকগুলো। তখন যা আপনার কাছে ভালো বলে মনে হয় তা-ই করবেন আপনি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অলিভারের দিকে তাকালেন রানি মাকেডা।

'প্রস্তাবটা ভালো,' বলল অলিভার। 'এই অরক্ষিত জায়গায় যে-অবস্থায় আছি আমরা, পাহাড়ি লোকদের কাছে গেলে অন্তত তার চেয়ে নিরাপদে থাকতে পারবো। ...তোমার সহচরীদের বলো আমাদের সবার জন্য আলখাল্লা নিয়ে আসতে। চেহারা এমনভাবে ঢেকে বাইরে বের হতে হবে যাতে দেখামাত্র আমাদেরকে চিনতে না-পারে কেউ।'

নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সদর দরজার দিকে গেলাম না আমরা; প্রাসাদের পার্শ্বদরজা খোলাই ছিল, এগোলাম সেদিকে। টানাসেতুটা দেখলাম নামানো, তার মানে ওই সেতু ব্যবহার করেই প্রাসাদে এসেছিল যশুয়ার অনুগত বাহিনি, আবার ওই সেতু ধরেই পালিয়ে গেছে ওরা।

আমাদের পরনের আলখাল্লাগুলোয় সন্ন্যাসীদের মতো হুড আছে; হঠাৎ করে কেউ যদি দেখে আমাদেরকে তা হলে সাধারণ আবাটি বলে মনে করবে, কারণ আবাটিরা রাতের বেলায় অথবা আবহাওয়া ঠাণ্ডা-ভেজা হলে এরকম কাপড় পরে। যা-হোক, শহরের মাঝখানে বিশাল যে-খোলা জায়গাটা আছে, জ্যামিতিক হিসেবে যে-জায়গাটা বিশাল এক বর্গগজের মতো, সেখানে হাজির হলাম আমরা ত্রস্তপায়ে। ভেবেছিলাম কারও সঙ্গে দেখাই হবে না হয়তো, কিন্তু প্রাসাদে হামলার খবর পেয়ে গেছে মুরের জনতা, দলে দলে এসে জড়ো হয়েছে ওরা খোলা জায়গাটায়। পুরুষ, নারী, শিশু—বাদ যায়নি কেউই। কী হয়েছে সে-ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা নেই কারোরই, তাই হইচই শুরু হয়ে গেছে; দূর থেকে সম্মিলিত এই গুঞ্জন শুনে গাছের-ডালে-থাকা একদল বানরের কিচিরমিচিরের কথা মনে পড়ে গেল আমার। খেয়াল করলাম, প্রাসাদের পিছনে অবস্থিত একটা পর্বতচূড়ার দিকে

ইঙ্গিতে কী যেন দেখাচ্ছে ওরা বার বার; পাঠকদের মনে আছে কি না জানি না, বিশাল ওই পর্বতটা এক সুরক্ষাপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহরটার জন্য।

আরেক আপদে পড়লাম আমরা। জনতাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, আবার ওদের মধ্যে গিয়ে হাজির হওয়াটা কতখানি নিরাপদ হতে পারে বুঝতে পারছি না। তাই এককোনায় সরে গেলাম আমরা; খোলা জায়গাটার একধারে ঘন হয়ে গজিয়ে আছে বেশ কিছু গাছ, ওগুলোর নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম সবাই। এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো একদল সৈন্য, জনতাকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে-গুঁতো দিয়ে পথ করে নিল নিজেদের জন্য। ঘন ছায়ার মধ্যে আরও সরে এলাম আমরা এবার, ভয় হলো উচ্চতা দেখে অলিভারকে না আবার চিনে ফেলে ওদের কেউ। থেমে দাঁড়ালাম, কারণ এই আড়াল ছেড়ে বের হলে জনতা বা সৈন্য যে-কারোরই চোখে পড়ে যাবো; ঘুরে তাকালাম পর্বতচূড়ার দিকে যেদিকে ইঙ্গিতে বার বার দেখাচ্ছে লোকজন।

এতক্ষণ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ, মেঘ সরে গেল, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারদিক। আর সেই আলোয় যা দেখলাম তা ভয়ঙ্কর যে-কোনো দৃশ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্রাসাদের ঠিক পিছনে যে-পাহাড়ি দেয়াল তার উচ্চতা কম করে হলেও একশ' পঞ্চাশ ফুট। ওটার চূড়ার কাছে একটা প্রান্ত, সম্ভবত প্রাকৃতিক কারণেই, বাইরের দিকে বেঁকে গিয়ে অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো আকার ধারণ করেছে। আবাটিরা এই পাহাড়টাকে ডাকে "সিংহ-পাহাড়" নামে, কিন্তু এতবার দেখেছি তারপরও সিংহের সঙ্গে কোনোদিক দিয়েই কোনো মিল খুঁজে পাইনি আমি ওই পাহাড়টার। যা-হোক, এখন অন্যরকম হয়ে গেছে ব্যাপারটা, কারণ বাইরের দিকে বেঁকে মুরের দিকে ঝুঁকে থাকা অংশটার মাথায় বসে আছে আরেকটা বিশাল মাথা—

ফাংদের সিংহ-দেবতা হারম্যাকের মাথা। এরকম পূর্ণিমা চাঁদের আলোয়, বিশাল এক শৈলান্তরীপের পটভূমিতে, দূর থেকে দেখে পাহাড়টাকে পাহাড় বলে মনে হচ্ছে না; বরং মনে হচ্ছে হারম্যাকের মূর্তিটাই যেন স্থানান্তরিত হয়ে হাজির হয়ে গেছে এখানে।

'ওহ্! ওহ্! ওহ্!' চাপাকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্যাফেট, 'ফাংদের ওই ভৌতিক মূর্তিটা শেষপর্যন্ত হাজির হয়ে গেছে এখানে!'

'গাধা!' ফিসফিস করে ধমক দিল হিগস, 'বলো ওই নিষ্প্রাণ মূর্তিটার মাথাটা এখানে নিয়ে এসেছি আমরা, তা-ও আবার স্রেফ বাতাসের ধাক্কায়। ভয় পেয়ো না, ওটার যদি চলার ক্ষমতা থাকত তা হলে অনেক আগেই হাজির হতে পারত; আজ কাজে লেগেছে আমাদের "ওষুধ", মূর্তিটার ধড় রয়ে গেছে হারম্যাকে, মুণ্ডু চলে এসেছে এখানে।'

'হ্যাঁ,' হিগসের সঙ্গে তাল মেলালাম আমি, 'গুহার ভেতরে থাকার সময় ভারী কিছু পতনের আওয়াজ পেয়েছিলাম; সেই ভারী কিছুটাই হচ্ছে হারম্যাকের মাথা।'

'মাথাটা কে এনেছে কীভাবে এনেছে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার,' সোজা জানিয়ে দিল জ্যাফেট, 'আমি শুধু জানি মাথাটা এসেছে এখানে এবং মুরবাসীদের দিন এবার শেষ—আজ বাদে কাল আমাদের শহর দখল করবে ফাংরা, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে সব।'

'সেটাই হওয়া উচিত,' মন্তব্য করল ঠোঁটকাটা হিগস, 'তা হলে উচিত শিক্ষা হবে এদেশের লোকদের। আরও একদিক দিয়ে ভালো হবে—মাথাটার নিখুঁত একটা হিসেব নিতে পারবো আমি, তার ফলে জানতে পারবো মূর্তিটা আসলে কত বড় ছিল।'

রানি মাকেডার দিকে তাকালাম। কাঁপছেন তিনি। ভয়ে, নাকি উত্তেজনায় বুঝতে পারলাম না। হাজার হোক মেয়েমানুষ, তার

উপর আধুনিক শিক্ষার স্পর্শ পাননি—তিনিও বোধহয় ভাবছেন হারম্যাকের মাথা হাজির হওয়ার ঘটনাটা খারাপ কোনোকিছুর ইঙ্গিত বহন করে। চুপ করে আছে অলিভারও, কী ভাবছে আপনমনে সে-ই ভালো জানে।

উত্তেজিত জনতার টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে আমাদের কানে। জ্যাফেটের মতোই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সবাই, তাই পর্বতের চূড়ার ওই মুণ্ডুটা দেখে ঘাবড়ে গেছে। সবার কথাই মোটামুটি এক—এবার খারাপ কিছু ঘটবেই ঘটবে মুরে, কারণ হারম্যাক যেখানে যায় সেখানে গিয়ে হাজির হয় ফাংরা, তার মানে যেভাবেই হোক এই দেশে হাজির হবে ওরা, এবং তারপর তছনছ করে দেবে সব। আর সবকিছুর জন্য আমরা চার বিদেশিই দায়ী। আমরা নাকি যাদুকর, তাই যেভাবে ধ্বংস করে দেয়ার কথা ছিল মূর্তিটাকে সেভাবে ধ্বংস করতে পারিনি, আরও বাড়িয়ে দিয়েছি কাজ—বাতাসের শক্তি কাজে লাগিয়ে মাথাটা নিয়ে এসেছি পর্বতের চূড়ায়।

জনতার এই অভিযোগ যদিও অসত্য, কিন্তু পুরোপুরি অবাস্তব নয়। আরও পরে আমরা জানতে পারি, বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কাটা ছড়িয়ে না-পড়ে মূর্তির ভিত্তি থেকে শুরু হয়ে ভিতরের শূন্যস্থান ধরে গিয়ে হাজির হয় মূর্তির ঘাড়ে। ওই জায়গাটা ছিল মোটামুটি নিরেট, তাই মুহূর্তের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মাথাটা। টুকরো টুকরো হওয়ার বদলে জায়গায় জায়গায় ভেঙে যায় মূর্তিটা, আর মাথাটা উড়াল দেয় বাতাসে খেলনার মতো; অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এতদূর "ভ্রমণ" করে অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই এসে পড়ে রানির প্রাসাদের পিছনের পাহাড়ে। জানি আর কেউই কোনোদিন হয়তো সরাবে না ওই মাথাটাকে ওখান থেকে, যুগের পর যুগ ধরে ওখানেই থাকবে ওটা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললাম আমি, 'বিস্ফোরণের ধাক্কাটা আরেকটু জোরে লাগলে আরও দূরে এসে হাজির হতো মাথাটা,

তার মানে সোজা গিয়ে পড়ত রানির প্রাসাদের উপর।'

'যদি তা-ই হতো,' কম্পিত কণ্ঠে বললেন রানি মাকেডা, 'তা হলে আমি ধন্যবাদ জানাতাম ঈশ্বরকে। কারণ তখন আমার সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারতাম আমি। ...চলুন বন্ধুরা, আমাদেরকে কেউ দেখে ফেলার আগেই নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যেতে হবে।'

সতেরো

সাধারণ আবাটিদের নিয়ে যে-সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলাম, ওরা যে-জায়গায় ছাউনি ফেলেছে, সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন। পথ চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভুল হিসেব এবং যশুয়ার ষড়যন্ত্রের ফলে রাতারাতি কীভাবে বদলে গেছে মুর শহর আর তার আশপাশের জায়গাগুলো। আগে যেখানে একাধিক প্রহরী থাকত এখন খাঁ খাঁ করছে সেসব জায়গা, আগে যেখানে রণসাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত একদল সৈন্য এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের সঙ্গে গল্প করছে কয়েকজন অফিসার, আর আগে যেখানে অফিসাররা বিশ্রাম নিত এখন সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসে দেদারসে মদ গিলছে নিম্নপদস্থ কয়েকজন সৈন্য। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না কেউই, বিহ্বল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার মতোও কেউ নেই—নিরাপত্তার কথা ভেবে রানি নিজেই পালাচ্ছেন এখন, বুঝতে পারছি তাঁর শূন্যস্থান অচিরেই পূরণ করবে যশুয়া, তখন আমাদের কী হবে ভাবতে গিয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার।

boighar

এই হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা আর উত্তেজনা একদিক দিয়ে কাজে লাগল আমাদের। কেউ দেখতে পেল না আমাদেরকে, অথবা দেখতে পেলেও এগিয়ে এসে বা পথ রোধ করে কিছু জিজ্ঞেস করল না। শেষপর্যন্ত জ্যাফেটের সেই পাহাড়ি-লোকদের বাহিনী যেখানে ছাউনি ফেলেছে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম আমরা।

বর্ণনার সুবিধার্থে এই লোকগুলোকে "পাহাড়ি লোক" বলে সম্বোধন করছি বার বার, আসলে এদের বেশিরভাগেরই জীবিকা কিন্তু ছাগল পালন করা। পাহাড়ের ঢালে কিংবা আরও উঁচু জায়গায় ছাগল চরায় এরা। হতদরিদ্র সবাই, পাহাড়ের ঢালে কোনোরকমে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকে। মূল শহর থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন, কারণ শহর থেকে বের হয়ে আরও কিছুদূর এগোনোর পর যে-জায়গা থেকে পার্বত্য এলাকা শুরু হয়েছে সে-জায়গা থেকেই এদের "রাজত্ব" শুরু। মুরের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ নেই এদের; এরা ওদের চেয়েও আদিম, আর স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত পরিশ্রমী। আর সে-কারণেই ভালো কিছু গুণ, যেমন সাহস বা আনুগত্য এখনও রয়ে গেছে ওদের মধ্যে।

মুরে ঢোকার একমাত্র পাহাড়ি রাস্তাটা পাহারা দিচ্ছে যশুয়ার অনুগত লোকরা, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সদস্যরা, আর যেসব জায়গায় গোপন পথ আছে বলে অনুমান করেছিল সে সেসব জায়গার দায়িত্বে আছে এই পাহাড়ি লোকরা। কারণ একটাই—এদের সাহস। যশুয়া ভালোমতোই জানে হামলা করলে ওই দুর্গম পথ দিয়ে আসবে না ফাংরা, গোপন কোনো পথ ধরেই হাজির হবে মুরে, তাই জানবাজ যোদ্ধাদেরই বসিয়ে রেখেছে সে জায়গামতো। পরাধীনতা কোনোদিনও মেনে নেবে না এই লোকগুলো, বরং বীরের মতো লড়াই করে মরবে, আর এজন্য অনেক আগে থেকেই ওদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন রানি মাকেডা, গড়ে তোলেন পাহাড়ি লোকদের আলাদা একটা বাহিনী।

এই লোকগুলোকে শহরের বাইরে মোতায়েন করার আরও একটা কারণ থাকতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে পরে বুঝলাম, এরা রানির অনুগত; রানির প্রাসাদে হামলা হয়েছে শুনলে ডানে-বাঁয়ে না-তাকিয়ে সোজা ছুটে আসবে, স্রেফ কচুকাটা করে ফেলবে আক্রমণকারীদের। বংশানুক্রমিক সংস্কার আর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মুরের রানিদের অতিমানবীয় কিছু একটা বলে মনে করে এই সহজ-সরল লোকগুলো।

এই পাহাড়ি লোকগুলোর দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র টের পেলাম মুরের সাধারণ জনগণের সঙ্গে এদের কত পার্থক্য। এ-পর্যন্ত যে এসেছি, আবাটিদের অনেকেই দেখেছে আমাদেরকে, কিন্তু থামায়নি, কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। এবার আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল কয়েকজন লোক। সামনে এগিয়ে গেল জ্যাফেট, ওই লোকগুলোর নেতার কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। শুনে একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর আলখাল্লা পরা, হুডে মাথা ঢাকা আর নেকাবে মুখ ঢাকা রানি মাকেডাকে স্থানীয় কায়দায় স্যালুট করল। অনতিদূরে আগুন জ্বলছে, আর ওখানে একসঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে এই পাহাড়ি লোকগুলোর নেতা এবং আরও কয়েকজন "গণ্যমান্য" লোক; আমাদেরকে সসম্মানে সেদিকে নিয়ে গেল এই লোকটা। দূর থেকেই কিছু একটা ইঙ্গিত করল সে, দেখে উঠে দাঁড়াল নেতা লোকটা এবং সঙ্গের লম্বা ধূসর দাড়িওয়ালা এক বুড়ো লোক।

আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল নেতা, 'মাফ করবেন, আপনাদের চেহারা দেখাতে হবে আমাদেরকে। তা না হলে শুধু মুখের কথা বিশ্বাস করতে পারবো না।'

মাথার হুড ফেলে দিলেন রানি মাকেডা, ঘুরে তাকালেন লোকটার দিকে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো গিয়ে পড়ল যেন আরেক পূর্ণিমার চাঁদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বুড়ো

লোকটা, বলল, 'রানি! ওয়ালদা নাগাসটা! আদেশ করুন!'

'তোমার লোকদের ডাকো,' বললেন রানি। 'তারপর সবার সামনে যা বলার বলবো আমি।' জ্বলন্ত আগুনের পাশে একটা কাঠের বেঞ্চ, সেটার উপর বসে পড়লেন তিনি, বোধহয় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা তিন জন আর জ্যাফেট দাঁড়িয়ে থাকলাম তাঁর পিছনে।

বলতে গেলে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল নেতা আর বুড়ো লোকটা। মোটামুটি একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল চারদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সামনে জড়ো হলো পাঁচ শতাধিক পাহাড়ি আবাটি। তারপর বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন রানি মাকেডা, নেকাব খুলে ফেললেন চেহারা থেকে যাতে প্রত্যেকে স্পষ্ট দেখতে পায় তিনি কে এবং বলতে শুরু করলেন, 'আমার দেশের পাহাড়ি যোদ্ধারা, আপনারা হয়তো জানেন আজ রাতে ধ্বংস হয়ে গেছে ফাংদের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিটা। কিন্তু এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই আমার চাচা যশুয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমার সঙ্গে, এই দেশ আর জনগণের সঙ্গে। আমার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হন তিনি, আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, হ্রদের শেষপ্রান্তে তাঁর যে-দুর্গ আছে সেখানে যেতে বলেন আমাকে তাঁর সঙ্গে। জানি না কী ইচ্ছা ছিল তাঁর–হয়তো খুন করে ফেলতেন আমাকে, অথবা কয়েদ করে রাখতেন সারাজীবনের জন্য। যুক্তি দেখান তিনি, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আর নিজের নিরাপত্তার জন্যই নাকি কাজটা করা উচিত আমার।'

মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা গেল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্য থেকে।

হাত তুললেন রানি, থেমে গেল গুঞ্জন। বলে চললেন তিনি, 'মুখের উপর চাচা যশুয়াকে বিশ্বাসঘাতক বললাম আমি তখন। আরও বললাম, আমার প্রাসাদ থেকে অনতিবিলম্বে চলে যেতে। আমাকে শাসাতে শাসাতে বিদায় নিলেন তিনি। আপনারা জানেন

আমার প্রাসাদের দরজায় সবসময় প্রহরী থাকে, চলে যাওয়ার আগে একজন কি দু'জন বাদে বাকি সবাইকে সরিয়ে নিলেন তিনি, তার মানে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন।' আমাদেরকে দেখালেন তিনি, 'এই বিদেশি লোকগুলো, যে-কোনোভাবেই হোক জানতে পারলেন আজ রাতে হামলা হবে প্রাসাদে। তাই তাঁদের মধ্য থেকে দু'জন, একজন যাঁকে আপনারা কালো জানালা নামে চেনেন, যাঁকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে ফাংদের কবল থেকে, আরেকজন যিনি একজন বীর যোদ্ধা, যাঁর নাম কুইক, চলে আসেন আমার প্রাসাদে, নিজেদের কথা না-ভেবে, শুধু আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য। ওদিকে অলিভার (সবার সামনে অসঙ্কোচে উচ্চারণ করলেন রানি নামটা) এবং ডাক্তার অ্যাডামস রয়ে গেলেন গুহার ভিতরে যাতে মূর্তিটা ধ্বংস করার জন্য ঠিক সময়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ পাঠাতে পারেন ফাংদের দেশে। তারপর আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন যশুয়া, বিনা বাধায় আমার প্রাসাদে ঢুকে পড়ল ওরা।

'কিন্তু আমাকে তুলে নিতে পারল না ওরা। কারণ কালো জানালা আর তাঁর সঙ্গী কুইক বীরের মতো লড়াই করলেন এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে। ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-তীর কোনোকিছুরই অভাব ছিল না যশুয়ার লোকদের, কিন্তু তারপরও রণকৌশলে পারল না ওরা দুই বিদেশির সঙ্গে। ওদের বেশিরভাগই পালাল, মারা গেল অনেকে, গুরুতর আহত অবস্থায় এখনও হয়তো কাতরাচ্ছে কেউ কেউ আমার খাসকামরার সামনে। কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বীর কুইক নিজে জখম হলেন মারাত্মকভাবে, এবং বেশ কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন তিনি। আমার আক্ষেপ ছিল, সাহসী লড়াকু বীর কোনো পুরুষ দেখার আগেই হয়তো বিদায় নিতে হবে এ-পৃথিবী থেকে, অনেক আগেই সেই আক্ষেপ থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি, (বোমা ফাটিয়ে ফাংদের তোরণ উড়িয়ে দিয়ে আমাকে আর কুইককে পালিয়ে

যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল অলিভার নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, আর সে-কথাটাই মনে করিয়ে দিলেন রানি সম্ভবত) আজ আরেকজন বীর দেখলাম। যে বীর মরেছেন বীরের মতোই, আর মরার আগে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন ওয়ালদা নাগাসটাকে, আপনাদের হাতে মান-সম্মানসহ তুলে দিয়ে গেছেন আপনাদের রানিকে। কালো জানালা নিজেও আহত হয়েছেন, দেখুন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা। হামলার খবর শুনে ছুটে আসেন অলিভার আর ডাক্তার অ্যাডামস, সঙ্গে আপনাদের ভাই জ্যাফেট—তিনজনই বলতে গেলে কোনোরকমে বেঁচে বের হয়েছেন ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া ওই গুহার ভিতর থেকে। কিন্তু ততক্ষণে থেমে গেছে প্রাসাদের ভিতরের লড়াই, পালিয়ে গেছে যশুয়ার লোকরা। ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করিনি আমি, তাই এঁদের সবাইকে নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে। এবার বলুন, পাহাড়ি যোদ্ধারা, আপনারা কি আমাকে রক্ষা করবেন না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সম্মিলিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল পাহাড়ি আবাটিরা, চারপাশের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হলো সেই আওয়াজ, 'কী করতে হবে শুধু আদেশ করুন আমাদেরকে। কী করতে পারি আমরা আপনার জন্য, ওয়ালদা নাগাসটা?'

পাঁচ শতাধিক লোকের এই দলটা কতগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত, আর প্রত্যেক উপদলের নেতৃত্বে আছে একজন করে অফিসার। সব ক'জন অফিসারকে আলাদা করে ডেকে নিলেন রানি মাকেডা, বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ করলেন সবার সঙ্গে, একে একে মত নিলেন সবার। কেউ কেউ প্রস্তাব দিল যশুয়া কোথায় আছে খুঁজে বের করা যাক, তারপর তৎক্ষণাৎ হামলা করা হবে ওর উপর, কারণ র‍্যাটল সাপের মাথা গুঁড়িয়ে দিলে লেজের ঝনঝনানি আপনাথেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

'আপনাদের সাহস দেখে ভালো লাগছে আমার,' সব শুনে বললেন রানি মাকেডা, 'কিন্তু ইচ্ছা হলেও কাজটা করতে পারবো

boiboi.net

না আমি এই মুহূর্তে। কারণ তাতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ফাংরা বলতে গেলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দরজায়, যে-কোনো মুহূর্তে হামলা করতে পারে আমাদের উপর, এই অবস্থায় নিজেরা নিজেরাই যদি খুনাখুনি করি আমরা তা হলে ফাংদের কাছে অবধারিতভাবে পরাজিত হতে হবে আমাদেরকে। আরেকটা কথা, আপনারা সংখ্যায় সব মিলিয়ে পাঁচশ' কিংবা তারচেয়ে কিছু বেশি, ওদিকে আবাটিদের পুরো সেনাবাহিনী আছে যশুয়ার নিয়ন্ত্রণে। এমনকী সাধারণ আবাটি জনগণও ওর পক্ষে, অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই বিদেশিদের বিপক্ষে। তার উপর ওদের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে, আমাদের কাছে তেমন কিছুই নেই। কীভাবে পরাভূত করবো আমরা ওদেরকে? আদৌ কি পরাজিত করা সম্ভব?'

'তা হলে কী করতে চান আপনি?' জানতে চাইল অলিভার।

'এই পাহাড়ি লোকদের নিয়ে ফিরে যেতে চাই প্রাসাদে। প্রথমে প্রাসাদটা দখল করতে চাই, তারপর দেশের জনগণের সমর্থন পেতে চাই। ওদের সামনে খুলে দিতে চাই যশুয়ার মুখোশ। দ্বিতীয় কাজটা কঠিন, কিন্তু অন্তত প্রাসাদ দখল করে রাখাটা অতটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না আমার।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি জানাল অলিভার। 'আমাদের সামনে আর কোনো পথও নেই আসলে। এক কাজ করা যেতে পারে–পালিয়ে যেতে পারি আমরা সবাই এই দেশ ছেড়ে। কিন্তু তা বোধহয় করবেন না আপনি, তা-ই না?'

প্রশ্নটা করা হয়েছিল রানি মাকেডাকে, শুনে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি অলিভারের দিকে, চোখে চোখে কথা হলো দু'জনার, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ওরা।

বুঝলাম, দেশের জনগণকে এত বড় বিপদের মধ্যে রেখে কিছুতেই ভালোবাসার মানুষের কাছে চিরতরে যাবেন না রানি মাকেডা। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজের যে-কোনো

স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেন নিজের দেশকে, দেশের মানুষদেরকে, অন্তত দেশের জনগণ তাঁর সঙ্গে যতক্ষণ না প্রতারণা করছে ততক্ষণ।

'তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে যাওয়াটাই আমাদের জন্য ভালো,' নীরবতা ভাঙল হিগস। 'কারণ আমার পা দুটো ভীষণ ব্যথা করছে। আর ঘুমও পাচ্ছে, চোখ খুলে রাখতে পারছি না।'

কী করতে হবে তা বুঝিয়ে বললেন রানি মাকেডা অফিসারদেরকে। আবারও একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, তবে সুশৃঙ্খলভাবেই ছাউনি গুটিয়ে নিতে শুরু করল পাহাড়ি লোকগুলো।

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি, তা ছাড়া কুইককে হারিয়ে, আমাদের এতদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের তেমন কোনো ফল না-দেখে আর আমার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে মনটাও মরে গেছে একেবারে। তীরভর্তি একটা তূণের উপর বসে পড়লাম তাই, আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম অলিভার আর রানি মাকেডার দিকে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আর কেউ নেই ওদের আশপাশে, কথা বলায় মগ্ন দু'জনে। আমার থেকে কিছুটা দূরে ঘাসের উপর বসে আছে হিগস; ঘুমে এত ঢুলছে সে যে, মনে হচ্ছে পড়েই যাবে। আমারও চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, এমন সময় হঠাৎ করেই বেড়ে গেল কোলাহল। সচকিত হয়ে দেখি, এক যুবককে পাকড়াও করেছে কয়েকজন পাহাড়ি লোক, গায়ে বর্শা ঠেকিয়ে নিয়ে আসছে আমাদের ক্যাম্পের দিকে।

তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না। না-করার কারণও আছে অবশ্য। একে তো শারীরিক-মানসিক অবসাদ, তার উপর মুরের এখন যা অবস্থা তাতে ওই যুবকের মতো গুপ্তচর হরহামেশা

গ্রেপ্তার হতে পারে যে-কোনো জায়গায়। দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যুবক সাধারণ আবাটিদের মতো নয়, তার মানে, ধরে নিলাম, কোনো দুঃসাহসী ফাং হবে হয়তো। চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল আবার, কিন্তু বিস্ময়ের একটা সম্মিলিত গুঞ্জন শুনে এবং তারপর হঠাৎ একটা থমথমে ভাব টের পেয়ে ভেঙে গেল আমার তন্দ্রা। বুঝতে পারলাম অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। উঠে দাঁড়ালাম, ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম যুবকের দিকে। এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না চেহারাটা, তা ছাড়া বেশ কয়েকজন পাহাড়ি লোক ঘিরে আছে ওকে। আমাকে এগোতে দেখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল পাহাড়ি লোকগুলো, কেউ কেউ আবার সম্মান দেখিয়ে কুর্নিশ করল। জানি না কেন, ওদের এই অভিবাদন ভালো লাগল আমার।

কাছাকাছি হওয়ার পর, প্রথমবারের মতো ভালো করে দেখতে পেলাম বন্দি যুবককে। বেশ লম্বা সে, অ্যাথলেটদের মতো সুগঠিত শরীর। পরনে আলখাল্লা, এ-অঞ্চলের লোকজন উৎসব-অনুষ্ঠানে সে-রকম আলখাল্লা পরে সাধারণত। সোনার বেশ মোটা একটা চেন ওর গলায়। মুর আর হারম্যাক—দু'জায়গাতেই বলতে গেলে দুর্যোগ চলছে এখন; এ-সময়ে এত জমকালো পোষাক গায়ে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার বুদ্ধি কে দিল এই যুবককে বুঝতে পারলাম না। এতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সে, এবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। চাঁদের আলো গিয়ে পড়ল ওর কালো চোখের উপর, উদ্ভাসিত হলো ওর অতি-সুদর্শন ফর্সা আর প্রায় গোল চেহারাটা, সুন্দর করে ছাঁটা কালো-দাড়িতে ভরা মুখটা এতক্ষণে দেখতে পেলাম আমি। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠতে হলো আমাকে।

আমার ছেলে রডরিক দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে!

তারপর কী হলো জানি না, কারণ খুশিতে সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। সংবিৎ ফিরলে দেখি, রডরিককে

জড়িয়ে ধরে আছি, আমাকে আলিঙ্গন করে রেখেছে সে-ও।

মনে পড়ে আজও, অ্যাংলো-স্যাক্সন ঢং-এ প্রথম যে-কথাটা বলেছিলাম ওকে, তা হলো, 'কেমন আছো? এখানে এলে কীভাবে?'

ভিনদেশী উচ্চারণে, অদ্ভুত কায়দায়, ধীরে ধীরে বলল সে, 'ভালো আছি, বাবা। পালিয়ে এসেছি এখানে।'

কখন যেন হিগস এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে, টেরও পাইনি, এখন দেখি রডরিকের সঙ্গে করমর্দন করছে সে; দু'জনে আবার বন্ধু হয়ে গেছে কি না!

'দেখে তো মনে হচ্ছে বিয়েটা সেরেই ফেললে, রডরিক?' ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল সে আমার ছেলেকে।

'ফাংদের রীতি অনুযায়ী,' ভুলে ভরা ইংরেজিতে বলতে লাগল রডরিক, 'অর্ধেক বিয়ে হয়ে গেছে আমার। এই যে দেখুন, এগুলো আমার বিয়ের পোশাক।'

'তা, তোমার বউ কোথায়?' আবারও জিজ্ঞেস করল হিগস।

'জানি না এবং জানতে চাইও না। তা ছাড়া মেয়েটা আমার বউ না, ওকে মন থেকে বিয়ে করিনি আমি, করতে চাইও না, জোর করে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে। আর ফাংদের নিয়মের কথা বললে, যে-কোনো রাজকীয় বিয়ে হতে দু'দিন সময় লাগে ওদের, মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষ হয়নি তাই। এই বিয়ে না-হওয়ায় আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হয়নি সম্ভবত। ইচ্ছা হলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে মেয়েটা, এবং আমি চাই অন্য কাউকেই বর হিসেবে বেছে নিক সে।'

'কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটল?' জানতে চাইলাম আমি।

'তেমন কিছুই না আসলে, বাবা। খাওয়া শেষ করে দু'জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি পুরোহিতের সামনে, কী সব আবোলতাবোল মন্ত্র পড়তে শুরু করেছেন তিনি কেবল, তখনই শুনি বিকট এক

শব্দ—বাজ পড়লে যেরকম আওয়াজ হয় অনেকটা সে-রকম। তাকিয়ে দেখি আকাশে উঠে গেছে আগুনের স্তম্ভ, হারম্যাকের মাথাটা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে সেই শিখায় ভর দিয়ে। উড়তে উড়তে একসময় হারিয়ে গেল মাথাটা, মানে আর দেখতে পেলাম না আমরা কেউই। তখন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, বলাবলি করতে লাগল, "সাদা মানুষদের যাদু! সাদা মানুষদের যাদু! পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে যে-দেবতা বসে ছিলেন আমাদের উপত্যকায় তাঁকে খুন করেছে সাদা মানুষরা। সব শেষ হয়ে গেছে আমাদের। পালাও, বাঁচতে চাইলে পালাও সবাই।"

'রাজা বারুং-ও ভীষণ ঘাবড়ে যান, নিজের জমকালো পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "পালাও, পালাও তোমরা যে যেদিকে পারো।" ওই মেয়েটা যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সে একবারও আমার দিকে না-তাকিয়ে হরিণীর মতো ছুটে পালাল কোথায় যেন।

'বিশাল একটা নদী আছে হারম্যাকের পুবে, দেখলাম সেদিকে গেল সবাই। আমার কথা মনেও থাকল না কারও। সুযোগ যখন পেয়েছি তখন আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে দেখলাম না—দৌড়াতে শুরু করলাম আমিও, তবে পশ্চিমদিকে, মানে ফাংরা যেদিকে গেছে তার ঠিক উল্টোদিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে হাজির হলাম একটা পাহাড়ের পাদদেশে, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম কোনোকিছুর তোয়াক্কা না-করে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, তাই দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না আমার। যা-হোক, অনেক কষ্ট করে পাহাড়ের মাথায় মাত্র চড়েছি, কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল এই লোকগুলো, পাকড়াও করল আমাকে। মেরেই ফেলত, কিন্তু আমার পোশাক দেখে বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল ওরা। ওদেরকে আমার কাহিনি শোনালাম, তখন আমাকে এখানে নিয়ে এল ওরা। ব্যস, আর কী? এখন আমি নিশ্চিন্ত; তুমিও, বাবা, কারণ আমরা একজন আরেকজনকে পেয়ে গেছি

boiRboi.net

এতদিনে।'

করুণ হাসি হাসলাম আমি। 'না, রডরিক, নিশ্চিন্ত নই আমরা। কারণ সামনে কী হবে তা জানা নেই আমাদের কারোরই। তবে এটুকু বলতে পারি, ফুটন্ত কড়াই থেকে পড়ে জ্বলন্ত উনুনে হাজির হয়েছ তুমি।'

'ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে?' আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল রডরিক। 'মানেটা বুঝলাম না, বাবা। এটা কি কোনো ইংরেজি প্রবাদ? ...তোমার হয়তো মনে আছে, আমাকে যখন ধরে নিয়ে যায় রাজা বারুং-এর লোকরা তখন আমার বয়স ছিল খুবই কম; তারপর থেকে কারও সঙ্গে ইংরেজি বলার সুযোগ হয়নি আমার, এমনকী একটা ইংরেজি বাক্যও আমাকে বলেনি কেউ কোনোদিন। ভুলেই যেতাম নিজের মাতৃভাষা, যদি না কালো জানালা বন্দি হতেন ফাংদের হাতে। তাঁর কাছ থেকে শুনে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর দেয়া একটা বাইবেল পড়ে ভাষাটা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলেছি আমি।'

'বাইবেল?' আশ্চর্য হয়ে তাকালাম হিগসের দিকে, লজ্জায় লাল হয়ে গেল ওর গাল।

'হ্যাঁ, বাবা, বাইবেল। ওঁর পকেটে ছিল। ছোট্ট একটা বই। সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেয়ার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হলো ওঁকে, তার আগে পকেট থেকে বের করে বইটা আমাকে দিয়ে যান তিনি।'

(ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন মানতে চায় না হিগস, এতদিন ধর্মের কথা শুনলেই কড়াগলায় সমালোচনা করেছে সে, আর আজ শুনি ওর পকেটে নাকি সবসময় একটা ছোট্ট বাইবেল থাকত!)

'অন্য কিছু না,' ধরা পড়তে নারাজ হিগস, 'সবই আসলে ইতিহাসের খাতিরে করেছি আমি। বাইবেল মানেই অনেক প্রাচীন ইতিহাস, তাই মাঝেমধ্যে খুলে দেখতাম কী লেখা আছে খ্রিস্টান

বা ইহুদিদের ব্যাপারে।' (তা-ই যদি হবে, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তা হলে সবসময় সঙ্গে রাখত কেন সে বাইবেলটা, কিন্তু কিছু বললাম না আর ওই ব্যাপারে।) 'এখন কথা হলো,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে বলল সে, 'ফাংরা কি ফিরে আসবে? হামলা করবে মুরে?'

'জানি না,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল রডরিক। 'বলতে পারি না আসলে। তবে আমার মনে হয় না আবার আসবে ওরা। ওদের ধর্ম বলে হারম্যাক যেখানে যাবে ওরাও সেখানে যাবে, কিন্তু মূর্তিটার দেহকাঠামো ভেঙে গেছে আর মাথাটা উড়াল দিয়েছে আকাশে, কোথায় গেছে কেউ জানে না তাই সবাই পালিয়ে গেছে পুবদিকে। আমার মনে হয় এখনও পালাচ্ছে ওরা সবাই, কারণ এত তাড়াতাড়ি ওদের ভয় যাবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু রডরিক, হারম্যাকের মাথাটা উড়ে এসে হাজির হয়েছে মুরে,' বললাম আমি। 'রানির প্রাসাদের পেছনে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের চূড়ায় এসে পড়েছে সেটা, আটকে গেছে সেখানেই।'

'তা হলে তো বাবা, আজ হোক বা কাল, ফাংরা আসবেই মুরে। ওরা কাপুরুষ না, খুব তাড়াতাড়িই ভয় কেটে যাবে ওদের। তখন সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করবে কোথায় গেছে মূর্তির মাথাটা। যদি জানতে পারে এই শহরেই আছে সেটা, ধরে নাও ওদের হামলা ঠেকাতে পারবে না কেউই।'

'তার মানে করার মতো একটা মাত্র কাজই আছে আমাদের—আশা করা যেন কোনোদিনই দেখতে না-পায় ফাংরা কোথায় আছে হারম্যাকের মাথাটা,' বলে হাত ধরে নিয়ে গেলাম আমি রডরিককে রানি মাকেডার কাছে।

আমাদের থেকে কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রানি, কিন্তু আমাদের কথার কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি, কারণ ইংরেজিতে কথা বলছিলাম আমরা। রডরিককে পরিচয় করিয়ে দিলাম তাঁর

সঙ্গে, কী হয়েছে বললাম সংক্ষেপে। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি রডরিককে, আর ছেলেকে ফিরে পাওয়ায় অভিনন্দিত করলেন আমাকে।

একজন অফিসার এসে খবর দিল এমন সময়, গোছানো শেষ হয়েছে, রওয়ানা করার জন্য প্রস্তুত সবাই। রওয়ানা হবো, যারা ধরে এনেছিল রডরিককে তারা বেঁকে বসল তখন। দাবি জানাল, রডরিককে ফিরিয়ে দেয়া হোক ওদের কাছে, যশুয়ার কাছে নিয়ে যাবে ওরা ওকে, তারপর যশুয়া যা বলে তা-ই করবে ওরা। শুনে রেগে গেলেন রানি, তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এদেশে কার হুকুম চলে, যশুয়ার না আমার? যাও, নিজেদের কাজে যাও। কাকে কয়েদ করতে হবে আর কাকে ছেড়ে দিতে হবে সে-ব্যাপারে জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে।'

রানি মাকেডার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকগুলো, তারপর তাঁকে স্থানীয় কায়দায় স্যালুট করে চলে গেল, আর কিছু বলল না। তবে পরে জানতে পারি, যে-জায়গার পাহারার দায়িত্বে ছিল ওরা সেখানে নাকি যায়নি, বরং সরাসরি গিয়েছিল যশুয়ার কাছে। রডরিকের ফিরে আসার ঘটনাটা সবিস্তারে জানায় ওরা ওকে; আরও বলে হারম্যাকের মূর্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় নাকি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ফাংরা, নদীপথে পালিয়ে গেছে সবাই পুবদিকে, ওদের আর কেউ নাকি কোনোদিন ভুল করেও আসবে না এই এলাকায়।

প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো, অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে। আমরা যাত্রা শুরু করতে-না-করতেই শুনলাম দারুণ একটা সাড়া পড়ে গেছে সারা মুরে। ভয়ের যে-কালো মেঘ এতদিন ঢেকে রেখেছিল ওদেরকে স্বস্তির রোদ থেকে, তা যেন সরে গেল নিমেষেই। যাত্রা শুরু হলো আমাদের, পথ চলতে চলতে দেখি, খুশিতে যেন পাগল হয়ে গেছে সাধারণ আবাটিরা। বহ্নুৎসব শুরু করে দিয়েছে ওরা

জায়গায় জায়গায়। শুরু হয়ে গেছে ভোজ, পাল্লা দিয়ে চলছে মদ খাওয়ার উৎসব। পরিচিত-অপরিচিত সবাই কোলাকুলি করছে একজন-আরেকজনের সঙ্গে। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না কারও—ওদের শক্তিমত্তার কারণেই ফাংরা পালিয়েছে কি না!

এই উৎসবে যোগ দিলাম না আমরা, যোগ দেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এমনকী আমাদের সঙ্গে পাঁচশ' পাহাড়ি লোকও নির্বাক দর্শকের মতো দেখতে লাগল সাধারণ আবাটিদের এই ফুর্তি। আবাটিরা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত, তাই একরকম বিনা-বাধায় হাজির হয়ে গেলাম বর্গাকৃতির সেই বিশাল খোলা জায়গায়, প্রাসাদটা তখনও আধ মাইলের মতো দূরে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হলো আমাদেরকে, কারণ চাঁদের আলোয় সামনে যা দেখতে পাচ্ছি তা মোটেও সুখকর কিছু নয়।

পুরোপুরি রণসাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই কি তিন হাজার সৈন্য। আমাদেরকে আটকানোই যে ওদের উদ্দেশ্য তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। আমাদেরকে থেমে দাঁড়াতে দেখে ঘোড়া দাবড়িয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল বেশ কয়েকজন অফিসার। পাহাড়ি বাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে জানতে চাইল একজন, নিজের জায়গা ছেড়ে কী কারণে এখানে হাজির হয়েছে সে, এবং যাচ্ছেই বা কোথায়।

'যা করতে বলা হয়েছে আমাকে,' বলল কমাণ্ডার, 'যেখানে যেতে বলা হয়েছে তা-ই করছি আমি। কারণ আমাদের সঙ্গে, আমাদের সবার চেয়ে বড় কেউ একজন আছেন।'

'বড় বলতে যদি তুমি ওই বিদেশি অলিভার আর ওর চ্যালাদের বুঝিয়ে থাকো, তা হলে রাজকুমার যশুয়ার আদেশ, এখনই ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আজ রাতে ওরা যা করেছে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে ওদেরকে মহামান্য যশুয়ার কাছে।'

'কিন্তু মুশকিল হলো,' পাহাড়ি বাহিনীর কমাণ্ডার বলল, 'রানি

ওয়ালদা নাগাসটা বলেছেন, ওই বিদেশি লোকগুলোকে সহিসালামতে প্রাসাদে পৌঁছে দিতে।'

'কোনো গুরুত্ব নেই কথাটার। কারণ মন্ত্রণাসভা অনুমোদন দেয়নি কাজটার। ...আবারও বলছি, ওই ভিনদেশীদেরকে তুলে দাও আমাদের হাতে, আর নিজেদের জায়গায় ফিরে যাও তোমরা। রাজপুত্র যশুয়ার আদেশ অমান্য করার শাস্তি কী তা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমাদের?'

এবার জ্বলে উঠলেন রানি মাকেডা, 'ধরো এই অফিসারটাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো তাঁর আদেশ।

'এবার মাথা কেটে ফেলো ওর। কত বড় সাহস, যারা আমার লোক তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে চায় আমার সামনে থেকে! ...কাটা মাথাটা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করো যশুয়ার কাছে, যাতে ওর আদেশের উপযুক্ত জবাব পায় সে।'

মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই অফিসারটা সাধারণ আবাটিদের মতোই কাপুরুষ। রানি মাকেডার কথা শুনেই সব বীরত্ব উবে গেল ওর, তাঁর পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল।

'কুকুর!' রাগে বলতে গেলে কাঁপছেন রানি, 'তোকে চিনতে পেরেছি আমি। আজ রাতে তুই-ই হামলা করেছিলি আমার প্রাসাদে। কী মনে করেছিস, ভুলে যাবো এত তাড়াতাড়ি? নাকি দেখিনি আমি তোকে তখন? উঠ্, উঠে দাঁড়া। ...আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? নিয়ে যাও একে, মাথা কেটে ফেলো।'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই শুনলেন না রানি। এমনকী অলিভারের কথাও নয়।

'আপনাদের ভাই-এর খুনির জন্য ওকালতি করছেন আপনারা?' তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি আমাদেরকে।

'একটুও খারাপ লাগছে না আপনাদের? ...যা বলার বলে ফেলেছি, শাস্তি পেতেই হবে একে।'

পাহাড়ি লোকগুলো টানতে টানতে অফিসারটাকে নিয়ে গেল কিছুটা দূরে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ওরা, সঙ্গে একটা ঢালের উপর নিয়ে আসছে অফিসারটার কাটা-মাথা। আমাদের সামনে থামল না ওরা, গিয়ে হাজির হলো উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের দিকে, তারপর মাথাটা ওদের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল আমাদের কাছে। ভয় আর ক্রোধের একটা সম্মিলিত গুঞ্জন শুনতে পেলাম আমরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের মধ্য থেকে।

'এগোও!' আদেশ দিলেন রানি মাকেডা, 'দখল করো প্রাসাদটা।'

একটা বর্গগজের মতো আকৃতি নিয়ে সারি করে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের পাহাড়ি যোদ্ধারা, রানি মাকেডা আর আমাদেরকে মাঝখানে রেখে এগোতে লাগল ধীরে ধীরে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে আমাদেরকে দেখল কিছুক্ষণ আবাটিদের সেনাবাহিনী, তারপর হঠাৎ করেই শুরু হলো ওদের আক্রমণ। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আর বর্শা ছুঁড়তে শুরু করল ওরা আমাদেরকে লক্ষ করে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘায়েল হলো আমাদের অনেক লোক। আদেশ দেয়ার দরকার হলো না পাহাড়ি লোকগুলোকে, সঙ্গে তীর-ধনুক সবই আছে এদের, তাই পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল এরাও। পাহাড়ে জীবন কাটাতে হয় বলে শিকার করতে হয় ওদেরকে, তাই বড় বড় তীর-ধনুক সঙ্গে রাখে এরা, আর আমার মনে হয় তীরচালনায় এরা অন্তত আবাটি সৈন্যদের চেয়ে অনেক পারদর্শী। সামনের দিকের লোকগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে, আর পিছনের লোকরা উপযুক্ত পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। সিংহ বা মহিষ মারার জন্য যেসব তীর ব্যবহার করে ওরা সাধারণত, একের পর এক সেসব তীর ছুঁড়তে শুরু

করল আবাটি সৈন্যদের দিকে।

প্রাসাদের সামনের বিশাল ওই খোলা জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হলো নিমেষে। পাহাড়ি লোকগুলো জানবাজ আর লড়াকু, অন্যদিকে কাপুরুষ আবাটি সৈন্যরা বুঝে গেছে আসলে দেশের জন্য নয় যশুয়ার জন্য লড়তে হচ্ছে ওদেরকে। এই খণ্ডলড়াই-এর মোড় ঘুরতে সময় লাগল না তাই। পাহাড়ি যোদ্ধাদের শক্তিশালী ধনুক থেকে নিখুঁত নিশানায় ছোঁড়া বড় বড় তীরগুলো অনায়াসে ভেদ করতে লাগল সাধারণ সৈন্যদের সাধারণ বর্মগুলো, মুহুর্মুহু আর্তনাদে উপুড় বা কাত হয়ে পড়তে লাগল ওরা একের পর এক। অবস্থা বেগতিক দেখে ঘাবড়ে গেল পিছনের সারির সৈন্যরা, অন্তত তীরের আওতা থেকে দূরে যাওয়ার জন্য পিছাতে শুরু করল ওরা। এই ঘটনা দেখে সাহস বেড়ে গেল পাহাড়ি লোকগুলোর, যে-বর্শাগুলো ছুঁড়ে মেরেছিল সৈন্যরা সেগুলোই কুড়িয়ে নিল ওরা, সর্বশক্তিতে নিক্ষেপ করতে লাগল এবার সৈন্যদের দিকে। এবার রণেভঙ্গ দিল সামনের সারির সৈন্যরা, কে কার আগে পালাবে যেন তা নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। পলায়নরত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ আর তীক্ষ্ণ হ্রেষায় মুখরিত হয়ে গেল চারদিক।

একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এতক্ষণ সব দেখছিল অলিভার, এবার জ্যাফেটের দিকে এগিয়ে গেল সে, ওর কানে কানে কী যেন বলল। মাথা ঝাঁকাল জ্যাফেট, ছুটে গেল পাহাড়ি যোদ্ধাদের কমাণ্ডারের দিকে। কী বলেছিল অলিভার বোঝা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই—আমাদের চারপাশে আমাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য বলতে গেলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনা পঞ্চাশেক যোদ্ধা সক্রিয় হলো এবার, আগে বেড়ে যোগ দিল সামনের সারির যোদ্ধা আর আবাটিদের সঙ্গে, তীর আর বর্শা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে এগোতে শুরু করল ওরা। আমরাও চললাম পিছন পিছন।

boiRboi.net

পাহাড়ি যোদ্ধারা এখন এগোচ্ছে তিন সারিতে। ওদের পিছনে মাত্র বারো জনের একটা দল পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানি মাকেডাকে। এদের একহাতে ঢাল, আরেকহাতে কারও বর্শা, কারও আবার নগ্ন তরবারি। যার যার ঢাল উঁচু করে ধরে একটা আড়ালের মতো তৈরি করে রেখেছে সবাই মিলে, যাতে শত্রুপক্ষের কোনো তীর বা-বর্শা এসে আঘাত করতে না-পারে রানিকে। এদের ঠিক পিছনেই আছি আমরা চারজন। আমাদের পিছনে আছে আরও কয়েকজন পাহাড়ি লোক, বিশাল ঢালগুলোকে স্ট্রেচারের মতো ব্যবহার করে আহত কয়েকজন সহযোদ্ধাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

যেসব পাহাড়ি যোদ্ধা মারা গেছে তাদেরকে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম আমরা। আবাটি সৈন্যদের তরফ থেকে তীরের বৃষ্টি হচ্ছে একটু পর পর, কিন্তু বেশিরভাগ তীরই নিষ্ফল হয়ে আছড়ে পড়ছে মাটিতে। একযোগে আমাদের দিকে ছুটে আসার চেষ্টা করল ওরা দু'বার, আমাদের পক্ষ থেকে অব্যর্থ তীরের কারণে পিছু হটতে হলো ওদেরকে দু'বারই। ওদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বুঝতে পেরে তীর ছোঁড়া বন্ধ করার আদেশ দিল পাহাড়ি যোদ্ধাদের কমাণ্ডার; তাই ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে রেখে কোমরে-ঝোলানো খাটো তরবারি হাতে নিল সবাই। তারপর রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে দ্রুতবেগে দৌড়ে গিয়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবাটি সৈন্যদের উপর। এতক্ষণ বলতে গেলে কিছুই করিনি আমরা, এবার আমি আর অলিভার রাইফেল খুলে নিলাম কাঁধ থেকে, সমানে গুলি চালাতে শুরু করলাম সৈন্যদের উপর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব। তীরভর্তি তূণ, ধনুক, বর্শা, তরবারি, বর্ম—বহন করতে কষ্ট হয় এরকম সবকিছু ফেলে রেখে পালাতে শুরু করল সৈন্যরা। এমনকী, দিগ্বিদিক

boiboi.net

জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন হাজির হয়ে গেল রানির প্রাসাদে, প্রহরীহীন সদর-দরজা গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল অনায়াসে। তরবারি উঁচিয়ে ওদের পিছু পিছু গেল পাহাড়ি যোদ্ধারা, প্রতিপক্ষের যাকেই হাতের কাছে পেল তাকেই কচুকাটা করে ফেলল। রক্ত আর লাশে ভরে গেল প্রাসাদ।

ভোরের আলো উঁকি দিল আকাশে, ক্ষীণ হতে শুরু করল পূর্ণিমার আলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে সৈন্যরা, পালিয়ে গেছে সবাই, অনেকেই মরে পড়ে আছে এখানে-সেখানে। সমাপ্তি ঘটেছে খণ্ডলড়াই-এর। মাত্র পাঁচশ' পাহাড়ি যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দুই-তিন হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনীকে পরাজিত করেছি আমরা। সাহস আর দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করলে মানুষ কত অসাধ্যই না সাধন করতে পারে!

যা-হোক, আপাতত আমরা নিরাপদ। মনে হচ্ছে, যে-শিক্ষা পেয়েছে যশুয়া, তাতে ভালোমতো যোগাড়যন্ত্র না-করে, ছক না-কষে আমাদের উপর হামলা করবে না আর। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম না, কারণ প্রাসাদে ঢুকবো এমন সময় হঠাৎ করেই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো রানির খাসকামরার একটা জানালা, চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল কাচ আর কাঠ, ওই পথ দিয়ে যেন লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে এল লালচে আগুনের জ্বলন্ত শিখা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, ওই আগুনের উৎপত্তি জ্বলন্ত এক লণ্ঠন থেকে। রানি মাকেডার বিছানায় সার্জেন্ট কুইকের মৃতদেহটা শুইয়ে রেখে বাইরে বের হয়ে এসেছিলাম আমরা, তখন কেউ খেয়াল করিনি ঘরের ভিতরে প্রজ্বলিত অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে লণ্ঠনটা। যশুয়ার লোকদের মধ্যে কেউ হয়তো আহত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল প্যাসেজে, সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়ে সে রানির খাসকামরায়, তাড়াহুড়ো করে বের হতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় লণ্ঠনটা। আবার এমনও হতে পারে, জোরালো

বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে লণ্ঠনের অগ্নিশিখার স্পর্শ পায় সোনার-কাজ-করা কোনো পর্দা, প্রথমে আগুন ধরে ওই পর্দায়, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরে।

যা-ই হোক, দাহ্য পদার্থের অভাব নেই প্রাসাদের ভিতরে, মৃদুমন্দ বাতাসও বইছে, আগুন ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না তাই। শক্তি বলতে যা বাকি ছিল আমাদের দেহে তার সবটুকু খরচ করে টানা দু'ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করলাম আমরা, তারপর নিয়ন্ত্রণে এল ভয়াবহ ওই আগুন। কিন্তু ততক্ষণে পাথরের পুরু দেয়াল ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই বাকি নেই, সব পুড়ে কয়লা বা ছাই হয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ডে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না আমরা সার্জেন্ট কুইককে, ভাবলাম আমি, ওর স্বজনদের হাতে তুলে দেয়া হলো না ওর লাশ। রাজকীয় এক চিতায় পুড়ে ছাই হলো ওর মরদেহ। হায় কপাল, শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত স্বজনের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে লোকে, আর আমরা ঢাললাম বালতির পর বালতি পানি, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না! কুইকের মরদেহ উদ্ধার করা তো পরের কথা, রানির খাসকামরায় ঢুকে ছাই ছাড়া আর কিছুই পেলাম না আমরা, কারণ আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল এখান থেকেই।

জন্মের সময় মাকে হারান রানি মাকেডা, তখন এক দাই-মা তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন, এখন বয়স হয়েছে ওই মহিলার, বুড়ি হয়ে গেছেন তিনি; এখনও আছেন আমাদের সঙ্গে, আরও আছে রানির ঘনিষ্ঠ দুই সহচরী। এদেরকে নিয়ে মোটামুটি অক্ষত একটা কামরায় ঢুকে পড়লেন রানি মাকেডা, ওই ঘরেই থাকবেন তিনি আপাতত। প্রাসাদ-সংলগ্ন অতিথিভবনটার একদিকের ছাদ ধসে পড়েছে, তারপরও আমরা গিয়ে ঢুকলাম সেখানে; দরকার হলে এক ঘরে গাদাগাদি করে থাকবো সবাই। টানাসেতুটা তুলে নিয়ে প্রাসাদের সদরদরজা ভালোমতো বন্ধ করে

দিয়ে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে আর ছাদের উপর সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিল পাহাড়ি যোদ্ধারা, বিশ্রাম নিতে লাগল সবাই।

এত ক্লান্ত ছিলাম যে, পরদিন বিকেল পর্যন্ত বেহুঁশের মতো ঘুমালাম আমরা। ঘুম যখন ভাঙল আমার, চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, অচল গুঁড়ির মতো পড়ে আছে হিগস আর অলিভার, এখনও ঘুমাচ্ছে দু'জনই। আমার বিছানার পাশে বসে আছে রডরিক, এখনও বিয়ের আলখাল্লা পরে আছে সে, হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকলাম আমিও কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরলাম রডরিকের একটা হাত, স্বপ্ন দেখছি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসলাম। বললাম, 'সত্যিই আছো তা হলে! আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি বুঝি।'

ভুলে ভরা অদ্ভুত ইংরেজিতে বলল রডরিক, 'না, বাবা, স্বপ্ন না, সত্যিই আছি আমি। ...এই পৃথিবীটা অদ্ভুত একটা জায়গা। আমার কথাই ভাবো। কতগুলো বছর? বারো...চোদ্দ বছর ধরে ফাংদের দাস হয়ে ছিলাম আমি, ওদের হয়ে গান গাইতাম ওদের প্রার্থনার সময় হলে। তারপরও মন পাইনি ওদের পুরোহিতদের। কতবার যে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল! শুধু রাজা বারুং রাজি হননি বলে আজও বেঁচে আছি। তারপর হঠাৎ করেই একদিন তাঁর কী মনে হলো জানি না—বললেন, আমার গায়ে অভিজাত রক্ত আছে, একমাত্র আমিই নাকি তাঁর মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। তারপর একদিন হঠাৎ করেই পরিচয় হলো তোমার বন্ধু হিগসের সঙ্গে। তোমার কথা বললেন তিনি আমাকে, তুমি দেখতে কেমন জানালেন, বললেন এতগুলো বছর ধরে তুমি নাকি খুঁজে বেড়াচ্ছ আমাকে। তারপর তাঁকে নামিয়ে দেয়া হলো সিংহের গুহায়, কিন্তু তোমরা বাঁচালে তাঁকে। তারপর গতকাল রাজা

বারুং-এর মেয়ের সঙ্গে অর্ধেক বিয়ে হলো আমার, যে-মেয়েকে বলতে গেলে আগে কখনও দেখিইনি আমি। তারপর হারম্যাকের মাথাটা উড়াল দিল আকাশে, যে যেদিকে পারল পালাল ফাংরা, আমিও পালালাম কিন্তু ধরা পড়ে হাজির হয়ে গেলাম তোমার সামনে। তারপর লাগল যুদ্ধ, মরল অনেকে, একটা তীর আমার কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল কিন্তু একটুও আহত হলাম না আমি। ...সত্যিই বাবা, পৃথিবীটা খুব অদ্ভুত। আর আমার মনে হয় ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন কোথাও-না-কোথাও, যিনি সবসময় নজর রাখছেন আমাদের উপর।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বললাম আমি। 'আরও মনে হয় সামনে যে-ভয়াবহ দিনগুলো আসছে সেসব দিনেও আমাদেরকে দেখবেন তিনি। সত্যিই তাঁর করুণার অনেক দরকার এখন আমাদের।'

চুপ করে থাকল রডরিক।

কথা চালিয়ে গেলাম আমি, 'আমার কী মনে হয় জানো? এখানে আমার সঙ্গে থাকার চেয়ে ফাংদের সঙ্গে থাকলেই বোধহয় ভালো হতো তোমার।'

'জানি না কীসের কথা বলছ তুমি। তবে আমার মনে হয় এত দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে। ফাংরা একটা কথা বলত প্রায়ই, শুনে বেশ ভালো লাগত আমার—দরজা ছাড়া ঘর হয় না। কোনো সমস্যা যদি হয় ঘরের মতো তা হলে সেই ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো-না-কোনো দরজা নিশ্চয়ই আছে কোথাও-না-কোথাও। কারণ দরজা ছাড়া ঘর হয় না। যার চোখ আছে সে দেখতে পায় ওই দরজা, আর যে অন্ধ সে শুধু হাতড়িয়ে মরে অথবা আক্ষেপ করে অথবা ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কাঁদতে থাকে।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, বোধহয় কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।'

এগিয়ে গিয়ে দেখি, লোকটা আর কেউই নয়—আমাদের

জ্যাকেট। আমাকে দেখে বলল সে, 'রানি ওয়ালদা নাগাসটা পাঠিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। একটা খবর দিতে চান তিনি আপনাদেরকে।'

জরুরি বিষয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাই ঘুম থেকে ডেকে তুললাম হিগস আর অলিভারকে। তবে রওয়ানা হওয়ার আগে হিগসের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করলাম আমি।

প্রাসাদে গিয়ে দেখি, সদর-দরজার কাছে, ভিতরের দিকের দেয়াল-সংলগ্ন একটা টাওয়ারে বসে আছেন রানি মাকেডা বিষণ্ন মনে। অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন ঘুম হয়েছে ওর, হিগসের কাছে জানতে চাইলেন ক্ষতগুলোর কারণে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে কি না বেচারার, তারপর নবজীবনে ফিরে আসার জন্য আমার ছেলেকে অভিনন্দিত করলেন আবারও, বললেন, 'তুমি আসলেই ভাগ্যবান, রডরিক। কারণ ডাক্তার অ্যাডামসের মতো একজন মহান বাবা আছেন তোমার। ভেবে দেখো, নিজের সব সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে চোদ্দটা বছর ধরে লেগে আছেন তিনি তোমার খোঁজে। এতগুলো বছরে কত কিছুই না সহ্য করেছেন তিনি শুধু তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশায়! এবং শেষপর্যন্ত ভাগ্য পুরস্কৃত করেছে তাঁকে—তোমাকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। দেখো, তোমার প্রতি তোমার বাবার এই ভালোবাসার কোনো অমর্যাদা যেন না-হয় কোনোদিন; তাঁর মুখ উজ্জ্বল করতে না-পারো ঠিক আছে কিন্তু এমন কিছু কোরো না কোনোদিন যাতে তিনি কলঙ্কিত হোন। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি ধরে রেখো নিজের কাছে।'

কিছু না-বলে সবার সামনেই আমাকে জড়িয়ে ধরল রডরিক, চুমু দিল আমার কপালে। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল আমার।

তখন আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এল রানি মাকেডার সহচরীরা। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন রানি, তাই নাস্তা সেরে

নিলাম আমরা সেখানেই।

খেতে খেতে বললেন রানি, 'যে-পরিমাণ রসদ আছে আমাদের তাতে আর কতদিন যাবে জানি না। এদিকে আমাকে সম্ভবত শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছেন যশুয়া। চিঠিটা কে নিয়ে এসেছে জানেন? না, কোনো দূত না, বেশ বড় একটা তীর।' যে-আসনে বসে আছেন তিনি তার এককোনায় রাখা একটুকরো পার্চমেন্ট বের করে মেলে ধরলেন তিনি, পড়তে শুরু করলেন, '"ওয়ালদা নাগাসটা, ভিনদেশী ওই খ্রিস্টানরা যাদু করেছে আপনাকে। শেষবারের মতো বলছি, ওদেরকে আমার হাতে তুলে দিন। যা প্রাপ্য ওদের তা-ই দেয়া হবে ওদেরকে। ওদের কারণেই এই দেশের এতগুলো নিরীহ লোকের রক্তে লাল হলো আপনার প্রাসাদ আর প্রাসাদের চত্বর। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছে পাহাড়ি লোকগুলোও, তাই ওদেরকেও ক্ষমা করবো না আমি। কিন্তু ক্ষমা করবো আপনাকে, আর বিয়ে করে নিজের বউ বানিয়ে নেবো চিরদিনের জন্য। যদি আমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, যদি আবারও লড়াই করতে চান আমার বিরুদ্ধে, তা হলে মনে রাখবেন আমার তরবারিই হবে আপনার অনুসারীদের ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব। আর আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে তখন। ...মন্ত্রণাসভার অনুমোদনসাপেক্ষে, ...যশুয়া, আবাটিদের রাজকুমার।"' চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি আমাদের দিকে। 'এবার বলুন, কী জবাব দেবো আমি এই হুমকির?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার। 'পাহাড়ি যোদ্ধাদের ব্যাপারে যদি ক্ষমা করার নিশ্চয়তা দিত যশুয়া, তা হলে ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে বলতাম আমি তোমাকে। ওটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আসলে তোমাকে চায় সে, আমরা ওর জন্য বাহানা মাত্র। ...ভেবে দেখো, প্রাসাদের ভিতরে প্রকৃতপক্ষে

আটকা পড়ে গেছি আমরা। বাইরে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ চারদিক দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে যশুয়ার বাহিনী। একটা তীরও ছুঁড়তে হবে না ওদেরকে, শুধু আমাদেরকে আটকে রাখলেই হবে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবো আমরা আপনাথেকেই।'

'যা বলছ বুঝেশুনে বলছ?' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রানি অলিভারের দিকে। 'আমাকে কেন চায় যশুয়া মনে আছে তো? আমাকে কেন কব্জা করার জন্য হামলা করেছিল সে গতকাল ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি,' জানি না কোন্ আবেগে লাল হয়ে গেল অলিভারের দু'গাল, তারপর চুপ হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এক কাজ করো তুমি। আমাকে নিয়েই তো যত সমস্যা, আমাকে তুলে দাও যশুয়ার হাতে। তাতে তোমার বাকি অতিথিরাও বাঁচবে, পাহাড়ি যোদ্ধারাও বাঁচবে, আর তুমিও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে সারাজীবন।'

করুণ হাসি হাসলেন রানি মাকেডা। 'এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে আসলে কোনো লাভ নেই। কারণ ইতোমধ্যেই জবাব দেয়া হয়ে গেছে আমার, এবং ঠিক যশুয়ার কায়দায়ই—তীরের মাধ্যমে। একটা অনুলিপি রেখেছি আমি আমার জবাবের,' বলতে বলতে আরেকটুকরো পার্চমেন্ট বের করলেন তিনি আসনের আরেকপ্রান্ত থেকে, 'পড়ছি, শোনো: "আমার দেশের বিদ্রোহী জনগণের প্রতি, ...আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন, যশুয়া চাচা। আত্মসমর্পণ করতে বলুন মন্ত্রণাসভার ওই সদস্যদেরকেও যাঁরা আমার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে, যাঁরা আমার অনুমতি ছাড়াই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে। দেশের প্রাচীন আইন অনুযায়ী, আপনাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান থাকলেও নিঃশর্ত ক্ষমা করবো। যদি আমার এই আদেশ

প্রত্যাখ্যান করেন, প্রতিজ্ঞা করছি, আগামী পূর্ণিমার আগেই এমন দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে এই দেশের উপর, যা আপনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি। বিশ্বাস করুন, এক বর্ণ মিথ্যাও নেই আমার কথায়। আবাটির জনগণ, এবার যা খুশি হয় করুন আপনারা, কারণ আমাদের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত—যা লেখা আছে তা ঘটবেই। ...ওয়ালদা নাগাসটা।"'

'দুঃখ-দুর্দশার মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইলেন বুঝলাম না,' রানির পড়া শেষ হলে জানতে চাইলাম আমি।

'আজ ভোরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখি আমি,' জবাব দিলেন রানি, 'দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকীয় চেহারার এক মহিলা। তাঁকে আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু জানি তাঁর কারণেই পৃথিবীতে এসেছি আমি—আমার নানীর নানীর নানী হবেন তিনি হয়তো। করুণ দৃষ্টিতে কিন্তু পরম মমতায় আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেলেন তিনি, সঙ্গে করে যেন নিয়ে গেলেন ভবিষ্যৎ-ঢেকে-রাখা কোনো ঘন কালো মেঘমালাকে; আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পেলাম আমি, আরও দেখলাম আমাদের এই শহরটাকে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সবকিছু, রাস্তায় পড়ে আছে শুধু লাশ আর লাশ। আরও অনেক কিছু দেখালেন তিনি আমাকে, কিন্তু সেগুলো এখনই বলা যাবে না। তারপর আমার মাথার উপর হাত রাখলেন তিনি, আশীর্বাদ করলেন আমাকে, এরপর চলে গেলেন।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল হিগস, স্পষ্ট শুনতে পেলাম না।

রডরিক মুখ খুলল তখন, 'আপনি যা বলেছেন রানি ওয়ালদা নাগাসটা, আমার মনে হয় তার সবই ঠিক। সময় ফুরিয়ে এসেছে আবাটিদের।'

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম আমার ছেলের দিকে। 'তুমি কীভাবে জানতে পারলে?'

'সেই কিশোর বয়স থেকে ফাংদের হাতে বন্দি আমি,' বলল

boiRboi.net

রডরিক, 'আমার একটা গুণের কথা জানে অনেকেই–সুন্দর করে প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে পারি আমি। আরও একটা গুণ আছে আমার, যা শুধু জানে ফাংরা। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারি আমি। লোকে যা স্বপ্নে দেখে, আমার কাছে যদি তার মানে জিজ্ঞেস করে, আমি বলে দিই, আর বেশিরভাগ সময়ই সেগুলো ঠিক হয়। এজন্য "মিশরের গায়ক"-এর মতো আরও একটা নাম ছিল আমার–"স্বপ্নপাঠক"। ...হেসো না বাবা, আমার সব কথা শোনো আগে। রাজা বারুং একবার স্বপ্নে দেখেন হারম্যাকের মূর্তিটায় মাথা নেই, মুরে গিয়ে হাজির হয়েছে সেটা। স্বপ্নটার মানে জিজ্ঞেস করেন তিনি আমাকে। আমি বলি, নিকট ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে মূর্তিটা, ওটার মাথাটা পাওয়া যাবে মুরের কাছাকাছি কোথাও, আর মুর দখল করবেন রাজা বারুং। খেয়াল করে দেখো, আমার দুটো ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু সত্যি হয়েছে। আজ না হোক কাল, আমার মন বলছে তৃতীয়টাও সত্যি হবে। ...আমি জানি স্বপ্ন কখন সত্যি হয় আর কখন মিথ্যা হয়। স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষমতা গান গাওয়ার ক্ষমতার মতোই একটা উপহার আমার জন্য–ঈশ্বরের পক্ষ থেকে,' আর কিছু না-বলে থেমে গেল সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল রানি মাকেডার দিকে। রানিও কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে।

'তোমরা, মানে এই অঞ্চলের মানুষরা খুবই অদ্ভুত আসলে,' মন্তব্য করল অলিভার। 'খুব সহজেই কত কিছু না বিশ্বাস করে ফেলো তোমরা। কিন্তু বিশ্বাস যখন করছ, তার মানে কিছু-না-কিছু আছে তার মধ্যে। যা-হোক, তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তা হলে ফাংদের সঙ্গে তোমার লোকদের যুদ্ধ লাগতে আর বেশি দিন বাকি নেই। আমি ভাবছি ওই "অসমযুদ্ধের" পরে কী হবে এই দেশটার। এখনই দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে তোমার জনগণ, ফাংরা হামলা করলে কীভাবে লড়বে ওরা ওদের বিরুদ্ধে?' প্রশ্নটা করে তাকাল সে নীচের দিকে। সাধারণ আবাটিরা দলে দলে

জড়ো হচ্ছে নীচের বিশাল সেই খোলা জায়গায়, কী উদ্দেশ্যে কে জানে!

রডরিকের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন রানি মাকেডা, প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন অলিভারের দিকে। 'যা-ই হোক, যা-ই ঘটুক, যত ঝামেলা আর অসুবিধা হোক না কেন আমাদের, একটা কথা মনে রেখো, বন্ধু, আমাদের পরিণতি কিন্তু তুমি যা আশঙ্কা করছ সে-রকম না-ও হতে পারে।'

'তার মানে আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারে?' প্রশ্নটা শুনেই বোঝা গেল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অলিভার।

জবাবে শুধু মিষ্টি করে মুচকি হাসলেন রানি মাকেডা, কিছু বললেন না।

আঠারো

প্রাসাদের ভিতরে আক্ষরিক অর্থেই আটকা পড়ে গেছি আমরা। প্রাসাদটার একটা প্রান্ত পুরোপুরি পুড়ে গেছে, আরেকদিকের অবস্থাও ভালো নয়। পরিখা আর পুরু দেয়ালের কারণে যথেষ্ট সুরক্ষিত আছি, তীর বা বর্শা মেরে তেমন কোনো ফায়দা করতে পারবে না যশুয়ার বাহিনী। হামলা করে প্রাসাদ দখল করার সুতীব্র ইচ্ছা যদি না-থাকে ওদের মধ্যে, তা হলে আপাতত ধরে নেয়া যায় আমাদেরকে এই প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করা ওদের মতো কাপুরুষদের পক্ষে এককথায় অসম্ভব। আগেও বলেছি আবাটিরা সাহসী নয়, বীরের মতো মরতে চাওয়া তো দূরের কথা সামান্য একটু আঘাত সইতেও নারাজ ওরা। আর একমাত্র এই

ব্যাপারটাই আছে আমাদের পক্ষে।

অন্যদিকে আমাদের বিপক্ষে আছে অনেক কিছু। গতরাতের লড়াই-এ একশ'র মতো পাহাড়ি লোক মারা গেছে। তার মানে আমাদের সঙ্গে আছে মাত্র চারশ' জন। এদের মধ্যে পঞ্চাশ জন আবার গুরুতরভাবে আহত। তার উপর অস্ত্রশস্ত্র তেমন একটা নেই আমাদের কাছে। বেশিরভাগ তীর শেষ হয়ে গেছে গতরাতের যুদ্ধে, কোথাও গিয়ে যে যোগাড় করে আনবো সে-উপায়ও নেই। সবচেয়ে খারাপ কথা হলো, প্রাসাদটা যেহেতু এ-রকম কোনো পরিস্থিতির কথা ভেবে বানানো হয়নি তাই বাড়তি খাবারের তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেই। খাদ্যোপযোগী যা ছিল তার বেশিরভাগই পুড়ে গেছে আগুনে। একটা নয়, দুটো নয়, কম করে হলেও চারশ'টা মুখের আহার যোগাতে হবে এখন আমাদেরকে, তাও আবার কতদিন চলবে এই অবস্থা জানি না কেউই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পাহাড়ি যোদ্ধাদের সঙ্গে তিন দিনের খাবার আছে। খাবার মানে রোদে-শুকানো গরু বা ছাগলের মাংস, এবং গম আর যবের মিশ্রণ থেকে বানানো একজাতের শক্ত বিস্কুট। এক বেলা না-খেয়ে থাকলে এই খাবার দিয়ে বেশি হলে আরও দু'দিন যেতে পারে। কিন্তু তারপর?

বিপদের এখানেই শেষ নয়। প্রাসাদটা যদিও পাথর দিয়ে বানানো, কিন্তু গিলটি-করা গম্বুজ আর সুদৃশ্য দুর্গকূটগুলো কাঠের। তার মানে আবারও আগুন লাগলে এগুলো পুড়ে ছাই হবে সবার আগে। ওদিকে ছাদের মধ্যে বসানো আছে পাতলা কনক্রিটের আস্তরণ দেয়া সিডার কাঠের সারি সারি বরগা, নীচে রজন কাঠের পাতলা বোর্ড। তার মানে জ্বলন্ত কাঠ খসে খসে পড়বে আমাদের মাথার উপর, আর ওতেই কাজ সেরে যাবে আমাদের। যশুয়ার মনে কী আছে জানি না, যদি আমাদেরকে পুড়িয়ে মারার কোনো ইচ্ছা থেকে থাকে ওর তা হলে এই

সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইবে না সে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখে যা মনে হচ্ছে, সাধারণ আবাটিরা চলে গেছে যগুয়ার পক্ষে। ওদেরকে প্ররোচিত করেছে সে, রানি মাকেডার বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে। আমাদের রক্ত চায় ওরা এখন—কাজ শেষে সব কাজীই পাজি হয়ে যায়।

সাধারণ জনগণ সঙ্গে আছে—আবাটি সৈন্যদের সুখ আর দেখে কে! খাবার আর অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে ওরা নীচের ওই বিশাল খোলা জায়গায়। পিছনের পাহাড়ি দেয়ালটা বাদ দিয়ে বললে তিন দিক দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে ওরা। হইচই আমোদপ্রমোদ চলছে সারাদিন, শৃঙ্খলা বলতে আর তেমন কিছুই নেই ওখানে।

আমি পেশায় ডাক্তার, মানুষের জীবন নেয়া নয় বরং মানুষকে নতুন জীবন দেয়াই আমার কাজ। শিকার করার জন্য অথবা আত্মরক্ষার তাগিদে হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছি অনেকবার, কিন্তু তারপরও কখনও নিজের পেশাটা ভুলে যাইনি। এখানে, এতগুলো আহত পাহাড়ি-লোককে পেয়ে আমার কাজ তাই বেড়ে গেল। বলতে গেলে সারাটাদিনই কাটিয়ে দিই ওদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে থাকে রডরিক, সাহায্য করে আমাকে, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু কাজ শিখে নেয় এই সুযোগে। চেতনানাশক ওষুধ নেই, ব্যাণ্ডেজ নেই, অন্যান্য সরঞ্জাম নেই—আমার যে কী কষ্ট হয় লোকগুলোর ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতে তা শুধু আমি জানি। ঘুরে আসার পর থেকে ক্রমাগত ব্যবহার করতে করতে ফুরিয়ে গেছে আমার ওষুধের-বাক্সের সব ওষুধ, তাই যুদ্ধাহত লোকগুলোর জন্য বলতে গেলে এখন কিছুই নেই আমার কাছে। তারপরও অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ওদের সেবা করে যাচ্ছি আমি। আমাদের বাপ-ছেলের এই পরিশ্রম বৃথা গেল না, মৃত্যুর মুখ থেকে সত্যিই ফিরে এল কয়েকজন যোদ্ধা। কিন্তু বেশিরভাগ মুমূর্ষু রোগীর বেলায় কিছু করার থাকল না আমার, ক্ষতস্থানে পচন ধরে

গিয়ে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রায় সবারই, আমাদের চোখের সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ওরা একে একে।

এদিকে অলিভার নিয়োজিত হয়েছে আরেক কাজে। হিগস, জ্যাফেট আর পাহাড়ি যোদ্ধাদের কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত পুরো প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখে সে, কোথাও কোনো দুর্বল জায়গা আছে কি না বের করার চেষ্টা করে। যদি সে-রকম কিছু মনে হয় ওর তা হলে দু'-তিনজন যোদ্ধাকে বসিয়ে দেয় সেখানে। কাজের সুবিধার জন্য পাহাড়ি যোদ্ধাদেরকে দুটো দলে ভাগ করেছে সে, একদল যখন পাহারা দেয় তখন আরেকদল ঘুমায়। আবার দ্বিতীয় দল যখন কাজে যোগ দেয় তখন প্রথম দল বিশ্রাম নিতে যায়।

একদল লোককে তীর বানানোর কাজে লাগিয়ে দিল সে। খসে-পড়া কড়িকাঠ, দক্ষ হাতে চেঁছে তীর বানাচ্ছে ওরা। বাতিল কাঠের অভাব নেই আপাতত—পুড়ে যাওয়া আসবাব আর আউটহাউসে মজুদ-করা কাঠ কাজে লাগছে এখন। প্রহরীদের ঘরে নিতান্তই ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে তীরের অনেকগুলো কাঁটা আর পালক। প্রাসাদের ভিতরে কয়েকটা ঘোড়া ছিল, ওগুলো জবাই করে ছাল ছাড়িয়ে মাংস আলাদা করে নিয়ে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে, আমাদের খাওয়ার কাজে লাগবে পরে।

ঝটিকা আক্রমণ হতে পারে আমাদের উপর—ভেবে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাসাদের ছাদের উপর জড়ো করে রাখা হয়েছে ছোট-বড় পাথর যাতে হামলাকারীদের উপর ছুঁড়ে মারা যায় দরকারের সময়। পিচ, তেল আর পানি গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় সবসময়; জরুরি মুহূর্তে বালতিতে করে ওগুলোও ছুঁড়ে মারা যাবে শত্রুপক্ষের দিকে।

কিন্তু আমাদের সব প্রস্তুতিই বলতে গেলে ভেস্তে গেল, কারণ সে-রকম কোনো সরাসরি হামলা করল না যশুয়ার বাহিনী। আমাদের অবরোধ করে রাখাটাই ওদের উদ্দেশ্য, আর এই

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য লুকিয়ে আছে ওরা চত্বরের বড় বড় গাছ ও ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে, কয়েকজন করে। ছাদে যদি আমাদের কাউকে দেখতে পায় ওরা, তা হলে দূর থেকে তীর মারে, তার বেশি কিছু করে না। ইচ্ছা থাকলেও জবাব দিতে পারি না আমরা, কারণ আমাদের কাছে এত তীর নেই; ওদিকে যশুয়ার বাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলায় আমাদের একজন-দু'জন করে মারা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। কাজেই আরও সতর্ক হতে হলো আমাদের, পারতপক্ষে ছাদে, বিশেষ করে প্রাসাদের সীমানা-প্রাচীরের কাছে যাওয়াটাই বন্ধ করে দিতে হলো আমাদেরকে।

তিনটা দুর্বিষহ দিন কেটে গেল এভাবে। বড় কোনো ঘটনা ঘটল না। তবে দ্বিতীয়দিন রাতে, তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, পরিখায় নেমে পড়ার চেষ্টা করল যশুয়ার বাহিনী, সাঁতরে এই পাড়ে হাজির হওয়ার মতলব ছিল ওদের। সঙ্গে সঙ্গে ছাদের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে পজিশন নিল পাহাড়ি যোদ্ধারা, ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকে যতখানি দেখা যায় তার উপর ভরসা করে তীর ছুঁড়তে লাগল অনুপ্রবেশকারীদের দিকে। নিয়মিত বিরতিতে গর্জাতে লাগল আমাদের রাইফেলগুলোও। তীর বা বুলেট কতখানি ক্ষতি করল ওদের বলতে পারবো না, তবে রাইফেলের আওয়াজেই ভীষণ ঘাবড়ে গেল আবাটিরা, পরিখা পার হয়ে এই পাড়ে আসতে যতখানি উৎসাহ ছিল ওদের তার চেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গেল জান বাঁচিয়ে ওই পাড়ে পালিয়ে যেতে। সাধারণ ধনুকের চেয়ে অনেক বড় কিছু ধনুক বানিয়ে ফেলেছিল অলিভার কায়দা করে, আর সেই ধনুকগুলো তুলে দেয়া হয়েছিল যেসব পাহাড়ি যোদ্ধা সবচেয়ে ভালো তীর ছুঁড়তে পারে তাদের কয়েকজনের হাতে; কথা ছিল তীরের বদলে বর্শা ব্যবহৃত হবে এগুলোতে। ফলাফল হলো দারুণ—তীরের রেঞ্জের চেয়ে আরও অনেকদূর গেল বর্শাগুলো, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল বেশ কয়েকজন আবাটিকে। তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই খেয়াল করলাম,

শুধু পালিয়ে যাচ্ছে না হামলাকারীরা, বরং দূরে সরে যাচ্ছে ওরা; ওদের আগের অবস্থান থেকে পিছু হটে গিয়ে প্রাসাদ থেকে প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে অবস্থান নিল ওরা শেষপর্যন্ত।

কী করা যায় ঠিক করার জন্য তৃতীয় দিন বিকেলে আলোচনায় বসলাম আমরা। আবাটিদের গতরাতের হামলার পরই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। আর যে-পরিমাণ খাবার বাকি আছে, তাতে বেশি হলে দু'দিন চলবে, তারপরই উপবাস শুরু করতে হবে আমাদেরকে। পাহাড়ি যোদ্ধাদের মনোবলও কমে গেছে অনেকখানি। এরা সম্মুখ-সমরে অভ্যস্ত, এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকা অথবা চোরাগোপ্তা হামলা ঠেকানো ওদের ধাতে নেই। প্রায় প্রতিদিনই দলে দলে হাজির হচ্ছে ওরা আমাদের কাছে, নিজেদের বউ-বাচ্চাদের কাহিনি শুনিয়ে পরোক্ষভাবে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে। বুঝে গেছে ওরা পরাজয় নিশ্চিত আমাদের, তাই বার বার জানতে চাচ্ছে যশুয়ার বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে কী অবস্থা হবে ওদের।

দেয়ার মতো জবাব নেই আমাদের কাছে, তাই একরকম নিরুত্তর হয়ে থাকতে হলো; তখন ওরাই বলছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হবে ওদের, বউ-বাচ্চাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস-দাসী বানানো হবে, মেরে ফেলা হবে অথবা জবাই করে খাওয়া হবে গৃহপালিত জন্তুগুলোকে। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে রানি মাকেডা বলছেন, এই লড়াই যদি শেষ হয় আর যদি জিততে পারেন তিনি তা হলে যা হারাবে ওরা তার পাঁচগুণ ফিরিয়ে দেয়া হবে ওদেরকে। কিন্তু আশার ক্ষীণতম আলোও জ্বলেনি একটা লোকের চেহারাতেও, কারণ ওরা শিশু নয়—ভালোমতোই জানে এই অসম যুদ্ধের পরিণতি কী হতে পারে। সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেলল কেউ কেউ, 'আমাদের ঘরবাড়ি ফিরিয়ে দিতে পারেন আপনি, ফিরিয়ে দিতে পারেন গরু-ছাগলও, কিন্তু আমাদের বউ-বাচ্চাদের যদি মেরে ফেলে ওরা তা হলে কি পারবেন ওদেরকে

ফিরিয়ে আনতে?'

এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেননি রানি মাকেডা।

আমাদের ওই নিরানন্দ আলোচনায় সম্ভাব্য সবরকম পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললাম আমরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল মাত্র দুটো উপায় আছে আমাদের হাতে—আত্মসমর্পণ করা অথবা সাহসের সঙ্গে বিপদ মোকাবেলা করা, মানে রাতের আঁধারে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যশুয়ার বাহিনীর উপর হামলা করা। দ্বিতীয় উপায়ের সরল অর্থ আত্মহত্যা করা। কিন্তু আত্মসমর্পণের পরিণতি মৃত্যুর চেয়েও খারাপ—সারাজীবনের জন্য বন্দি হয়ে থাকতে হবে যশুয়ার জেলখানায়, দাসত্ব স্বীকার করতে হবে ওর, তখন যা খুশি তা-ই করাতে বাধ্য করবে সে আমাদেরকে।

যশুয়ার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই যে কচুকাটা হয়ে যাবো আমরা তা কিন্তু না-ও হতে পারে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের, সুতরাং মরণপণ করেই লড়বো আমরা, ওদিকে আবাটিরা লড়বে কর্তব্যের খাতিরে, তার উপর সবাই জাত কাপুরুষ। এমনও হতে পারে ভয়েই পালিয়ে যাবে ওদের অনেকে।

ঠিক করলাম, সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবো আমরা পাহাড়ি যোদ্ধাদের সঙ্গে। ডেকে পাঠানো হলো জ্যাফেটকে, যারা পাহারার দায়িত্বে আছে তারা বাদে আর সবাইকে হাজির করতে বলা হলো রানির সামনে। সবাই এল, কথা বলতে শুরু করলেন রানি।

কিন্তু পাহাড়ি লোকগুলোকে কী বলেছিলেন তিনি সেদিন তা আর ঠিকমতো মনে নেই আমার। তা ছাড়া কোনো নোটও রাখিনি আমি তাঁর ওই বক্তৃতার। তবে এটুকু খেয়াল আছে, চমৎকার আর মর্মস্পর্শী ছিল তাঁর সেই ভাষণ। আমাদের দুরবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে জানালেন তিনি, বললেন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হয়েছে—হয় লড়তে হবে, অথবা আত্মসমর্পণ করতে হবে।

নিজের ব্যাপারে বললেন, 'পরোয়া করি না আমি। আমার মা ছিলেন রানি আর তাঁর একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে আমিও তোমাদের রানি, তা ছাড়া আমার বয়সও কম, কিন্তু তারপরও জীবনের উপর কোনো মায়া নেই আমার। জোর করে কেউ বিয়ে করবে আমাকে আর তার বউ হয়ে চরম লজ্জার একটা জীবন যাপনের চেয়ে স্বেচ্ছায় তা বিসর্জন দিতে রাজি আছি আমি। যারা একদিন আমার আদেশ মানতে বাধ্য ছিল, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তাদের দাসে পরিণত হবো না আমি কোনোদিনও। কিন্তু এই ভিনদেশীদের নিয়ে খুব ভয় হয় আমার। আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার দেশে তাঁদেরকে নিয়ে এসেছি আমি, যতটুকু করা সম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে তার চেয়ে বেশি করেছেন তাঁরা আমার জন্য, একজন তো আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। এঁরা ধরা পড়লে, যশুয়া বলে রেখেছে, ভয়ঙ্কর মৃত্যু জুটবে এঁদের সবার কপালে। ভেবে বলুন, আপনারা যদি আত্মসমর্পণ করেন তা হলে কি একই দশা হবে না আপনাদেরও? এত সহজে আপনাদের সবাইকে ছেড়ে দেবে প্রতিশোধপরায়ণ যশুয়া? সুতরাং হামলা করা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে আমাদের?'

সমবেত কণ্ঠে "না, না" বলে প্রশ্নটার জবাব দিল বেশিরভাগ পাহাড়ি যোদ্ধা। কিন্তু কেউ কেউ চুপ করে থাকল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে রানির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্যালুট করল একজন বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন, তারপর বলল, 'মহামান্য ওয়ালদা নাগাসটা, আমার মনে হয় আপনার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আরও কিছু কথা বাকি থেকে গেছে যা আলোচনা করা উচিত। আপনার কি মনে হয় না, অলিভার ওর্ম নামের এই বিদেশি যোদ্ধার প্রতি আপনার ভালোবাসার কারণেই আজ আমাদের এত সমস্যা? আপনাদের রাজপরিবারের নিয়ম অনুযায়ী, একজন বিদেশির প্রতি আপনাদের পরিবারের কারও ভালোবাসা কি বেআইনি নয়? এবং আপনি কি

আমাদের ধর্মমতে ও স্বেচ্ছায় রাজকুমার যশুয়ার বাগদত্তা নন?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবলেন রানি মাকেডা, তারপর ধীরেসুস্থে বললেন, 'বন্ধু, তিনটা প্রশ্ন করেছেন আপনি আমাকে, জবাব দিচ্ছি তিনটারই। ...না, আমার মনে হয় না শুধু অলিভার ওর্ম নামের এই ভিনদেশি যোদ্ধার জন্যই আমাদের এত সমস্যা। তিনি যদি এখানে না আসতেন তা হলে আমাদের অবস্থা যে আরও খারাপ হতো না তার নিশ্চয়তা কে দিল আপনাকে? ফাংরা দখল করে নিতে পারত আমাদের এই দেশটা, আমাকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসে আপনাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে দিতে পারতেন যশুয়া। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলছি, আমার হৃদয় শুধু আমারই। এবং নিজেকে দিয়ে এই ক'দিনে যা বুঝেছি আমি, হৃদয়রাজ্যে ধর্মের শাসন চলে না, রাজপরিবারের আইন চলে না, জাতি-বর্ণ-গোত্র কোনোকিছুর বিভেদ চলে না। যদি কোনোদিন কাউকে ভালোবেসে থাকেন তা হলে চিন্তা করে বলুন আমার কথা ঠিক না বেঠিক। আর আপনার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, চাচা যশুয়ার সঙ্গে ধর্ম মেনে, স্বেচ্ছায় বাগ্দান হয়েছিল আমার, কিন্তু সেই অঙ্গীকারনামা ভঙ্গ করেছেন তিনি নিজেই, কয়েকদিন আগে। আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সশস্ত্র সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি আমার প্রাসাদে, এবং নির্বিঘ্নে যাতে সারতে পারে ওরা কাজটা তাই ওরা আসার আগেই সরিয়ে নিয়েছিলেন আমার প্রহরীদের। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় কয়েদ করতে চেয়েছিলেন তিনি? জানি না। যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে বলে জানে সবাই, এমন কোন্ ঘটনা ঘটল যার কারণে প্রকৃতপক্ষে অসহায় ওই মেয়েটাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসতে হবে রাতের ওই প্রহরে যে-সময় ঘুমিয়ে থাকে বেশিরভাগ লোক? ...আজ যদি আপনার কোনো মেয়ে থাকত, আপনি কি চাইতেন একজন কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ওই মেয়েটার বিয়ে দিতে? তা হলে আমি, এই দেশের রানি হয়ে,

অভিভাবকবিহীন একটা মানুষ হয়ে, কী করে চাইতে পারি প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বার্থপর একটা লোকের বউ হতে?'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল আমাদের মধ্যে। অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ সেই ক্যাপ্টেন বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাবে আসলে বলার মতো কিছু নেই আমার। আপনি সম্ভ্রান্ত-বংশের একজন নারী, আপনাকে পরামর্শ দেয়া আমার মতো অতি সাধারণ এক গরিব পাহাড়ির পক্ষে শোভা পায় না, তা ছাড়া আপনার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার জড়িত, তাই ভাগ্যে যা আছে আমাদের তা-ই হবে ধরে নেয়া ছাড়া আর কোনোভাবে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারি না আমরা। তবে রাজকুমার যশুয়ার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই আমি। আমার দৃষ্টিতে তিনি একটা ব্যাঙ—লম্বা জিভের ব্যাঙ। দেখতে যদিও তাঁকে অনেক ধীরস্থির মনে হয় কিন্তু তাঁর আশপাশে উড়তে থাকা একটা মাছিও ধরতে সমস্যা হয় না তাঁর। ...আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি আমরা, যুদ্ধ করেছি যশুয়ার বিরুদ্ধে, তাঁর অনেক লোক মারা গেছে আমাদের কারণে, আমরাও হারিয়েছি আমাদের কয়েকজন সঙ্গীকে। এতগুলো ঘটনার কোনোটাই ভুলে যাবেন না যশুয়া। তাই আমার মনে হয়, আমরা যা করেছি তার শেষ দেখে যাওয়া উচিত আমাদের; কারণ ফাঁসিকাঠে মরার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে মরা অনেক অনেক ভালো। আমার কথা যদি বলি, আজ রাতে বাইরে গিয়ে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি আমি, যদিও যশুয়ার সৈন্যের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তার উপর ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মুরের সাধারণ জনগণ। ...আমাদের যা অবস্থা এখন, একটা দিন যদি বেশি বাঁচতে পারি তা হলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবো আমি।'

বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলোয় দারুণভাবে আন্দোলিত হলো পাহাড়ি যোদ্ধারা। ভেবে দেখল ওরা, কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আত্মসমর্পণ করলেও মরণ, আবার লড়াই করলেও

মরণ—সুতরাং বীরের মতো মরাই ভালো। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ভোরের এক ঘন্টা আগে হামলা করবো আমরা, পালিয়ে যাওয়ার জন্য পথ বের করে নেয়ার চেষ্টা করবো। আশা করা যায়, ওদের বেশিরভাগই ঘুমিয়ে থাকবে সে-সময়, আর ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে প্রতিরোধ করার চেয়ে আতঙ্কিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। আমার মনে হয় আমাদের এই হঠাৎ আক্রমণের ব্যাপারটা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছিল আবাটিরা। আমরা যে মরিয়া হয়ে লড়বো ওদের বিরুদ্ধে, তা-ও জানত ওরা এবং এই কথা কে না জানে যে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বিড়ালও বাঘ? সুতরাং আমাদের মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না ওদের।

রাতটাও ছিল আলকাতরার মতো কালো, বিশেষ করে সূর্য ডোবার পর থেকে চাঁদ ওঠার আগ পর্যন্ত। এক ফুট দূরের জিনিস দেখা যায় না এ-রকম অবস্থা। জোরালো পুবালি বাতাসের কারণে সন্দেহজনক বেশিরভাগ শব্দই চাপা পড়ে যাচ্ছিল। পাহারায় ছিল অল্প কয়েকজন পাহাড়ি লোক, কারণ ভোররাতে হামলা করতে হবে তাই বেশিরভাগ যোদ্ধাকেই বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন রানি মাকেডা। তা ছাড়া আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে এরকম কোনো দুশ্চিন্তা বলতে গেলে ছিলই না আমাদের কারও মধ্যে।

যা-হোক, সদরদরজা-সংলগ্ন টাওয়ারে পাহারার দায়িত্বে ছিল আমার ছেলে রডরিক, ওর কান আবার খুব খাড়া; রাত আটটার দিকে খবর দিল পরিখার অপরপ্রান্তে নাকি জড়ো হচ্ছে আবাটিরা, আওয়াজ শুনেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে পরিখার দিকে দেখার চেষ্টা করলাম আমরা কয়েকজন, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। শেষপর্যন্ত ধরেই নিলাম ভুল হয়েছে রডরিকের। কাজেই যার যার জায়গায় ফিরে গেলাম আমরা, অপেক্ষা করতে লাগলাম চন্দ্রোদয়ের। কিন্তু কপাল খারাপ

আমাদের, চাঁদ উঠল না সে-রাতে, কিংবা উঠলেও দেখতে পেলাম না আমরা। আকাশ ঢাকা ছিল ঘন কালো মেঘে, বোঝাই যাচ্ছিল প্রচুর বৃষ্টি হবে, সারাদিনের বিচ্ছিরি গরমটাও কেটে যাবে একইসঙ্গে এই আশাই ছিল আমাদের মনে।

সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পর, ছাদের উপর উঠে হাঁটাহাঁটি করছিলাম আমি, কী মনে হতে পিছন ফিরে তাকালাম। যে-পর্বতের ঢালে বানানো হয়েছে প্রাসাদটা সেটার চূড়ার দিকে, মানে দেবতা হারম্যাকের মাথাটা আছে এখন যেখানে সেখানে তাকিয়ে দেখি, জ্বলন্ত কী যেন খসে পড়ল নীচের দিকে। উল্কা, ভাবলাম আমি। পাশে দাঁড়ানো অলিভারকে বললাম, 'দেখো, একটা উল্কা।'

'না, ওটা উল্কা না,' শান্ত কণ্ঠে বলল অলিভার। 'আগুন জ্বালিয়েছিল কেউ ওখানে।'

কথাটার সত্যতা টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। ওই চূড়ার উপর মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল আরও অনেকগুলো "উল্কা", তারপর আমরা এক কদম নড়ার আগেই "উল্কাগুলো" সোজা ছুটে এল আমাদের দিকে। প্রাসাদ-সংলগ্ন কাঠের যে-ছোট ছোট দালানগুলো আছে সেগুলোর উপর, আর প্রাসাদের নগ্ন কড়িকাঠগুলোর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল বড় বড় তীরের সঙ্গে সুকৌশলে বাঁধা মশালগুলো।

'ডেকে তুলুন সবাইকে!' চিৎকার দিয়ে উঠল অলিভার। 'ঈশ্বরের দোহাই ডেকে তুলুন! তা না হলে জ্যান্ত কাবাব হয়ে যাবে সবাই।'

মৌচাকের মধ্যে ঢিল পড়লে মৌমাছিদের যে-রকম অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও হলো সে-রকম। অর্ধেক ঘুম অর্ধেক জাগরণের মধ্যে থেকে, চোখ কচলাতে কচলাতে বের হয়ে এল পাহাড়ি যোদ্ধারা; কী হয়েছে জানে না হয়তো কেউই ঠিকমতো, কোথায় যেতে হবে কী করতে হবে তা-ও বুঝতে পারছে না।

এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে ওরা বিহ্বলের মতো, আর সমানে চেঁচাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই, সাহসের সঙ্গে বিপদের মোকাবেলা করার কথা মাথায় আসছে না কারোরই। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ, তারপর খালিহাতে পিটিয়ে অথবা তরবারির বাঁট দিয়ে আঘাত করে সহযোদ্ধাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল ওরা। কিছুটা হলেও কাজ হলো তাতে।

আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে লাগলাম আমরা সবাই মিলে। অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমাদের দিকে, কিন্তু কোনোটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, আবার কোনোটা বাতাসের তোড়ে নিভে গেছে। যেগুলো ঠিকমতো এসে পড়েছে সেগুলোর কারণে ভালোমতোই আগুন লেগে গেছে কম করে হলেও ছ'জায়গায় এবং ক্রমশ বাড়ছে সে-আগুন। পরিস্থিতি দেখে বুঝতে পারছি কোনো আশা নেই আমাদের। পরিখায় অনেক পানি আছে, এবং প্রাসাদের পিছনের পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসা এক বারোমেসে ঝরনার কারণে এই পানি শুকিয়ে যায় না কখনও; কিন্তু এই পানি কাজে লাগানোর কোনো উপায় নেই আমাদের হাতে। আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতি নেই, পরিখা থেকে পানি নিয়ে আসার জন্য শত শত বালতিও নেই।

তারপরও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলাম না আমরা। হাতের কাছে যে যা-ই পেলাম, পানিভর্তি করে নিয়ে এসে সে-পানি ছুঁড়ে মারতে লাগলাম আগুনের উপর। আগুন যাতে বাড়তে না-পারে সে-কাজে লেগে গেল আরেক দল—যেসব জায়গায় আগুন লেগেছে তার সঙ্গে সংযোগ আছে এরকম কড়িকাঠ, তক্তা, কাঠের বোর্ড ইত্যাদি কুপিয়ে কাটতে লাগল ওরা কুড়াল দিয়ে। কিন্তু লাভ হলো না প্রকৃতপক্ষে—একদিকের আগুন নেভাই আমরা তো আরও দু'দিকে আগুন জ্বলে ওঠে, কারণ এখনও একের পর এক উড়ন্ত মশাল ছুটে আসছে আমাদের দিকে। এই দৃশ্য যে কত

ভয়ঙ্কর, যে চোখে না দেখেছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না। অন্ধকারের চাদর ভেদ করে হঠাৎ হঠাৎ উড়ে আসছে একের পর এক মশাল, কখনও পড়ছে প্রাসাদের কোনো কড়িকাঠের উপর, কখনও কাঠের স্তূপে, আবার কখনও কোনো পাহাড়ি যোদ্ধার গায়ে। প্রাসাদের আনাচে-কানাচের আগুন, আহাজারিরত পাহাড়ি লোকজন আর ভয়ঙ্কর ওই রাতটার কালিমা দেখে আমার মনে পড়ে গেল সেই দিনটার কথা যেদিন মহাকালের অন্তে শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে বাইবেলে।

হাল ছাড়লাম না আমরা। প্রাসাদের এককোনায় এখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা চার শ্বেতাঙ্গ, আর জ্যাফেটের নেতৃত্বে কয়েকজন পাহাড়ি লোক। সমানে পানি ঢালছি আমরা চতুর্দিকে, যেখানে আগুনের কোনো ফুলকি নজরে পড়ছে সেখানেই। কালো একটা আলখাল্লায় আবৃত হয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন রানি মাকেডা, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সহচরী। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আশপাশের এই নারকীয় অবস্থার কোনোকিছুই যেন স্পর্শ করছে না তাঁকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি সামনের দিকে, কিন্তু কিছুই যে দেখছেন না আসলে তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার। তাঁর পাশেই খসে পড়ছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ, কখনও উড়ে এসে তাঁর পিছনের দেয়ালেই বিদ্ধ হচ্ছে মশালবাহী তীর, কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো বিকার নেই তাঁর। চেহারা একেবারে শান্ত, আচরণে কোনোরকম অস্থিরতা নেই।

কিন্তু তাঁর সহচরীরা ভেঙে পড়েছে একেবারেই। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদছে ওরা। আতঙ্কে ইতোমধ্যেই জ্ঞান হারিয়েছে একজন। ঘুরে ওদের দিকে তাকালেন রানি মাকেডা, কিছুক্ষণ দেখলেন ওদেরকে, তারপর যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যেতে বললেন। খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল ওরা, আর

একটা মুহূর্তও দেরি না-করে ছুট লাগাল, দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ছাদ থেকে বীভৎস একটা চিৎকার ভেসে এল এমন সময়। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, জ্বলন্ত মশালবাহী একটা তীর বিঁধে গেছে এক পাহাড়ি লোকের গায়ে; তীরের যন্ত্রণা থেকে বাঁচবে কী বেচারা, আগুনের লেলিহান শিখা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করছে সমানে, চোখের পলকে ওর পোশাক এমনকী মাথার চুলেও আগুন লেগে গেল, আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়ে ছাদ থেকে লাফ দিল সে নীচের পরিখায়।

অলিভারের অনুরোধে ছুটে গেলাম আমি রানি মাকেডার দিকে, নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার অনুরোধ জানালাম তাঁকে। কিন্তু একচুলও নড়লেন না তিনি। বললেন, 'যেখানে আছি আমাকে সেখানেই থাকতে দিন, ডাক্তার অ্যাডামস। আমার কপালে যদি মরণ লেখা থাকে, তা হলে আজ এখানেই মৃত্যু হবে আমার। তবে আমার মনে হয় না...' কী মনে হয় না তাঁর তা আর জানা হলো না, কারণ জ্বলন্ত মশালবাহী এক তীর ছুটে এসে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে, লাথি মেরে তীরটা সরিয়ে দিলেন তিনি নিরাপদ দূরত্বে। 'আমি এতদিন জানতাম আমার দেশের লোকরা লড়তে জানে না, কারণ তারা জন্মগতভাবে কাপুরুষ। কিন্তু আজ দেখলাম মানুষকে কষ্ট দিতে পারে ওরা ঠিকই—ক্ষুধার কষ্ট, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার কষ্ট। এতদিন ভাবতাম ওরা সহজ-সরল, আজ জানলাম ওরা কতখানি নিষ্ঠুর। ...ওই যে শুনুন, আগুন বাড়ছে আমার প্রাসাদে আর একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওদের বিজয়োল্লাস! ...শুনুন, কী জানতে চাইছে ওরা আমার কাছে শুনতে পাচ্ছেন? জ্যান্ত পুড়ে মরবো, নাকি আপনাদেরকে, মানে আসলে আমার অলিভারকে তুলে দেবো ওদের হাতে?' একবার তাকালেন তিনি আগুনের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াইরত অলিভারের দিকে, তারপর ভেজাচোখে, কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'না, আমার প্রাণ থাকা পর্যন্ত আমার

প্রেমকে তুলে দেবো না আমি আমার শত্রুদের হাতে। ...শুনুন, কী জানতে চাইছে ওরা আপনাদের কাছে। আগুনে পুড়ে মরবি, নাকি বাইরে এসে জবাই হবি আমাদের হাতে?' টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর দু'গাল বেয়ে, অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছেন তিনি দু'হাত। 'ঈশ্বর! এই অভিশপ্ত জাতির মধ্যে কেন পাঠিয়েছিলে আমাকে? কেন এদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলে? তোমার মৃত্যুর দেবতা আজ কোথায়? কেন তিনি হরণ করছেন না সব আবাটির প্রাণ? ...আজ আমি যা দেখলাম, যা শুনলাম, তারপর যদি কোনোদিন গজব নেমে আসে ওদের উপর আর শুধু আমার ক্ষমতা থাকে সে-গজব ঠেকানোর তা হলেও আমি বলবো ওদেরকে বাঁচাতে, বলবো না...' কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মেঝেতে। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলাম আমি তাঁর দিকে।

নীচের খোলা চত্বর থেকে তুমুল একটা হর্ষধ্বনি শোনা গেল এমন সময়। অক্ষত একটা জানালার কাছে ছুটে গেলাম আমি, বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, রানির সহচরীরা ধরা পড়েছে সৈন্যদের হাতে। আগুনের কবল থেকে বাঁচার জন্য চরম আতঙ্কিত ওই মেয়েগুলো সোজা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরিখায়, তারপর সাঁতরে পরিখা পার হয়ে হাজির হয়েছিল অপর পাড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে ঘিরে ধরে মুরের সাধারণ আবাটি আর যগুয়ার সৈন্যরা। ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে বলতে গেলে টানাহেঁচড়া শুরু হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। একজন আবার সুর করে অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিতে চিৎকার করে গাইছে, 'ঘুঘু আমার সোহাগি ঘুঘু, পুড়ে গেছে ডানা, কাছে এসো মলম লাগাই, কে করেছে মানা?'

ওই গানের একটা অংশ রানি মাকেডাকে নিয়ে গাইল লোকটা, যা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁধে রাইফেল তুললাম আমি, নিশানা করে টেনে দিলাম ট্রিগার। যে-লোকটা অশ্লীল গান গাইছিল তার কপাল ফুটো করে দিয়ে বের

হয়ে গেল বুলেট। এত অন্ধকারের মধ্যে এত দুর্দান্ত নিশানা করতে পারলাম কী করে জানি না, তবে এটা জানি ওই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনো মানুষকে গুলি করে মারিনি আমি।

যা-হোক, সরে এলাম জানালার কাছ থেকে; ভাবলাম রানি মাকেডা যা বলেছেন, অলিভারের কাছে গিয়ে তা জানাই ওকে। কিন্তু করতে পারলাম না কাজটা, কারণ তার আগেই আরও বড় একটা বিপর্যয় দেখা দিল। প্রাসাদের অনতিদূরে যে-আস্তাবলটা আছে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুকনো বিচালি মজুদ করা ছিল রানির নিজস্ব ঘোড়া আর উটগুলোর জন্য, হঠাৎ করেই আগুন ধরে গেল সেখানে এবং আমরা কিছু করার আগেই সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আগুনের লেলিহান শিখা এমনকী প্রাসাদের ছাদ ছাড়িয়ে উঠে গেল আরও উপরে। এই দৃশ্য দেখামাত্র ভেঙে পড়ল পাহাড়ি লোকদের মনোবল, দলে দলে ছুট লাগাল ওরা সদর-দরজার দিকে। আমার মনে হয় মাত্র এক মিনিটের মধ্যে, শুধু জ্যাফেট ছাড়া আর কেউ থাকল না আমরা চার শ্বেতাঙ্গ আর রানি মাকেডার সঙ্গে।

প্রাসাদের ভিতরে এককোনায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। টানাসেতুটা নামানো হলো, কে বা কারা করল কাজটা জানি না, উন্মত্ত জনতা বা সৈন্যদের ধাক্কায় ভেঙে গেল প্রাসাদের সদর-দরজা, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল যশুয়া, 'যাকে খুশি মারো তোমরা, কিন্তু যে লোক মাকেডার গায়ে একটা আঁচড়ও দেবে তাকে নিজের হাতে খুন করবো আমি। ওই মেয়ে আমার!'

কথাটা শোনামাত্র যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অলিভারের গায়ে। এক লাফে গিয়ে হাজির হলো সে রানি মাকেডার সামনে, তাঁর একটা হাত ধরল সে শক্ত করে, বলল, 'চলো।'

'কোথায়?' এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন রানি যেন শরীরে

শক্তি বলতে আর কিছুই বাকি নেই তাঁর শরীরে।

'মাটির নীচে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই শহরটাতে। যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই আমাদের, নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও নেই হাতে। সঙ্গে রাইফেল আছে আমাদের, যগুয়ার সৈন্যদের সংখ্যা যদি এক হাজারও হয় তা হলেও ওদেরকে আটকে দিতে পারবো আমরা ওই জায়গায়। ...চলো।'

মাথা ঝাঁকালেন রানি মাকেডা, বললেন, 'চলো।'

দৌড় দিলাম আমরা। কিছুদূর যাওয়ার পর টের পেলাম, আর একটা মিনিট যদি দেরি হতো আমাদের তা হলে আরও বড় বিপদে পড়তাম। আগুন ধরে গেছে প্রাসাদের একটা গম্বুজে, দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, ছাদ আর দেয়ালের বোর্ডের জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে, যেদিকেই তাকাই চোখে পড়ছে আগুনের লকলকে জিহ্বা আর কালো ধোঁয়া। একদিকের দেয়াল ধসে পড়ল হঠাৎ, কয়েক মুহূর্ত আগেও সে-জায়গায় ছিল আমার ছেলে রডরিক। বয়স কম তাই কৌতূহল বেশি ওর, গতি কমিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে কী হচ্ছে, হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনলাম আমি ওকে সে-জায়গা থেকে।

মূলত ছাদে ধরেছে আগুন, আর শিখা যেহেতু সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী তাই হাতে কিছু সময় পেয়েছি আমরা। সময়টুকু কাজে লাগালাম। আগে গেলাম যার যার শোওয়ার জায়গায়; ব্যবহার্য আর গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ছিল আমাদের এবং যা কিছু বহন করা সম্ভব, দ্রুতহাতে গুছিয়ে নিলাম সব। সৌভাগ্যক্রমে, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, আমাদের নোটবুকগুলোও নিতে পারলাম, যা পরে খুব কাজে লেগেছিল। যা-হোক, এসব জিনিস নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হাজির হলাম আমরা বড় সেই হলটাতে। সেখানে পা দেয়ামাত্র মনে হলো নরকে হাজির হয়েছি যেন—সারা ঘর ভরে গেছে কালো ধোঁয়ায়, সমানে জ্বলছে চোখ, পানি মুছতে হচ্ছে বার বার তাই ঠিকমতো তাকাতেও পারছি না সামনের দিকে,

নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া গিলে কাশছি আমরা সবাই, বাড়ন্ত আগুনের প্রচণ্ড তাপে মনে হচ্ছে ফোস্কা পড়ে যাবে শরীরে।

ঘণ্টাখানেক পর হাজির হলাম ভূগর্ভস্থ শহরটার প্রবেশমুখের কাছে। আসার সময় অন্য কারও সঙ্গে দেখা হয়নি, তার মানে হয় পালিয়ে গেছে অথবা জ্যান্ত পুড়ে মরেছে আমাদের সঙ্গীরা। কয়েকটা লণ্ঠন খুঁজে পেয়েছি আমরা, সেগুলো জ্বালিয়ে নিয়ে এগোচ্ছি এখন, কিন্তু তাতে আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার কমছে বলে মনে হচ্ছে না।

আগেও অনেকবার বলেছি, আবাটিরা খাঁটি কাপুরুষের জাত। তা না হলে আজ আমাদেরকে খুব সহজেই কাবু করতে পারত ওরা, বন্দি করে নিয়ে যেতে পারত যগুয়ার কাছে। টানাসেতুটা কাজে লাগিয়ে অনায়াসে হাজির হতে পারত ওরা প্রাসাদে, ধরতে পারত আমাদেরকে। কিন্তু আমাদেরকে ধরতে এসে আবার নিজেরাই আটকা পড়ে কি না আগুনের ফাঁদে ভেবে সাহস পায়নি কাজটা করার। আর সেজন্যই বেঁচে গেছি আমরা। আবার এমনও হতে পারে, মরিয়া পাহাড়ি যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই বেধে গিয়েছিল ওদের, সবাইকে কাবু করে পথ করে নিতে নিতে আগুন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ভিতরে ঢোকাটা আর সম্ভব ছিল না।

জ্যাফেট, অলিভার আর আমি যেভাবে বের হয়ে এসেছিলাম ভূগর্ভস্থ ওই শহর থেকে, ঠিক সেভাবে ভিতরে ঢুকলাম সবাই। তারপর হঠাৎ করেই টের পেলাম, অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে আমাদের চারপাশে। ঘণ্টাখানেক আগেও কানে বাজছিল আগুনের লেলিহান শিখার আওয়াজ, জিনিসপত্র পোড়া আর ধসে পড়ার শব্দ, মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি; আর এখন সব নিথর হয়ে গেছে। আমাদের সব উত্তেজনা যেন উবে গেছে হঠাৎ করেই। যেন মুহূর্তের মধ্যেই টের পেয়ে গেছি কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি সবাই মিলে; হিংস্র চারপেয়ে-প্রাণীর লম্বা জিহ্বার মতো জ্বলন্ত আগুনের লাল শিখা থেকে বেঁচে গেছি

ঠিকই, কিন্তু হাজির হয়েছি এমন এক জায়গায় যেখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, বরং আশপাশের এই কালো অন্ধকারই এখন আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সামনে।

প্রবেশমুখের যে-জায়গাটা পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে, ভিতরে ঢুকে সেখানে থাকতে বললাম হিগসকে, আর আমরা বাকিরা সামনের দিকে এগিয়ে চললাম মাটিতে-পড়ে-থাকা টেলিফোনের তারের উপর নজর রেখে। হিগসকে ওই জায়গায় পাহারায় না-রাখলেও চলত, কারণ পিছনে, মানে প্রাসাদে আরও কার্যকরী প্রহরী রেখে এসেছি আমরা—আগুন। সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে যতক্ষণ না আপনাথেকেই নিভবে সে-আগুন ততক্ষণ আবাটিরা ভিতরে পা দেবে বলে মনে হয় না।

একসময় আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল যে-জায়গা সেখানে হাজির হলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। কোনো লাভ নেই জেনেও গিয়ে দাঁড়ালাম অলিভারের ঘরের সামনে। বিশাল সেই পাথরটা আগের জায়গাতেই আছে এখনও। যদি থাকতে চাই তা হলে ঘরের অভাব নেই আশপাশে, কিন্তু সেসব ঘর আর বসবাসের উপযোগী নেই। বছরের পর বছর ধরে, কে জানে কোত্থেকে এসে, ওই ঘরগুলোতে আড্ডা গেড়েছে হাজার হাজার বাদুড়; আর এখন আমাদের আওয়াজ পেয়ে একটা-দুটো করে বের হয়ে আসছে আস্তানা ছেড়ে, শয়ে শয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। বাদুড়ের উৎপাত কম এরকম একটা ঘর সাফসুতরো করে গুদামঘর বানিয়েছিলাম আমরা, আমাদের প্রয়োজনীয় রসদ রাখতাম ওখানেই; মোটামুটি পরিষ্কার করে রানি মাকেডার থাকার উপযোগী করা হলো ঘরটাকে, তারপর তাঁকে গিয়ে বললাম সে-কথা।

অলিভারের দিকে তাকালেন তিনি, লণ্ঠনের আলোয় তখন হঠাৎ করেই দেখতে পেলাম তাঁর দু'চোখ ভেজা। সেই ধীরস্থির

আর আশ্চর্য মোহনীয় কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, দেখো, একবার তাকিয়ে দেখো ঘরটার দিকে। একটুখানি আলোও নেই ভিতরে, দেখলে মনে হয় যেন কারও কবর। দেশের মাটিতে শান্তি পেলাম না আমি, লোকে কুঁড়েঘরে রাত কাটায় আর আমার একটা প্রাসাদ ছিল অথচ সেখানেও থাকতে পারলাম না শেষপর্যন্ত। আজ এরকম একটা কবরই আমার দরকার। প্রার্থনা করো, ওই কবরে ঢোকামাত্র যাতে ঘুম নেমে আসে আমার চোখে, আর সেই ঘুম যাতে কোনোদিনও না-ভাঙে।

'অলিভার,' আবেগে কাঁপছে তাঁর গলা, আমাদের সবার সামনেই বলছেন তিনি তাঁর মনের কথাগুলো কারণ মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই জানলে সত্য গোপন করার প্রবণতা আর মেকি লজ্জা হয়তো আপনাথেকেই চলে যায়, 'আমার সর্বনাশ করে দিয়েছ তুমি, অথচ দেখো, এই তোমাকেই আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছি। ভবিষ্যতে কী হয় জানি না, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, যা হারিয়েছি আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। আমি জানি আজ না হয় কাল, এই অন্ধকার গুহায় আটকা থেকেই মরবো আমি, কিন্তু বিশ্বাস করো, ঈশ্বর যদি আমাকে বলতেন আমার প্রাণের বিনিময়ে কী চাই আমি তা হলে বার বার, হাজারবার তাঁর কাছে বলতাম, আমার অলিভারকে নিরাপদে ওর দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও যাতে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারে সে।'

কথাগুলো আন্দোলিত করল অলিভারকে, রানি মাকেডার দিকে এগিয়ে গেল সে, তাঁর কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল কিছুক্ষণ ধরে। শুনে দুঃখের হাসি হাসলেন রানি, আলতো করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন অলিভারকে। শুধু বললেন, 'না, তা হয় না। অন্তত এখন না।' তারপর এগিয়ে গেলে ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে।

তাঁর দিকে মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকল অলিভার।

উনিশ

আবাটিরা সম্ভবত ধরেই নিয়েছে জ্যান্ত পুড়ে মারা গেছি আমরা। ওরা হয়তো ভাবতেই পারেনি, বেঁচে গেছি আমরা সবাই, পালিয়ে চলে এসেছি এই ভূগর্ভস্থ শহরে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল হিগস প্রবেশমুখের কাছে, পরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সঙ্গে, কিন্তু কারও পায়ের আওয়াজ পেলাম না। এমন কোনো শব্দ হলো না যাতে ভেঙে খান খান হয়ে যায় চারপাশের সুনসান নীরবতা, এবং একসময় এই অখণ্ড নৈঃশব্দ্য চেপে বসল আমাদের স্নায়ুর উপর। বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনে মনে হলো যেন মস্ত কোনো ঈগল পাখি উড়ে যাচ্ছে কয়েক হাত দূর দিয়ে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলাম আমরা, কারণ বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিরত ভরাট কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিল আবার বোধহয় বিস্ফোরকের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে অদূরবর্তী হারম্যাক শহরে।

এখন আমাদের প্রথম কাজ, খাবার যোগাড় করা। মনে পড়ে গেল, অলিভার যে-ঘরে থাকত সেখানে টিনজাত কিছু মাংস আছে, ইংল্যাণ্ড থেকে সেগুলো নিয়ে এসেছিলাম আমরা। তবে আমার জানামতে বেশিরভাগ টিনই খালি হয়ে গেছে। রানি মাকেডা একবার বলেছিলেন, ফাংরা যদি কখনও অবরোধ করে, সে-কথা ভেবে তিনি নাকি কিছু কিছু করে শস্য সঞ্চয় করে রাখেন এই ভূগর্ভস্থ শহরে। তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা বলার পর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এরকম একটা জায়গায়, যেখানে,

খেয়াল করলাম, মেঝেতে লোহার আংটাওয়ালা গোল গোল পাথর বসানো আছে। ইউরোপের ছোট ছোট শহরগুলোর ফুটপাতে ওরকম পাথর বসানো থাকে, তবে আকারে আরও ছোট হয়।

আংটা ধরে টেনে বহুকষ্টে ওরকম একটা পাথর সরালাম আমরা। আমার কাছে মনে হলো, মুরের প্রাচীন রাজাদের রাজত্বকালের পর থেকে আর কেউ কখনও সরায়নি এই পাথরগুলো। যা-হোক, পাথরটা সরানোর পর বেশ বড় আর কালো একটা গর্ত দেখা গেল মাটিতে। তখনই নামলাম না কেউ গর্তে, অনেকক্ষণ খুলে রাখলাম মুখটা যাতে ভিতরের বদ্ধ বাতাস বের হয়ে আসতে পারে। তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে রডরিককে নামিয়ে দিলাম নীচে, সঙ্গে দিলাম একটা লণ্ঠন। কিছুদূর গিয়েই চিৎকার করে উঠল সে, 'উপরে তুলুন আমাকে, উপরে তুলুন! জায়গাটা মোটেও ভালো না।'

সঙ্গে সঙ্গে টেনে তোলা হলো ওকে। কী দেখেছে সে জানতে চাইলাম ওর কাছে। বলল, 'খাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই। বেশ কিছু হাড়গোড় পড়ে আছে দেখলাম, আর শত শত ইঁদুর।'

আংটা ধরে টেনে পাথর সরিয়ে পরের দুটো গর্তও দেখলাম আমরা। কিন্তু ফল একই—কোনো খাবার নেই, শুধু মানুষের কঙ্কাল আর কঙ্কাল এবং বড় বড় ইঁদুর। ব্যাপার কী জানতে চাইলাম আমরা রানি মাকেডার কাছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, তাঁর জন্মের পাঁচ প্রজন্ম আগে নাকি ভয়াবহ এক প্লেগ দেখা দিয়েছিল মুরে। এর ফলে মুরের জনসংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। যারা আক্রান্ত হয়েছিল প্লেগে তাদেরকে নাকি জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয় এই ভূগর্ভস্থ শহরে যাতে রোগ আর না-ছড়াতে পারে। কঙ্কালগুলো সম্ভবত ওই হতভাগা লোকদেরই।

কথাটা শোনামাত্র আর দেরি করলাম না আমরা, তাড়াহুড়ো করে পাথর টেনে আবার বন্ধ করে দিলাম গর্তগুলো।

amarboi.net

শস্য মজুদের কাজ কখনও তদারিক করেননি রানি মাকেডা, তাই তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন না কোথায় রাখা আছে ওগুলো। তবে রাখা আছে কোথাও না কোথাও, জোর দিয়ে বললেন কয়েকবার। তাই, আগে যে-জায়গার পাথর সরিয়েছিলাম সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে এসে, আরেক জায়গার পাথর সরালাম আমরা। এবার পাওয়া গেল, কিন্তু শস্য নয়, শস্যের গুঁড়ো, যা আর খাওয়ার উপযোগী নয়। আরও দুটো পাথর সরালাম আমরা, কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে প্রথমে হতাশ পরে আশ্চর্য হতে হলো আমাদের—কিছুই নেই!

কালো হয়ে গেল রানি মাকেডার চেহারা। অপরাধীর মতো কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আবাটিরা এই কাজ করল! আমার দেশের মানুষ আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করল? দেশের কথা ভেবে মজুদ করার জন্য সেনাবাহিনীর অফিসারদের দিয়ে শস্য পাঠিয়েছিলাম আমি এই জায়গায়, আর ওরাই সব চুরি করে ফেলল? এতদিন এই লোকগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি আমি রাজা বারুং-এর আক্রোশ থেকে?'

আমাদের যার যার ঘুমানোর জায়গায় ফিরে গেলাম আমরা নিঃশব্দে। চুপ হয়ে গেছি সবাই, কারণ খাবার যা আছে তা দিয়ে আর এক বেলা, বড়জোর দু'বেলা চলবে। পানি আছে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু শুধু পানি খেয়ে তো আর চলে না।

কী করা যায় তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সেরে নিলাম আমরা নিজেদের মধ্যে। অলিভার বলল, 'যে-সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলাম আমরা সেটা ধরে যদি এগিয়ে যেতে পারি তা হলে সরাসরি হাজির হবো সিংহের গুহায়। আমার মনে হয় বিস্ফোরণের কারণে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে গুহাটা, তাই একটাও সিংহ নেই আর। ফাংরাও পালিয়েছে, কাজেই হারম্যাকে যদি হাজির হতে পারি তা হলে কিছু-না-কিছু খাবার জুটবেই কপালে।'

'চলো তা হলে,' বললাম আমি।

boiRboi.net

প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে গিয়ে দেখি, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জায়গাটা, এখানে-সেখানে আলগা মাটি আর পাথরের স্তূপ। তবে হাঁটা যাবে ওখান দিয়ে, কিন্তু কষ্ট হবে খুব। কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে আছে হাড়গোড়, সোনার জিনিসপত্র আগে যেমন সাজানোগোছানো ছিল এখন সব এলোমেলো হয়ে গেছে, উল্টে পড়ে আছে পাথরের চেয়ারগুলো। তবে ভাগ্য ভালো আমাদের—জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরার কথা বাদ দিলে মূল গুহার ছাদ আর দেয়াল বলতে গেলে অক্ষতই আছে।

'কী নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ!' ঐতিহাসিক জিনিসপত্রের ক্ষতি দেখে আমাদের এই দুরবস্থার মধ্যেও রেগে গেল হিগস, 'আগেই বলেছিলাম এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাই। তখন কাজটা করতে দাওনি তুমি আমাকে, অলিভার। আফসোস! যদি দিতে তা হলে সবকিছু এভাবে নষ্ট হয়ে যেত না।'

'না দেয়ার কারণ আছে। কোনো না কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যেত কথাটা, তখন সবাই ভাবত এত সোনা দেখে লোভ সামলাতে পারিনি আমরা, তাই চুরি করছি। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গের পাহাড়ি লোকগুলো ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এমনিতেই কাজ করতে চাইছিল না ওরা, আর এই হাড়গোড় সরানোর কথা বললে তো রাতারাতি পালাত। আর সরিয়ে কোথায় নিয়ে রাখতেন আপনি? মাকেডার প্রাসাদে? কোনো লাভ হতো? পুড়ে নষ্ট হতো সব।'

কুঁজোপিঠের সেই বিশাল রাজা যে-চেয়ারে বসে ছিলেন, তার নীচ থেকে খোঁড়া হয়েছিল সুড়ঙ্গটা; ওই জায়গায় হাজির হওয়ামাত্র সব আশা শেষ হয়ে গেল আমাদের। পাথর আর মাটি দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা, এবার ডিনামাইট ফাটালেও বোধহয় পরিষ্কার করা যাবে না এত মাটি আর পাথর। এবং আমাদের কাছে একটা ডিনামাইটও বাকি নেই।

সুতরাং আর কোনো উপায় না-দেখে ফিরে এলাম আমরা।

কয়েক ঘণ্টা যেতে-না-যেতেই আরেকটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। লণ্ঠন বা মশাল জ্বালানোর কাজে যে-খনিজ তেল ব্যবহার করে আবাটিরা, খেয়াল করে দেখলাম, সেই তেল আর খুব বেশি বাকি নেই আমাদের কাছে। আর যতটুকু তেল আছে তা দিয়ে চারটা লণ্ঠন বেশি হলে তিন দিন তিন রাত জ্বালানো যাবে। চারটা লণ্ঠনই কাজে লাগবে আমাদের; কারণ একটা ব্যবহার করবেন রানি মাকেডা, একটা আমরা, ভূগর্ভস্থ শহরে ঢোকার বন্ধ মুখের কাছে আমাদের যে-কোনো একজন পাহারায় থাকে সবসময়—ওর কাছে থাকবে একটা, আরেকটা টুকিটাকি কাজের জন্য।

টুকিটাকি কাজের ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। করার কিছু নেই, এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও সহ্য করা যায় না বেশিক্ষণ, তাই কিছু একটা নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য অদ্ভুত উপায়ে সময় কাটাতে শুরু করেছে হিগস। লণ্ঠন আর বড় একটা ঝুড়ি নিয়ে প্রতিদিন যায় সে প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানে, জানি না কীভাবে মাটি সরিয়ে বের করে আনে সোনার জিনিসপত্র আর সেগুলো ভরে ওই ঝুড়িতে, তারপর ঝুড়িটা আবার বহন করে নিয়ে আসে আমাদের থাকার জায়গায়। যেসব জিনিস নিয়ে আসে সেগুলো একটা একটা করে বের করে ঝুড়ি থেকে, তারপর ওর নোটবুকে কী সব যেন লিখে রাখে। লেখালেখি শেষ হলে বিস্ফোরকের খালি বাক্স এনে ওগুলোতে যত্ন করে ভরে জিনিসগুলো। তারপর বাক্সগুলো ঠেস দিয়ে রাখে একদিকের দেয়ালের সঙ্গে।

প্রথম প্রথম কিছু বলিনি, কিন্তু একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম ওকে, 'এই পাগলামি করার মানে কী, হিগস? কোনো লাভ হবে এই কাজ করে? আর বেশি হলে এক সপ্তাহ বাঁচবো আমরা, তারপর মরে যাবো না-খেতে পেয়ে। তখন কী কাজে লাগবে তোমার এই গবেষণা আর এই নোটবুক?'

'জানি না,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল সে, কারণ আমাদের আর

সবার মতো শুধু পানি খেয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে গত কয়েকদিন ধরে, শুকিয়ে গেছে বেচারা এই ক'দিনেই, 'আসলে ভালো লাগে কাজটা করতে, তাই করি। কেন ভালো লাগে জানো? কাজ করতে করতে কল্পনা করি, একদিন লণ্ডনে, আমার বাড়িতে আরাম করে বসে এই বাক্সগুলো খুলবো, ভিতরের জিনিসগুলো বের করে আরও ভালোমতো দেখবো, তবে তার আগে মজার মজার সব খাবার পেট ভরে খাবো।' জানি না কোন্ খাবারের কথা চিন্তা করে ঠোঁট চাটল সে কয়েকবার। 'একটা একটা করে সোনার জিনিস বের করবো আর দেখাবো ... ...' লণ্ডনের কয়েকটা সুপরিচিত যাদুঘরের বড় বড় কয়েকজন কর্মকর্তার নাম বলল সে, 'আমার কালেকশন দেখে রাগে আর হিংসায় চুল ছিঁড়বে ওরা।' উন্মত্তের মতো হাসল সে কিছুক্ষণ, তারপর আবার বলল, 'আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। তবে আমার মনে হয় না কোনোদিন সে-ভাগ্য হবে আমার। না-হোক, ক্ষতি নেই, আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশ' বছর পরে হয়তো আমার মতোই একজন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পা রাখবেন এখানে, খুঁজে পাবেন এসব জিনিস আর আমার নোটবুকটা। যদি ভালোমানুষ হন তিনি, আশা করি আমার বর্ণনাগুলো আমার নাম দিয়েই প্রকাশ করবেন। আর সত্যিই যদি বিশ্ববাসীর কাছে আমার কথাগুলো প্রকাশিত হয় তা হলে অমর হয়ে যাবো আমি। ...যাই, কাজ শুরু করি আবার। আরও চারটা বাক্স খালি আছে, তেল শেষ হওয়ার আগেই সেগুলো যতটা সম্ভব ভরে ফেলতে হবে।'

প্রাচীন রাজাদের কবরস্থানের মাটি-পাথর সরিয়ে সোনার জিনিস বের করা, সেগুলো বহন করে নিয়ে আসা, ক্যাটালগ বানানো এবং সবশেষে বাক্সবন্দি করা—আমরা বলতে গেলে মড়ার মতো একদিকে পড়ে থাকলেও হিগসের এই কাজ চলল বিরতিহীনভাবে। মনে আছে, সবশেষে, সোনা দিয়ে বানানো বিরাট একটা মানুষের-মাথা নিয়ে এসেছিল সে। মুরের কোনো

এক রাজার চেহারার আদলে বানানো হয়েছিল মাথাটা কোনো এক কালে। জিনিসটা এত ভারী ছিল যে, ক্ষুধায় দুর্বল হিগসের পক্ষে সেটা বহন করা সম্ভব হয়নি। তাই মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসে সে জিনিসটা। আর এই কাজ করতে গিয়ে সোনার ওই চেহারাটার নাকটা উধাও হয়ে যায় কোথায় যেন। একটা উষ্ণীষ ছিল জিনিসটার কপালে, সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিছুটা।

অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে যখন আমাদের সামনে দাঁড়ায় হিগস, সেই স্মৃতি বোধহয় ভুলতে পারবো না আমি কোনোদিন। এমনিতেই কাহিল বেচারা, তার উপর মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে—পা দুটো কাঁপছে ওর থরথর করে। পরনের কাপড় ফুটো হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। বহুকষ্টে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে সে ওই জিনিসটা, সর্বশক্তিতে ধাক্কা দিয়েও একেকবারে এক ফুটের বেশি সরাতে পারছে না ভারী চেহারাটাকে।

'নিয়ে এসেছি!' আমাদের কাছাকাছি এসে বিজয়ীর হাসি হাসল সে, কিন্তু বড় দুর্বল হয়ে দেখা দিল হাসিটা ওর চেহারায়, 'জ্যাফেট, এখানে এসো তো। হাত লাগাও আমার সঙ্গে। ...এই মাদুরটা দিয়ে প্রথমে পেঁচিয়ে ফেলো জিনিসটাকে। তারপর দু'জনে মিলে তুলে নিয়ে ভরবো এই বাক্সে। ...না, না, গাধা, চেহারাটা উপরের দিকে থাকবে—নাকটা তো গেছেই, পরে চোখ, ঠোঁট এসব কিছুই আর থাকবে না। ...হুঁ, বাক্সের অনেকখানি খালি রয়ে গেছে এখনও, তা-ই না? দাঁড়াও,' শার্ট আর প্যান্টের পকেট থেকে সোনার কয়েন এবং সোনার আরও কিছু ছোট ছোট জিনিস ঢালতে লাগল সে বাক্সের ভিতরে। তারপর বাক্সটা ভালোমতো বন্ধ করে দিয়ে জ্যাফেটের সাহায্যে সেটা মুড়ে দিল ছাগলের লোম থেকে বানানো একটা কম্বল দিয়ে, নিজের বিছানা থেকে এই কম্বলটা নিয়ে এসেছে সে।

কাজ শেষে বাক্সের উপর বসল সে, নোটবুকটা বের করে

boiRboi.net

আনার জন্য হাত দিল পকেটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। খুব কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, টলমল পায়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে, পানির ছিটা দিলাম ওর চোখেমুখে। নিজেও জোর পাচ্ছিলাম না খুব একটা, তাই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম ওর পাশে। আর ঠিক তখনই নিভে গেল আমাদের একটা লণ্ঠন।

'লণ্ঠনটা জ্বালাও, জ্যাফেট,' বললেন রানি মাকেডা। 'বড় বেশি অন্ধকার এখানে।'

'ও ওয়ালদা নাগাসটা, আপনার আদেশ পালন করতে পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তেল শেষ হয়ে গেছে।'

আধ ঘণ্টা পর নিভে গেল আরেকটা লণ্ঠন। আর দুটো বাকি আছে, ওই দুটোও নিভে যাওয়ার আগে টুকটাক কাজ যা আছে সেরে নিলাম আমরা বহুকষ্টে, অনেক সময় খরচ করে। টুকটাক কাজ মানে পানির দুটো জার পূর্ণ করা, পিস্তল-রিভলভার-রাইফেল আর বুলেট হাতের কাছে রাখা, এবং বেশ কয়েকটা কম্বল একটার পাশে আরেকটা বিছিয়ে সেগুলোর উপর সবাই পাশাপাশি শুয়ে পড়া। শক্তি বলতে যা বাকি ছিল আমার শরীরে তার প্রায় সবটুকু খরচ করে আমার কম্বলের উপর যখন গিয়ে শুয়ে পড়লাম তখন মনে মনে বললাম, এই তা হলে আমার মরণশয্যা।

জানি না কতক্ষণ ওভাবে শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ টের পেলাম, হামাগুড়ি দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, জ্যাফেট। প্রবেশমুখের কাছে পাহারায় ছিল সে এতক্ষণ, কিছু একটা হয়েছে তাই চলে এসেছে আমাদেরকে জানাতে।

আর একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে, জ্বলছে না-বলে নিভে যাচ্ছে বলাই ভালো, সেই অনুজ্জ্বল আলোয় খুবই মলিন দেখাল জ্যাফেটের চেহারাটা। মনে হলো মানুষ নয়, যেন কবর থেকে

বের হয়ে এসেছে কোনো প্রেতাত্মা।

মুখ খুলল জ্যাকেট, আমার মনে হলো আর্তনাদ করছে সে, 'আমার লণ্ঠন নিভে গেছে! পাহারায় ছিলাম আমি, তখন হঠাৎ নিভু নিভু হয়ে গেল, তারপর একবার লাফিয়ে উঠেই নিভে গেল শিখা। "কথা-বলা-তার" যদি না-থাকত, তা হলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারতাম না আমি আপনাদের কাছে। ওই তার ধরে হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হয়েছি এখানে।'

'যাক, হাজির হতে পেরেছ, এ-ই বেশি,' বলল অলিভার। 'কিছু বলার আছে তোমার?'

'না, তেমন কিছু না। আপনারা শুনেছেন কি না জানি না, আমি যে-জায়গায় পাহারায় ছিলাম সেখান থেকে অনেক আস্তে শোনা গেছে আওয়াজটা। কী যেন ধসে পড়েছে, সম্ভবত প্রাসাদের কোনো একদিকের দেয়াল। লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়েছি আমি—নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন কথা বলছিল ওরা। টুকরো টুকরো কিছু কথা ভেসে এসেছে আমার কানে। একজন বলছিল, "ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। ওয়ালদা নাগাসটা আর তাঁর বিদেশি বন্ধুরা যদি আগুনে পুড়ে মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁদের কঙ্কাল গেল কই? বিদেশি লোকগুলোর সঙ্গে সবসময় বন্দুক থাকত, সেগুলো গেল কই?" আরেকজন তখন জবাব দিল, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। কিন্তু ওরা সবাই যাদুকর, হয়তো যাদু করে সব উধাও করে দিয়ে গেছে।" ...লোকগুলো খুব বেশি দূরে ছিল না, ওরা হয়তো টের পেয়ে গেছে আমরা লুকিয়ে আছি এখানে।'

কিছুই বললাম না আমরা। বলার মতো কিছু নেইও আসলে। হিগস বাদে বাকিরা উঠে বসেছি যার যার কম্বলের উপর, নিভন্ত লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে আছি সবাই। উজ্জ্বলতা কমতে কমতে শিখাটা কাঁপতে শুরু করল একসময়, দূরবর্তী দেয়ালে নাচতে শুরু করল আমাদের ছায়াগুলো, আর এই দৃশ্য দেখে ভয়ে মাথা খারাপ

হয়ে গেল জ্যাফেটের।

'ও ওয়ালদা নাগাসটা,' যেন কেঁদেই ফেলবে বেচারা, রানির পায়ের কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বসেছে সে, 'আপনি বলেছেন আমি নাকি একজন সাহসী লোক। কিন্তু যেখানে সূর্য বা তারা আছে, অথবা নিদেনপক্ষে লণ্ঠনের আলো আছে, আমি শুধু সেখানেই সাহসী। এখানে, এই অন্ধকারের মধ্যে, আমি জানি হাজার হাজার বদরাগী প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার আমার পেটেও জ্বলছে ক্ষুধার আগুন, কাজেই আমার মধ্যে এখন আর একফোঁটাও সাহস নেই। আমি এখন মুরের সবচেয়ে বড় কাপুরুষ, এমনকী রাজকুমার যশুয়াও আমার মতো কাপুরুষ নন। ...সময় থাকতেই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত আমাদের। জানি ধরা পড়বো আবাটিদের হাতে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, রাজকুমার যশুয়া দয়া করলেন আমাদের সবার উপর, ছেড়ে দিলেন আমাদের সবাইকে? এমনিতেও তো মারা যাচ্ছি আমরা, একটা সুযোগ নিতে অসুবিধা কী? আর আমার মনে হয় আপনাকে কিছু বলবেন না তিনি। যা-ই থাকুক আমার কপালে, অন্তত সূর্যের আলোর নীচে মরতে চাই আমি, এই অন্ধকার গুহায় মরে ভূত হতে চাই না।'

কিন্তু মাথা নাড়লেন মাকেডা, নীরবে জানিয়ে দিলেন জ্যাফেটের প্রস্তাবে সম্মত নন তিনি।

অলিভারের দিকে তাকাল জ্যাফেট। 'প্রভু, আপনি কি চান আপনার হাতে রানি মাকেডার রক্ত লেগে থাকুক? আপনার জন্য তিনি লুকিয়ে আছেন এই গুহায়, আপনি কি চান আপনার জন্য এভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করুন তিনি এখানে? এভাবেই কি তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দেবেন আপনি? বের করে নিয়ে যান তাঁকে। আমাদের যা হয় হবে, কিন্তু অন্তত তাঁর তো ক্ষতি করবেন না রাজকুমার যশুয়া?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল অলিভার, তারপর রানিকে বলল,

boiRboi.net

'জ্যাফেট ভুল বলেনি, মাকেডা। এখানে থাকি বা বাইরে যাই, মৃত্যু আমাদের জন্য অবধারিত। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি কেন কষ্ট করছ আমাদের জন্য? তোমার বাইরে চলে যাওয়া উচিত। কেউ কিচ্ছু বলবে না তোমাকে।'

'কেউ কিছু না-বলুক, কিন্তু একজন ঠিকই বলবে,' আবেগে কাঁপছে রানি মাকেডার কণ্ঠ, 'জানি কেউ হাত দেবে না আমার গায়ে, কিন্তু একজন ঠিকই দেবে। আর ওই ঘৃণ্য হাত আমাকে স্পর্শ করার আগে একবার কেন হাজারবার মরতে রাজি আছি আমি। যদি আমরা দু'জনই মারা যাই এখানে, এ-জীবনে পাবো না একজন আরেকজনকে, কিন্তু পরের জীবনে আমি শুধু তোমারই হবো, অলিভার, শুধু তোমার। ...এখন যেতে বলো জ্যাফেটকে, ওর কথা শুনতে ভালো লাগছে না আমার।'

আরও নিভু নিভু হলো লণ্ঠনটা; একবার, দু'বার, তিনবার কেঁপে উঠল শিখা, তারপর শেষবারের মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে নিভে গেল চিরতরে।

তারপর, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। একটুখানি আলোও নেই কোথাও। সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেললাম আমরা। আমার মনে হয় টানা তিন দিন তিন রাত ছিলাম আমরা ওখানে, ওই অন্ধকারের মধ্যেই। কীভাবে কেটেছিল সেই সময়টা তার বিস্তারিত বর্ণনা দেবো না, তা ছাড়া আমার মনেও নেই ঠিকমতো, কারণ আমার মনে হয় আমার চেতনা ঠিকমতো কাজ করছিল না তখন। প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা খেয়াল আছে আমার, খেয়াল আছে পানি ছাড়া পেটে দেয়ার মতো আর কিছু ছিল না আমাদের কাছে। মনে আছে, একবার একটা বাদুড় উড়তে উড়তে সম্ভবত দিকভ্রান্ত হয়ে বাড়ি খায় হিগসের চুলের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে থাবা দিয়ে বাদুড়টা ধরে ফেলে সে, তারপর কাঁচাই খেতে শুরু করে সেটার মাংস। আমাকেও সেধেছিল, রাজিও হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত পারিনি।

boighar.net

শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া অল্প কয়েকটা বিস্কিট ছিল আমার কাছে, কিন্তু সেগুলো রেখে দিয়েছিলাম আমি রানি মাকেডার জন্য। মজার কথা হলো, শুধু তাঁর কপালেই জুটেছে সেসব বিস্কিট। কীভাবে, বলি। যখন আমার কাছে মনে হতো আর পারছি না, এবার পেটে কিছু না-গেলেই নয়, তখন কোনোরকমে গলা চড়িয়ে ঘোষণা করতাম, খাওয়ার সময় হয়েছে। আমার কথা শুনে উঠে বসত সবাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে, কিছুই দেখা যায় না, তাই কাকে কী দিচ্ছি তা বুঝতে পারতেন না রানি মাকেডা। একটা করে বিস্কিট দিতাম তাঁকে, তিনি আস্তে আস্তে খেতেন, আর আমরাও খাওয়ার অভিনয় করতাম (এ-ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আগেই শলা-পরামর্শ করে রেখেছিলাম আমরা), শব্দ করে ঠোঁট চাটতাম আর বলতাম অন্তত আরও একটা বিস্কিট পেলে খুব ভালো হতো, কবে যে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো ইত্যাদি ইত্যাদি। রানি মাকেডা আমাদের এই চালাকি ধরতে পেরেছিলেন কি না জানি না।

আমার হিসেবে ভুল না-হলে আটচল্লিশ ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় ধরে চলল আমাদের এই ভয়াবহ অবস্থা। তারপর ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-ভয়ে পাগলপারা হয়ে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল আমাদেরই এককালের অতি-বিশ্বস্ত জ্যাফেট। কীভাবে করল সে কাজটা সঠিক বলতে পারবো না, ভুলে গেছি। হয় রানি মাকেডাকে সরাসরি বলেই ফেলেছিল সে আমাদের এই অভিনয়ের কথা, অথবা ওর কারণেই রানি টের পেয়ে যান কোনো একটা গণ্ডগোল ঘটছে আমাদের খাওয়ার সময়। যা-হোক, আর মাত্র একটা বিস্কিট তখন বাকি ছিল আমার কাছে, ধরা যখন পড়েই গেছি তখন আর অভিনয় করা যায় না তাই বিনীতভাবে সাধলাম আমি সেটা রানি মাকেডাকে, তিনিও ধন্যবাদ দিয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে সেটা, তারপর দিয়ে দিলেন জ্যাফেটকে। শিকারের উপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে

ক্ষুধার্ত নেকড়ে সেভাবে বিস্কিটটা খেল জ্যাফেট।

এই ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর, উদ্বিগ্ন হয়ে খেয়াল করলাম আমরা, জ্যাফেট নেই, কোথায় যেন চলে গেছে আমাদেরকে না-বলে। সে যে-কম্বলের উপর ছিল, তার উপর হাত বুলালাম বার বার, কিন্তু রক্তমাংসের কোনো শরীর স্পর্শ করতে পারলাম না। ওর নাম ধরে ডাকলাম বেশ কয়েকবার, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ধরে নিলাম, মরার সময় হয়েছে টের পেয়ে দূরে সরে গেছে সে। কিন্তু আমাদের এই অনুমান যে কত বড় ভুল ছিল তা টের পেলাম আরও কিছুক্ষণ পর।

খাবার নেই, পানি নেই, নড়াচড়া করার শক্তি নেই শরীরে; অদ্ভুত এক ক্লান্তি পেয়ে বসেছে আমাদের সবাইকে, ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ কিন্তু তারপরও ঘুমাতে পারছি না, বুঝতে পারছি চেতনার বিলুপ্তি ঘটলেই ভালো হয় কিন্তু তারপরও জ্ঞান হারাচ্ছি না। ব্যথা-বেদনা যা ছিল শরীরে সব উধাও হয়ে গেছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিও নেই। হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছি আমরা হঠাৎ করেই, আজেবাজে বকছি অনেকক্ষণ ধরেই। ফাং, আরও কয়েকটা বর্বর গোত্র, এদের পূজা—এসব নিয়ে একাই বকবক করে গেল রডরিক লম্বা সময় ধরে। তারপর শুরু করল গান, প্রথমে ইংরেজি পরে আরবি ভাষায়। অতি উৎসাহী হয়ে রানি মাকেডাকে ইংরেজি ভাষা শেখাতে শুরু করল অলিভার, আর রানিও হাসতে হাসতে তাল মেলাতে লাগলেন ওর সঙ্গে।

কেন যেন ম্যাচকাঠি জ্বালিয়েছিল হিগস, আর তার আলোয় শেষ যে-দৃশ্যটা মনে আছে আমার তা হলো, রানি মাকেডার পাশে বসে আছে অলিভার, একটা হাত দিয়ে রানির কোমর জড়িয়ে ধরে আছে সে, অলিভারের কাঁধে মাথা রেখেছেন রানি, মায়ায়-ভরা বড় বড় দুই চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কিন্তু দেখছেন না কিছুই। মমির মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে আমার ছেলে রডরিক,

উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাচ্ছে এদিকে-ওদিকে। ওর ঠিক পাশেই বসে আছে হিগস, পেন্সিল দিয়ে কী যেন লেখার চেষ্টা করছে বাতাসে। ওর বাঁ হাতে জ্বলছে ম্যাচকাঠিটা।

তারপর আরও বেশি, অনেক বেশি গাঢ় হলো অন্ধকার, বুঝতে পারলাম মারা যাচ্ছি আমি।

জানি না কত মিনিট বা কত ঘণ্টা বা কত দিন পর খুব অস্পষ্টভাবে টের পেলাম, কে বা কারা যেন বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। কানে এল লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ, কিন্তু তারা কী বলছিল বুঝতে পারলাম না কিছুই। হঠাৎ করেই সাদা একটা চাদর দেখতে পেলাম চোখের সামনে, আসলে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে। তীব্র সেই আলোর কারণে বলতে গেলে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি, রীতিমতো ব্যথা করতে শুরু করল আমার দুই চোখ। আমার মুখটা হাঁ করে ধরল কারা যেন, তারপর গরম পানি বা ওই জাতীয় কিছু ঢেলে দেয়া হলো আমার মুখের ভিতরে। গিলতে পেরেছিলাম কি না মনে নেই, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি আমি ততক্ষণে।

ঘুম ভাঙলে দেখি, বড় একটা ঘরে একটা বিছানার উপর শুয়ে আছি। এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না এটা কোন্ ঘর। জানালা দিয়ে রোদ আসছে, তার তেজ দেখে বুঝলাম কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে; রডরিক, হিগস আর অলিভারকেও একই ঘরে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। আলাদা আলাদা খাটে শুয়ে আছে ওরা, কিন্তু ঘুম ভাঙেনি কারোরই।

এমন সময় খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল কয়েকজন আবাটি ভৃত্য। একজাতের বাজে সুপ, তাতে মাংসের ছোট ছোট টুকরো ভাসছে। একটা কাঠের বোলে করে কিছুটা সুপ দিল ওরা আমাকে, গোগ্রাসে গিললাম। ধাক্কা দিয়ে আমার সঙ্গীদেরকেও ঘুম থেকে জাগাল ওরা, তারপর সেই একই কায়দায় কাঠের বোলে করে সুপ খাওয়াল প্রত্যেককে। খাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা, আমিও

ঘুমিয়ে পড়লাম; সবাই বেঁচে আছি দেখে ধন্যবাদ দিলাম ভাগ্যকে ঘুমানোর আগে।

একই ঘটনা ঘটতে লাগল কয়েক ঘণ্টা পর পর—আবাটি ভৃত্যরা সুপের বোল নিয়ে ঘরে ঢোকে, ঘুম থেকে ডেকে তোলে আমাদেরকে, চেটেপুটে খাই আমরা সবটুকু সুপ, তারপর আবার ঘুমিয়ে যাই।

শেষপর্যন্ত উঠে বসলাম আমি বিছানার উপর, হিগসও তখন বসে আছে ওর খাটের উপর, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'পুরাণে পড়েছিলাম,' বলল সে, 'মারা যাওয়ার পর মড়ার আত্মা নাকি কোথায় যায়। কী মনে হয়? আমরা কি এখন সেখানে আছি, নাকি যে-কোনোভাবেই হোক বেঁচে গেছি?'

'আবাটিরা যখন আছে আমাদের সঙ্গে, তার মানে পৃথিবীতেই আছি মনে হয়,' বললাম আমি।

'খাঁটি কথা,' আমার সঙ্গে তাল মেলাল হিগস। 'মরার পরে যাওয়ার মতো একটাই জায়গা আছে আবাটিদের—নরক। যেখানে এই ঘরটার মতো সাদা-রঙ-করা দেয়ালওয়ালা কোনো ঘর নেই, আর ঘুমানোর জন্য চার পা-ওয়ালা কোনো বিছানা নেই। ...অলিভার, ওঠো। আবাটিরা বের করে এনেছে আমাদেরকে ওই ভয়ঙ্কর গুহার ভিতর থেকে।'

দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল অলিভার, তাকাল আমাদের দিকে। 'মাকেডা কোথায়?'

প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই আমাদের, তাই চুপ করে থাকলাম।

রডরিকেরও ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে বসল সে বিছানায়। বলল, 'একটা কথা মনে পড়েছে। ওই গুহার ভিতর থেকে আমাদের সবাইকে বের করে নিয়ে আসে ওরা। ওদের সঙ্গে তখন ছিল জ্যাফেট। আমাদেরকে যখন বহন করে নিয়ে আসছিল ওরা, তখন রানি মাকেডাকে নিয়ে যায় একদিকে, আর আমাদেরকে নিয়ে আসে আরেকদিকে। এটুকু দেখার পর জ্ঞান হারাই আমি।'

কিছুক্ষণ পর আবার দেখা মিলল সেই আবাটি ভৃত্যদের। এবারও সঙ্গে করে খাবার নিয়ে এসেছে ওরা, তবে সুপ নয়, শক্ত কিছু। ওঝামার্কা এক লোকও আছে সঙ্গে; ঘরে ঢুকেই আমাদের সবাইকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগল উজবুকটা। কাজ শেষে উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা করল, কোনো সমস্যা নেই, এ-যাত্রা নাকি বেঁচে গেছি আমরা। কোথায় আছি, কী হচ্ছে এসব নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম আমরা লোকটাকে, কিন্তু একটা প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না সে। বোঝা গেল মুখ বন্ধ রাখার কঠোর আদেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে। যা-হোক, পানি নিয়ে আসার অনুরোধ জানালাম আমরা ওদেরকে, কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। অনুরোধটা রাখল ওরা, পানি নিয়ে এল আমাদের জন্য। সঙ্গে করে পলিশ-করা বড় একটুকরো ধাতুখণ্ডও নিয়ে এল। আয়নার বিকল্প হিসেবে এই জিনিসটা ব্যবহার করে আবাটিরা। ওই ধাতব আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হলো আমাদের।

আবাটিদের সতর্ক ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি, যতই সেবা করুক আমাদের, আসলে আমাদেরকে পাহারা দিচ্ছে ওরা। এবং সম্ভবত; আমরা যদি উল্টোপাল্টা কিছু করি তা হলে আমাদেরকে মেরে ফেলার আদেশ আছে ওদের উপর। ভালোমতো তাকালাম আমি লোকগুলোর দিকে। শান্ত চেহারা একেকজনের, চোখে খুনী দৃষ্টি। ঠোঁটের কোনায় উপহাসের হাসি যা দেখে বোঝা যায় আপাতত বেঁচে থাকলেও সময় আর বেশি বাকি নেই আমাদের হাতে।

যে-ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে আমাদেরকে সে-ঘরের বাইরে থেকে উত্তেজিত জনতার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেলাম আমরা সেদিন সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের পর; রীতিমতো শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, "দেশদ্রোহীর ক্ষমা নাই, চার বিদেশির রক্ত চাই", "অপেক্ষা ফুরাক আজ রাতে, বিদেশিদের দাও আমাদের হাতে" ইত্যাদি

ইত্যাদি। শেষপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলো সৈন্যরা, ছত্রভঙ্গ করে দিল উন্মত্ত জনতাকে।

ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে লাগলাম আমরা। কিন্তু ওই কথা বলা পর্যন্তই, আসলে কিছুই করার নেই আমাদের। মাকেডা ছাড়া এই দেশে এখন আর কেউ নেই যে সাহায্য করতে পারে আমাদেরকে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রানি নিজেও বন্দি হয়ে আছেন যশুয়ার হাতে। হয়তো সে-কারণেই যোগাযোগ করতে পারছেন না আমাদের সঙ্গে। এদিকে পালানোরও কোনো উপায় নেই আমাদের।

'ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে,' মন্তব্য করল হিগস। 'ওরা যদি আমাদেরকে বের করে নিয়ে না-আসত ওই গুহার ভিতর থেকে তা হলে ভালো হতো। ক্ষুধায় মরেই গিয়েছিলাম, ভালোই হয়েছিল একদিক দিয়ে, এবার না জানি কত কষ্ট দিয়ে মারবে এই হারামিগুলো আমাদেরকে! আমার তো মনে হয় আবাটিদের মতো বজ্জাতদের হাতে মার খেয়ে মরার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভার, বুঝতে পারলাম বেশিরভাগ সময় চুপ করে থেকে রানি মাকেডার কথাই ভাবছে সে, 'মারতে মারতে মেরে ফেলবে বলেই আমাদেরকে বের করে নিয়ে এসেছে ওরা ওই গুহার ভিতর থেকে। শোনেননি কী শ্লোগান দিচ্ছিল ওরা আমাদের নিয়ে? দেশদ্রোহী। জানি না কী শাস্তি হবে আমাদের, তবে তা যে খুব নিষ্ঠুর কিছু হবে তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার।'

পকেট থেকে ছোট্ট একটা বোতল বের করলাম আমি এমন সময়। সবাইকে দেখিয়ে বললাম, 'আমার ওষুধের বাক্সের মধ্যে এই বোতলটাও থাকত সবসময়, তবে একেবারে আলাদা করে রাখতাম আমি এটা সবসময় যাতে সহজে কেউ নিতে না-পারে। তোমাদের হয়তো খেয়াল আছে, রানি মাকেডার প্রাসাদে অবরুদ্ধ

থাকা অবস্থায় সব ওষুধ শেষ হয়ে যায় আমার, তখন এই বোতলটা রেখে দিই আমি আমার কাছে। কারণ ভেবেছিলাম পরে হয়তো কখনও কাজে লাগবে। আজ মনে হয় সময় হয়েছে এই বোতলের ট্যাবলেটগুলো কাজে লাগানোর।'

'কী আছে এতে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল অলিভার।

'বিষ। এই বোতলের সবগুলো ট্যাবলেট একেকটা শক্তিশালী বিষ। দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু খুব দ্রুত কাজ করে ট্যাবলেটগুলো। জিজ্ঞেস করতে পারো, গুহায় যখন আটকা পড়ে ছিলাম তখন কেন ব্যবহার করলাম না ট্যাবলেটগুলো। কারণ একটাই—আশা ছাড়িনি আমি, জ্যাফেট যখন উধাও হয়ে গেল তখন হয়তো মনের ভুলেই ভেবেছিলাম আমাদের জন্য কোনো-না-কোনো সাহায্য নিয়ে আসবে সে। কিন্তু এভাবে যে ধরা পড়ে যাবো আবাটিদের হাতে ভাবতেও পারিনি। তা ছাড়া আত্মহত্যা করা কাপুরুষের কাজ, কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই আমাদের—তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে আমাদেরকে মারবে আবাটিরা আর তা সহ্য করবো আমরা তা হয় না। জানি না তোমরা পারবে কি না কিন্তু আমি অন্তত পারবো না এই বয়সে। তাই যদি সত্যিই তুলে দেয়া হয় আমাকে উন্মত্ত আবাটিদের হাতে তা হলে তখন ব্যবহার করবো আমি ট্যাবলেটগুলো। চাইলে তোমাদেরকেও দিতে পারি একটা করে ট্যাবলেট, একটা খেলেই কাজ হয়ে যাবে এক মিনিটের মধ্যে।'

হাত বাড়িয়ে একটা করে ট্যাবলেট নিল সবাই আমার কাছ থেকে।

'আমার পরামর্শ হচ্ছে,' বলে চললাম, 'যদি দেখো নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছে যগুয়া আমাদের জন্য শুধু তখনই খেয়ে নিয়ো ট্যাবলেটগুলো। তা হলে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা আর পূরণ হবে না আবাটিদের। তবে আশা করি ওই অবস্থা আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারবে তোমরা সবাই।'

'চমৎকার,' শার্টের পকেটে বিষের ট্যাবলেট ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল হিগস, 'তবে মুশকিলের কথা কী জানো? আমি আবার পানি ছাড়া ট্যাবলেট খেতে পারি না। কী আর করা, চুষে চুষেই হয়তো খেতে হবে আমাকে ট্যাবলেটটা।'

আরও তিনটা দিন কেটে গেল, কিন্তু কিছুই ঘটল না। উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দেয়া হলো না আমাদেরকে, নিয়ে যাওয়া হলো না ফাঁসির মঞ্চে, আবার কেউ দেখাও করতে এল না আমাদের সঙ্গে। শুধু খাওয়ার সময় হলে খাবার নিয়ে এল ওই ভৃত্যরা। আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, একজন "দেশদ্রোহী"কে যতটুকু এবং যে-মানের খাবার দেয়া হয় সাধারণত, আমাদেরকে তার চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক ভালো খাবার দেয়া হচ্ছে। যা দেয়া হয় তার সবটুকুই খেয়ে নিই আমরা, তাই শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেতে সময় লাগল না আমাদের। আরও একটা ব্যাপার–"আগামীকাল আর হয়তো খাবার জুটবে না আমাদের কপালে", এই কথাটাও মাথায় থাকে আমাদের।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এসেছে অলিভারের মধ্যে, স্বাভাবিকভাবেই। বলতে গেলে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে সে, সারাক্ষণ কী নিয়ে যেন ভাবে, উদাস হয়ে থাকে। ওর ভাবনার বিষয়বস্তু বুঝতে কষ্ট হয় না আমাদের। কী হয়েছে রানি মাকেডার, এতদিন হয়ে গেল তারপরও দেখা নেই কেন, কোনো খবর পর্যন্ত নেই—নিজের খাটে শুয়ে বা বসে এসবই ভাবে সে সারাদিন চুপ করে থেকে।

আমাদের মধ্যে একমাত্র রডরিকই কিছুটা হাসিখুশি। আসলে বছরের পর বছর ফাংদের হাতে বন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে ওকে, মৃত্যুর ভয় কাজ করেছে ওর মধ্যে সবসময়, তাই আমাদের এই বন্দিদশা ওর জন্য তেমন কোনো দুশ্চিন্তার কারণ বলে মনে হয় না।

চতুর্থ দিন সকালে অন্য দিকে মোড় নিল ঘটনা।

boiRboi.net

সকালে, নাস্তা শেষ করেছি মাত্র, এক ধাক্কায় কে বা কারা যেন খুলে ফেলল আমাদের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, যশুয়ার নিজস্ব দেহরক্ষী-বাহিনীর উর্দি পরা এক দল সশস্ত্র সৈন্য ঢুকছে আমাদের ঘরে। সবার সামনে একজন অফিসার। ঘরে ঢুকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় হুকুম করল লোকটা, 'ওঠো সবাই, এখনই যেতে হবে তোমাদেরকে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'বিচার হবে তোমাদের। রানি ওয়ালদা নাগাসটা আর তাঁর মন্ত্রণাসভার সদস্যরা বিচার করবেন তোমাদের।'

'আমাদের অপরাধ?' রানি মাকেডার বিচার করবেন আমাদের কথাটা শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না অলিভার।

নিষ্ঠুর হাসি হাসল অফিসারটা। 'আগে গিয়ে দাঁড়াও রানির সামনে, তখনই জানতে পারবে কী অপরাধ করেছ তোমরা। ...চলো। দেরি করলে অথবা যেতে না-চাইলে তোমাদের মাথা কেটে ফেলার আদেশ আছে আমার উপর।'

'হ্যাঁ, চলো,' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল হিগস। 'রানি মাকেডা যখন আছেন ওখানে তার মানে অন্তত অলিভারের খাতিরে সুবিচার পাওয়ার আশা করতে পারি আমরা।'

'আশাটা বাদ দিতে পারো, হিগস,' নিচু কণ্ঠে বললাম আমি।

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল সে।

'সব কেমন উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে আমার কাছে। মনে হচ্ছে পুরো ছকটাই পাল্টে গেছে যেন। আর রানির ব্যাপারে এতখানি ভরসা না-করাটাই বোধহয় ভালো হবে। হাজার হোক মেয়েমানুষের মন, কখন কী সিদ্ধান্ত নেবে তা ওরা নিজেরাও জানে না।'

ভ্রূ কুঁচকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল হিগস। 'দেখো, তুমি যদি এভাবে কথা বলো তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া

boiRboi.net

হয়ে যাবে আমার। কার ব্যাপারে কী বলছ তুমি বুঝতে পারছ? রানি মাকেডা পরিবর্তন করবেন তাঁর মন? তা-ও আবার আমাদের ব্যাপারে? আর আমাদের কথা-না-হয় বাদই দিলাম, অলিভার আছে না আমাদের সঙ্গে? তিনি কি নিজের মুখে বলেননি অলিভারকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি?'

'বলেছেন,' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম, 'কিন্তু আমি জানি যশুয়াও তাঁকে ভালোবাসে, যদিও ওই লোকটার ওই আবেগকে ভালোবাসা বলা যায় কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে, আর আমার অনুমান যদি ভুল না-হয়, রানি মাকেডা এখন যশুয়ার হাতের পুতুল।'

বিশ

আমাদের চারজনকে একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল ওরা। দেখলে যে-কেউ ভাববে আমরা বোধহয় ভিক্ষা করতে যাচ্ছি। একেকজনের গালে বড় বড় দাড়ি, ক্ষৌরকর্মের সুযোগ পাইনি কতদিন তা নিজেও জানি না, এমনকী কাঁচি বা ক্ষুরও নেই আমাদের কাছে, সব নিয়ে নিয়েছে আবাটিরা।

ঘর থেকে বের হয়ে দেখি, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেক সশস্ত্র সৈন্য, অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। চারদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলল ওরা, যাতে কোনোভাবেই পালাতে না-পারি আমরা। রানির দরবারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ টের পেলাম, আমাদেরকে এভাবে ঘিরে ফেলার আরও একটা কারণ আছে সৈন্যদের—উন্মত্ত জনতার হাত

থেকে রক্ষা করতে চায় ওরা আমাদেরকে, যাতে একটুকরো পাথরও কেউ ছুঁড়তে না-পারে আমাদের দিকে।

দূর থেকে দেখতে পেলাম রানি মাকেডার প্রাসাদটা। এখন ওটাকে প্রাসাদ না-বলে প্রাসাদের কঙ্কাল বললেই বোধহয় মানায় বেশি। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, ধসে পড়েছে দু'দিকের দেয়াল। জানালা-দরজা কিছুই বাকি নেই, তবে দরবারকক্ষটা আগের মতোই আছে–উন্মুক্ত, আর শত শত মানুষ দিয়ে ঠাসা। আমাদেরকে দেখামাত্র বিস্ফোরিত হলো ওদের ক্রোধ, রক্তলোলুপ প্রাণী যেমন তার অসহায় শিকারের উদ্দেশ্যে গর্জন ছাড়ে আমাদের উদ্দেশ্যেও ঠিক একইভাবে, সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল ওদের শ্লোগান, 'দেশদ্রোহীদের ক্ষমা নাই, চার বিদেশির রক্ত চাই!'

এই দৃশ্য কত ভয়ঙ্কর তা যে না-দেখেছে সে কোনোদিনও বুঝতে পারবে না। পুরুষদের কথা বাদই দিলাম, উজ্জ্বল পোশাক আর বর্ণিল সাজে সজ্জিত নারী আর এমনকী শিশুদের হাতও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে ক্রোধে, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা, সমানে থু থু মারছে ওরা আমাদেরকে লক্ষ্য করে যদিও তা পৌঁছাতে পারছে না আমাদের কাছে।

'কী লাভ হলো, বাবা?' আমার পিছনে থাকা রডরিক জিজ্ঞেস করল আমাকে এমন সময়। 'এই লোকগুলোর জন্য এত পরিশ্রম করে কী লাভ হলো তোমাদের? আজ দেখো, এরাই তোমাদেরকে খুন করার জন্য কীরকম উন্মুখ হয়ে আছে!' বলেই মাথা নিচু করল সে, কারণ কে যেন হঠাৎ করেই বেশ বড় একটুকরো পাথর ছুঁড়ে মেরেছে আমাদের দিকে। 'যে মানুষগুলোর উচিত ছিল সারাজীবন তোমাদেরকে মাথায় করে রাখা, তোমাদের জন্য তাদের আবেগ আজ এত বদলে গেল কেন?'

'দুটো কারণে,' জবাব দিলাম আমি। 'এক, বংশ-পরম্পরায় যে-নারী তাদের রানি, তিনি, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কাকতালীয়

হলেও সত্য, মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছেন আমাদের কোনো একজনকে। দ্বিতীয় কারণ, আবাটিদের কারও স্বামী বা ভাই বা ছেলে মারা গেছে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। আরও কথা আছে। অনেক দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি, ভিনদেশীদের পছন্দ করে না ওরা, আর বাইরে থেকে যতটা সহজ-সরল বলে মনে হয় ওদেরকে আসলে প্রকৃতিগতভাবে ওরা খুব নিষ্ঠুর, কাপুরুষরা যে-রকম হয় সাধারণত। তা ছাড়া এখন ফাংদের কোনো ভয়ও নেই ওদের, তাই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো দরকার দেখছে না ওরা।'

'এরা শুধু কাপুরুষই না, চরম বোকাও। ফাংদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। অনেকগুলো বছর ওদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে আমাকে। ওরা যে কতখানি প্রতিশোধপরায়ণ তা বোধহয় আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। আজ হোক বা কাল, এক মাস পরে হোক বা এক বছর পরে, ওরা আসবেই মুরে, মানে হামলা করবে। ভেবো না ধর্ম রক্ষার তাগিদে করবে ওরা কাজটা, ওদের চেয়ে কম শক্তিশালী একটা জাতির কাছে পরাজয় মেনে নেবে না ওরা কখনোই।'

'আমি জানি, রডরিক। আর এ-ও জানি, যেদিন হামলা করবে ফাংরা মুরে, সেদিনটা দেখার জন্য আমাদের কেউই হয়তো বেঁচে থাকবে না।'

দিক বদল করল সৈন্যরা, সুতরাং দিক পাল্টাতে হলো আমাদেরকেও—এবার আদালত-ভবনের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। যতদূর শুনেছিলাম, ফৌজদারি-দেওয়ানি সবরকম অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হয় এখানে। আজ বোধহয় আবাটিরা ওদের সব কাজ ফেলে জড়ো হয়েছে আদালত-ভবনের বিশাল হলঘরে, দূর থেকে দেখেই বুঝলাম ভিতরে তিল ধারণের জায়গা নেই, কারণ বাইরেও উপচে-পড়া ভিড়।

সৈন্যরা ভিড় ঠেলে জায়গা করে দিল আমাদের জন্য, এগিয়ে

গিয়ে ঢুকলাম আমরা আদালত-ভবনের ভিতরে, কিছুটা ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম শুধু অপরাধীদেরকেই দাঁড় করানো হয় এখানে।

আমাদের সামনে, বেশ কিছুটা দূরে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসানো আছে পাঁচটা চেয়ার। পাঁচ চেয়ারে বসে আছেন পাঁচজন বিচারক, যাদের মধ্যে একজন যশুয়া। মাঝখানের চেয়ারটা সবচেয়ে বড় আর জমকালো, তাতে বসে আছেন রানি মাকেডা। তাঁর চেহারা বরাবরের মতোই নেকাবে ঢাকা, পরনে অতি-চমৎকার একটা আলখাল্লা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' ফিসফিস করে বলল অলিভার, 'ভালো আছে সে, নিরাপদে আছে।'

'কিন্তু ওখানে কী করছেন তিনি?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল হিগস। 'আমাদের বিরুদ্ধে যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে থাকে তা হলে আমার তো মনে হয় একই অভিযোগে তাঁকেও অভিযুক্ত করা যায়। তাঁর তো এখানে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত, সিংহাসনের মতো দেখতে ওই চেয়ারে বসার কথা না।'

যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, সেখানে, আমাদের থেকে মাত্র কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে কম করে হলেও ত্রিশ জন সৈন্য; সবার একহাতে নগ্ন ঝকঝকে তরবারি আরেকহাতে বিশাল ঢাল। আদালত-ভবনের ভিতরে উপস্থিত শত শত উন্মত্ত জনতা যাতে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে না-পারে সেজন্য বর্শা-হাতে দু'সারিতে দাঁড়িয়ে বলতে গেলে "মানববন্ধনী" তৈরি করেছে আরও কিছু সৈন্য। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই আনমনা হয়ে গেলাম আমি, জীবন কত বিচিত্র হতে পারে সে-চিন্তা এসে ভর করল আমার মনে। এই আমি ছিলাম পেশায় ডাক্তার আর নেশায় পরিব্রাজক, ভেবেছিলাম এ-জীবনে কোনোদিন নারী আসবে না কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই পরিচয় হয়ে গেল রডরিকের

মা'র সঙ্গে, আমার সুখের সংসার ভেঙে খান খান হয়ে গেল যখন মারা গেল সে আর রডরিককে ধরে নিয়ে গেল ফাংরা, বছরের পর বছর ধরে খুঁজতে লাগলাম আমি রডরিককে আর একদিন নিতান্ত কপালগুণে রানি মাকেডার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল আমার। বুনো আফ্রিকার এক কোনায়, সভ্যতার ছোঁয়া যেখানে আজও লাগেনি এবং কবে লাগবে তা-ও জানি না, প্রাচীন ধর্ম আর তার চেয়েও প্রাচীন এক রাজপরিবারের শাসনে-থাকা কাপুরুষ আবাটি আর তাদের চিরশত্রু হিংস্র ফাংরা যেখানে বলতে গেলে পাহাড় আর মরুভূমির আড়ালে অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে জন্মাবধি, সেখানে রানি মাকেডার মতো একজন মানুষ থাকতে পারেন কল্পনাই করা যায় না। ইচ্ছা করলেই রাজা বারুং-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে আর দশজন রানির মতো বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন তিনি, কিন্তু দেশ ও দেশের মানুষের কথা সবসময় মাথায় রেখে সুখ অথবা সংগ্রামের মধ্যে সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। এই মানুষরটার অনুরোধ ফেলতে পারিনি আমি, হারম্যাকের মূর্তিটা উড়িয়ে দেয়ার জন্য কত কষ্টই না করতে হয়েছে আমাদেরকে, এমনকী আমাদের সঙ্গী দেশপ্রেমিক একজন বিশ্বস্ত ইংরেজ হয়তো সবার অগোচরেই জীবন দিয়ে গেল এখানে; কিন্তু বিনিময়ে কী পেলাম আমরা? আবাটিদের ভালোবাসার বদলে অকৃত্রিম ঘৃণা এবং রাশি রাশি স্বর্ণের বদলে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ যার পরিণতি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাস্তবে ফিরে এলাম, অনেকটা হঠাৎ করেই উপলব্ধি করতে পারলাম, থেমে গেছে আদালত-ভবনের সব কোলাহল আর গুঞ্জন; তাকিয়ে দেখি, রাষ্ট্রপক্ষের উকিল জাতীয় একটা লোক এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে, সম্মানিত বিচারক আর উপস্থিত জনতার কাছে আমাদের অপরাধের বর্ণনা দিচ্ছে সে উঁচু গলায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে, '...আপনারা জানেন অভিযুক্তরা

সবাই ছিলেন আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয়কাজে নিযুক্ত বিদেশি কর্মচারী, কারণ পুরস্কারের বিনিময়ে আমাদের দেশের হয়ে কাজ করার জন্য প্রথমে চুক্তিবদ্ধ পরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু পরে উপযুক্ত সময় বুঝে বিশ্বাসঘাতকতা করেন সবাই, আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেন, দেশের সংখ্যালঘু পাহাড়ি সম্প্রদায়কে সম্মানিত মন্ত্রণাসভার বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে রীতিমতো গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেন। এ-কথা অসত্য না যে, রণনীতিতে তাঁরা দারুণ পারদর্শী, আর তাই অল্প কিছু পাহাড়ি লোক সঙ্গে নিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে দেন তাঁরা এবং আমাদের অজ্ঞাত আরও কিছু কৌশল প্রয়োগ করেন যার ফলে মারা যায় অনেক নিরীহ লোক আর আমাদের সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সদস্য। তাঁদের কারণেই জ্বলে ছাই হয়েছে মহামান্য রানির প্রাসাদ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, মহামান্য ওয়ালদা নাগাসটাকে অসহায় ও একা অবস্থায় পেয়ে ধরে নিয়ে যান তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার আগে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভূগর্ভস্থ শহরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, ইঁদুরের মতো জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়, এমনকী তাঁকে খেতেও দেয়নি ওরা। তাঁদের সঙ্গে থাকা জ্যাফেট নামের এক পাহাড়ি লোকের শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটে এমন সময়, রানিকে যারা খুঁজছিল পাগলের মতো তাদের কাছে জানিয়ে দেয় সে কোথায় আছেন আমাদের মুরের গোলাপ।'

কথায় পটু বাচাল উকিল থামল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল জনতা, 'ওরা দোষী! ওরা দোষী! মেরে ফেলো সবগুলোকে, মাথা কেটে নাও, বিদেশিদের রক্ত চাই!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে রানি মাকেডার কাছে গেলেন চার জন বিচারক, বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর যার যার আসনে গিয়ে বসলেন আবার। চেহারা দেখে সবাইকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

হাত তুললেন রানি মাকেডা, থেমে গেল জনতার কোলাহল।

boiRboi.net

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল পুরো আদালত-ভবনে। শীতল কণ্ঠে, যথেষ্ট অস্বস্তি নিয়ে বার বার থেমে থেমে বলতে লাগলেন রানি মাকেডা, 'ভিনদেশী বিধর্মী যোদ্ধারা! আজ এই আদালত-ভবনে তোমাদের বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ করা হয়েছে তার সবই সত্য। আমার দেশে, আমি থাকা অবস্থাতেই, আমার অনুমতি ছাড়াই গৃহযুদ্ধ শুরু করেছ তোমরা। খুন করেছ আমার দেশের অনেক লোককে। তোমাদের এই অপরাধের কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করার দরকার নেই, কারণ আমিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাকিয়ে দেখো তোমাদের কারণে কত নারী বিধবা হয়ে গেছে, কতগুলো বাচ্চা পিতৃহীন হয়েছে। তোমাদের কত বড় সাহস ভেবে দেখো—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ধরে নিয়ে গেছো তোমরা মাটির নীচের ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে, থাকতে বাধ্য করেছ আমাকে সেখানে যাতে কেউ তোমাদেরকে কিছু বলতে না-পারে, সহজ কথায় আমাকে জিম্মি করেছিলে তোমরা।'

অন্যদের কথা জানি না, কারণ জানার সুযোগ পাইনি, আমি স্রেফ হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম রানি মাকেডার মুখ থেকে এত জঘন্য অভিযোগ শুনে। মনে আছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম আমি তাঁর দিকে, বার বার মনে হচ্ছিল তিনি কি আসলেই রানি মাকেডা, নাকি তাঁর মতো কাউকে নেকাব পরিয়ে হাজির করিয়েছে যশুয়া।

'এতগুলো গুরুতর অভিযোগের কারণে একমাত্র নিষ্ঠুর মৃত্যু ছাড়া আর কোনো শাস্তি হতে পারে না তোমাদের,' বলে চললেন রানি। 'তোমরা জানো, ইচ্ছা করলে এখনই তোমাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারি আমি, সে-ক্ষমতা আছে আমার। কিন্তু একটা কারণে, শুধু একটা কারণে তোমাদেরকে জানে মারার হুকুম দিলাম না—বিশ্বাসঘাতক হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেছ তোমরা, ফাংদের সেই মূর্তিটা ধ্বংস করে দিয়েছ। তোমাদের শাস্তি—ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে তোমাদেরকে

মুর থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে তোমাদের মালপত্র, আর যদি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করো তা হলে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙা হবে তোমাদের। আবার যদি কখনও ভুলেও পা রাখো আমাদের এই দেশে, দেখামাত্র ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা-বিচারে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে তোমাদেরকে। যাও, বের হয়ে যাও আমাদের দেশ থেকে, আর যেন কোনোদিন তোমাদের ওই পাপী চেহারা চোখে না-পড়ে আমার।'

আমার মনে হলো পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছে আমার, চেষ্টা করেও একচুল নড়তে পারছি না আমি। রানি মাকেডা বললেন ওই কথাগুলো? রানি মাকেডা?

এদিকে রায় শোনামাত্র খুশিতে ফেটে পড়েছে সাধারণ জনতার অনেকে, অনেকে আবার জোরগলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে, 'না, বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা নাই, মেরে ফেলো ওদেরকে, মেরে ফেলো।'

উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য আবার হাত তুলতে হলো রানি মাকেডাকে। 'আমার দেশের আবাটিরা,' বললেন তিনি, 'আমি জানি আপনারা মহৎ, উদার মনের মানুষ। এই ভিনদেশী বিশ্বাসঘাতকরা যে-দেশের মানুষ, সে-দেশের আইন-অনুযায়ী কিন্তু ফাঁসির আসামিকেও ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন সে-দেশের রানি। কারণ তিনি দেশের রানি, তিনি জানেন তাঁর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেবে তাঁর দেশের লোক, কারণ তাঁরাও আপনাদের মতো মহৎ আর উদার। যদি তা-ই হয় তবে আপনারা কেন মহত্ত্ব আর উদারতার পরিচয় দেবেন না? এরা বিশ্বাসঘাতক, শাস্তি এদের প্রাপ্য, কিন্তু সেই শাস্তির দায়িত্ব আমরা কেন তুলে দিই না সেই সর্বশক্তিমানের হাতে যিনি আমাদের সবার দৃষ্টির আড়ালে থেকে পরিচালনা করে যাচ্ছেন পুরো পৃথিবীটাকে এবং একদিন যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের সবাইকে? একবার ভেবে দেখুন, যে লোকগুলো আজ আসামি হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে আপনাদের সামনে, তারা আসলে কুকুরের মতো—শিকারের জন্য যেভাবে কুকুর কাজে লাগায় লোকে আমরাও ফাংদের মূর্তি ধ্বংস করার জন্য সেভাবে কাজে লাগিয়েছি ওদেরকে, এবং ভালোমতোই শেষ হয়েছে আমাদের শিকার, এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে ফাংরা। কাজেই এখন এদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হঠাৎ মৃত্যু উপহার দিয়ে লাভ কী? বরং বেঁচে থাক ওরা আপনাদের অভিশাপ মাথায় নিয়ে, মরার আগ পর্যন্ত ভুগতে থাকুক যেভাবে মুমূর্ষু রোগী ভুগে সেভাবে। ...ওদেরকে কথা দিয়েছিলাম আমি, ঠিকমতো কাজ শেষ করতে পারলে কিছু সোনাদানা উপহার দেবো, আমি ঠিক করেছি কথা রাখবো, কারণ ঈশ্বরের কৃপায় যথেষ্ট ধনী আমরা, আমাদের ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু সোনার-জিনিস দেশের বাইরে চলে গেলেও কিছু যাবে-আসবে না আমাদের। তা ছাড়া আপনারা তো জানেনই, শিকার শেষ হলে কুকুরকে কিছু উচ্ছিষ্ট খেতে দেয় মালিক, আমরাও না-হয় সেরকম কিছু উচ্ছিষ্ট দিলাম ওদেরকে! ভেবে দেখুন, কত ভালোই না হবে যদি আমরা এই বিশ্বাসঘাতক কুকুরগুলোর অপবিত্র রক্তে আমাদের মুরের পুণ্যভূমিকে কলঙ্কিত না-করে বরং কিছু সোনাদানা ভিক্ষা দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দিই ওদেরকে আমাদের দেশ থেকে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক বলেছেন রানি!' এবার একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল উপস্থিত জনতা, 'ঘাড় ধরে বের করে দাও কুকুরগুলোকে আমাদের দেশ থেকে।'

'এই বিশ্বাসঘাতকদের বিচারকাজ এখানেই শেষ,' বলে চললেন রানি, 'তবে আরও কিছু কথা বলার আছে আমার। কে বা কারা যেন আমার বিরুদ্ধে কিছু গুজব ছড়িয়েছে—আমি নাকি এই বিদেশিদের কোনো একজনের প্রতি একটু বেশিই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম,' চূড়ান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি অলিভারের দিকে। 'কথাটা সত্যি না মিথ্যা যাচাই করুন আপনারাই।

আপনারা জানেন, কিছু কিছু বুনো কুকুর আছে, যেগুলো জাতে যেমন হিংস্র আর তেজী কাজেও তেমনই পটু। যতক্ষণ না ওদের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দেয় কেউ ততক্ষণ বশ্যতা মেনে নেয় না ওরা। আমার সঙ্গে যাকে জড়িয়ে গুজব ছড়ানো হয়েছে, সে-লোকটাও ওরকম একটা বুনো কুকুর; কাজ হাসিল করার জন্য, মানে দেশের স্বার্থেই ওই লোকটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হয়েছে আমাকে কখনও কখনও। কারণ একটাই—এমন সব কৌশল জানে সে যা জানা নেই আমাদের কারোরই, এমনকী ওর সঙ্গীদেরও না। যেমন, সে জানত কীভাবে কী করলে ধ্বংস হয়ে যাবে ফাংদের সেই বিশাল মূর্তিটা এবং কাজটা করে দেখিয়েছে সে। ...আপনাদেরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, একদম ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, আমি মাকেডা, ওয়ালদা নাগাসটা, এই দেশের প্রাচীন রাজবংশের একমাত্র জীবিত বংশধর, যাকে আদর করে সম্মান করে "মুরের গোলাপ" বলে ডাকেন আপনারা, পাগলাটে এক ভিনদেশী কুকুরের প্রেমে পড়তে পারি? কী দায় আমার পড়েছে যে, নিজের মান-সম্মান সুখ-সুবিধা সব বিসর্জন দিয়ে, রাজকুমার যশুয়ার মতো যোগ্য কাউকে বাদ দিয়ে একটা ভবঘুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে যাবো? আর চাচা যশুয়াকে যদি আমি ভালো না-ই বাসবো তা হলে তাঁর সঙ্গে বাগ্দান করতে গেলাম কেন?' তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকালেন তিনি অলিভারের দিকে, কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে গেল অলিভার কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিলেন না তিনি, 'কই, দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেউ কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না আমার কথার। তারপরও যাদের মনে এখনও সন্দেহ রয়ে গেছে, তাদের জন্য সুখবর: আগামীকাল রাতে চাচা যশুয়ার সঙ্গে বিয়ে হবে আমার। সেই অনুষ্ঠানে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আগামীকাল, আমাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী, কাচের পানপাত্র ভাঙবো আমি

যাতে প্রমাণিত হবে এই বিয়েতে পূর্ণ সম্মতি আছে আমার এবং পরের রাতে চাচা যশুয়ার দুর্গে তাঁর বউ হিসেবে যাবো আমি,' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালেন তিন বার, তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন যশুয়ার দিকে। খুশিতে গদ গদ হয়ে তাঁর সেই হাতে কয়েকবার চুমু দিল যশুয়া, কিছু বলল যা শুনতে পেলাম না আমরা।

উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা, একযোগে হাততালি দিতে শুরু করেছে সবাই।

অত্যধিক শোকেই হয়তো, নিকট অতীতের কথা মনে পড়ে গেল আমার, বোধহয় হ্যালুসিনেশনের কারণেই রানি মাকেডার কণ্ঠ শুনতে পেলাম কানের কাছে, 'অলিভার, আমার সর্বনাশ করে দিয়েছ তুমি, অথচ দেখো, এই তোমাকেই আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছি। ভবিষ্যতে কী হয় জানি না, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, যা হারিয়েছি আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। আজ না হয় কাল, এই অন্ধকার গুহায় আটকা থেকেই মরবো আমি, কিন্তু বিশ্বাস করো, ঈশ্বর যদি আমাকে বলতেন আমার প্রাণের বিনিময়ে কী চাই আমি তা হলে বার বার, হাজারবার তাঁর কাছে বলতাম, আমার অলিভারকে নিরাপদে ওর দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও যাতে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারে সে।'

'রানি মাকেডা,' অলিভারের ডাকে বাস্তবে ফিরে এলাম আমি, 'আপনার আর আপনার দেশের লোকদের বিচারে আমরা বিশ্বাসঘাতক, তারপরও কয়েকটা কথা বলার আছে আমার।'

কেউ কিছু বলল না, এমনকী যশুয়াও না। নেকাবে ঢাকা থাকার কারণে রানির চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর দু'চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারছি অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আর অনেক পরিশ্রম করে ফাংদের সেই মূর্তিটা ধ্বংস করতে পেরেছি আমরা ভিনদেশীরা,' বলল অলিভার,

'আমাদের অন্য কোনো কাজের স্বীকৃতি পাই বা না-পাই অন্তত ওই কাজটার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন আপনি আমাদেরকে, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ইচ্ছা করলেই আমাদেরকে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন আপনি, তা না-করে চরম অপমান করে চিরদিনের মতো বের করে দিলেন আপনার দেশ থেকে, এবং এর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর যদি আমাদের দেশে পৌঁছাতে পারি, তা হলে যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার আর আপনার দেশের মানুষদের এই উদারতার কথা ভুলবো না আমরা। তবে চলে যাওয়ার আগে, যদি সত্যিই এই ক'দিনে আপনাদের সামান্য কোনো উপকারও করে থাকি, সেই উপকারের একটা প্রতিদান চাই আমি।'

এবারও চুপ করে থাকল সবাই, এমনকী রানি মাকেডাও কিছু বললেন না।

'মহামান্য ওয়ালদা নাগাসটা,' বলে চলল অলিভার, 'শেষবারের মতো দেখতে চাই আমি আপনার চেহারাটা। নিশ্চিত হতে চাই, নেকাবের আড়ালে থাকা মানুষটা আর কেউ নয়, আপনি নিজে। যাতে সারাজীবন বলতে পারি নিজেকে, এমন একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার যে নিজের দেশের মানুষের স্বার্থে নিজের অতিথিদের সঙ্গে চরমতম ছলনা করতেও পিছু-পা হয় না।'

আবেগশূন্য দৃষ্টিতে অলিভারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রানি মাকেডা। আমার মনে হয় আদালত-ভবনে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ ওই সময় তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে—কী করেন তিনি দেখার জন্য। খুব ধীরে ধীরে নেকাবটা সরালেন তিনি চেহারার উপর থেকে, তাঁর সেই অনিন্দ্যসুন্দর চেহারাটা দেখতে পেলাম আমরা আরও একবার।

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মানুষটা রানি মাকেডা-ই। তাঁকে প্রথমবার যখন দেখেছিলাম

তখন নিশ্চিত ছিলাম পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে যদি কেউ তাঁর তুলনা করে তা হলে ভুল হবে, কারণ তিনি আরও অনেক বেশি সুন্দরী। কিন্তু এখন, এই ক'দিনে, আমার মনে হলো অনেক কমে গেছে তাঁর সেই সৌন্দর্য। মলিন হয়ে গেছে চেহারাটা, চোখের নীচে কালি পড়েছে, ঠোঁট দুটো চেপে বসে আছে একটা আরেকটার সঙ্গে। আমাদের প্রতি তাঁর সেই আবেগপূর্ণ দৃষ্টি তো দূরের কথা, দেখে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন তিনি, যেন চিনতেই পারছেন না আমাদেরকে। বুঝতে ভুল হলো না আমাদের কারোরই–তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ ওই শহরে কাটানো দিনগুলোতেও আসলে অভিনয় করে গেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে। এত বড় ছলনাময়ী নারী আমি কোনোদিন দেখিনি এই জীবনে, কারও ব্যাপারে কোনোদিন শুনিওনি এ-রকম কোনো কথা।

এত বড় প্রতারণা করার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন তিনি, বরং, আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, অদ্ভুত এক তৃপ্তি খেলা করছে তাঁর চোখেমুখে। গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাঁর দেশবাসীর সামনে, নীরব বাহবা কুড়াচ্ছেন সবার। একবার, মাত্র একটাবার অলিভারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না তাঁর অবজ্ঞাপূর্ণ দাম্ভিক সেই আচরণের। উপহাসের হাসি হাসলেন তিনি আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে, তারপর নেকাবটা পরে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যশুয়ার সঙ্গে কথা বলায়।

উল্লাসে আরও একবার ফেটে পড়ল আবাটিরা।

আড়চোখে তাকালাম আমি অলিভারের দিকে। মনে হলো বাজ পড়েছে ওর উপর, মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে বেচারা, একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে রানি মাকেডার দিকে। হঠাৎ শুনি বিড়বিড় করে বলছে হিগস, 'এসব দেখার আগে মরণ কেন হলো না আমার? ওই সিংহের-গুহা থেকে কেন বের করে আনতে গেলে

তোমরা আমাকে?'

ওর সেই প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ।

খুব ধীরে ধীরে ভিজে গেল অলিভারের দু'চোখ, অশ্রু গড়িয়ে নামতে গিয়েও যেন আটকে থাকল চোখের কোনায়। যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়াল সে কোমরের দিকে, যেখানে রিভলভার রাখে সে। কিন্তু রিভলভার তো দূরের কথা, একটুকরো লোহাও নেই আমাদের কাছে, কারণ সব নিয়ে নিয়েছে আবাটিরা। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ার পর হাত ঢুকাল সে শার্টের পকেটে, বের করে আনল বিষের ট্যাবলেটটা যেটা ওকে দিয়েছিলাম আমি।

হিগস বা আমি কিছু করার আগেই মুখ হাঁ করে গিলে নিচ্ছিল সে ট্যাবলেটটা, কিন্তু একলাফে ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো রডরিক, থাবা দিয়ে ফেলে দিল ট্যাবলেটটা অলিভারের হাত থেকে, তারপর জুতোর তলায় পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল সেটাকে।

রাগে মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ হয়ে উঠল অলিভারের চেহারা, হাত তুলল সে, মনে হলো মারবে রডরিককে। তারপর অত্যধিক উত্তেজনা আর শোক সহ্য করতে না-পেরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

এই দৃশ্য দেখে হা হা করে হেসে উঠলেন রানি মাকেডা। হাতের ইশারায় অজ্ঞান অলিভারকে দেখিয়ে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, 'না, আমাকে দেখে না, সোনাদানা যা পাবে ভেবেছিল তা আসলে পাবে না বুঝে জ্ঞান হারিয়েছে কুকুরটা।'

রানির কথা শুনে সম্মিলিত হাসিতে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা।

'প্রহরীরা,' বললেন রানি, 'এই ভিনদেশী বিধর্মীদের নিয়ে যাও কয়েদখানায়। তেজী কুকুরটার সৌভাগ্য, একজন ডাক্তার আছে সঙ্গে। ওর জ্ঞান ফিরলে ওদের চারজনকে নিয়ে যাবে তোমরা পাহারা দিয়ে, বের করে দেবে আমাদের দেশ থেকে।

খেয়াল রেখো, কেউ যাতে কোনো আঘাত করতে না-পারে ওদেরকে, বাধ্য না-হলে তোমরাও কিছু কোরো না, কারণ ওদের কোনো ক্ষতি হলে দেশে ফিরে গিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে আমাদের বদনাম ছড়াবে ওরা। আর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দিয়ে দিয়ো যাতে মরুভূমি পাড়ি দিতে পারে, তা না হলে আবার বলবে ওদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাইনি কিন্তু খাবার আর পানি না-দিয়ে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি যাতে আরও কষ্ট পেয়ে মরে।' কথা শেষ করে যশুয়াকে সঙ্গে নিয়ে, বিচারক আর প্রহরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি বিশাল সেই আদালত-কক্ষ থেকে।

নড়ার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছি আমরা, কী করবো বুঝতে পারছি না। এমন সময় কয়েকজন প্রহরী এগিয়ে এল আমাদের দিকে, দেখলাম ওদের হাতে বেশ বড় একটা ঢাল, চার কোনা ধরে আছে চারজন, তার মানে স্ট্রেচার হিসেবে ব্যবহার করে নিয়ে যাবে অলিভারকে।

রওয়ানা হলো ওরা অলিভারকে নিয়ে, আমরাও চললাম পিছু পিছু। উৎফুল্ল জনতা তীব্র টিটকারি দিতে লাগল আমাদেরকে, শ্লীলতার খাতিরে যার বেশিরভাগই বাদ দিয়ে বলতে হচ্ছে আমাকে, 'দেখো, দেখো, সবচেয়ে লম্বা-চওড়া ভিনদেশী শুয়োরটাকে দেখো। কত বড় সাহস আমাদের দেশের রানিকে বিয়ে করতে চায়! মুরের গোলাপকে পকেটে পুরে নিয়ে যেতে চায় মুর থেকে। উচিত শিক্ষা হয়েছে ওর—গোলাপ রয়ে গেছে গোলাপের জায়গায়, কাঁটাটা ঠিকমতোই বিদ্ধ হয়েছে শুয়োরটার হাতে।'

আরেকজন বলল, 'কাঁটার যন্ত্রণায় আবার মরল না তো শুয়োরটা? তা হলে কিন্তু বদনাম হবে আমাদের, ওর দেশের মানুষরা বলবে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি আমরা হারামিটাকে।'

যা-হোক, নিরাপদেই কয়েদখানায় ফিরে এলাম আমরা।

করার মতো যেহেতু আর কিছু নেই, তাই অলিভারের সেবাযত্ন শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান ফিরে পেল সে, এক কাপ পানি খেল। তারপর খুব ধীরে ধীরে, অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'সবই দেখেছেন আপনারা। আর কিছুই বলার নেই আমার, আশা করবো কেউ সান্ত্বনাও দেবেন না আমাকে। শুধু একটা অনুরোধ করতে চাই, আপনারা যদি সত্যিই আমার বন্ধু হয়ে থাকেন, আর কোনোদিন মাকেডার ব্যাপারে কিছু বলবেন না আমাকে এবং ওই নামটাও উচ্চারণ করবেন না আমার সামনে। সন্দেহ নেই, যা করেছে সে তার পিছনে কোনো-না-কোনো কারণ আছে। ...ঠিকই বলেছিলেন আপনি, ডাক্তার অ্যাডামস, সত্যিই আগুন নিয়ে খেলছিলাম আমি এতদিন; দুঃখ একটাই—নিজের ভুল বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেল আমার। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল আমার এতদিন, আজ বুঝলাম আমি আসলে মহাবোকা। ...চলুন, খাবার দিয়ে গেছে আমাদের জন্য, ডিনারটা সেরে নিই। আবার কবে বা কখন খেতে পারবো কে জানে!'

চুপ করে ওর সব কথা শুনলাম আমরা, কেউ কিছুই বললাম না। শুধু রডরিককে দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে নিল, বুঝতে অসুবিধা হলো না অলিভারের কথা শুনে হাসছে সে। ধমক দিতে ইচ্ছা হলো ওকে, কিন্তু জোর করে নিয়ন্ত্রণ করলাম নিজেকে—এখন এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না যাতে অলিভারের কষ্ট আরও বাড়ে।

খাওয়া শেষ করেছি মাত্র, একজন অফিসার এসে ঢুকল আমাদের ঘরে, কড়া গলায় জানাল, যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের। কথাটা বলে শেষ করেওনি লোকটা, ওর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা অধঃস্তন কয়েজন সৈন্য কয়েকটা পোঁটলা ছুঁড়ে মারল আমাদের দিকে। তাকিয়ে দেখি, আমাদের জামাকাপড়। সঙ্গে উটের-লোম থেকে বানানো চমৎকার চারটা আলখাল্লাও আছে। মরুভূমিতে রাতের বেলায় আমাদের ঠাণ্ডা লাগতে পারে

ভেবে হয়তো রানি মাকেডা দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওগুলো। এখন যে-কাপড় পরে আছি আমরা সেগুলো আর পরার উপযুক্ত নেই, বলতে গেলে ন্যাতা হয়ে গেছে, কাজেই নতুন কাপড়গুলো পরে নিলাম আমরা রওয়ানা হওয়ার আগে।

কয়েদখানার বাইরে নিয়ে আসা হলো আমাদেরকে। দেখি, সারি করে দাঁড়িয়ে-থাকা বেশ কয়েকটা উট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আশ্চর্যই হলাম কিছুটা, কারণ উটগুলো যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান আর তেজী, সুতরাং এখানে এগুলোর দামও নিশ্চয়ই অনেক। এত দামি দামি উট আমাদেরকে দেয়ার মানেটা বুঝতে পারলাম না। আরও অবাক কাণ্ড, অলিভারের জন্য যে-উটটা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা রানি মাকেডার নিজের। কখনও কখনও, খেয়াল করে দেখেছি আমি, বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে ঘোড়ার বদলে শখ করে উটে চড়তেন তিনি, আর বেশ কয়েকটা উটের মধ্য থেকে এই উটটাকেই বেছে নিতেন সবসময়। উটটা চিনতে পারল অলিভারও, তখন আরও গম্ভীর হয়ে গেল বেচারা।

'ভিনদেশী বিধর্মীরা,' আগের মতোই কর্কশ কণ্ঠে বলল অফিসারটা, 'হাবার মতো হাঁ করে কী দেখছ? এসো এখানে, তোমাদের জিনিসপত্র বুঝে নাও তা না হলে পরে আবার বলবে আমরা চুরি করেছি। ...এই যে, তোমাদের আগ্নেয়াস্ত্র আর বুলেটের বাক্স। কিন্তু এখন না, মুর থেকে যখন বের করে দেয়া হবে তোমাদের তখন এগুলো পাবে তোমরা। তা না হলে এখনই আবার খুনখারাপি শুরু করে দেবে। ...আর এই যে উটগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর পিঠে যে-বাক্সগুলো আছে তাতে কী আছে আমি নিজেও জানি না, সম্ভবত যেসব যাদুর আগুন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে সেগুলোই হবে। মাটির নীচের শহরে ওগুলো পেয়েছি আমরা, খুলে দেখার প্রয়োজনও বোধ করিনি, তা ছাড়া রানি ওয়ালদা নাগাসটাও নিষেধ করেছেন কাজটা করতে। আর শেষের দুটো উটের সঙ্গে বাঁধা বাক্সের ভিতরে আছে

তোমাদের পারিশ্রমিক। মিশর ছেড়ে বের হওয়ার আগে অথবা তোমাদের দেশে পৌঁছানোর আগে ওগুলো খুলে দেখতে নিষেধ করেছেন রানি তোমাদেরকে, কারণ তোমরা লোভী, তাই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করে দেবে। একটা উটে তোমাদের জন্য কিছু খাবার আর পানি আছে, কারণ মরুভূমিতে খাওয়ার মতো কিছু যোগাড় করতে না-পারলে আবার দোষ দেবে আমাদেরকে। ...এখন যার যার উটের পিঠে চড়ো, আর বের হয়ে যাও আমাদের দেশ থেকে চিরদিনের জন্য।'

হাঁটু গেড়ে বসে ছিল উটগুলো, সেগুলোর পিঠে চড়ে বসলাম আমরা। কয়েক মিনিট পরই মুর থেকে বের হওয়ার মূল ফটকের দিকে এগোতে শুরু করল আমাদের কাফেলা। কম করে হলেও একশ' সৈন্য পাহারা দিয়ে রেখেছে আমাদেরকে, যাতে উল্টোপাল্টা কিছু করতে না-পারি আমরা, আবার উন্মত্ত জনতাও যাতে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে না-পারে। সাধারণ আবাটিদের রাগ এখনও কমেনি, একবার কি দু'বার হামলা করার চেষ্টা করল ওরা আমাদের উপর, কিন্তু সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ করে দিল ওদেরকে।

পথ চলতে চলতে উত্তেজিত কণ্ঠে ইংরেজিতে আমাকে বলল হিগস, 'ঘটনা কী ঘটে গেছে বুঝতে পারছ? মাটির নীচের ওই শহরে যখন বন্দি ছিলাম, করার কিছু নেই ভেবে প্রাচীন রাজাদের কবরস্থান থেকে বেশ কিছু সোনার অলঙ্কার আর জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে এসে জ্যাফেটের সাহায্যে বাক্সবন্দি করি আমি, মনে আছে? বোকা আবাটিরা সেসব বাক্স ডিনামাইটের বাক্স মনে করে তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে। ...চলো চলো তাড়াতাড়ি চলো, নিজেদের বোকামি কখন আবার ধরতে পারে আবাটিরা কে জানে, তার আগেই বের হয়ে যাই ওদের এই হতচ্ছাড়া শহর থেকে! ...জানো, শুধু ওই মুখোশটার জন্যই...'

ঠিক তখনই, সুদর্শন এক আবাটি বালক একটা পচা ডিম

ছুঁড়ে মারল আমাদের দিকে, আর সেই ডিমটা এসে পড়ল ঠিক হিগসের মাথার উপরে, তারপর ফেটে গিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত কুসুম গড়িয়ে নামতে লাগল ওর কপাল-আর গাল বেয়ে। থেমে গেল ওর কথা, রাগে ভাষা হারাল সে, আর এই দৃশ্য দেখে না-হেসে পারলাম না আমরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হিগস, তারপর সে-ও যোগ দিল আমাদের হাসিতে। ভালোই হলো একদিক দিয়ে, নিদারুণ যন্ত্রণার যে-মেঘ জমে ছিল আমাদের সবার মনে, কেটে গেল সেটা।

মুর থেকে বের হওয়ার প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে যশুয়া, ওর সেই চিরাচরিত শিকলের বর্ম পরে। একটা শিশুমার যদি সওয়ার হয় ঘোড়ার পিঠে তা হলে যেমন দেখাবে, ওকেও ঠিক তেমন দেখাচ্ছে।

'বিদায়, ভিনদেশী বিধর্মীরা, বিদায়,' চূড়ান্ত ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলল সে, এবং আমাদেরকে উপহাস করে কুর্নিশ করল, 'আশা করি এখান থেকে বের হওয়ার পর নরকে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না তোমাদের। মানো বা না-মানো, তোমাদের মতো শুয়োরদের কিন্তু যাওয়ার মতো ওই একটা জায়গাই আছে। ...শোনো, অলিভার না কী যেন নাম তোমার, তোমার জন্য ওয়ালদা নাগাসটার পক্ষ থেকে একটা মেসেজ আছে আমার কাছে। তিনি বলেছেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে থাকতে বলতে না-পারার জন্য তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত। ভিনদেশী অতিথি, তার উপর আবার ভাড়া খাটা যোদ্ধা, সবার আগে তো তোমাদের দাওয়াত পাওয়ার কথা; কিন্তু তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বের করে দিলেন তিনি তোমাদেরকে মুর থেকে, কারণ আবাটিরা যদি মওকামতো পায় তোমাদেরকে, জবাই করে ফেলতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। তিনি চান না তোমাদের মতো বিদেশি কুকুরদের রক্তে আমাদের এই পবিত্র দেশটার মাটি নাপাক হয়ে যাক। তিনি আরও বলেছেন, মানে আমাকে বলতে

বলেছেন আর কী, এই দেশে যে-ক'দিন কাটালে তোমরা, যেসব কাজ করেছ আর যা যা ঘটতে দেখেছ, নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো শিক্ষা হয়েছে তোমাদের সবার। অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছ, যেসব নারী নিজেদের স্বার্থে তোমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে যাবে তারা যত ভালো ব্যবহারই করুক না কেন তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের খেয়ালখুশি মতো চলতে তারা বাধ্য থাকবে না, কারণ তারা তোমাদের ক্রীতদাসী হবে না, বরং তোমরা হবে তাদের চাকর। ...দেশে ফিরে গিয়ে...ও, না, না, এত তাড়াতাড়ি তো আবার তোমরা ফিরতে পারবে না তোমাদের দেশে, কারণ কাল রাতেই তো আমাদের বিয়ে—অন্তত মরুভূমিতে যখন থাকবে তখন আমাদের মতো নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করে এক গ্লাস করে মদ খেতে পারবে তো?' ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল সে আমাদের উটগুলো। 'আমার লোকরা মদ দিয়েছে তো তোমাদের সঙ্গে?'

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে অলিভারের চেহারা। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে। আমাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে, ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করল সে নিজের মনের আবেগ, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'রাজকুমার যশুয়া, আগামীকাল কিংবা তার পরদিন সূর্য ওঠার আগে কী হয় মুরে তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে কে? এমন অনেক কিছুই ঘটে আমাদের জীবনে, যার শুরুটা হয় ভালো, কিন্তু শেষটা ভালো হয় না। আমাকেই দেখুন না, ওই ব্যাপারে তিক্ত একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে জ্বলন্ত একজন সাক্ষী হয়ে মাথা নিচু করে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের দেশ থেকে। হয়তো এমন দিন আপনার জীবনেও আসতে পারে, যেদিন আমারই মতো অসহায় হয়ে উপলব্ধি করবেন, যাকে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন সে-ই ঠকিয়েছে আপনাকে, পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সেদিন হয়তো আমারই মতো কিছু করার থাকবে না আপনার, শুধু মাথা নিচু করে চলে যাওয়া ছাড়া,' কথা

শেষ করে গুঁতো দিল সে উটের পেটে, আবার চলতে শুরু করলাম আমরা।

চলতে চলতেই তাকালাম আমি যশুয়ার দিকে। একটু আগে অলিভারের চেহারা যে-রকম সাদা হয়ে গিয়েছিল, ওর চেহারাটা এখন ঠিক সে-রকম হয়ে গেছে। গোল গোল চোখ দুটো আরও গোল দেখাচ্ছে, যেন সমুদ্র থেকে উঠে আসা অতিকায় কোনো মাছ সে। ভয় আর ঘৃণার মিশ্র একটা আবেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে অলিভারের দিকে।

এ-ই শেষ, এরপর আর কোনোদিন রানি মাকেডার চাচা রাজকুমার যশুয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের।

তারপর, সংক্ষেপে বললে, মুরের প্রধান ফটক থেকে বের করে দেয়া হলো আমাদেরকে। শেষ উটটা যখন বের হয়ে এল ফটক দিয়ে, শুনলাম জোরে জোরে আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে প্রহরীরা। ফাংদের ভয়েই হোক, অথবা তাড়াতাড়ি গিয়ে রানি মাকেডার বিয়েতে যোগ দেয়ার তাগিদেই হোক, বিশাল দরজাটা বন্ধ করে দিল ওরা তাড়াহুড়ো করে, তবে তার আগে বাইরে ছুঁড়ে মারল আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর বুলেটের বাক্স।

দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে আবার, তাই প্রথমেই লম্বা একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলাম আমরা উটগুলোকে, যাতে একসারিতে চলতে পারে ওগুলো এবং মরুঝড়ের সময় হারিয়ে না-যায়। সঠিক জানি না কেন, ভালোই লাগছে মুর থেকে জ্যান্ত বের হতে পেরে। তবে এটা জানি আমার মতো অন্য সবাই চাইছে শুধু এই জীবনেই নয়, পরের জীবনেও যেন আর কখনও কোনো আবাটির সঙ্গে দেখা না-হয় আমাদের, এমনকী ওদের কণ্ঠও যেন শুনতে না-পাই আমরা।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই থামলাম আমরা, তাকালাম এদিক-ওদিক। কয়েক মাস আগে ঠিক এই জায়গাতেই রাজা বারুং-এর সঙ্গে "শান্তি আলোচনা" হয়েছিল আমাদের, মানে রানি

মাকেডার। কৃতিত্ব হাসিল করতে গিয়ে রাজা বারুংকে ঘিরে ফেলেছিল যশুয়া কাপুরুষের মতো, তারপর কুইকের চালাকিতে ধরাশায়ী হয়েছিল সে। যা-হোক, উট থেকে নেমে যার যার রাইফেল আর রিভলভার বের করে নিলাম আমরা বাক্স থেকে, বুলেট ভরলাম সেগুলোতে। তারপর আবার সওয়ার হলাম উটের পিঠে, চলতে শুরু করলাম একটানা।

আগেরবার শ্যাডর্যাক ছিল আমার সঙ্গে, এখন সে সম্ভবত নরকে, তাই উট নিয়ে আমাকেই চলে আসতে হলো সবার আগে, কারণ আমার সঙ্গীদের চেয়ে এই মরুভূমি ভালো চিনি আমি। অলিভার আর হিগস থাকল মাঝখানে, এবং উটগুলো যাতে দিকভ্রান্ত হয়ে এদিক-সেদিক চলে না-যায় সেজন্য সবার পিছনে থাকল রডরিক।

একঘেয়ে যাত্রা, উল্লেখ করার মতো কোনো ঘটনাও নেই। অনেকদূর চলে এলাম আমরা। আমাদের ডান পাশে এখন পরিত্যক্ত হারম্যাক শহরটা। দেখলাম, যে-তোরণটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম আমরা সেটার মেরামত চলছিল, তবে কাজটা শেষ করতে পারেনি বেচারা ফাংরা, তার আগেই দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে ওদেরকে। শহরটাও একেবারে ফাঁকা, মানুষ তো দূরের কথা একটা কুকুর পর্যন্ত চোখে পড়ল না। দূরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ফসলের জমি, পেকে আছে জমির সব ফসল, কাটার সময় হয়েছে কিন্তু কাটার লোক নেই, অরক্ষিত পেয়ে লোভী পাখির দল উৎসব শুরু করে দিয়েছে সেসব ক্ষেতে। আর কোনো সন্দেহ থাকল না আমাদের মনে—সত্যি সত্যিই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে ফাংরা।

থামলাম না আমরা, এগিয়েই চললাম। হাজির হলাম সেই উপত্যকায় যেখানে কিছুদিন আগেও সদর্পে হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল দেবতা হারম্যাকের মূর্তিটা। গতি কমল আমাদের, চলতে চলতেই তাকালাম আমরা মূর্তিটার দিকে। মাথা ছাড়া

কেমন যেন বীভৎস দেখাচ্ছে ওটাকে, তবে গুঁড়িয়ে যায়নি একেবারে। জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে, বড় বড় ফুটো তৈরি হয়েছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়, একদিকের কাঁধ আর থাবা উধাও হয়ে গেছে। যে-গুহার ভিতরে রাখা হতো পবিত্র সিংহগুলোকে সে-গুহার লোহার গরাদেটাও দেখা যাচ্ছে না, অথচ কোনো সিংহও নেই আশপাশে—তার মানে হয় মারা গেছে সবগুলো না-হয় পালিয়েছে।

এর আগে মরুভূমির একটা জায়গায় থেমেছিলাম আমরা, সেখানে বিষ খাইয়ে অলিভারের কুকুর ফারাওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল শ্যাডর‍্যাক; সন্ধ্যা নাগাদ হাজির হয়ে গেলাম সেখানে। সেদিনের মতো যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিলাম, মালপত্র নামিয়ে নিলাম উটগুলোর পিঠ থেকে, ছোট করে ক্যাম্প করলাম। এখানে তাঁবু গাড়ার আরও একটা কারণ—সুপেয় পানি আছে কাছেপিঠে, আর পরিত্যক্ত ফসলের ক্ষেতও আছে যেখানে ছেড়ে দিলে পেট ভরে খেতে পারবে আমাদের উটগুলো।

সন্ধ্যার আলো পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার আগে ক্ষেত থেকে একটা উট নিয়ে এল রডরিক, বলল আশপাশটা একটু চক্কর দিয়ে দেখতে চায় সে, কোনো বিপদ আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়। আগেই বলেছি ওর শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ, তাই যেতে দিলাম ওকে। বেশি সময় নিল না সে, ফিরে এল কিছুক্ষণ পরই। জানাল, কোনো সমস্যা নেই আপাতত।

আবাটিরা আমাদেরকে যেসব খাবার দিয়ে দিয়েছে সেগুলো থেকে কিছু খাবার বের করে নিলাম, ডিনারটা সেরে নেয়া দরকার। একবার মনে হলো, খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কি না যশুয়া; একটা উটের উপর পরীক্ষা চালিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর খেতে শুরু করলাম আমরা।

খেতে খেতে আলোচনা চলল আমাদের—কোন্ দিকে যাবো। দুটো রাস্তা আছে, মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ফিরে যেতে পারি মিশরে,

boighar.net

আবার যেহেতু বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছে তাই আশপাশের অনেক জলাভূমিই শুকিয়ে গেছে, কাজেই উত্তরের পথ ধরে এগোনোটাও এখন আর তেমন কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হয় না। শ্যাডর‍্যাক একবার এই পথের কথাই বলেছিল; আমার কাছে বহু পুরনো একটা ম্যাপ আছে, সেটা খুলে দেখি এই পথটা মরুভূমির চেয়ে সংক্ষিপ্ত, তার মানে এটা ধরে এগোলে মিশরে পৌঁছাতে সময় লাগবে কম। তা ছাড়া হিগসও দেখলাম ওই রাস্তা দিয়ে যেতেই বেশি আগ্রহী, যদিও পরে বুঝেছিলাম আসলে নতুন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দেখা পাওয়া যেতে পারে ভেবে ওই প্রস্তাব দিয়েছিল সে।

কিন্তু হিগসের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি। মরুভূমির এই যাত্রাটা দীর্ঘ আর কষ্টকর হলেও পথটা চেনা আছে আমার, তা ছাড়া এই পথ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ কারণ মরুভূমির মধ্যে আফ্রিকার বুনো কোনো গোত্র বাস করে না সাধারণত, তাই মানুষের পক্ষ থেকে হঠাৎ বিপদের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আমাদের দু'জনের কথা শুনল অলিভার, কিন্তু কোন্‌দিকে যাওয়া উচিত আমাদের সে-ব্যাপারে কোনো মত দিল না। তখন মুখ খুলল রডরিক, 'আমরা যদি উত্তর দিকে যাই তা হলে কিন্তু ফাংদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যেতে পারে আমাদের।'

'মানে?' কিছুটা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঘণ্টাখানেক আগে যে বাইরে গেলাম তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! কই, ফিরে এসে তো কিছু বলোনি আমাদের?'

'বলিনি কারণ আমি ভেবেছিলাম মরুভূমি ধরেই এগোবো আমরা, উত্তর দিকে যাবো না।'

'কী দেখেছ তুমি?'

boiRboi.net

'কাউকে দেখিনি আমি, জনমানুষের কোনো চিহ্নও চোখে পড়েনি আমার, তবে এখান থেকে আনুমানিক হাজার গজ দূরে অনেক অনেক পায়ের ছাপ দেখেছি আমি।'

'পায়ের ছাপ!'

'হ্যাঁ, পায়ের ছাপ, মানুষের পায়ের ছাপ। আমার মনে হয় বিশাল কোনো সেনাবাহিনী গেছে ওই জায়গা দিয়ে। ...চোদ্দটা বছর ফাংদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে আমাকে, ওদের উপস্থিতি টের পাই আমি আমার আশপাশে; আমার যদি ভুল না-হয় তা হলে বাবা, নিশ্চিত থাকো, রাজা বারুং হাজির হয়েছেন আমাদের খুব কাছেই, অন্তত যে-জায়গায় তাঁর সেনাবাহিনীর উপস্থিতির চিহ্ন দেখেছি আমি সেখানে ছিলেন তিনি বেশি হলে বারো ঘণ্টা আগেও।'

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে আরও কিছুদূর যেতাম, নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতাম আসলেই ওই সেনাবাহিনী রাজা বারুং-এর কি না।'

'আমারও একবার ইচ্ছা হয়েছিল এগিয়ে গিয়ে দেখি আসল ঘটনা কী, কিন্তু পরে আর সাহসে কুলায়নি।'

'কেন?'

'প্রথম কথা, আমাকে দেখতে পেলে আবার বন্দি করবেন রাজা বারুং, আমি আর বন্দি হতে চাই না। দ্বিতীয় কথা, তিনি এসেছেন, তার মানে তাঁর মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন; এমনকী স্বপ্নেও ওই ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষটার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই না আমি।'

'কিন্তু...কিন্তু রাজা বারুং-এর উদ্দেশ্য কী?' উত্তর জানা থাকার পরও প্রশ্নটা জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না। 'পালিয়ে যাওয়ার পর আবার কেন সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি এই এলাকায়?'

'মুর দখল করতে,' সংক্ষেপে জানিয়ে দিল রডরিক।

'যত কষ্টই হোক, মরুভূমি ধরেই এগোবো আমরা,' ঘোষণা করল অলিভার। 'ওটাই নিরাপদ হবে আমাদের জন্য। ...রডরিক তো শুধু ওই একটা মেয়ের চেহারা দেখতে চায় না, আর আমি ফাং বা আবাটি কারও চেহারাই দেখতে চাই না আর কখনও। ...লম্বা সময় আছে আমাদের হাতে, আরাম করে ঘুম দিন আপনারা সবাই, কাল ভোরে আবার যাত্রা শুরু করতে হবে আমাদেরকে।'

রাত দুটোর দিকে উঠে পড়লাম আমরা। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিলাম, মালপত্র উঠালাম উটের পিঠে, তারপর আবার যাত্রা শুরু করলাম। ভোরের আলো ভালোমতো ফুটে উঠার আগেই, কাল রাতে রডরিক যে-জায়গার কথা বলেছিল সেখানে হাজির হলাম। ঠিকই, হাজার হাজার সৈন্য এগিয়ে গেছে এই জায়গা দিয়ে, মুরের দিকে। ওদের সঙ্গে উট আর ঘোড়াও আছে অনেক। উষ্ণীষ থেকে খসে-পড়া পালক, অথবা তূণ থেকে অসাবধানতাবশত পড়ে-যাওয়া তীর দেখে চিনতে ভুল হলো না, এই সেনাবাহিনী রাজা বারুং ছাড়া আর কারও নয়।

নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই চলার গতি বাড়ালাম আমরা। ফাংরা যেদিকে গেছে, ডানে-বাঁয়ে না-তাকিয়ে আমরা যাচ্ছি ঠিক তার উল্টোদিকে; প্রতিশোধপরায়ণ জিঘাংসু একটা সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মতো বড় ভুল করতে চাচ্ছি না কেউই। যা-হোক, দুপুর বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম এবুর নদীর তীরে। নদী পার হতে তেমন কোনো কষ্ট হলো না আমাদের, কারণ পানি শুকিয়ে গেছে অনেকখানি। নদীর পিছনে মোটামুটি ঘন জঙ্গল, সে-রাতে সেখানেই ক্যাম্প করলাম আমরা।

পালা করে পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা, হিগস ছিল পাহারায়, ভোরের কয়েক ঘণ্টা আগে ঠেলে-ধাক্কিয়ে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল সে।

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসলাম আমি। 'কী হয়েছে?'

BoiRboi.net

'অদ্ভুত এক রঙ লেগেছে দূরের আকাশে।'

উঠে দাঁড়িয়ে তাকালাম আকাশের দিকে। নির্মেঘ, তারায় ভরা আকাশটার দূরবর্তী এককোনায় যেন সুদক্ষ কোনো চিত্রশিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ঠাঁই নিয়েছে মুরের দাম্ভিক পর্বতগুলো। ঘুমানোর আগেও দেখেছি অনেকগুলো তারা জ্বলছিল ওই পর্বতগুলোর উপরে, কিন্তু এখন আর জ্বলছে না, বরং অদ্ভুত এক লাল আভা যেন গ্রাস করে নিয়েছে আকাশের ওই কোনাটা।

কী হয়েছে তা বুঝতে আর বাকি থাকল না আমার। মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'চলো গিয়ে জাগাই অলিভারকে। ওরও দেখা দরকার কী হচ্ছে মুরে।'

আমাদের থেকে কিছুটা দূরে, একটা গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিল অলিভার, সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছে সে, দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটা টিবির উপর, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুরের ওই পর্বতগুলোর দিকে। কে জানে, হয়তো সারারাত ঘুমায়নি বেচারা, কারণ আজ রাতে বউ হিসেবে যশুয়ার প্রাসাদে যাওয়ার কথা রানি মাকেডার।

'মুর জ্বলছে,' আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে, আমরা কিছু বলার আগেই বলল সে, 'ঈশ্বর! আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে দেশটাতে। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সব। ...মাকেডা... মাকেডা...' বিলাপ করতে করতে কাঁদতে শুরু করল সে, টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল ওর গাল বেয়ে।

খারাপ লাগছে আমাদেরও। চরমতম ছলনা করেছেন আমাদের সঙ্গে রানি মাকেডা, তারপরও যে-ক'দিন তিনি ছিলেন আমাদের পাশে, বন্ধুর মতো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। যা ঘটছে এখন মুরে তা হয়তো তাঁর ভাগ্যে লেখা আছে, সে-ব্যাপারে কিছু করার নেই আমাদের, কিন্তু তারপরও যখন মনে পড়ে যায় প্রকৃতপক্ষে অসহায় ওই মানুষটার কথা, বুকের ভিতরে কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠে।

'বেচারী!' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

মরুভূমি থেকে আর বেশি দূরে নেই আমরা, তাই পরদিন ভোরে ঠিক করলাম সারাদিন বিশ্রাম নেবো, উটগুলোকেও বিশ্রাম দেবো। কারণ আগামীকাল থেকে শুরু হবে আমাদের যাত্রার সবচেয়ে কষ্টকর দিক—মরুঝড় মোকাবেলা করে, রোদে পুড়ে এবং ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করে পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে বালির সমুদ্র। তা ছাড়া এতক্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আবাটিরা, অনেক অনেক বছর পর মুর দখল করতে পেরে ফাংরা নিশ্চয়ই উৎসব শুরু করে দিয়েছে, ধরে নেয়া যায় আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসবে না কেউ, তাই কোনো তাড়াও নেই আমাদের। আরও বড় কথা, কাছেপিঠে মিঠাপানির একটা ঝরনাও আছে, কপালে এত ভালো পানি আবার কবে জুটবে ভেবে শেষপর্যন্ত থেকেই গেলাম আমরা ওই জঙ্গলের ভিতরে।

সে-রাতে পাহারায় ছিল রডরিক, ভোরের আলো ফুটে উঠতে-না-উঠতেই শুনি ডাকছে সে আমাকে, 'বাবা, বাবা, এসে গেছে ওরা, ধরা পড়ে গেছি আমরা।'

পড়িমরি করে উঠে দাঁড়ালাম আমরা, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর আগেই টেনে নিয়েছি যার যার রাইফেল।

'কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'ওই যে, ওখানে,' দূরের একটা টিবির দিকে ইঙ্গিত করল সে।

এখান থেকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না টিবিটা, তাই দৌড়ে খানিকটা পথ এগোতে হলো আমাদেরকে। কারা এসেছে জানি না, তাদের সংখ্যাও জানা নেই আমাদের, তাই ইচ্ছা করেই ঘুরপথে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে হাজির হতে হলো আমাদেরকে ওই জায়গায়।

টিবির উপরে, ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লোকটা। আতিপাতি করে তাকালাম আমরা চারদিকে, কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেলাম না। কিছুটা

boiRboi.net

আশ্চর্যই হলাম, আবার তাকালাম নিঃসঙ্গ ওই অশ্বারোহীর দিকে।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ওর ঘোড়াটা, ক্লান্তিতে মাথা নুয়ে পড়েছে জন্তুটার। যেখান থেকেই আসুক আরোহী, বোঝাই যাচ্ছে খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে হয়েছে ওকে। ভোরের আলো ফুটছে আকাশে, সেই আলোয় চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না আমরা লোকটাকে, কারণ বেশ বড় একটা আলখাল্লা পরে আছে সে, চেহারা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে ঝুলওয়ালা হুডের কারণে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় লোকটা একজন গুপ্তচর, আমাদের উপর নজর রাখার জন্যই পাঠানো হয়েছে ওকে।

কাঁধে রাইফেল ঠেকাল হিগস, কিছু না-ভেবেই টান দিল ট্রিগারে। কিন্তু ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল অলিভার, শেষমুহূর্তে একধাক্কায় রাইফেলের নলটা উপরের দিকে তুলে দিল সে, বুলেট ছুটে গেল আকাশের দিকে।

বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল অলিভার, 'কী করছেন বোকার মতো? একটা মাত্র মানুষ, সঙ্গে বেশি হলে তলোয়ার বা বর্শা থাকতে পারে, আর আমরা চারজন, চারজনের কাছেই রাইফেল আছে। ওকে গুলি না-করে বরং ধরা দরকার আমাদের, কী চায় সে জানা যাবে।'

রাইফেলের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাল লোকটা, আমরা কোথায় আছি বুঝে গেল। বেশ কয়েকবার গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে, চরম-ক্লান্ত জন্তুটা নিতান্ত অনিচ্ছায় এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

দূরত্ব কিছুটা কমার পর আরও আশ্চর্য হলাম আমরা ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকিয়ে। লোক নয়, শারীরিক গঠন-কাঠামো দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশি হলে পনেরো-ষোলো বছর বয়সী এক কিশোর এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম আমরা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাছে এসে ঘোড়া থামাল কিশোর, নামল জিন থেকে। কিন্তু

কিছুই বলল না, মুখ নিচু করে তাকিয়ে থাকল মাটির দিকে।

'কে তুমি?' রাইফেলের নল ছেলেটার দিকে ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'কেউ না,' যেন কান্নাভেজা কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ, শুনে ছেলেটার বয়স আরও কম বলে মনে হলো আমার, 'একটা জিনিস দিতে বলা হয়েছে আমাকে, আর আপনাকে সেটা দেয়ার জন্যই এতদূর এসেছি আমি। এই যে...' আলখাল্লার ভিতর থেকে বের হয়ে দুধের মতো সাদা আর মাখনের মতো কোমল একটা হাত, দেখে ছেলেটার উপর খুব মায়া হলো আমার। না জানি কে পাঠিয়েছে ওকে, আমাদেরকে খুঁজে বের করতে কত কষ্টই না করতে হয়েছে বেচারাকে। তা-ও আবার মরতে বসেছিল—ঠিক সময়েই হিগসের রাইফেলের নল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে অলিভার।

ডান হাত দিয়ে একটা আংটি বাড়িয়ে ধরেছে ছেলেটা অলিভারের দিকে। আংটিটা দেখামাত্র চিনতে পারলাম: রানি শেবার আংটি। বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে আংটিটা আমাকে দিয়েছিলেন রানি মাকেডা, ওটা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাই আমি, দেখাই হিগসকে। তারপর ঘুরে যাওয়ার পর সসম্মানে জিনিসটা ফিরিয়ে দিই রানি মাকেডার কাছে।

ওই আংটিটা দেখামাত্র চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল অলিভারের। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এই আংটি তোমাকে কে দিল? আমি জানতে চাই এই আংটি তুমি পেলে কার কাছ থেকে? এই আংটি পরার একমাত্র অধিকার যার আছে সে কি...সে কি মরে গেছে?'

'জী, জী,' কান্নাভেজা কণ্ঠে জবাব দিল ছেলেটা। 'ওয়ালদা নাগাসটার কথাই বলছেন তো আপনি? তিনি মারা গেছেন। আংটিটা ছিল তাঁর জন্য রাজবংশের ক্ষমতার প্রাচীন চিহ্ন; মরে গেলে আর কোনো ক্ষমতা থাকে না মানুষের, তাই এই আংটিরও

আর কোনো দরকার নেই তাঁর। তবে...মরার আগে এই আংটিটা আপনাকে দিয়ে গেছেন তিনি।'

হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল অলিভারের, আপনাথেকেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, বাঁধভাঙা অশ্রু গোপন করার জন্য দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

'কিন্তু...' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলল ছেলেটা, 'মাকেডা নামের যে-মেয়েটাকে আপনি ভালোবাসতেন বলে জানে সবাই সে-মেয়ে...'

থেমে গেল অলিভারের কান্না, মুখ তুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে ছেলেটার দিকে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ছেলেটা কী বলে তা শোনার জন্য।

'মাকেডা নামের ওই মেয়ে...লোকে বলে যাকে নাকি ভালোবাসতেন আপনি একসময়...এখনও বেঁচে আছে,' বলতে বলতে একটানে আলখাল্লার হুড সরিয়ে দিল ছেলেটা।

সূর্যের প্রথম আলো তখন সবে উঁকি দিয়েছিল আকাশে, সেই সোনালি আলোয় কান্নাভেজা কণ্ঠের মালিকের চেহারাটা দেখতে পেলাম আমরা সবাই।

কীসের ছেলে, এ তো রানি মাকেডা স্বয়ং!

হাঁ হয়ে গেছি আমরা সবাই, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি যার যার জায়গায়, কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

'অলিভার,' হাসছেন রানি মাকেডা, 'আমার প্রাণপ্রিয় অলিভার, তোমার জন্য সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছি আমি পথের ধুলোয়, প্রেমের প্রতীক হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি রানি শেবার এই আংটি, তুমি কি আমার এই উপহার গ্রহণ করবে? একদিন, মাটির নীচের অন্ধকার এক শহরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে তুমি আমাকে, আজ যদি বলি হ্যাঁ রাজি আছি আমি, তা হলে আমাকে কি নিয়ে যাবে তোমার দেশে?'

উপসংহার (মাকেডার নোট)

আমি মাকেডা, ওরফে ওয়ালদা নাগাসটা, ওরফে টাকলা ওয়ারদা, বংশ পরম্পরায় আফ্রিকার মুর নামের দেশটার এককালের রানি, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে, ক্যাপ্টেন অলিভার ওর্মের অনুরোধে এই বিবৃতি প্রদান করছি। আমার জানামতে আমার এই বক্তব্যের প্রতিটা অক্ষর সত্যি।

ছোট থেকেই জানতাম, পুরুষমানুষ মানেই বোকা। কিন্তু ওরা যে এত বোকা জানতাম না। আর সবচেয়ে বড় বোকা অলিভার ওর্ম। কালো জানালা, মানে প্রফেসর হিগস আর তাঁর বন্ধু ডাক্তার অ্যাডামসও কম নন এই ব্যাপারে। তা না হলে তাঁদেরকে বাঁচানোর জন্য আমার অভিনয়টা তাঁরা বুঝতে পারলেন না কেন?

অবশ্য, ডাক্তার অ্যাডামসের ছেলে রডরিক কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু মুর থেকে যে-কোনো মূল্যে পালাতে চাইছিল সে, তাই ওই ব্যাপারে ওর বাবাকে বা ওর অন্য সঙ্গীদেরকে কিছু বলেনি সে।

ইংরেজি ভাষাটা এখনও ভালোমতো রপ্ত করতে পারিনি আমি, তাই বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবো না। তা ছাড়া অল্প কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করতে হবে আমাকে, তাই বিস্তারিত বলার মতো তেমন কিছু নেইও আসলে।

ক্ষুধার জ্বালায় মরতে বসেছিলাম আমরা মাটির-নীচের ওই শহরে। তারপর আবাটিরা উদ্ধার করল আমাদেরকে, বহন করে নিয়ে গেল বাইরে। চাচা যশুয়ার হাতে বন্দি হলাম আমি। তখন

boirboi.net

এত দুর্বল ছিলাম যে, আত্মহত্যা করার মতো শক্তিও ছিল না শরীরে; তা না হলে ওই ঘৃণ্য লোকটার চেহারা আবার দেখার আগে পৃথিবী থেকে চলে যেতাম চিরদিনের জন্য।

খেয়াল করলাম, আমার সঙ্গীদের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। পরে অবশ্য জানতে পারি, আমার সঙ্গে চালাকি করেছিল ওরা—নিজেরা না-খেয়ে খেতে দিয়েছিল আমাকে। এজন্য কোনোদিনও ক্ষমা করবো না আমি ওদের কাউকে। যা-হোক, বিশ্বাসঘাতকতাই বলি আর বিবেচনাবোধই বলি, হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছিল আবাটিরা আর জ্যাফেটই ওদের কাছে গিয়ে বলে দেয় কোথায় আছি আমি এবং আমার সঙ্গে কারা আছে। তারপর আর কী, ধরা পড়ে যাই আমরা সবাই, আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ভূগর্ভস্থ ওই শহর থেকে।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমার অলিভার আর ওর সঙ্গীদের নিয়ে গেল ওরা কয়েদখানায়, আর আমাকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করল আলাদা একটা বাসায়। বুঝলাম, নজরবন্দি হলাম আমি। তবে আমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেনি ওরা, সময়মতো খেতে দিয়েছে, আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রেখেছে।

টানা কয়েকটা দিন শুধু খেলাম আর ঘুমালাম আমি। আরও একটা কাজ করলাম—ওই বিদেশি লোকরা আমার অতিথি, ওদেরকে বাঁচানো আমার কর্তব্য, তাই কীভাবে ওদেরকে বাঁচাবো তার একটা পরিকল্পনা করে ফেললাম ভেবে ভেবে।

যা-হোক, একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল রাজকুমার যশুয়া, বলল, 'এবার আমার জালে ধরা পড়েছ তুমি, পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, তা ছাড়া তোমার এখন আর কোনো ক্ষমতাও নেই। এখন তুমি আমার।'

বললাম, 'আপনি আসলে একটা বোকা। আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার জাল খুব মজবুত, আসলে সেখানে হাজারটা ছিদ্র

boiRboi.net

রয়ে গেছে। একদিন না একদিন, কোনো-না-কোনো ছিদ্র দিয়ে ঠিকই বের হয়ে যাবো আমি।'

'মানে?'

মানেটা বুঝিয়ে বলার দরকার মনে করলাম না তাঁকে। আলোচনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বললাম, 'রাজা বারুং-এর কোনো খোঁজ পেয়েছেন?'

'কেন? তাঁর আবার কী হলো? তা ছাড়া তাঁর খোঁজ নিয়ে আমার কী লাভ? মূর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, তিনি পালিয়ে গেছেন, ঝামেলা চুকে গেছে।'

সবজান্তার হাসি হাসলাম আমি তখন, আসলে ভয় ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম যশুয়ার মনে। কাজ হলো। কাপুরুষ লোকটা আমার ওই হাসিতেই চুপসে গেল একেবারে। দাপট দেখানোর চেষ্টা করছিল আমার সঙ্গে, আগের সেই শ্রদ্ধা আর ভীতি ফিরে এল তাঁর ভিতরে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। রাজা বারুং-এর ব্যাপারে যদি কিছু জানা থাকে আপনার তা হলে বলুন আমাকে। দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এতে।'

কিন্তু দেশ ও জাতির যে কোনো উপকার হবে না কোনোদিন তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার। বললাম, 'মনে রাখবেন, আমি এখনও মুরের রানি। আমার কোনো ক্ষমতা নেই—কথাটা ঠিক না। কেউ আমার সঙ্গে জোর করলে অন্তত নিজেকে খুন করার ক্ষমতাটুকু আছে আমার, তা-ই না?'

এবার পুরোপুরি ঘাবড়ে গেল যশুয়া। কিছু বলল না আর।

'আত্মহত্যা করার হাজারটা উপায় জানা আছে আমার,' বলে চললাম আমি। 'কাজেই যদি আমাকে সত্যিই পেতে চান তা হলে আমার ইচ্ছামতো কাজ করতে হবে।'

'আমি রাজি। কিন্তু...আপনার...মানে ওই লম্বা খ্রিস্টানটার কী হবে? আর ওর সঙ্গীদেরই বা কী শাস্তি দেবেন? আপনি যদি আত্মহত্যা করেন তা হলে কিন্তু ওদের সবক'টার মাথা আমি

boiboi.net

নিজের হাতে কাটবো। কীভাবে মারবো ওদেরকে আমি জানেন?' বলতে বলতে হিংসায় দাঁত বেরিয়ে গেল যশুয়ার। 'কোনো মেষপালকের হাতে যদি কোনো নেকড়ে ধরা পড়ে তা হলে সে যেভাবে মারে নেকড়েটাকে আমিও ঠিক সেভাবে মারবো আপনার...ওই লোকগুলোকে।'

'আমি আপনাকে বোঝাতে পারিনি। আমি কিন্তু বলিনি ওদের কাউকে হত্যা করা হলে আত্মহত্যা করবো আমি। আমি বলেছি, আমার সঙ্গে যদি জোর করেন আপনি তা হলে নিজেকে শেষ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না আমার হাতে। আমি বলেছি, আমাকে যদি পেতে চান তা হলে আমার ইচ্ছামতো কাজ করতে হবে। ...আর বিদেশিদের শাস্তির কথা বলছেন? হ্যাঁ, শাস্তি হবে ওদের। তবে কী শাস্তি হবে তা আমি ঠিক করবো। কিন্তু তার আগে কেউ যেন ওদের গায়ে ফুলের টোকাটাও না-দেয়।'

'দেবে না,' হাসল যশুয়া, 'আমি আশ্বাস দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, তা হলে আসুন একটা চুক্তি করে ফেলি আমি।'

'চুক্তি! কীসের চুক্তি?'

'ওই চার বিদেশিকে নিরাপদে, অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে যেতে দেবেন আপনি মুর থেকে, নিজেদের দেশে ফিরে যাবে ওরা, বিনিময়ে আপনাকে বিয়ে করবো আমি।'

আবারও হাসল যশুয়া, বোঝা গেল আমার প্রস্তাবটা ওর মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল সে, তারপর বলল, 'কিন্তু দেশের জনগণকে সামলাবেন কীভাবে? ওরা তো খুব ক্ষেপে আছে চার বিদেশির উপর।'

'জনগণকে সামলানোর দায়িত্ব আমার। আগেও সামলিয়েছি, এবারও সামলাবো। কিন্তু আমার শর্ত একটাই—চার বিদেশির কারও যেন কোনো ক্ষতি না-হয়।'

আবারও কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল যশুয়া। তারপর, যেহেতু আমাকে পাওয়ার কামনা আর মসনদের মোহ ওর মধ্যে প্রবল

boiRboi.net

থেকে প্রবলতর হচ্ছিল দিন দিন, তাই সম্মতি জানিয়ে বলল, 'চার বিদেশির কোনো ক্ষতি হবে না। আমি কথা দিলাম।'

এরপর কী হয়েছিল তা হয়তো জানেন আপনারা। অলিভার আর ওর সঙ্গীদের হাজির করা হলো আমার সামনে, দেশের জনগণের সামনে যা করা উচিত তা-ই করলাম আমি—ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলাম ওদেরকে নিয়ে যাতে আমার লোকরা বুঝতে পারে সত্যিই এতদিন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই কাজে লাগিয়েছি এই বিদেশিদেরকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এত বোকা এই বিদেশিরা! আমার অভিনয়টুকু ধরতে পারল না? নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নিল ওদের সঙ্গে ছলনা করেছি আমি? বাকিদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, কিন্তু আমার অলিভার কী করে পারল কাজটা করতে?

না, ছলনা আসলে ওদের সঙ্গে না, যদি ওরকম কিছু করে থাকি আমি তা হলে যশুয়ার সঙ্গে করেছি, আমার দেশের কাপুরুষ, কর্মবিমুখ আর স্বার্থপর লোকদের সঙ্গে করেছি যারা আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্য হামলা করেছিল আমারই প্রাসাদে।

আমার চেহারা দেখতে চাইল অলিভার, নেকাব সরিয়ে দিয়ে নির্বিকার হয়ে থাকলাম আমি, দেখে খুব মজা পেল আবাটিরা। বোকা অলিভার, বুঝতেও পারলে না, ওই সময় ওরকম যদি না-করতাম আমি, তা হলে হয় ফাঁসিতে ঝোলানো হতো তোমাদের সবাইকে, অথবা তুলে দেয়া হতো আবাটিদের হাতে আর তোমাদেরকে নাগালে পাওয়ামাত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত ওরা।

যা-হোক, আমার বিদেশি অতিথিদের যাতে কোনো অসুবিধা না-হয় সেজন্য বলতে-গেলে গৃহবন্দি হয়ে থাকার পরও সবরকম খোঁজখবর করার চেষ্টা করি আমি। সৈন্যদের বলি এমনভাবে ওদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে যাতে আবাটিরা একটুকরো পাথরও ছুঁড়তে না-পারে ওদের দিকে। ভালো ভালো খাবার আর

কাপড়ের ব্যবস্থা করি ওদের জন্য। আমার নিজের উট দিয়ে দিই অলিভারকে। মাটির-নীচের শহরে লুকিয়ে থাকার সময়ে দেখেছি, কত কষ্ট করে সোনার জিনিস সংগ্রহ করছেন "কালো জানালা"—লোভে নয়, তাঁর "পড়াশোনার" জন্য। মিথ্যা বলেছি সৈন্যদের কাছে—'এগুলো আগুনের বাক্স, যত জলদি পারো এগুলো তুলে দাও উটের পিঠে যাতে এগুলো নিয়ে বের হয়ে যায় বিদেশি কুকুরগুলো, কারণ এগুলো এখানে থাকলে আবার আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের শহরটা। কী আছে ভিতরে খুলে দেখার চেষ্টাও কোরো না, দেখতে গেলেই মরবে।'

ভীতু সৈন্যরা কোনো ঝুঁকিই নেয়নি, সবার আগে ওই বাক্সগুলো তুলে দেয় উটের পিঠে।

যা-হোক, সঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল অলিভার। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। নিজের ঘরে একা বসে নীরবে কাঁদলাম অনেক অনেকক্ষণ, কারণ আর হয়তো কখনও দেখা হবে না ওই মানুষটার সঙ্গে। কিন্তু তারপরও আমার জন্য সান্ত্বনা—যেখানেই থাকুক শান্তিতে থাকবে সে, ভালো থাকবে; হয়তো আমার চেয়েও ভালো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখের ঘর করবে। আর দুঃখ একটাই—আমাকে ভুল বুঝে চলে গেল সে চিরদিনের জন্য, কারণ ওর জীবন বাঁচানোর জন্য যশুয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া এবং জনগণের সামনে অভিনয় করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার। আমাকে হয়তো ছলনাময়ীই মনে করবে সে সারাজীবন, কিন্তু আমার এই মিথ্যা ছলনা যে ওর এবং ওর সঙ্গীদের জীবন বাঁচিয়ে দিল তা কোনোদিন বুঝতে পারবে না। দুঃখ একটাই—ওকে ভালোবাসি বলেই যে ওর কাছ থেকে আলাদা হতে হলো আমাকে তা কোনোদিন বলতে পারবো না ওকে, কারণ এ-জীবনে হয়তো আর কোনোদিনই দেখা হবে না ওর সঙ্গে আমার।

তারপর, চোখের পানি মুছে, প্রস্তুত হতে লাগলাম আমি

boiRboi.net

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য। হাসছি, একটু পর পরই হাসছি শুধু, আর আমার সহচরীরা বার বার অবাক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে। কারণ আমি জানি কী হবে আমার—যশুয়া কোনোদিনও পাবে না আমাকে।

যা-হোক, আবাটিদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী, কাচের পানপাত্র ভাঙা হলো বিয়ের রাতে, জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হলো অনুষ্ঠানটা। পরের রাতে, মুরের নামিদামি সব পুরোহিত, বড় বড় জমিদার আর মন্ত্রণাসভার সব সদস্যের উপস্থিতিতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল যশুয়া, হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, বিয়ের মঞ্চে নিয়ে যেতে চায় আমাকে। আর ঠিক তখনই, যা স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি বেশ কিছুদিন আগে, তা বাস্তবে পরিণত হলো।

অনেক, অনেক দূর থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার, তারপর আরেকটা এবং তারপর একের পর এক। নিজের প্রাসাদেই সব আয়োজন করেছিল যশুয়া, বিশাল হলঘরের বিশাল খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে আমার প্রাণপ্রিয় মুরকে। প্রথমে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো, তারপর ঢাকের গুড়গুড় শব্দের মতো এবং তারপর ধাতবখণ্ডের উপর আরেকটা ধাতবখণ্ড দিয়ে আঘাত করলে যে-রকম আওয়াজ হয় ঠিক সে-রকম আওয়াজ হতে শুরু করল একটানা।

উপস্থিত অতিথিরা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'কী? কী হচ্ছে?'

কিন্তু জবাবটা এল প্রাসাদের বাইরে থেকে, 'ফাং! ফাংরা সর্বশক্তিতে হামলা করেছে আমাদের উপর। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা আমাদের প্রধান ফটকের উপর, ভেঙে ফেলেছে ওটা।'

মুহূর্তের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সবার মধ্যে, 'ফাং! পালাও! পালাও!'

boiRboi.net

আমার হাত ধরে টান দিল তখন যশুয়া, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? চলো আমার সঙ্গে।'

আলখাল্লার ভিতরে একটা খঞ্জর লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম আমি ওর প্রাসাদে, সে আমার হাত ধরে টান দেয়ামাত্র আরেকহাতে একটানে বের করলাম আমি ভীষণদর্শন ওই খঞ্জরটা। পাগলিনীর মতো ক্ষিপ্র কণ্ঠে বললাম, 'আর একটা বার শুধু ছুঁয়ে দেখো আমাকে, শপথ স্রষ্টার, হয় তোমার না-হয় আমার রক্তের স্বাদ পাবে এই খঞ্জর।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে দু'পা পিছনে সরে গেল যশুয়া, তখনই বাইরে থেকে আবার শোনা গেল জনতার মরণ-আর্তনাদ, 'ফাং! ফাংরা হামলা করেছে আমাদের উপর, পালাও!'

আর থাকার দরকার মনে করল না যশুয়া, থাকার মতো সাহসও নেই ওর, মোটা শরীর নিয়েই যত জোরে পারল ছুটে পালাল ওর চ্যালাদের সঙ্গে নিয়ে।

উঁচু একটা চেয়ার আনা হয়েছিল আমার বসার জন্য, সেখানে গিয়ে বসে থাকলাম আমি। জানি যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই আমার, তাই ভাগ্যে যা লেখা আছে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম ওই চেয়ারে একা বসে থেকে। বাকিরা সবাই পালিয়েছে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কী হচ্ছে আমার দেশে।

যে যেদিকে পারছে, পালাচ্ছে। লড়াই বা প্রতিরোধের কথা কল্পনাও করছে না কেউ। কেউ যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ ওই শহরটাতে, কেউ গিয়ে চড়ছে উঁচু কোনো গাছে, কেউ আবার গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে কোনো পর্বতের ঢালে। মূল কথা, আবাটিদের কেউই মুরে থাকতে রাজি নয় অন্তত এই মুহূর্তে। ওদের পিছন পিছন ধাওয়া করে আসছে ফাংরা—হাজারে হাজারে। বাঁধ ভেঙে গেলে বন্যার পানি যেভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘরবাড়ি বা গাছপালা, সে-দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল আমার। কচুকাটা হয়ে যাচ্ছে আবাটিরা,

নির্বিচারে ওদেরকে খুন করছে ফাং সৈন্যরা। কোনো ঘরবাড়ি দেখলেই আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

একসময় মুরের মূল শহরটার একটা বাড়িও বাদ থাকল না, সবগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ফাংরা। উঁচু সেই চেয়ারটাতে বসে খোলা জানালা দিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে শুধু দেখছি আমি। আজ না-হয় কাল এই ঘটনা ঘটতই, জানতাম আমি; আমার ভাগ্য একদিক দিয়ে ভালো—যশুয়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগেই হামলা করল ফাংরা।

তারপর, জানি না কতক্ষণ পর, দৃঢ় পায়ে কে যেন এসে ঢুকল হলঘরে। তাকিয়ে দেখি, রাজা বারুং দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, হাতে রক্তে-রঞ্জিত একটা তরবারি। আমাকে দেখে সম্মান জানানোর ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরলেন তিনি তরবারিটা, বললেন, 'কেমন আছেন, মুরের গোলাপ? দেখলেন তো, যা বলেছিলাম তা সত্যি হলো? মুর আবার ফাংদের দখলে চলে এল।'

'হ্যাঁ,' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'মুর আবার দখল করে নিল ফাংরা।' হাতের খঞ্জরটা দেখালাম আমি রাজা বারুংকে। 'কী করবেন এবার বলুন। আপনিই মারবেন আমাকে, না নিজের বুকে চালাবো আমি এই খঞ্জরটা?'

'কোনোটাই না। যে-শহর আমাদের ছিল এককালে তা আজ আবার আমাদের হলো; নতুন করে সব শুরু করার আগে আগুন দিয়ে সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমি আবার পুনর্গঠন করবো এই দেশটাকে, আবার এখানে থাকতে শুরু করবে আমার বংশধররা। আর আপনি, আমার অধীনে থেকে শাসন করবেন এই দেশ।'

করুণ হাসি হাসলাম। 'আর কোনো দেশ শাসন করার ইচ্ছা আমার নেই। জনগণের শাসক হওয়া যে কত কঠিন একটা দায়িত্ব, কেউ যদি সৎ শাসক হয় তা হলে শুধু সে বোঝে। বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছাও আমার নেই, কারণ কোনো অবলম্বন নেই

আমার। একটা মানুষকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, সে-ও আমাকে ভুল বুঝে চিরদিনের জন্য চলে গেছে বহুদূরে, এমন একটা দেশে যে-দেশের নামটাও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না। আর আপনার বংশধরদের কথা বলছেন? নিশ্চিত থাকুন, আমার দ্বারা আপনার কোনো বংশধর আসবে না এই পৃথিবীতে, যদি আপনি জোর করতে চান তা হলে এখনই বলুন,' খঞ্জরটা আবার দেখালাম তাঁকে, 'এই মুহূর্তে জীবন দিয়ে দিই আমি।'

'না, না, ওই কাজ করতে যাবেন না। আমার পক্ষ থেকে কোনো জোর নেই আপনার উপর। ...কিন্তু কী করবেন তা হলে আপনি?'

'চলে যাবো। অনেকদূরে কোথাও চলে যাবো। কোথায় যাবো জানি না, কিন্তু শুধু জানি যাবো। তবে যাওয়ার আগে তিনটা জিনিস চাইবো আপনার কাছে। দেবেন?'

'দেবো। কথা দিলাম দেবো। শুধু বলে দেখুন।'

'এক, তেজী আর স্বাস্থ্যবান একটা ঘোড়া আর পাঁচদিনের খাবার দেবেন আমাকে, অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো আমি। দুই, জ্যাফেট নামের এক পাহাড়ি লোক আছে সম্ভবত আমাদের কয়েদখানায়, এখনও যদি বেঁচে থাকে সে তা হলে তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন আপনি, ওর কোনো ক্ষতি করবেন না। তিন, যেসব আবাটি বেঁচে আছে এখনও, তাদেরকে প্রাণে মারবেন না, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন দেবেন না।'

হাসলেন রাজা বারুং। 'যা যা চাইলেন, কথা দিচ্ছি তার সবই আপনাকে দেবো আমি। আপনি জানেন আপনাকে খুব পছন্দ করি আমি, তাই আরও একটা কিছু দেবো, যা হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারেননি।'

'কী?'

'আপনার সেই প্রিয়তম এখন কোথায় আছে সেই সংবাদ।'

লাফিয়ে নামলাম আমি চেয়ার থেকে। 'বলেন কী? কোথায়

boiboi.net

আছে আমার অলিভার?'

'আমি আগেও অনেকবার বলেছি, যেসব মানুষ সৎ, জ্ঞানী আর নির্ভীক, তাদেরকে শ্রদ্ধা করি আমি, পারতপক্ষে তাদের কোনো ক্ষতি করি না, তারা আমার ক্ষতি করলেও না। ...আপনার বিদেশি অতিথিরা আপনার দেশ থেকে বের হওয়ার পর পরই আমার গুপ্তচররা অনুসরণ করতে শুরু করে তাঁদেরকে, কিন্তু কিছুই টের পাননি তাঁরা। আর গতকাল তো আরেকটু হলে তাঁদের সঙ্গে দেখাই হয়ে যেত আমার। আপনার প্রিয়তম তো আপনার উটের পিঠেই সওয়ার হয়েছেন, তা-ই না?' আবার হাসলেন তিনি। 'আগুনের যে-খেলা দেখিয়েছে আপনার অতিথিরা তার ফলে একরকম ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের দেবতার মূর্তিটা, কিন্তু জানেন হয়তো, প্রত্যেক খারাপ ঘটনার একটা না একটা ভালো দিক থাকে—এই ঘটনাও আমাদের জন্য একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। গোপন একটা সুড়ঙ্গ খুলে গেছে আগুনের ধাক্কায়, আমার গুপ্তচররা ওই সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করেছে, আর ওই পথ দিয়েই আমার অর্ধেক সৈন্য ঢুকে পড়েছে আপনার শহরে। (এখানে একটা কথা বলে রাখি। আমার মনে হয় খুবই সৌভাগ্যবশত ওই একই সুড়ঙ্গ দিয়ে মুরে হাজির হতে পেরেছিল ডাক্তার অ্যাডামসের ছেলে রডরিক। কিন্তু রাতের বেলায় পাহাড়ি ওই সুড়ঙ্গকে পাহাড়ি ঢাল বা দেয়াল ভেবে ভুল করে সে।) তারপর ওরা হামলা করেছে আপনাদের প্রধান ফটকে, ভেঙে ফেলেছে ওটা, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি অর্ধেক সৈন্য তখন অতি-সহজে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। এত সহজে মুর জয়ের জন্য নিশ্চয়ই আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার বিদেশি ওই অতিথিদের কাছে? তা ছাড়া দেবতার মূর্তি আবার গড়ে নেয়া যাবে, তা-ই না?'

'কিন্তু,' রাজা বারং-এর এসব কথা শুনতে মোটেও ভালো লাগছে না আমার, 'অলিভার কোথায় এখন?'

boiboi.net

'আমার গুপ্তচররা ভালো বলতে পারবে। ওদের সঙ্গে গতরাতের পর আর যোগাযোগ হয়নি আমার। তবে আমার মনে হয় মরুভূমিতে পৌঁছানোর আগে যে-জঙ্গলটা আছে, সেখানেই আছেন তাঁরা।'

'আর দেরি করবেন না তা হলে দয়া করে,' উত্তেজনায় রীতিমতো কাঁপছি আমি, 'আমার ঘোড়া আর খাবারের ব্যবস্থা করুন যত জলদি সম্ভব।'

চিৎকার করে কাকে যেন ডাকলেন রাজা বারুং, আমার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করার আদেশ দিলেন।

'চলে যাওয়ার আগে,' দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আমাকে বললেন তিনি, 'আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবেন?'

'কী প্রশ্ন?' উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সামলাতে না-পেরে পায়চারি করছি আমি। যদি চলে যায় আমার অলিভার? যদি খুঁজে না-পাই আমি ওকে ওই জঙ্গলের ভিতরে? তা হলে কী হবে?

'আজ যদি হামলা না-করতাম আমি তা হলে কি সত্যিই বিয়ে করতেন আপনি যশুয়াকে?'

খঞ্জরটা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম আলখাল্লার ভিতরে, সেটা বের করলাম আবার। 'না, কোনোদিনও বিয়ে করতাম না ওকে। পুরোহিতের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াতাম দু'জনে, আমি জানি না, এই খঞ্জর দিয়ে কার প্রাণ আগে হরণ করতাম—আমার না যশুয়ার। তবে মনে হয় নিজেকেই শেষ করে দিতাম আমি আমাদের ধর্মমতে ওর বউ হওয়ার আগে।'

'বুঝলাম। কিন্তু...আরও একবার ভেবে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি আমি আপনাকে। বংশ পরম্পরায় আপনি মুরের রানি, আপনার শরীরে রাজরক্ত। বিদেশি এক যুবক, যে কিনা প্রকৃতপক্ষে একজন ভবঘুরে, সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তাঁর জন্য চলে যাবেন আপনি এমন এক দেশে যে-দেশে যাওয়া তো দূরের কথা, যে-দেশের নামটা পর্যন্ত ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না আপনি?

আমার বউ না-হয়েও তো আমার অধীনে থেকে শাসন করতে পারেন আপনি এই দেশটা? পারেন না?'

'পারি, কিন্তু করবো না। কারণ এই দেশের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হলে আপনার মতো কাউকেই দরকার। তা ছাড়া যখন রানি ছিলাম তখন জানতাম না আমি ভালোবাসা কী, আজ প্রেমের খাতিরে নিজের সিংহাসন তো অবশ্যই, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি আছি আমি অবলীলায়।'

মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন আমাকে রাজা বারুং। যাকে ডেকেছিলেন তিনি কিছুক্ষণ আগে, সেই লোকটা এসে ঢুকল হলঘরে, কী যেন বলল তাঁকে। তখন আমাকে বললেন তিনি, 'আমার পুরো সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে তেজী আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ঘোড়াটা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। পাঁচজন বিশ্বস্ত আর বীর রক্ষী দিয়ে দিচ্ছি আমি আপনার সঙ্গে, যতক্ষণ না ওই সাদা মানুষগুলোর দেখা পান আপনি ততক্ষণ আপনার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকবে ওরা; স্বয়ং যমও যদি আসে আপনার প্রাণ হরণ করতে, নিশ্চিত থাকুন, এরা ঠেকিয়ে দেবে তাঁকে। ...সেই লম্বা-চওড়া বিদেশি যুবকটা কতই না ভাগ্যবান—আজ বাদে কাল মুরের সুগন্ধী গোলাপকে বুকে নিতে যাচ্ছে সে। ...জ্যাফেটের ব্যাপারে বলেছিলেন আপনি আমাকে, কয়েদখানায় পেয়েছি আমরা ওকে, আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সে, ওকে ছেড়ে দিয়েছি আমরা। ...আর একটা আবাটিকেও যাতে প্রাণে না-মারা হয় সে-আদেশও দিয়ে দিয়েছি আমি ইতোমধ্যে। তবে, যগুয়াকে খুঁজছে আমার লোকরা, এবং আমি শপথ করে বলছি পাওয়ামাত্র হত্যা করা হবে ওকে। দয়া করে কিছু বলতে যাবেন না ওর জন্য, দেবতা হারম্যাকের শপথ, আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না।'

দেরি করার কোনো মানে হয় না, তাই রাজা বারুংকে বিদায় জানিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালাম আমি।

boiRboi.net

তারপর? তারপর মুরের রাস্তায় রাস্তায় যে-দৃশ্য আমি দেখলাম তার বর্ণনা আর দিতে চাই না, দেয়ার দরকারও নেই। শুধু বলি, আমার সেই স্বপ্নের একটা দৃশ্যও একটুও এদিক-ওদিক হয়নি।

...অলিভার, আমার প্রাণপ্রিয় অলিভার, আর কিছু বলার নেই আমার। মুরের সিংহাসনে আর কোনোদিনও বসার ইচ্ছা নেই আমার, কারণ ষড়যন্ত্র আর জটিলতায় ভরা ওই দেশটার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর একটা রাজ্য খুঁজে পেয়েছি আমি—তোমার মন।

***

boiRboi.net